ড্রাগন সীড

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত

পার্ল বাকের উপন্যাস

ড্রাগন সীড

গুড আর্থ

দুই ধারা

পেট্রিয়ট

মাদার

ড্রাগনসীড

পার্ল বাক

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব ॥ কলিকাতা-১২
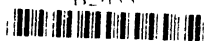
। বাংলা অনুবাদ : পার্থ কুমার রায়
। প্রচ্ছদপট ও নামপত্র : মণীন্দ্র মিত্র

প্রথম ইংরেজী সংস্করণ : ১৯৪১
প্রথম বাংলা সংস্করণ : ১৯৫৪
দ্বিতীয় বাংলা মুদ্রণ : ১৯৫৭

দাম : ৫.২৫

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর : মুরারিমোহন কুমার, শতাব্দী প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১৪

ড্রাগনের বংশ

চীনাদের কাছে ড্রাগন কোনো অসৎ শক্তির প্রতীক নয়, ড্রাগনকে তারা মনে করে দেবতা, মানুষের বন্ধু, উপাস্য দেবতা ব'লে। "সম্পদ ও শ্রীর" অধিদেবতা হলেন ড্রাগন। বারি ও বায়ুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব, তিনি জলদ-দেবতা এবং সেইজন্য প্রাচুর্যের প্রতীক ব'লে গণ্য হন। কথিত আছে, হ্‌সিয়া শাসনকালে দু'টি ড্রাগন পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মেতে প'ড়েছিলেন এবং লড়তে লড়তে তাঁরা দু'জনেই অন্তর্ধান করেছিলেন। উর্বরা ফেনপুঞ্জে সে-যুদ্ধ ক্ষেত্র ভরে উঠেছিল। সেই ফেনপুঞ্জ থেকে হ্‌সিয়ার লোকেরা জন্ম গ্রহন করে। একটা বীর জাতির স্রষ্টিকর্তা হিসেবে ড্রাগন গণ্য হয়ে থাকেন।

। এক ।

লিংটান কান খাড়া ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। এক হাঁটু জলে ক্ষেতের কাজ করতে করতে তার কানে ভেসে আসে দূর থেকে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। এই অবেলায়ই বা কেন ডাকছে সে? খাবারও সময় নয় এখন, ঘুমেরও নয়—তবে ডাকছে কেন? ক্ষেতের আর এক কোণে ঘোলাটে জলে ডান হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধানের চারা রুয়ে চলেছে তার দুই ছেলে।

লিংটান চেঁচিয়ে ওঠে: 'হেই! তোদের মার গলা না?'

বাপের ডাকে দুই ছেলে একসঙ্গে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের মন গর্বে ভরে ওঠে। সবল দৃঢ় গঠনের জোয়ান দুই ছেলে। বিয়ে তাদের সে দিয়েছে। বড় ছেলে লাও-তা—বৃদ্ধের দুই নাতির বাপ। কোলের ছোট নাতিটির বয়স মাত্র এক মাস। মেজ ছেলে লাও-এর। তারও বিয়ে হয়েছে এই মাস কয়েক হ'ল। এরই মধ্যে তার বৌ গুমরতে সুরু করেছে। ছোট ছেলে লাও-সান। দূরে সবুজে-ঘেরা পাহাড়ের কোলে মোষের পিঠে চড়ে ঘাসের বনে সে মোষ চরিয়ে বেড়ায়। দুটি মেয়ে; বড়জনের বিয়ে দিয়েছে সে শহরের এক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে,—বাড়ীর পিছন থেকে শহরের দিকে তাকালে তাদের বাড়ীর দেয়ালটা চোখে পড়ে। আর ছোট মেয়ে এখনও অবিবাহিতা।

'ও বুড়ো মিন্‌সে...কালা বোবা নাকি গো?' স্ত্রীর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এসে লাগে।

'হ্যাঁ, মা-ই তো ডাকছে,' লাও-তা বলে। তিনজনের মুখে মুচকি হাসি। লিংটান ধানের চারাগুলো বাঁ হাত থেকে জলের ধারে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে: 'নাঃ, এই অসময়ে কাজ বন্ধ ক'রে যাওয়া মানেই পয়সা নষ্ট করা, গোটা টাকা জলে ফেলে দেওয়া...তোরা কিন্তু থামিস না বাপু!'

'তুমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পার বাবা—' জ্যেষ্ঠপুত্র বলে।

দু'ভাই নিচু হ'য়ে আবার কাজ সুরু করে। ঈষৎউষ্ণ ঘোলাটে জলে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে তারা ধানের চারাগুলো লাগিয়ে দেয়। উর্বরা ধরণীর পঙ্কে তাদের পা যায় ডুবে, নগ্ন-পিঠে এসে লাগে সূর্য-কিরণের উষ্ণতা। মাথায় বাঁশের টোকা। মৃদু কণ্ঠে কথা কয় তারা।

দু'ভাই-এর বয়সের ব্যবধান এক বছরেরও কম। আশৈশব একসাথে বর্ধিত হয়েছে তারা, সখ্যতার বাঁধন তাই সুনিবিড়। বিয়ের পরে তাদের জীবনে দুইটি ভিন্ন স্ত্রীলোকের আগমন হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন চির ধরেনি। বুড়ো বাবা যখন চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, তখন তারা আলাপ করছিল মেয়েদের সম্বন্ধে —তাদের স্ত্রীদের বিষয়ে। বাবা চলে যাবার পর তারা আবার ফিরে এল ঐ অসমাপ্ত আলোচনায়। দুনিয়ার সব কিছু, খাওয়া-পরা থেকে নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দিন-রত্রির যত কাহিনী, সব কিছু তাদের চোখে বিস্ময়ের ছোপ লাগিয়ে এসে দেখা দেয়, আলোচনায় তারা জমে ওঠে। পাহাড়ের কোলে সবুজে ঘেরা এই গ্রামই হ'ল তাদের দুনিয়া। এই লিং গ্রামেই বংশপরম্পরায় তাদের বাস, এখানেই তারা বড় হয়েছে, সময়ের পদক্ষেপে ধরণীর কোল থেকে নীরবে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। পুরুষানুক্রমে তারা এই জমি চাষ করেছে...পিতা-পিতামহের হাতের কর্ষিত ভূমি আজ তারা চাষ করছে। শহরের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'তে চায় না তারা। শহর তাদের ভালোও লাগে না। দূরের ঐ শহর তো শুধু তাদের হাট-বাজার। বোনের বিয়ে শহরে হওয়ায় খোঁজ-খবরের জন্যে মাঝে-মধ্যে শহরে যেতে হয় বটে তবে চাষবাসের কাজে ব্যস্ত থাকায় খুব কমই শহরে যাওয়া হ'য়ে ওঠে।

বাঁশের টোকার নিচে তারা কথা কয়। কর্মব্যস্ত হাতের সুনিপুণ চঞ্চলতায় ধানের চারাগুলো সামনের জলে শিকড় গুঁজে দাঁড়াতে থাকে একে একে, পিছনের জল নিজের ব্যাপ্তিকে সঙ্কোচন ক'রে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে ভরিয়ে দেয় চারা গাছের দোলায়।

'আচ্ছা বলতে পার, দাদা, স্ত্রীর অঙ্গে যে বীজ বোনা হয় তার কি ফল হবে, তা কি আগেই বোঝা যায়?' লাও-এর প্রশ্ন করে।

মৃদু হেসে লাও-তা জবাব দেয়: 'ও তো অন্ধ চাষ রে! বারে বারে তাই বীজ ছড়াতে হয়। এতো আর দিনের আলোয় মাঠে চাষ দেয়া নয়।...তোর বৌ কি বাধা দেয় নাকি রে?'

'প্রথম প্রথম ঝামটা মেরে উঠত—'

'তাহ'লে দিন তিনেক একেবারে ছুঁবি না। তারপর প্রথম রাতে যেভাবে নতুন বৌর কাছে এগুতে হয়, ঠিক সেই ভাবে এগোবি। বীজ বোনার আগে জমিটা তৈরি করতে হয় রে, যেমন তেমন ক'রে বীজ ছড়িয়ে দিলেই তো আর ক্ষেতে ফসল হয় না। সব ঠিক ঠাক ক'রে ভাল ক'রে তাতিয়ে তবেই না

রুইতে হয়! বেশ ভালভাবে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়, ঠিক এমনি ভাবে...'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লাও-তা তার সুডৌল হাতটা নরম কাদার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এক একটা ধানের চারা রোপন ক'রে দেয়।

উদগ্র মন নিয়ে লাও-এর দাদার কথা গেলে। আধো লজ্জায় বিনম্র বদনে বলে: 'কিন্তু আমার যে তর সয় না, অন্নেই—'

'ও, তবে তো ফসল না হওয়ার মূলে তুই নিজেরে!' দুষ্টুমিভরা চাহনি হেনে ভাইয়ের দিকে মৃদু হেসে বলে লাও-তা: 'যাক না বছরখানেক, তখন বৌ ফেলে ব্যাটা হবে মাথার মণি!'

'কিন্তু বৌ যে রকম করে, মাসিক দেখা দিলেই ও যায় ক্ষেপে...'

মেজাজী যুবতী স্ত্রীটির কথা মনে হতেই, তার চাল-চলনের কথা চোখের ওপর ভেসে উঠতেই, দু'ভাই হেসে ওঠে। লাও-তা'র স্ত্রী হ'ল মোটাসোটা, মেজাজ যে নেই, একেবারে যে ভিজে মাটি—তাও নয়, তবে মেজাজ চেপে রাখতে সে শিখেছে। কিন্তু লাও-এরের বৌ ঠিক যেন কালবৈশাখী—আসতে যেতে দোলা উঠিয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই লাও-এর তার প্রেমে ডুবেছে।

লাও-তা ভালবাসতো তার স্ত্রীকে, কিন্তু সে-ভালবাসায় ছিল পরিমাপ। বয়োবৃদ্ধদের শয়ন, ভ্রমণ, মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে প্রত্যাগমনের দিকে নজর রেখে লাও-তা প্রকাশ করতো স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা। গৃহে ফিরে এসে লাও-তা যদি দেখত বয়োজ্যেষ্ঠরা তখনও জেগে রয়েছে, সে ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে একথা ওকথা বলে সময় কাটাতো। একটা নিশ্চল নিথর প্রেম তার স্ত্রীর প্রতি। বিছানার এক প্রান্তে নিদ্রামগ্না স্ত্রীর পাশে সে এসে শুয়ে পড়বে, কোন চঞ্চলতা নেই, উদ্দীপনার কোন পরশ নেই তার প্রেমে।

কিন্তু তার চঞ্চলা দামিনীর দুষ্টুমির কোন খেই খুঁজে পেত না লাও-এর। দুষ্টুমির ঝলকে চমক দিয়ে বেড়ায় সে কামিনী। ধরে বেঁধে বিছানায় বন্দী না করলে তাকে পাওয়া ভার। প্রতি সন্ধ্যায় অস্থির আবেগে লাও-এর সুযোগ খুঁজত বধূটির পাশে আসতে, কিন্তু সাথীদের দুষ্টুমি-ভরা মুচকি হাসি বাধা দিত তাকে। নাম তার সুবৃহৎ, কিন্তু লাও-এর ডাকত 'নীলা' বলে। ঘরে এসেই সে ঐ নামেই স্ত্রীকে জানাত প্রথম সম্ভাষণ। কিন্তু এসেই কি আর ঘরে পাওয়া যেত সে-মেয়েকে! এক জায়গায় দু'বার কেউ তাকে দেখতে পাবে না। প্রতীক্ষার আকুলতা নিয়েও তো নীলা স্বামীর জন্য ঘরে বসে থাকে না! তবে কি নীলা ভাল-

বাসে না তাকে? কিন্তু সাহস হয় না প্রশ্ন করতে। কি জানি, যে ভাবে হেসে ওঠে ও! প্রশ্ন শুনে হয়ত দপ ক'রে রাগে জ্বলে ওঠার মতই হো হো ক'রে দিলখোলা হাসিতে ফেটে গড়িয়ে পড়বে। যে মেয়ে বাবা!...কি ক'রছে এখন নীলা একা একা? সকালে মাঠে এসেছিল একবার ধানের চারা রুইতে, কিন্তু এবেলা তো আর আসবে না। দুপুরে খাওয়ার পরে ঘুম-কাতুরে নীলা, 'ঘুম পেয়েছে' ব'লে শুয়ে পড়েছিল। নীলার পাশে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল লাও-এরের। কিন্তু সেই ভরা-দুপুরে বৌ-এর পাশে শোয়ার সাহস হয়নি তার। ক্ষেতে ধান রোয়ার কাজ রয়েছে, বাবা চেঁচিয়ে উঠবে। নিদ্রামগ্না প্রিয়াকে বারে বারে তাকিয়ে দেখে চলে আসতে হয়েছে লাও-এরকে...ছোট্ট মেয়ের মত কী সুন্দর কচি মুখখানা নীলার!... কিন্তু কতক্ষণ ঘুমুবে ও, তারপর ঘুম থেকে উঠে কী করবে?...সূর্যের দিকে তাকিয়ে আঁচ করবার চেষ্টা করল কত প্রহর বেলা হ'ল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও আবার কাজে মন দিল।

বাড়ির উঠানে ছায়ামণ্ডপে বসে লিংটান এক অপরিচিত ফেরিওয়ালার সঙ্গে কথা বলে। সানটুং-এর রেশমী আর মোটা কাপড়ের ফেরিওয়ালা সে। বসন্ত-কালে এরা দক্ষিণে বয়ে নিয়ে যায় নানারকমের মনোহারী পণ্য, আর গ্রীষ্মের সুরুতে দক্ষিণের সুন্দর রেশমী কাপড় নিয়ে ফিরে আসে উত্তরের বাজারের জন্য। ভাল কাপড় তার সব বিক্রি হ'য়ে গেছে, অবিক্রীত পড়ে আছে কতগুলো মোটা ঘেসো কাপড়। কৃষাণের ঘর ছাড়া ঘসঘসে মোটা কাপড়ের খদ্দের পাওয়া যাবে না বুঝে ফেরিওয়ালা গাঁয়ের পথ ধরেছে। লিং গাঁয়ে ঢুকে লিংটান-এর শ্রীমণ্ডিত গৃহ দেখে সে এগিয়ে এসেছে এ-বাড়ির দিকে। এ-বাড়ির পানে তাকে আরও টেনেছে দরজায় দণ্ডায়মানা তন্বী বধূটি। তন্বী বধূর সঙ্গে কথা কইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির গৃহিণী লিংসাও দরজা খুলে বেরিয়ে এসে কর্কশ কণ্ঠে খ্যাঁক ক'রে উঠল: 'বউড়ী-ঝির সঙ্গে কথা কেন রে মিনসে, আমাকে ডেকে কথা কইতে পার না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা,—তোমার কথাই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম...' ফেরিওয়ালা একবার নিরীক্ষণ করেই বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাই, বড় পাকা-পোক্ত গৃহিণী। বলল: 'জিনিসপত্তর বেচে এখন ফিরছি উত্তরাঞ্চলে আমার দেশে। পথে পড়ল তোমাদের এই গ্রাম মা, তাই এলাম। গরমের সময় পরনের কিছু ভাল কাপড় আছে, নিতে পার...শুনলাম এ অঞ্চলে তোমার নাম ডাক—'

'বক্তৃমা থামিয়ে কাপড়টা বের কর তো দেখি—' ফেরিওয়ালাকে থামিয়ে দিয়ে গৃহিণী বলে।

মৃদু হেসে ফেরিওয়ালা কাপড় বের করে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দাম নিয়ে নরম গরম গলায় চিৎকার স্থরু ক'রে দিল ক্রেতা-বিক্রেতা।

'জলের দামে কাপড়টা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কী-ই-বা করি বল...শুনছি এই গ্রীষ্মেই বলে লড়াই লাগছে আমাদের ঐ উত্তরাঞ্চলে।'

গৃহিণীর হাত থেকে কাপড়টা খসে পড়ে যায়। 'লড়াই? লড়াই আবার কাদের সঙ্গে—?

'আমরা কি আর লড়াই চাইছি মা? পূব-সাগরের ওপার থেকে সেই বামন-গুলো, যারা কেবলই যুদ্ধ চায়—তারাই তো স্থরু করেছে।'

'তবে কি যুদ্ধ এদিকেও হবে?' চিন্তিত কণ্ঠে গৃহিণী জিজ্ঞেস করে।

'কি ক'রে বলি মা!'

এর পরেই লিংসাও তার স্বামীকে চেঁচিয়ে ক্ষেত থেকে ডেকে আনে। লিং-টান এসে উঠানের পাথর বাধানো ছায়ামণ্ডপে বসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সব শোনে। শীতে সূর্য-কিরণে লিংটান-এর বাড়ির চত্বরটি বেশ গরম থাকে, গ্রীষ্মে ছায়ামণ্ডপের নিচটা হয় সুশীতল। উঠানের এক কোণে লিংটান-এর কোন্ এক পূর্বপুরুষ ডোবা কেটে পদ্ম-লতা ভাসিয়েছিল। সেই পদ্ম বনের বুকে ফুটে রয়েছে ছ'টা ফুল—তাদের হলদে বুকে জল জল করছে পদ্মরাগ। ছায়ামণ্ডপের নিচে বসে সর্বঋতুতেই তারা ভাত খায়, গল্প করে। টেবিলের পাশে ব'সে লিংটান ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সব শোনে। গৃহিণী বাটিতে ক'রে তাদের চা ঢেলে দিয়ে এক কোণে বসল জুতো তৈরির সাজসরঞ্জাম নিয়ে। মোটা চামড়ার সুকতলার সঙ্গে কাপড় সেলাই ক'রে জুতো তৈরি করে লিংসাও। লম্বা সুচ দিয়ে সেলাই ক'রে পাকানো সুতোটা দাঁত দিয়ে কেটে হেঁচকা টানে ছিঁড়ে নিচ্ছে। স্ত্রীর এই দাঁতের কসরত দেখলেই লিংটান আর একদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিত। কি জানি কেন, লিংসাওর এই দাঁতের কসরত দেখলেই লিংটানের গা'টা কেমন শিউরে ওঠে।

ফেরিওয়ালাকে লিংটান প্রশ্ন করে: 'পূব-সাগরের বামনরা আমাদের দেশের কিছু লোককে হত্যা করেছে, বলছ?'

'উত্তরাঞ্চলে তারা আমাদের ছেলে মেয়ে শিশুদের পর্যন্ত হত্যা করেছে।'

চা পান শেষ ক'রে ফেরিওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ে। 'কালকের মধ্যেই আমাকে আবার পেংপু পৌঁছোতে হবে। এবার তাহ'লে উঠি মোড়ল।' ফেরিওয়ালাদের মতই তার চেহারাও অতি সাধারণ ; নানাধরনের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরুণ তার কথাবার্তার কায়দাও বেশ সরস।

চিন্তামগ্ন লিংটান নিজে নিজেই বলে ওঠে : 'কেন, কি জন্য এ লড়াই ?'

তার এ-প্রশ্নের জবাব কেউ দেয় না, প্রশ্ন সে কাউকে বিশেষ ক'রে করেও নি। বোঁচকা-বুঁচকি কাঁধে তুলে, মাথাটা একবার নুইয়ে ফেরিওয়ালা বিদায় গ্রহণ করে। লিংসাও কেবল আনমনে জুতো সেলাই ক'রে চলে। কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে থেকে লিং টান বাড়ির চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। এই গৃহ...এই গৃহেই পুরুষানুক্রমে তারা বাস ক'রে আসছে। প্রাচীনরা গতায়ু হয়েছেন, তারপর এই গৃহে এই বংশে এসেছে সে একা। সেই প্রাচীনকালের ইঁটের দেওয়ালের বাড়ি, টালির ছাউনি, ইঁটের দেয়াল দিয়ে কোঠা তৈরি, মাটির আস্তর দিয়ে গেঁথে তারই ওপর চুনের পোছ দেওয়া। এই গৃহে সে বাস করছে...করছে তার তিন পুত্র, এসেছে বংশের ভবিষ্যৎ জনিতৃ নবশিশু, পৌত্র।

চারদিকের নিথর নিস্তব্ধতার ছোঁয়াচ এসে লাগে পদ্মগুলোর বুকেও। তারাও যেন থরো থরো কেঁপে ওঠে। ঘরের ভিতরে নবশিশুর ক্রন্দন কানে আসতেই লিংসাও-উঠে ভেতরে চলে যায়, লিংটান একা বসে থাকে, ভাবে তার জীবনেতিহাস।...পাহাড়ের কোলে সবুজে-ঘেরা তাদের এ গাঁয়ের পাদদেশ চুমে বয়ে চলেছে এক স্রোতস্বিনী চাষবাসের জলাভাব মিটিয়ে দিয়ে। শহরও অনতিদূরে। ক্ষেতের দৌলতে তার অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল—গরীবও নয়, ধনীও নয়। তার একটি মাত্র ছোট মেয়ের মৃত্যু ছাড়া, এ-বাড়িতে এ-পুরুষে মৃত্যু প্রবেশ করেনি। ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও শরীর তার বেশ শক্ত-সমর্থ, যুবা বয়সের মত কর্মক্ষম। লিংসাও যদি সন্তান গর্ভে ধারণ করবার বয়স পেরিয়ে না যেত, তবে সে এখনও আরও সন্তানের পিতা হ'তে পারত। উপপত্নী রাখবার জন্য গাঁয়ের এক বৃদ্ধা মাঝে মাঝে তাকে জ্বালাতন করত, কিন্তু উপপত্নী রাখতে সে রাজী নয়। উপপত্নী!...বৃদ্ধাকে হেসে উড়িয়ে দিত লিংটান। উপপত্নী.. উপপত্নী আসবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের শান্তি যাবে উড়ে। উপযুক্ত সমর্থ ছেলেরা রয়েছে ঘরে। তাছাড়া এ-গৃহের কর্ত্রী লিংসাও..পরস্পরকে তারা দেখেছে, জেনেছে, আরও গভীর ভাবে ভালবেসেছে, অন্তস্তল পর্যন্ত যার কাছে অগোপন

তারই সামনে আসবে তারই সমপর্যায়ে নতুন যুবতী !...ভূতের নাচন সুরু হবে সংসারে, তিষ্টোন যাবে না একমুহূর্ত।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কোমরের শ্লথ কাপড় জড়াতে জড়াতে লিংটান গৃহপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে ক্ষেতে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে তার দুই ছেলে ক্ষেতের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছে, আর ঘণ্টাখানেক কাজ করলেই সবটা ক্ষেতে চারা রোয়া শেষ হবে। তাদের কাজ দেখে বেশ হৃষ্ট মনে ভাবে লিংটান: 'বাস সবটা ক্ষেতেরই কাজ শেষ হ'য়ে গেল, এই ফসলেই গোটা পরিবারের বছরের খাদ্যের সংস্থান হ'য়ে যাবে।'

বৃদ্ধ নিজে কাজে নেমে আসে। ক্ষেতের কাজে উবু হ'য়ে মাথা নোয়াতেই নিচের ঘোলাটে জলে নিজের পাতলা চতুষ্কোণ মুখের ছায়া ভেসে ওঠে। তার মাথার টোকার দড়িটা থুতনির সঙ্গে কেমন এঁটে লেগে থাকে। অনেকেরই থুতনিতে এঁটে লাগে না ব'লে দাঁত দিয়ে দড়িটা কামড়ে ধরে কাজ করতে হয়। তার খুড়তুতো ভাইকেও টোকা মাথায় রাখতে হয় দাঁত দিয়ে দড়িটা কামড়িয়ে ধরে।...খুড়তুতো ভাইটি কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। সরকারী কাগজপত্র, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম-নামা পড়ে অর্থ উদ্ধার করতে পারত সে। লিংটানের ধারণা, খবর—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক—ঠিক কানে এসে পৌঁছোয়ই। সুতরাং কাগজের উপর ঐ আঁকা নক্সা পড়তে শিখবার জন্য সময় নষ্ট করবার এমন কি দরকার? নিজেও সে পড়তে জানত না, ছেলেদেরও পাঠশালায় পাঠায়নি। ইদানীং শহর থেকে ছেলে-মেয়েরা গাঁয়ে এসে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝাতে চাইছে। কিন্তু এদের রক্তহীন পাণ্ডুর চেহারা দেখে তাদের বক্তৃতায় বিশ্বাস করবার কোন কারণ খুঁজে পায় না লিংটান। নিজের জীবনের অভ্যস্ত গতিপথে সে গড়িয়ে চলবে, তার ছক-করা জীবন-দর্শনের বিচ্যুতি ঘটবে না এতটুকুও।

দিনের শেষে কাজের সমাপ্তিতে তারা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, মাথার টোকা খুলে পিঠে দেয় ঝুলিয়ে। তারপর লাও-তা জিজ্ঞেস করে: 'মা কেন ডেকেছিল, বাবা?'

'ওঃ, উত্তরাঞ্চল থেকে এক ফেরিওয়ালা এসেছিল।'

বহুক্ষণ ধরে ফেরিওয়ালার কথা নিয়ে লিংটান চিন্তা করেছে। এখান থেকে উত্তরাঞ্চল অনেক, অনেক দূরে—ও নিয়ে চিন্তা ক'রে কোন লাভ নেই। সে ভাল ক'রে ধানের চারাগুলো নিরীক্ষণ ক'রে দেখল। সবুজ চারাগুলো ঘোলাটে

জলের উপর কালো রেখাপাত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেরা তারই মতন বেশ সোজা ক'রে চারাগুলো জলের ভেতর মাটির বুকে লাগিয়ে দিতে পারে। জামার হাত দিয়ে মুখটা মুছে লাও-এরকে ডেকে বৃদ্ধ বলে :

'যা তো রে, তোর কসাই খুড়োর দোকান থেকে কিছু শুয়োরের মাংস কিনে নিয়ে আয়। আজ রাতে বাঁধা কপির সঙ্গে খাওয়া যাবে।'

বড় ভাই একটু শয়তানি ক'রে এগিয়ে এল : 'আচ্ছা আমি যাচ্ছি, বাবা…!' বৃদ্ধ তার দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখল মেজর মুখটা রক্তিম হ'য়ে উঠেছে। লাও-তা হো হো ক'রে হেসে উঠল। মেজ ভাই এদিক ওদিক ক'রে লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইল। এদের হাব ভাব দেখে বৃদ্ধ মৃদু হাসল। এখনও ছেলেমানুষ এরা! মৃদু হাসতে হাসতে আনন্দচিত্তে বৃদ্ধ গৃহপানে এগোল। গৃহে প্রবেশ করবার আগেই লিংটান দেখল লাও-এর তার আগেই অতি দ্রুত বাড়িতে ঢুকে গেল। ওঃ! এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরবার গরজের কারণ তবে বাড়ির ভেতরেই আছে! কিন্তু বৃদ্ধের মনে একবারও জাগল না যে তার পুত্রবধূই ছেলেকে এভাবে গৃহের কোণে ছুটিয়ে নিয়ে আসে।

লাও-এর নিজের ঘরে ঢুকে দেখে নীলা নেই সেখানে।

'নীলা, 'নীলা!' অধীর আগ্রহে চাপা কণ্ঠে ডাকে লাও-এর। চারদিক নীরব নিথর। তবে বোধহয় দুষ্টুমি ক'রে লুকিয়েছে কোথাও। নিচু গলায় আবার ডাকে : 'নীলা, ও নীলা!' কিন্তু কোন সাড়া আসে না। শূন্য ঘরে শুধু প্রতিধ্বনি ওঠে। ওর মনে ভয় হয়, তবে কি নীলা ওকে ছেড়ে চলে গেল?…মার কাছে নেই তো? উঠান পেরিয়ে লাও-এর ছোটে রান্নাঘরের দিকে। দেখে, উনুনের পাশে বসে মা ফুটন্ত ভাতের নিচে আস্তে আস্তে কাঠ খড়-কুটো ঠেলে দিচ্ছে। লাও-এর লজ্জায় সোজাসুজি মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। কিছুক্ষণ:চুপ থেকে কণ্ঠস্বরে রাগের ভাব মিশিয়ে বলে ওঠে :

'তুমি আবার উনুনে কাঠ ঠেলতে বসেছ মা, কেন তোমার বৌ গেল কোথায়? সে কি এটাও পারে না…অকেজো, আলসে…'

'একেবারেই অকেজো। সেই দুপুরের পর থেকে আর তার দেখা নেই। ঘটক বেটা আমাদের ঠকিয়েছে।…হবেই বা না কেন? পা-খোলা মেয়ে…ডানা গজিয়েছে, ফুর ফুর ক'রে চারধারে উড়ে বেড়ায়। আমাদের ছোট বেলায় পা থাকত বাঁধা, বয়স বাড়লে এভাবে আর কেউ বাড়ি থেকে বের হ'তে পারত না।'

লাও-এর এবার রেগে বলে উঠল: 'আচ্ছা, আমি ওকে এবার এমন পিটব—'

'হ্যাঁ, তাই দরকার হ'য়ে পড়েছে...তবে হ্যাঁ, জানিসকি—' মার চোখে হাসির ঝলক খেলে যায় : 'আজকালকার মেয়ে, মারা অত সহজ নয় !'

শুষ্ক হাসি হেসে মা আগুনের লেলিহান জিহ্বায় রসদ ঠেলে দেয়।

সুগৃহিণী লিংসাও বাপের বাড়ি থেকে শিক্ষা পেয়েছিল, স্বামীর অবস্থা যাই হোক না কেন, সংসারে কোন জিনিসের যেন অপচয় না হয়। অপচয় বাঁচিয়ে চলার গুণ কি আর আজকালকার মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়? সেই যে বিপ্লব হ'ল, তারপর সব গেল বদলে, মেয়েদের পায়ের বাঁধনের রীতি গেল বন্ধ হ'য়ে। এ-বাড়ির মেয়েদেরও পায়ের বাঁধন আর পড়ল না, এমন কি বাড়ির বড় বৌ অকিডের ছোট বেলায় পায়ে যে বাঁধন ছিল, বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সে-বাঁধনও খুলে ফেলতে হয়েছিল। উনুনের ধারে বসে মা সংসারের আরও কত কি ভাবে। সংসারে তো বৌরাই সবকিছু, তারাই পারে সংসারকে শ্রীমণ্ডিত করতে, তারাই পারে সংসারে আগুন জ্বালাতে—শান্তি-অশান্তি সবই তাদের হাতে। সংসারে বৌরাই তো খুঁটি। ছেলেরা তো হাতের পুতুল, সত্তাহীন—ওদের ওপর কি আর সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!...হুঁঃ, নীলাকে মারবে লাও-এর? ও পারবে না।...যৌবনে ওর মিনসে দু'বার ওকে মেরেছিল...কত শক্ত জোয়ান ছিল লিং টান, ছেলেরা তো ওঁর তুলনায় কিছু না...নরম তুলতুলে। আর ও নিজেও তো নেহাৎ দুর্বল ছিল না, স্বামীর মারধোরের সমুচিত জবাব ও দিত কামড়ে খিমচে, কিল-ঘুসি দিয়ে। এখন পর্যন্ত স্বামীর ডান কানের লতিতে ওর কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। লিংটানকে কানের এই ক্ষতচিহ্নের কথা জিজ্ঞেস করলে হাসতে হাসতে ও জবাব দিত : 'ওঃ! এক পাহাড়ী বাঘিনী ধরেছিল—!' লিংসাও-র বাপের বাড়ী ছিল পাহাড়-দেশে। হুঁঃ, আর নীলা—নীলাকে মারবে লাও-এর? তবেই হয়েছে!

ভাত ফুটে সুবাসিত গন্ধে মাতিয়ে দিচ্ছে চারদিক। কয়েকটা ভাত টিপে দেখে উনুনের আঁচ দেওয়া বন্ধ ক'রে বৃদ্ধা সোজা দাঁড়িয়ে হাই ছাড়ল। তারপর বাসনগুলো জলে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নিল। ভাপে ভাপে এখন ভাত বেশ সিদ্ধ হ'য়ে যাবে। হাঁটু দুটিতে একটু চিন চিন করছে, কিন্তু ওদিকে আর মন দেয় না সে। ও-বেলার কিছু মাছ-তরকারি রয়েছে, তা'দিয়েই এবেলা চলে যাবে। বাড়ির পিছনের ডোবার জলের মাছ, খরচের দরকার নেই, শুধু জাল ফেলে ধরা সাপেক্ষ।

উঠানের টেবিলে থালাগুলি সাজিয়ে, ভাত খাওয়ার কাঠিগুলো রেখে গৃহিণী ঢোকে নিজের ঘরে। লিংটান এক বালতি ঠাণ্ডা জলে তারই হাতে বোনা গামছা দিয়ে নিংরিয়ে নিংরিয়ে গা মুছে ফেলছে। কোন কথা না বলে গৃহিণী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে স্বামীর সুগঠিত সুন্দর নিটোল পরিষ্কার দেহ। কথা বললে কিংবা হাসলেও তার মুখ থেকে কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। ওর খুড়তুতো দেওরের মুখ দিয়ে যা বিশ্রী দুর্গন্ধ! তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিল এক দিন লিংসাও : 'ওর পাশে শোও কি ক'রে গো ?' জবাবে সে বলেছিল : 'ও-দুর্গন্ধ তো সব পুরুষের মুখেই।' লিংসাও বেশ একটু গর্বের সাথেই বলেছিল সেদিন : 'আমার মিনসের মুখে ওসব বাজে গন্ধ নেই বাপু।'

গা মুছে ফেলে নীল রংএর পা-জামাটা কোমরে জড়াতে জড়াতে লিংটান বলে : কৈ গো, খেতে দাও।' শুয়োরের মাংসের কথা হঠাৎ মনে পড়ায় বলে : 'ওঃ, একেবারে ভুলে গেছি, লাও-তাকে পাঠিয়েছি কিছু মাংস আনতে।'

চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে গৃহিণী বলে : 'আবার মাংস আনতে দিলে, ওবেলার মাছ-তরকারি তো রয়েছে!'

'তা থাক, আজ মাংস খাব।' একটু জোরেই বলে লিংটান।

রান্নাঘরে গৃহিণী দেখল মাংস আনা হ'য়ে গেছে ; পদ্মপাতায় লাল ও সাদাটে মাংসটা জড়ান রয়েছে। ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিল—না, মাংসটা খারাপ দেয়নি। ওদের কসাই আত্মীয়টি লিংটানকে সম্মান করত, লিংসাওকে করত ভয়। খারাপ মাংস চালিয়ে দেবার জায়গা এ নয়, সে জানত। বেশ ভাল ক'রে মাংসটা কুচিয়ে নিয়ে নুন আর রসুন মাখিয়ে গোল গোল গুলি পাকিয়ে ফুটানো জলে চাপিয়ে দিল। গৃহিণী লিংসাও পাকা রাঁধুনী ; লিংটান দু' কলকে তামাক শেষ করবার আগেই রান্না নামিয়ে ফেলল।

রান্নাঘরের দোর থেকে গৃহিণী বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করে : 'কিরে তোদের বাপের হ'য়ে গেছে ?'

লাও-তা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে : 'হ্যাঁ, আমরা বসছি।'

লিংটান ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে লাও-এরকে ডাকে।

ঠাণ্ডা কপির তরকারিটা গরম ভাতে মেশাতে মেশাতে মা জবাব দেয় :

'ওকি আর এখন শুনবে, ও খুঁজছে ওর বৌকে!'

একটা হাসির রোল ওঠে উঠানে। দুইটি পুরুষের হাসি—যাদের স্ত্রীদের খুঁজে বেড়াতে হয় না। থালায় ভাত বেড়ে নিয়ে আসতে আসতে মা তাদের হাসিতে

যোগ দেয়। বড় বৌ ব্লাউজের বোতাম আঁটতে আঁটতে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বলে : 'আমি ভাত বেড়ে দিই মা—' কিন্তু দোর থেকে সে আর এগোল না। তারপর সেও না বুঝে সকলের সঙ্গে যোগ দিল হাসিতে; হাসির কারণ খুঁজে দেখবার দরকার নেই তার, এ-বাড়ির সহজ-হাসির দোলায় সে নিজেকে দিল দুলিয়ে।

ওদের খেতে বসবার পরেই কনিষ্ঠ পুত্র লাও-সান মোষের নাকের দড়ি ধরে টানতে টানতে বাড়িতে ঢুকলো। সুন্দর গড়নের ছিমছাম ষোল বছরের ছেলেটি। একেবারে চুপচাপ স্বভাব, কথা বলে না বললেই হয়। তার সঙ্গে কেউই কথা বলল না, আশাও করেনি সে। কিন্তু তার ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের স্নেহভরা দৃষ্টি তার উপর দিয়ে বয়ে গেল, বাপের তড়িৎ চাউনি তার উপর দিয়ে চলে গেল। তারা দুজনেই দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল ছেলের সর্বাঙ্গীণ কুশল। অন্য কেউ বুঝত না, কিন্তু লিংসাও এই ছেলেকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। ছেলের মেজাজের জন্য তার প্রকাশ হ'তে পারত না। খুঁটিনাটি ব্যাপারে বড় দু'ভাইয়ের ওপরে ও নিত ছোটর সুযোগ এবং তারাও তাতে আপত্তি করতো না। মাঝে মাঝে বেশী বিরক্ত হ'লে ওর মুণ্ডিত মস্তকে গোটা কয়েক গাট্টা বসিয়ে দিত। বাপ-মায়ের আব্দারে-আহ্লাদে লাও-সান হ'য়ে উঠেছে অতি একগুঁয়ে, যার জন্যে ওকে কিছু করতে পর্যন্ত তারা বলত না। পাহাড়ের কোলে মোষ চরাতে পাঠিয়ে দিয়ে লিংটান ওর একগুঁয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

ছোটর প্রতি তাদের এই মনোভাবের মূলে ছিল তার সৌন্দর্য। এত সৌন্দর্য কি দেবতারা দেখতে পারে? বাপ-মায়ের তাই অষ্টপ্রহর ভয় ছিল এই বুঝি হিংসুটে দেবতারা নিজেদের কাছে টেনে নেয় ছেলেকে। বড় সুন্দর চেহারা ওর। দীর্ঘ টানা দুই চোখে স্বচ্ছ শুভ্রতার ওপর জ্বলছে যেন নিকষ কালো বৈদূর্যমণি। চৌকো মুখখানায় পরিপূর্ণ নিটোল ঠোঁট দুটি—যেন খোদাইকরা প্রতিমার মুখ। কিন্তু কেমন যেন একটা তন্দ্রালু আবেশ শৈথিল্যের মত জড়িয়ে আছে ওর সমস্ত সত্তায়—ভাল লাগে না সর্বক্ষণ, তবু ওর নানা দোষের মত এ-ত্রুটিটুকুও ধরে না কেউ। গত দু'বছরে ও অনেকখানি বড় হয়েছে।

লাও-সান মাটির কলসী থেকে খানিক জল কাঠের বালতিতে ঢেলে নিয়ে আঙ্গিনার ও-ধারে বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে বেশ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে এল টেবিলের পাশে নিজের জায়গাটিতে।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বাপের মন গর্বে ভরে ওঠে। লাও-এরের জায়গাটা

এখন শূন্য রয়েছে, কিন্তু এক্ষুণি ও এসে যাবে, তারপর চারদিক উঠবে ভরে। শিশুপুত্রকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে লাও-তা ভাতের মণ্ড চিবিয়ে নরম ক'রে নিয়ে পদ্মের কুঁড়ির মত লাল টুকটুকে ছোট ঠোঁট দুটির মধ্যে গুঁজে দেয়। সন্ধ্যা গড়িয়ে ডুবে যায় রাত্রির গভীরতায় ; সন্ধ্যা-সমীরণের শীতলতা গায়ে মেখে পদ্মগুলি ঝিমিয়ে পড়ে রাত্রির সুপ্তিতে। চারদিক ঘিরে নেমে আসে নিথর নীরবতা, শুধু একটানা শব্দ আসে তাঁত-ঘর থেকে। কনিষ্ঠ কন্যা প্যানসিয়াও এখনও তাঁত চালাচ্ছে, খেতে আসবার আগে পর্যন্ত সে এই ভাবে তাঁত চালাবে।

গৃহিণী মোষটাকে কতগুলি বিচালি এনে খেতে দিল। লেজ নাড়তে নাড়তে হলদে বড় কুকুরটা খাদ্য প্রাপ্তির আশায় ছুটে এল। নেকড়ের মত দুর্দান্ত বৃহৎ কুকুরটা পরোয়া করে না কাউকে, কিন্তু মনিবের কাছে যেন ভিজে বিড়ালটি। ছুটে এসে লিংটান-এর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল। লিংটান পা দিয়ে শক্ত লোমগুলির উষ্ণতা অনুভব করতে করতে একটা মাছের টুকরো ওটার দিকে ছুঁড়ে দিল। লিংটানের গৃহস্থালির অঙ্গ এই কুকুরটিও।

লাও-এর তখনও নীলার খোঁজ করছে গৃহের চারদিকে। অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো দিগন্ত প্রসারী সবুজের ওপর মধুর মত ঢেলে পড়েছে। তার মধ্যে নীলার নীলাম্বরি নিশ্চয়ই চোখে পড়বে—ধানের সবুজ ছোট চারাগুলো তাকে ঢেকে রাখতে পারবে না। কিন্তু কোথায় ও? কোথায় এখন থাকতে পারে? চায়ের দোকানে? না, সেখানে তো পুরুষের আড্ডা। খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়িতেও যেতে পারে না নীলা, কারণ, তার সমবয়স্ক খুড়তুতো ভাইটিরও নজর ছিল তার ওপর। বিয়ের আগে নীলাকে একবার দেখে তারই মত ও-ও তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে সুরু করেছিল। ছোট খাট কথা নিয়ে তখন এই দুই আত্মীয়-প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে প্রায়ই বচসা হাতাহাতি লেগে যেত। সমগ্র গ্রামে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা জানাজানি হ'য়ে গিয়েছিল, এবং যখনই এ-দুজনের মধ্যে কোন সাধারণ কিছু নিয়ে হাতাহাতি লেগে যেত, অন্যরা ছুটে গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে দিত।

• দু'জনের মধ্যে নীলা কাকে মনে মনে চাইত, তাও সে বলত না। একদা বিয়ের আগে তার মা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, নরম কাঁধ দুটো নাচিয়ে তখন সে জবাব দিয়েছিল : 'এদের দু'জনের মধ্যে তফাৎ কি আছে, মা?

দু'হাত দু'পা, একই রকম আঙ্গুল...সবই তো একরকম, কানা-খোড়াও নয়, টেকো মাথাও কারও নেই, তবে অত পছন্দ-অপছন্দের কি আছে?'

একথা শুনে নীলার বাপ চাইল ছেলের বাপের টাকার পরিমাপ করতে। যে যত বেশী দিতে পারবে তার মেয়ের দাম, মেয়ের বরমাল্য যাবে তারই গলায়। ফলে দুই ছেলেই ছুটল তাদের বাপদের কাছে। বলতে লাগল, যদি এই মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে না দেওয়া হয়, আত্মহত্যার পথ অবধারিত সে নেবে বেছে। দুই গৃহের শান্তি গেল উড়ে। চায়ের দোকানে লিংটান একদিন তার পণ্ডিত ভাইকে ডেকে বললে:

'দেখ, তোমায় আমি তিরিশ ডলার দিচ্ছি, তুমি তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে বল যে ও-মেয়ে আমার ঘরেই আসবে। তা না হ'লে আর ঘরে তিষ্ঠোন যাচ্ছে না।'

তিরিশ ডলার! গাঁয়ের শিক্ষকের ছয় মাসের উপার্জন। সুতরাং ঘটনার ইতি হলো ওখানেই। শীঘ্রই লাও-এরের সঙ্গে নীলার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হ'য়ে গেল, তারপর দিনক্ষণ দেখে নীলা পুত্রবধূ হ'য়ে চলে এল লিংটানের গৃহে। কিন্তু লাও-এরের মনে কাঁটা হ'য়ে ফুটে রইল একটি চিন্তা: নীলাকে তো ও জিতে পেল না; প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপছন্দ ক'রে বরমাল্য স্বেচ্ছায় তো ওকে দেয় নি নীলা। কিন্তু প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না। ঘুমন্ত নীলার পাশে শুয়ে গভীর রাত্রে লাও-এর ভাবে: 'আচ্ছা আরও দিন যাক, আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মিলে মিশে যাই, তারপর ওর কাছে জানতে চাইব কেন আমাকে নিজে থেকে পছন্দ ক'রে নিল না তখন।'

কিন্তু আজ পর্যন্ত জিজ্ঞেস ক'রে উঠতে পারে নি। নীলার সর্বঅঙ্গের প্রতিটি রেখা ও দেখেছে, জেনেছে, কিন্তু নীলাকে ও পেল কই! প্রেমের পরিপূর্ণতা তাই ও খুঁজে পায় না, গভীরতার প্রশান্তিতে ও পারে না ডুবে যেতে। তড়িতে যায় প্রেম নিভে, বেদনা, বড় ব্যথাময় হ'য়ে ওঠে ওর ক্ষণিকের ভালবাসা।...

গাঁয়ের পথে দ্রুত পা চালায় লাও-এর। উন্মুক্ত প্রান্তরে বিস্ফারিত চোখ মেলে দেখতে দেখতে যায় নীলাম্বরি পরিহিতা, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা, কোন তন্বীকে দেখতে পায় কিনা। দিন কুড়ি আগে নীলা তার অত সুন্দর লম্বা চুল কেটে ফেলেছিল। সেদিন সত্যিই চটে গিয়েছিল লাও-এর। তার ক্রোধদৃপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে নীলা শুধু বলেছিল: 'বড় গরম যে—'

'তাই বলে তুমি অত সুন্দর চুল কেটে ফেলবে? কেন তুমি কেটে ফেললে ও-চুল? আমায় একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না?'

কোন উত্তর দেয় নি নীলা। ক্রোধে ফেটে পড়েছিল লাও-এর: 'কি করেছ সে-চুল দিয়ে, কোথায় রেখেছ?'

নীরব নীলা ঘরের মধ্য থেকে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ নিয়ে এসে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিল। একটি লাল ফিতে দিয়ে সে-কেশ ছিল বাঁধা। আলতো ক'রে হাতে নিয়ে লাও-এরের মনে সেদিন সত্যিই দুঃখ হয়েছিল। প্রিয়দর্শিনী নীলার সর্বসত্তার সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে ছিল এই কেশ। আজ তারই একটি অংশ স্ব-ইচ্ছায় কেটে বাদ দিয়ে দিল নীলা! একবার জিজ্ঞাসাও করল না তাকে! হারানোর ব্যথা সেদিন জমে উঠেছিল তার মনে, হৃদয়াবেগ ফেটে পড়তে নিয়েছিল দু'আঁখি বেয়ে। 'কি হবে এখন এ-দিয়ে?' অতি ধীরপ্রশ্ন বেরিয়েছিল তার বেদনাহত মুখ দিয়ে।

'কেন, বেচে দাও, বেচে দিয়ে...আমাকে এক ..এক জোড়া কানের দুল কিনে দিও।' বলেছিল নীলা।

'তুমি কানে দুল পরবে? কৈ তোমার কানে তো ফুটো নেই!' আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করেছিল লাও-এর।

'হ্যাঁ, পরব। কান ফুটিয়ে নেব'খন।'

'আচ্ছা দুল এনে দেব, তাই ব'লে তোমার চুল বিক্রি করে দুল কিনতে হবে?'

কোন কথা না বলে লাও-এর উঠে গিয়ে সেই কেশগুচ্ছ অতি সযত্নে নিজের বাক্সে তার অন্যান্য প্রিয় বস্তুর সঙ্গে রেখে দিয়েছিল। সে-বাক্সে ছিল তার শিশু বয়সের ছোট্ট রূপোর হার, আর ছিল দু'একটি ভাল জামা কাপড়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদূর ভবিষ্যতে যখন সে বৃদ্ধ হবে, পক্ককেশিনী বৃদ্ধা হবে নীলা, যখন যুবা বয়সের স্মৃতি রোমন্থন ক'রে তারা দিন কাটাবে, তখন নীলার এই ঘন-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ বাক্স থেকে বের ক'রে সতৃষ্ণ নয়নে দেখবে লাও-এর বারে বারে, আলতো ক'রে হাত বুলোবে সেই কেশের পরে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত দুল কিনে আনতে পারে নি লাও-এর। ঊষা থেকে গোধুলি পর্যন্ত একটানা কাজ ক'রে যেতে হয়েছে ক্ষেতে, এতটুকু ফুরসত পায় নি। আজই মাত্র শেষ হ'ল ধানের চারা রোয়ার কাজ।

বৌয়ের খোঁজে বেড়িয়েছে, এ-কথা যাতে তার হাবে-ভাবে প্রকাশ না পায়, সেদিকে সতর্ক খেয়াল রেখে সে গাঁয়ের পথে হাঁটতে থাকে। কিন্তু সজাগ দৃষ্টি

রাখে গাঁয়ের কোথাও নীলাম্বরি তন্বীকে দেখতে পায় কিনা। মনে মনে সে ঠিক করে, যদি নীলা দুষ্টুমি না ক'রে থাকে তো কাল শহরে গিয়ে এক জোড়া দুল কিনে আনবে তার জন্য। আজই রাতে ওকে জিজ্ঞেস ক'রে রাখবে কি রকম দুল ওর পছন্দ। কিন্তু কোথায় নীলা ? কোথায় গেল সে ? হঠাৎ ওব মনে ভয়ের ঢেউ ওঠে : ওর মনে পড়ে খুড়তুতো ভাইয়ের কথা। নীলার ওপর তার নজর ছিল, লাও-এরের সঙ্গে নীলার বিয়ে হওয়ার পরেও তো সে এখনও বিয়ে করে নি। নীলাকে হারানোর ব্যথা এখনও সে-ছেলে ভোলেনি। খুড়োর বাড়ির পথে সে পা বাড়ায়। বাড়ির দোরে বসে ছুঁচলো মুখো খুড়ী তখন গামলায় ক'রে চুমুক দিয়ে কি খাচ্ছিল। বৌয়ের কথা তো সুজাসুজি গুরুজনের সামনে তোলা যায় না, সুতরাং ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে লাও-এর :

'কি খুড়ীমা, কি খাচ্ছ ?' লাও-এর সতর্ক থাকে যেন উৎকণ্ঠা প্রকাশ না পায় তার কণ্ঠস্বরে।

'আয় রে আয়, একটু খা।' মুখ থেকে গামলা নামিয়ে লাও-এরের দিকে এগিয়ে দেয় খুড়ী।

'না, না, এখন আর কিছু খাব না—। তুমি কি বাড়ীতে একলাই আছ নাকি ?'

'তোর খুড়ো তো ওখানে বসে খাচ্ছে। আর তোর ভাই তো এখনও ফেরেই নি—'

'ও—, তা' সে গেল কোথায় ?' লাও-এর প্রশ্ন করে।

'বেরুবার সময়ে তো বলে গিয়েছিল যে শহরে যাচ্ছে। সেও তো সেই কখন,—ওই যখন গাছের মাথায় খাড়া রোদ্দ,র। কোন্ চুলোয় যে সে এখন, কে জানে বাপু ?'

খুড়ী গামলাটা আবার মুখে তুলে নেয়। লাও-এর বেরিয়ে আসে। প্রচণ্ড ঝড় ওঠে তার মনে। খুড়তুতো ভাইয়ের সাথে যায়নি তো নীলা ? তাই যদি হয় তো দুটোকেই ও মেরে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে রাখবে গাঁয়ের এই প্রশস্ত পথের ওপরে। দেখুক তখন সকলে ওদের। শরীরের ভিতরে সমস্ত রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে ; গলা ফুলে দম বন্ধ হ'য়ে আসে, চোখে মুখে গালের নিচে যেন রক্ত আছড়ে পড়তে থাকে, রাগে নিজের ডান হাত মোচড়াতে থাকে সে।

•

এমন সময়ে গাঁয়ের চা-খানার সামনের মাঠে নজর পড়ে লাও-এরের। দেখে, অনেক লোক জমা হয়েছে ওখানে। ঐ মাঠে এরকম জমায়ত আগেও অনেকবার

হয়েছে ভানুমতীর ভেল্কি, ভ্রাম্যমাণ নাট্যকার কিংবা বিদেশী পণ্য বিক্রেতাদের ঘিরে। আজকের এই জমায়ত জমবার মূলে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কিছু। লাও-এর দেখতে পেল দুটো বাঁশে মস্ত সাদা কাপড় টান ক'রে ঝুলিয়ে তার ওপর নানারকম ছবি টাঙ্গিয়ে কি সব দেখাচ্ছে চার-পাঁচজন যুবক যুবতী। এদের দেখেই লাও-এর বুঝল যে এরা শহুরে মানুষ। ছবিগুলোর ওপরে নজর পড়বার আগেই তার চোখে পড়ল দর্শকদের মাঝে বসে রয়েছে খুড়তুতো ভাই। নিশ্চয়ই নীলাও আছে আশে পাশে কোথাও তার সঙ্গে। প্রখর দৃষ্টি ফেলে অনুসন্ধান করে খুড়-তুতো ভাইয়ের চারপাশে। কিন্তু কোথায় নীলা? হঠাৎ সমস্ত রাগ যায় নিভে, বড় পরিশ্রান্ত মনে হয় লাও-এরের। খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে নীলা আসে নি তবে। যাক...তবুও ওকে আজ বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম দেবে লাও-এর। দোষ করুক আর নাই করুক, কেন সে এভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে? স্বামীর অপেক্ষায় বসে থাকার রীতি কেন সে মানেনি?

এতক্ষণ পরে যুবক-বক্তার কথা লাও-এরের কানে প্রবেশ করে যদিও গোড়া থেকেই একটানা বক্তৃতা দিচ্ছিল সে।

'...আমাদের ঘর বাড়ি মাঠ ক্ষেত পুড়িয়ে ফেলব যাতে একদানা শস্য না পড়ে শত্রুর মুখে, আমাদের দেশে ব্যাটাদের না-খেয়ে মরতে হবে। পারবে না তোমরা এ-কাজ করতে?'

জমায়তের একটি লোকও জবাব দেয় না। বক্তার কথার কিছুই বোধগম্য হয়নি তাদের। সাদা কাপড়ের ওপরে টাঙ্গানো ছবিগুলি শুধু তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। লাও-এরও দেখে। কোথাকার কোন্ শহরের ছবি...বড় বড় বাড়ি, সুবৃহৎ অট্টালিকার ছবি...বাড়িগুলোয় দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। গ্রামবাসী ছবিগুলো দেখে, কিন্তু বক্তার প্রশ্নের উত্তর দেয় না কেউ। হঠাৎ লাও-এর দেখে কে একজন সোজা উঠে দাঁড়াল। নীলা! মাথার ঝাঁকড়া চুলের গোছা ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে বক্তার দিকে তাকিয়ে সে বলছে: 'হ্যাঁ আমরা পারব!'

গাঁয়ের এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নীলা কি বলল, কি তার অর্থ? স্বামী সঙ্গে নেই—কেনই বা সে কথা বলল এই রীতি-বিরুদ্ধ ভাবে?

লাও-এর চেঁচিয়ে ওঠে: 'বাড়ি চল। ক্ষিদে পেয়েছে আমার।'

নীলা তাকিয়ে দেখে লাও-এরের দিকে, কিন্তু সে-চাউনিতে না-চেনার ভাব রয়েছে তখনও। লাও-এরের চিৎকারে জমায়তের সব লোক ফিরে এল গাঁয়ে

গৃহে, তাদের অভ্যস্ত জীবন-পথে। নড়ে চড়ে বসে মুষ্টিবদ্ধ দুই বাহু তুলে, হাই নিয়ে, আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে তারাও যেন ফিরে এল তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন-উপলব্ধিতে, বুঝতে পারল তাদেরও খিদে পেয়েছে। একে একে তারা উঠে পা বাড়াল যে যার গৃহপানে। খুড়তুতো ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা নাড়ল লাও-এর। কেন যেন তার রাগ তখনও যায়নি, যদিও সে বুঝেছিল যে তার ভাইয়ের কোন দোষই নেই। তবুও মনের কোণে খচ খচ ক'রে কি যেন একটা বেঁধে। প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে সে নীলার জন্য। নীলার ওপর নরম হ'লে চলবে না এখন, একটু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে তাকে। এত লোকের সামনে সোজাসুজি স্ত্রীর দিকে তাকিয়েও দেখতে পারে না, লজ্জা করে।

'যে-ছবি আজ তোমাদের দেখালাম, যে-কথা শুনালাম, মনে রেখ, সে-সব সত্যি!' যুবক বক্তা চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু সে-কথায় কান দেয় না কেউ। নীলা বেরিয়ে এলে লাও-এর এগোয়। কোণা-চাউনি দিয়ে মাঝে মাঝে সে দেখে নীলা পেছন পেছন আসছে কিনা। গাঁয়ের বসতি-বাজার ছেড়ে নির্জন পথে এসে লাও-এরের ক্ষোভ ফেটে পড়ে :

'সকলের সামনে এমনি ক'রে নিজেকে তুলে না ধরলে হয় না তোমার? কেন তুমি আমাকে এভাবে লজ্জায় ফেলবে?'

একটি কথাও বলে না নীলা। বিক্ষুব্ধ লাও-এর ধূলো-পথে চলতে চলতে পিছনে নীলার পদশব্দ শুধু শোনে। আরও গলা চড়িয়ে বলে : 'সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ক্ষেত থেকে ফিরছি, খিদেয় পেট জ্বলছে—'

'তা, খেলে না কেন—?' নীলার নম্র কণ্ঠের পরিষ্কার উত্তর শোনে লাও-এর।

মাথা না ঘুরিয়েই লাও-এর বলে :

'তুমি বাড়িতে না থাকলে খাই কি ক'রে? কোথায় খুঁজি তোমাকে? তোমার জন্য বাবা মা, দাদা বৌদির কাছে আমার লজ্জার আর শেস নেই।'

উত্তর দেয় না নীলা। লাও-এর পারে না আর সহ্য করতে। ভাবছে কি মেয়েটা? অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখে প্রতীক্ষ্যমাণ হাসি-ভরা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে নীলা তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই উচ্চ হাসিতে ফেটে প'ড়ে দু'পা এগিয়ে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরে। লাও-এর পারে না হাত ছাড়িয়ে নিতে। এক মুহূর্তে লাও-এরের রাগ যায় উড়ে। কিন্তু এত সহজে নীলাকে ক্ষমা করাও তো ঠিক নয়। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে : 'তুমি আমার সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করছ।'

'অ—, চ্‌চ, চ্‌চ, চ্‌চ...তাইতো কি রকম মিইয়ে গেছ তুমি, কি রকম রোগা হয়েছ—, আ হা-হা, সত্যিই দুঃখ হয় তোমার জন্য, আমার মণি, আমার ওল কপি!' চাপা হাসি নীলার কণ্ঠে।

নীলার এ-হাসি ঠিক পছন্দ করতে পারে না লাও-এর, কিন্তু কি যে পছন্দ করে তাও তো ঠিক বুঝতে পারে না। গোধূলির মেঘ-ঢাকা চাঁদ ধীরে ধীরে সাঁঝের আকাশে সোনার মত জ্বল জ্বল ক'রে ভেসে ওঠে। চারদিকের জল-ভরা ক্ষেতের মাঝে দাদুরীর একটানা ডাক কানে আসে...লাও-এরের হাতে নীলার কোমল কর—যেন প্রিয়ার সমস্ত হৃদয়...আলতো ক'রে তুলে নিয়ে নিজের কাঁধে গালে গলায় প্রিয়ার সে-নরম কর নেয় বুলিয়ে। কথা ফোটে না মুখে, কেন যেন পারে না লাও-এর নিজের মনের সব কথা মুখের ভাষায় ফোটাতে। দৈনন্দিন কাজের ভাষা সে পায় মুখে, কিন্তু প্রেমের বিশেষ মুহূর্তের ভাষা কই পায় খুঁজে, সব যেন কেমন গুলিয়ে হারিয়ে যায়। গাঢ় কণ্ঠে বলে :

'যদি লেখাপড়া জানতাম, ভাষা পেতাম মুখে—'

'কি বিশেষ ভাষা চাও তুমি?'

'মনের সমস্ত কিছু, আমার মনের সব কথা তোমাকে বলতে পারতাম।'

'কি মনে হয় তোমার?'

'বুঝি, অনুভব করি, কিন্তু ঠিক গুছিয়ে বলতে পারি না যে।'

লোকালয়ের বাইরে ধান ক্ষেতের আলের ওপরে দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঘন সবুজ উইলো গাছের ডাল নেমেছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে। নীলার কাঁধে হাত রেখে লাও-এর আস্তে আস্তে তাকে টেনে নেয় নিজের দেহ সংলগ্ন ক'রে। স্তব্ধবাক দু'টি তরুণ হৃদয় এক সঙ্গে দেহলীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সন্ধ্যা-উত্তর প্রথম রাত্রির আধো-আঁধারে। এত কাছে এমন ভাবে এরা যেন নিজেদের আর পায়নি কোনদিন।

'কিন্তু আমিও তো বিশেষ লেখাপড়া কিছু জানি না,' ফিস-ফিসিয়ে বলে

'সেই জন্যেই কি তুমি আমার সঙ্গে এত কম কথা বল?'

'কি ক'রে বলি বলতো, যে রকম মুখ গোমড়া ক'রে চুপচাপ থাক তুমি সমস্ত দিন! দু'জনেই দু'জনের মনের কথা বললেই না দু'জনকে দু'জনে জানতে পারে!'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ভাবে লাও-এর...হাতের বাঁধন শিথিল হ'য়ে

যায়। দু'জনেই তারা এতদিন প্রতীক্ষায় আকুল হ'য়ে ক্ষণ গুনছিল,...আগে কে কথা কইবে, কি কইবে, এই কি ছিল তাদের বাধা ? লাও-এর জিজ্ঞেস করে :

'আমার মনের কথা তোমায় সব বললে তুমি তোমার মনের সব কথা বলবে ?'

'হ্যাঁ।'

লাও-এরের হাতের বাঁধন একেবারে খুলে পড়ে। তবুও মনে হয় নীলা যেন কত কাছে।

'তবে আজ রাতে আমরা কথা কইব,' লাও-এর বলে।

'হ্যাঁ, বলব।'

এত নম্রতা নীলার কণ্ঠে ! নীলার কণ্ঠস্বর তো মনে হয় না। কিন্তু নীলাই তো কথা বল্‌ল। নিজের শক্ত হাতে নীলার নরম কর তুলে নিয়ে গৃহপানে এগোয় লাও-এর। বাড়ির কাছাকাছি এসে নীলা আবার রীতি অনুযায়ী স্বামীর পিছনে পিছনে হাঁটে।

গৃহ-প্রাঙ্গণে বাপ ভাইয়ের আহার হ'য়ে গেছে, মা বৌদি ও ছোট বোন খেতে বসেছে। ছেলেকে দেখে মা বলে :

'তোদের দেরি দেখে আমরা এই খেতে বসলাম রে।'

'বেশ করেছ, আমার জন্য অপেক্ষা না ক'রে ভালই করেছ।' মার কথার উত্তর দিয়ে লাও-এর কণ্ঠে আদেশের স্বর মিশিয়ে নীলাকে বলে তার ভাত আনতে, যাতে মা বৌদি তাদের গভীর প্রেমের নতুন কথা না বুঝতে পারে। স্বামীর ভাতের থালা বেড়ে দিয়ে নিজের ভাত নিয়ে নীলা এসে বসে শাশুড়ীর পাশে। এরই মধ্যে সেই যুবক-বক্তার কথা সেও ভুলে গেছে, অথচ যখন প্রথম শুনেছিল তখন তার মনে হয়েছিল, এ-বক্তৃতা জীবনেও কোনদিন ভুলতে পারবে না। খেতে খেতে তার মনে হ'ল আজ রাতে স্বামী মনের অর্গল খুলে দেবে তার কাছে। আজই কি জানতে পারবে পরিপূর্ণভাবে তার জীবন-সঙ্গীর মনের সব কিছু ?

খাওয়া শেষ ক'রে উঠতে উঠতে শাশুড়ী নীলাকে বলল :

'দেখ বৌ, রান্নার ধারকাছ দিয়েও তো মাড়াও নি একবার। সকলের খাওয়া হ'য়ে গেলে এঁটো-সকড়ি পরিষ্কার করবে তুমি, বুঝলে !'

'হ্যাঁ মা, আমি পরিষ্কার করব'খন।' উঠে দাঁড়িয়ে ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয় নীলা।

উঠে দাঁড়িয়ে এভাবে এত নরম হ'য়ে নীলা উত্তর দিল দেখে শাশুড়ী মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখে পুত্রবধূকে। আর কোন কথা না বলে লিংসাও এগিয়ে গেল উঠানের কোণে দোরের দিকে। 'হুঁ, বাছাধনকে দেখছি, আজ দিয়েছে বেশ দু'ঘা বসিয়ে লাও-এর,' ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেল গৃহিণী। দোরের পাশে বেঞ্চির ওপরে বসে আছে গৃহকর্তা লিংটান। নিচে শক্ত পিটোন মাটির উঠানে বসে বাপের সঙ্গে গল্প করছে বড় ছেলে। ছোট ছেলে খড়ের গাদার ওপরে পড়ে ঘুমোচ্ছে। লাও-এরের দিকে একটু ভাল ক'রে নজর দিয়ে দেখল লিংসাও। বেশ পরমানন্দে সে খেয়ে চলেছে, কোন রকম দুঃশ্চিন্তার চিহ্ন নেই সে-মুখে। 'হুঁ, বেশ মার দিয়েছে আজ নীলাকে,' হৃষ্টমনে ভাবে লিংসাও : 'বৌকে মারধোর না করলে কী আর বিয়ে সুখের হয় !' পুত্র-গর্বে বুক ভরে ওঠে গৃহিণীর।

শুধু কথা পারে এমন ক'রে ভালবাসা শেখাতে ? দেহের আমন্ত্রণকেও ছাপিয়ে যায় এমনি ক'রে ভালবাসার ভাষা ? সে-রাত্রে নীলার পাশে শুয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল লাও-এরের।

অদ্ভুত, সব কিছু নতুন, এমন কি কেমন একটু লজ্জাও লাগে সে-রাত্রে লাও-এরের। নীলা তো সেই নীলা মাত্র নয়, আরও নতুন, বিয়ের রাতের থেকেও নতুন মনে হয় তাকে। নীলার সুতনুর সব কিছু জানা সত্ত্বেও, তার দেহের অভ্যন্তরে, মুখশ্রীর আবরণের নিচে অজানা এত কিছু লুকিয়ে ছিল এতদিন ? কত কিছুই তো সে জানত না। দেহস্পর্শ না ক'রে আজ শুধু সে শুনবে, শুধু শুনবে তার পরম প্রিয়ার বাণী। পরম প্রতীক্ষায় সে শুধু পল গোনে। নীলাও বসে বসে দেখে আর ক্ষণ গোনে। অবশেষে অধীর লাও-এর বলে ফেলে : 'তুমিও কি প্রতীক্ষায় বসে আছ ?'

'হ্যাঁ গো।'

'কে প্রথম কথা কইবে ?'

'কেন ! তুমি, তোমার যা ইচ্ছে আমায় জিজ্ঞেস কর।'

কি প্রশ্ন করবে লাও-এর ? একটা কথা আছে ওর মনের সংগোপনে, প্রশ্ন করবে কি ? জিহ্বার গোড়ায় সে-কথা এসেও গেল, তো তো ক'রে কোন মতে সে বলেও ফেলল :

'তুমি কি আমার সেই খুড়তুতো ভাইয়ের কথা ভাব. যে তোমাকে চেয়েছিল ?'

'ও—, তোমার মনে এই সন্দেহ বাসা বেঁধে আছে ? এ্যাঁ—' সোজা উঠে

জোড়াসন হ'য়ে বসে নীলা। বলে : 'তুমি কি গো! তোমার মনে এই কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে এতদিন? না, না, না, কিচ্ছু বলব না আর তোমাকে. যত কিছু জিজ্ঞেস কর না কেন আমাকে, কিচ্ছু বলব না তোমাকে, একটি কথাও না—'

মাথা গুলিয়ে যায় লাও-এরের, অথৈ জলে যেন সে হাবুডুবু খায়।

'তা হ'লে সমস্ত দিন এত ভাব কি? চুপচাপ থাক, একটা সাড়া পর্যন্ত দাও না। রাতেও তো তাই। সমস্ত রাত মুখ এঁটে শুয়ে থাক,' লাও-এর প্রশ্ন করে।

'কত কী যে মনে আসে...সমস্ত চিন্তা-ভাবনাগুলো যেন একটার সঙ্গে আর একটা শিকলের মত বাঁধা। আকাশে পাখী দেখে মনে প্রশ্ন জাগে কি ক'রে ওটা ওড়ে, কি ক'রে মাটি থেকে ওপরে ওঠে, মানুষ পারে না কেন উড়তে? তারপরই বিদেশী উড়ো জাহাজগুলোর কথা মনে এসে যায়। কি ভাবে ও-গুলো তৈরি হয়...আচ্ছা, ওর মধ্যে কি কোন ভেল্কি আছে? না, বিদেশীরাই শুধু জানে ও-গুলো তৈরি করতে, আমরা জানি না। ঐ উড়োজাহাজের কথার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে চা-খানার সামনের মাঠে সেই যুবক-বক্তার বক্তৃতা। আমাদের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোর ওপরে বিদেশীরা উড়োজাহাজ দিয়ে কি ভাবে সব ধ্বংস করছে, কি ভাবে আমাদের দেশের লোকজন জীবন-ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে—'

নীলার চিন্তার লাগাম টেনে দেয় লাও-এর। উত্তরের শহর তো এখান থেকে অনেক দূরে। সে প্রশ্ন করে : 'তুমি ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

'তোমার নীল কোটটা সেলাই করতে বসেছিলাম। সুতো ফুরিয়ে গেল, মার কাছেও দেখলাম শুধু সাদা সুতো। তাই বেরোতে হ'ল সুতো কিনতে। সেখানে গিয়ে দেখি ঐ জমায়ত।'

'এভাবে তোমার একলা বাইরে বেরোন উচিত নয়—'

'কেন?' প্রশ্ন করে নীলা।

'অন্যরা যে তোমাকে দেখবে—'

'আমি তো তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি না।'

'আমি চাই না যে অন্য কেউ তোমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তুমি আমার বৌ, তার ওপর সুন্দর—'

'রাতদিন আমি ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকব নাকি? এখন তো আর সেই সাবেক কাল নয়,' নীলা বলে।

'সেই সাবেক কালই ছিল ভাল। তোমাদের ঘরের আড়ালে রাখাই উচিত।'

'আমায় ঘরে আটকে রাখলে আমি খাওয়া ছেড়ে দিতাম, তারপর না-খেয়ে না-খেয়ে মরে যেতাম।'

'উঁহু, মরতে দেব না তোমাকে।'

হেসে ওঠে নীলা : 'কিন্তু এখন তো নতুন কাল, আমিও বাইরে বেরোব।'

'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কি কেউ কথা বলে?'

'তা বলবে না কেন? পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে কথা বলে না?'

দু'জনেরই কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। তারপর লাও-এর আবার বলে :

'আচ্ছা, আমায় যখন প্রথম দেখলে তখন তোমার মনে কি হয়েছিল?'

বিছানার চাদরের ওপর নীল ও সাদা সুতোর সূচী-শিল্প আঁকা ছিল, তার ওপর নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে নীলা বলে :

'সে-কথা কি আর এখন মনে আছে?'

'না, অনেক আগের কথা জিজ্ঞেস করছি না, আমাদের বিয়ের পর প্রথম যখন দেখা হলো, তখন কি মনে হয়েছিল।'

মুখ ফিরিয়ে বসল নীলা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার কপালে ও কপোলে, ছোট্ট টানা নাকের ওপরে ও ঠোঁটে, চিবুকে। নীলার নিচের ঠোঁটটা ওপরটার থেকে একটু পিছনে।

'আমার থেকে তুমি লম্বা হওয়াতে আমি সত্যিই সেদিন খুব খুশি হয়েছিলাম। মেয়েদের মধ্যে আমি তো আবার একটু লম্বা।'

'কে বললে তুমি লম্বা—'

স্বামীর কথায় বাধা দেয় না নীলা।

'সেদিন আমার সম্বন্ধে তুমি কি ভেবেছিলে?' লাও-এর জিজ্ঞেস করে।

মাথা নিচু ক'রে বলে নীলা : 'সেদিন আমার বড় জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, আমাকে পেয়ে তোমার মনে সেদিন কি—'

'কিন্তু তুমি তো জানতে তোমার জন্য আমি কি রকম পাগল হ'য়ে পড়েছিলাম,' নীলার কথার মাঝে বলে ওঠে অধীর লাও-এর।

মাথা তুলে নীলা বলে : 'আমরা মন খুলে কবে কথা কইব? অন্যান্য স্বামী-স্ত্রীদের মতই কি আমরা শুধু পরস্পরের কাছে থাকব? তুমি কি সত্যিই কোন দিন আমার সত্তার মূল্য দেবে, না, অন্যান্য সাধারণ বিবাহিতদের মত আমাকে দেখবে শুধু তোমার সন্তান-দাত্রী হিসেবে, তোমার সংসারের গৃহিণী হিসেবে? তুমি কি আমাকে তোমার নিজের ক'রে নেবে না কোন দিন? না, আমি শুধু

থাকব তোমাদের সংসারের বহুর একজন হ'য়ে? আমার মনে প্রশ্ন উঠত, তুমি কি কোনদিন লেখাপড়া শিখবে? কতকিছু জানার রয়েছে বইয়ে।...আমায় একটা বই কিনে দেবে?...আমার যে একটা বইয়ের বড় ইচ্ছে গো! ফুল আমি চাই না, আমায় তুমি শুধু বই কিনে দাও! এই জন্যেই আমি চুল কেটে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐ চুল বেচে একখানা বই কিনব। কিন্তু ভয়ে সে-কথা সেদিন তোমাকে বলতে পারিনি। মিথ্যে ক'রে বলেছিলাম ফুলের কথা। আমায় একটা বই কিনে দাও না!'

ঝুঁকে পড়ে প্রতীক্ষা করে নীলা লাও-এরের উত্তরের।

'বই! আমাদের মস্ত লোকরা আবার বই দিয়ে কবে কি করেছে?' চিন্তিত কণ্ঠে বলে লাও-এর।

'আমি শুধু একটা বই চাই গো—' অধীর কণ্ঠে নীলা বলে।

'কিন্তু পড়বে কে?'

'কেন, আমি পড়তে পারি।'

আশ্চর্য হ'য়ে হা ক'রে তাকিয়ে থাকে লাও-এর। এর থেকে নীলা যদি বলত যে উড়োজাহাজের মত সে উড়তে পারে তাতেও বোধ হয় লাও-এর এত বিস্মিত হতো না।

'তুমি পড়বে! কি ক'রে পড়তে শিখলে? আমাদের ঘরের মেয়েরা তো পড়তে শেখে না!'

'হ্যাঁ গো, আমি শিখেছিলাম। একটা একটা ক'রে কথা আমি শিখেছিলাম। আমার ছোট ভাইকে বাবা স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। তার কাছে প্রতিদিন একটা একটা ক'রে কথা শিখতাম আমি। আমার তো আর বই ছিল না।'

মুহূর্তে কি ভেবে লাও-এর বলে:

'বেশ, আমি তোমায় বই এনে দেব। আমাদের সংসারে যে বৌ মেয়ে কোন-দিন বই পড়বে, আমি ভাবতেও পারি নি।'

প্রহরের পর প্রহর কথা বলে চলে তারা এইভাবে। রাত্রি গড়িয়ে যায় গভীর নিশীথিনীর বুকে...বাক-পরিশ্রান্ত প্রেমিকের চোখে নেমে আসে তন্দ্রার আবেশ।

'এবারে ঘুমোও। কাল ভোরে আবার মাঠে কাজ আছে...তারপর যাব শহরে বই কিনতে—'

কথার মাঝে থেমে যায় লাও-এর। দয়িতের দেহের সঙ্গে ধীরে ধীরে লীন ক'রে দিচ্ছে নিজেকে নীলা। এভাবে কই আগে কোনদিন তো প্রিয়া দেয় নি

নিজেকে নিবেদন ক'রে। সন্দীপ্ত আবেশে আত্ম-সঞ্চারিণী নীলা দেয় উদ্‌ঘাটিত ক'রে। স্তব্ধবাক লাও-এর স্পর্শমধুর আবেগে পল গোনে। বিয়ের রাতে অজানা নীলাকে যখন সে প্রথম পেয়েছিল, সে-রাতের সে-পাওয়া থেকে আজের এই পাওয়ার অভিজ্ঞতা কত মধুর। এত আনন্দ তো সে পায়নি আগে কোনদিন। বারে বারে মনে প্রশ্ন জাগে, আগে কেন জানবার চেষ্টা করে নি, কেন বুঝবার চেষ্টা করেনি প্রিয়ার সুষমা মণ্ডিত সুতনুর ভিতরের এই হৃদয়কে। কিন্তু তাকে তো কেউ কিছু বলেও দেয় নি কোন দিন। নিজের অনভিজ্ঞতার আবেগ-মথিত দেহে-মনে বারে বারে হোঁচট খেয়েছে, বিক্ষোভ বাসা বেঁধেছে মনে : 'কই বিয়ের পরেও তো পেলাম না প্রিয়াকে!' আজই প্রথম সে পেল তার পরম ধনকে.

পরমানন্দে লাও-এর ঘুমোয়। আজের এই মধুর রাতে নীলার গর্ভে আসবে নবশিশু, আসবে শিশু-ভগবান।

॥ দুই ॥

ভাইদের মধ্যে সাধারণতঃ লাও-এরই শহরে যেত তাদের সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সওদা করতে। শহরের হালচাল সে বুঝতো। বৃদ্ধ বাপ পারত-পক্ষে চাইত না শহরে যেতে, শহরের হাঁপ-ধরা হাওয়ায় বলে তার দম বন্ধ হ'য়ে আসত। শহুরে লোকের গায়ের বোটকা গন্ধ সইতে পারত না লিংসাও। স্ত্রীর এ-কথা হেসে উড়িয়ে দিত লিংটান,—মানুষের গায়ের আবার বোটকা গন্ধ কি! তবে এক এক জনের গায়ে এক এক রকম গন্ধ থাকে বটে। শুকনো বাসী তরিতরকারি খেয়ে খেয়ে শহরের লোকদের গায়ে যে দুর্গন্ধ হয়, তাদের মাঝে যেতে বৃদ্ধা রাজী নয়। গাঁয়ের সজীব সব্জি খেয়ে খেয়ে প্রাণবন্ত আত্মীয় স্বজনের মাঝেই সে থাকবে। সরল বিশ্বাসী জ্যেষ্ঠ পুত্র শহরে গিয়ে কোন কিছুর থই পায় না, শহুরে লোকের চালে ভুলে গিয়ে ঠকে আসে; আর কনিষ্ঠ তো এখনও খুবই ছোট। তাকে শহরে পাঠানো লিংটানের ঠিক মনঃপূত নয়। শহরে গিয়ে হয়তো খারাপ কিছু শিখে ঘরে ফিরবে। সুতরাং শহরের সওদার কাজে সবদিক থেকে উপযুক্ত মনে হয় দ্বিতীয় পুত্র লাও-এরকে।

তাই শহরের দক্ষিণ তোরণের কোণের দোকানে লাও-এরই বেচতে যেত

টাটকা ডিম কিংবা শুয়োরের মাংস, চাল-পটিতে যেত উদ্‌বৃত্ত চাল নিয়ে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই ভাবে শহরে যাতায়াতের ফলে সাধারণ গেঁয়ো চাষীদের মত শহরে ঢুকেই সব জিনিসের দিকে হা ক'রে সে তাকিয়ে থাকত না ; শহরে গেলে অন্য গ্রামবাসীদের মত তার দমও বন্ধ হ'য়ে আসত না, কিংবা পায়ে পা জড়িয়ে সে শ্লথগতি হয়েও পড়ত না। নীল পাজামা ও কোট পরে সে আসত শহরে, হাঁটত সোজা মাথা তুলে। পায়ে দিত তাদেরই ক্ষেতের খড় দিয়ে তৈরি খ'ড়ো জুতো, শীতের সন্ধ্যায় বসে বসে ভাইয়েরা গালগল্পের মধ্যে সেগুলো বানাত। শহরের কোলাহলপূর্ণ রাস্তায় প্রথম পা দিয়েই সে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে পাট ক'রে নিত। ব্যবসা-পটির হাল-চাল সে জানত ভাল ভাবেই। শহরে লোকের সঙ্গে কথা বলতে হ'লে বেশ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে কৃষাণ-সুলভ ধীর ভাবে কথা বলত। ডিমের দাম দিতে গিয়ে দোকানদার যদি অচল আনি চালিয়ে দিত, কোন প্রতিবাদ না ক'রে তাই নিয়েই সে ফিরত ঘরে। পরের বারে তাজা ডিমের সঙ্গে ঐ অচল আনির দামের পচা ডিম মিশিয়ে দোকানীকে বুঝিয়ে দিত : বাপুহে, অত সহজ নয় ! হেথায় সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ! সুতরাং ঠাঁই কঠিন বুঝে লাও-এরের সঙ্গে সোজা পথেই কারবার করত দোকানী। কথা কাটা-কাটি রাগারাগি হয়নি তাদের মধ্যে কোনদিন। পরস্পর বুঝে নিয়েছিল দু'জনকেই।

কিন্তু বই কিনতে এসে দেখল যে শিশুর মতই এ-বাজারে সে একেবারে আনাড়ী। বই-এর পাড়ায় প্রবেশ ক'রে বইয়ের দিকে সে হা ক'রে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিছুই সে বোঝে না বইয়ের, সব বই-ই তার চোখে একরকম ঠেকে। লাও-এরের ঐ অবস্থা দেখে এ-দোকান ও-দোকান থেকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করে দোকানীরা। কিন্তু কী উত্তর সে দেবে ! কিছুই তো জানে না। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই বা কি ক'রে যে বইয়ের দরকার তার স্ত্রীর জন্য। সুতরাং ভাব দেখায় যে বইটি তার নিজেরই প্রয়োজন।

এই সব বইয়ের দোকানীরা জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে এক কালে বেছে নিয়েছিল গুরুমশায়ের জ্ঞান বিতরণের মহান ব্রত। কিন্তু সে-ব্রত উদ্‌যাপনের অভাব অনটনের কঠিন বাস্তব ঘায়ে টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি তারা। জীবনযুদ্ধে বারে বারে ঘা খেতে খেতে সে-আদর্শ গেছে চূর্ণ হ'য়ে, আজ শুধু তারই রেশ টেনে কোনমতে বইয়ের পসরার বিপণি সাজিয়ে আছে বসে। এদের কেউই ভাবতে পারে নি যে লাও-এর সত্যি সত্যিই পড়তে জানে না। নতুন ক্রেতার কাছে বই

বিক্রির আকুল আগ্রহে হাঁক-ডাকের সোরগোল তুলে তারা চেঁচায় : 'এই যে দেখ গো, এই বইয়ে শুধু পাবে হাসির ফোয়ারা—বিদেশী শয়তানদের কেচ্ছা!' 'এই যে এই বইয়ে আছে গির্জার সেবাদাসীর মজার মজার প্রেম-কাহিনী!' 'এই নামকরা বইটি এখনো পড়োনি? তিন রাজ্যের কাহিনী...না পড়ে থাকলে এক্ষুণি কিনে পড়গে চাষার পো!' তার চোখের সামনে বইগুলো তুলে তুলে ধ'রে দোকানীরা প্রলুব্ধ ভাষায় চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু কোন তফাৎই তো দেখতে পায় না লাও-এর বই-গুলোর মধ্যে। হঠাৎ কি মনে ক'রে চকচকে লাল রং-এর মলাট দেখে একখানা বই সে তুলে নিল। বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে জিজ্ঞেস করল দোকানীকে বইয়ের নাম।

'কেন, ঐতো লেখা রয়েছে বইয়ের ওপরে! মলাটের পিছনে দেখ বই সম্বন্ধে লেখা আছে।'

লজ্জিত কণ্ঠে লাও-এর বলে ফেলে : 'কিন্তু সত্যি কথা কি জান ভাই, আমি একেবারেই পড়তে জানি না।'

বিশ্বাস করতে পারে না দোকানী। জিজ্ঞেস করে : 'তা বইয়ের পাড়ায় কেন এসেছ তুমি? মিঠাই কিংবা কাপড়ের দোকানে যাও না—বইয়ের দোকানে কেন?' দোকানীর কণ্ঠে স্পষ্ট বিদ্রূপের স্বর। লাও-এর রেগে যায়। হঠাৎ ঘুরে চেঁচিয়ে বলে : 'বই আমি কিনব, কিন্তু তোমার দোকান থেকে নয়।'

দিদির বাড়ি গিয়ে ভগ্নীপতির কাছ থেকে জেনে নেবে একটা ভাল বইয়ের নাম। তারপর ফিরে এসে এই দোকানী-ব্যাটার চোখের ওপরেই পাশের দোকান থেকে সে বই কিনবে।

পথের ভিড় ঠেলে তিনটি রাস্তা পেরিয়ে লাও-এর এসে হাজির হ'লো ভগ্নীপতি উলীনের দোকানে। বিদেশী পণ্যদ্রব্যের কারবার করে উলীন। হরেক রকম বোতল, খাবার, টর্চ লাইট, রবারের জুতো, রংবেরঙের জামা কাপড়, কলম পেন্সিল, মোটা তুলতুলে শ্বেতাঙ্গিনীদের ফ্রেমে আঁটা ছবি, এবং আরও কতরকমের মনোহারী পণ্যদ্রব্য সাজানো রয়েছে তার বিপণিতে। কাচের ঢাকনির নিচের এত সব জিনিস দেখতে দেখতে লাও-এরের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে পারে। কিন্তু আজ আর লাও-এর দোকানে দেরী করে না। সোজা দোকান পার হ'য়ে, পরিচিত কর্মচারীদের পাশ কাটিয়ে সে চলে যায় অন্দর মহলে।

স্থূলাঙ্গী উলীন শ্লথ বস্ত্রে একটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। সর্বকনিষ্ঠ শিশুটিকে তার অনাবৃত নরম তুলতুলে মেয়েলী দেহের ওপরে বসিয়ে একহাতে

ধরে আছে, আর এক হাত দিয়ে আস্তে আস্তে একটি হাত-পাখা নাড়ছে। তার কব্জির ওপরে থলথলে মাংসের আঙটা পড়েছে। হাতের আঙ্গুলগুলো বেশ মোটা। বন্ধুরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো উলীনকে তার স্থূলাঙ্গের জন্য। মৃদু মৃদু হাসত শুধু সে, উপভোগ করত বন্ধু-বান্ধবদের হাসি ঠাট্টা। লাও-এরকে দেখে দেহকে সামান্য একটু নাড়া দিয়ে ভগ্নীপতি আহ্বান জানিয়ে বলে :

'আরে, আরে শালা বাবু যে, এস, এস—বস !'

স্ত্রীকে ডেকে বলে : 'কই গো, তোমার ভাই লাও-এর এসেছে যে !'

গৃহাভ্যন্তর থেকে ছুটতে ছুটতে দিদি বেরিয়ে আসে, গলা-খোলা জামা গায়ে তার, ভাইকে দেখে আনন্দ উছলে পড়ছে তার সর্ব অবয়বে। ভাইয়ের উদ্দেশ্যে খল খল ক'রে চেঁচিয়ে বলে : 'তুই যে হঠাৎ এলি রে! বাড়ির সব কেমন আছে? বাবা মা? বৌকে নিয়ে এলি না কেন? ওর কি বাচ্চা হবে নাকি রে? তুই যে কেমন হয়েছিস বাপু!'

কথার আর হাসির বুদ্বুদ ফাটিয়ে চলেছে সে এমন ভাবে যে তার লাল মুখের ভিতর থেকে হাসি আর কথা একাকার হ'য়ে মিশে অনর্গল ছুটে বের হচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে কিছু বিদেশী কেক এনে গরম চায়ের সঙ্গে ভাইকে দেয় খেতে।

ক্ষুদে ভাগ্নেকে কোলে নিয়ে লাও-এর আদর করতে করতে বাড়ির খবর দেয় দিদিকে আর শোনে ভগ্নীপতির ব্যবসার কথা। বিদেশী পণ্যের কারবারে বেশ দুটো পয়সা পাচ্ছে উলীন। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে ছাত্রদের নিয়ে। রাতদিন শুধু প্রচার করবে বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে। এসব প্রচার যদি না হতো তবে কোন্ ক্রেতা আর মাথা ঘামায় কোথা থেকে কোন্ জিনিস এল তাই নিয়ে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে দেশপ্রেম আর ঐ ছাত্রদের যে কি যোগ থাকতে পারে উলীন কিছুতেই বুঝতে পারে না। এই সব কথা শেষ হ'য়ে গেলে লাও-এর তার বই কেনার ব্যাপারটা ভগ্নীপতির কাছে তুলতে পারে।

উলীনরা পুরুষানুক্রমে শহরের বাসিন্দা। আর লাও-এরের ভগ্নীপতি উলীন লেখাপড়াও শিখেছিল। তার ঠাকুর্দা, বাবা এই শহরেই বাস করত। প্রত্যেক পুরুষেই উলীনরা বিয়ে করত গাঁয়ের মেয়েকে। কারণ, তাদের ধারণা, শহুরে মেয়েকে বিয়ে করলে সংসারের সুখ-শান্তি যায় উড়ে। এই সব শহুরে মেয়েরা হয় নরম তুলতুলে, আলসে—পড়ে পড়ে কেবল ঘুমোয় আর জাগ্রত অবস্থায় কেবল খেলে 'মাজং' জুয়ো। খেলার নেশায় কোলের শিশু সন্তানদের দিকে

পর্যন্ত তারা নজর দিতে ভূলে যায়। ফলে, বিক্ষুব্ধ স্বামীরা সংসারে এনে বসায় উপপত্নীর হাট। সংসারের সুখ সমৃদ্ধির ইতি হ'ল তখুনি। যুবা বয়স থেকে উলীন প্রচুর বই পড়েছে এবং এখন পর্যন্ত তার এই পড়ার অভ্যাস সে বজায় রেখেছে। কোলের শিশুটিকে পায়ের পাশে মেঝের ওপরে বসিয়ে দিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির মত উলীন বলে :

'বই তো কত রকমের আছে। বই পছন্দ করতে হ'লে জানা দরকার কার জন্য এবং কেন চাই বই। নিজের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে যদি কেউ বই পড়তে চায়, সে-জাতীয় বইও আছে। দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ পেতে চায় যারা অথচ সংসারের কাজের চাপে তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তাদের জন্য রয়েছে ভ্রমণ-কাহিনীর বই। খুন, বিষ প্রয়োগে হত্যা ইত্যাদি নিয়েও রোমহর্ষণ বই আছে ; নরহত্যা প্রভৃতি যারা করতে পারে না, অথচ এই বিষয়ে পড়ে আনন্দ পেতে চায়, তারা পড়ে এই সব বই। তা, তোমার কি জন্য বই চাই ?'

মন খুলে কথা বলতে পারে না লাও-এর, লজ্জা লাগে। তবুও সত্য কথা বলতেই হয় : 'বুঝলে জামাই বাবু, আমি যখন বিয়ে করেছিলাম তখন কি আর জানতাম যে নীলা আবার লেখাপড়া জানে ! আর আমাদের ঘরের মেয়ে বৌদের বই পড়া !—কল্পনাও করি নি কোন দিন। কিন্তু এখন দেখছি সে লেখাপড়া জানে, বই পড়তে চায়। অত অত সুন্দর চুল ছিল মাথায়, কাউকে না বলে কয়ে চুল কেটে ফেলেছে বই কেনার জন্য। তাই এলাম এখন শহরে। ভেবেছিলাম, দুল কিনে দেব এক জোড়া। তা, দুল নয়, চাই তার বই। কিন্তু কি বই কিনব, বইয়ের কিছুই তো ছাই আমি বুঝি না।'

'তোমার জিজ্ঞেস ক'রে আসা উচিত ছিল।'

'বইয়ের মধ্যে এত শত তফাৎ আছে, তা আমি কি ক'রে জানব, বল ?'

উলীন কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলে : 'আচ্ছা, ব্যাটার মা, মনে কর তুমি যদি পড়তে জানতে, তা হ'লে, কি ভাল লাগত তোমার কাছে ?

পাশে বসে হা ক'রে স্বামী ও ভাইয়ের কথা শুনছিল সে। সে বই পড়বে ! স্বামীর এ প্রশ্নে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি হাত তুলে মুখ ঢাকে যাতে তার কালো দাঁত দেখা না যায়। 'বই পড়ার কথা আমি কল্পনাও করিনি কোন দিন—' বলতে বলতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হ'য়ে যায়। উলীনের

মোটা হলদেটে মুখে অধৈর্যের ছাপ পড়েছে। মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে সে বলে :

'আমাদের ছোট বয়সে গাঁয়ের সেই এক-চোখো কথক-ঠাকুরের কাছে যেতাম আমরা গল্প শুনতে। সে বলত হ্রদের পাশের ডাকাতদের গল্প। গল্প যখন বেশ জমে উঠত, শ্রোতাদের সকলে যখন এর পরে কি হচ্ছে জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠত,...এই যেমন যুদ্ধ হয় হয় অবস্থা, কিংবা একজন লোক জালে ধরা পড়েছে,...ঠিক সেই সময় কানা কথক থালা বাড়িয়ে দিত দক্ষিণার জন্য। পাই পয়সা আনি যা থাকত শ্রোতাদের কাছে, মাঠ-ভরা পাকা ধানের ওপরে শিলা বৃষ্টির মত ঢেলে দিত বুড়োর থালায়।'

গর্ব মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উলীন স্ত্রীর দিকে।

'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। মনে পড়েছে সে-বইয়ের নাম : "সুই হু চুয়াঁ।" সব কিছু এর মধ্যে আছে—ব্যাভিচারিণী স্ত্রীদের শাস্তির কথা আছে এতে, সত্যের গুণগান আছে এ-বইয়ে। শয়তানদের কথাও আছে এ-বইয়ে,—শয়তানী অপকর্মের জন্য তাদের সব সময়েই শাস্তি পাওয়ার কথা আছে, যুদ্ধে যায় তারা সকলের আগে। পরোপকারী ডাকাতদের কাহিনীও আছে এই বইয়ে। ছোট বয়সে আমি পড়েছিলাম, এখনও আবার নতুন ক'রে পড়া যায়—এত ভাল বই।'

বইয়ের কাহিনীগুলো মনে পড়ায় উলীনের ঠোঁটে মৃদু হাসি ভেসে ওঠে। বইয়ের নামটি আর একবার আওড়ে নিয়ে লাও-এর বিদায় নেয় দিদি ভগ্নীপতির কাছ থেকে। দোকানের ভেতর দিয়ে বেরোবার সময় শোনে দোকান ভর্তি ক্রেতাদের গুঞ্জনের মাঝে দোকানের বাইরে কিসের হৈ-হুল্লোড় চিৎকার ধ্বনি। হঠাৎ সেই সুউচ্চ চিৎকারে কেনাকাটা বন্ধ ক'রে ক্রেতারা দোকানের প্রশস্ত দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে। ইঁট আর লাঠি হাতে একদল যুবক দরজার মুখে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দলের যুবক নেতার লম্বা চুল এসে পড়েছে চোখের ওপরে। মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুল সরিয়ে নিয়ে যুবক নেতা চিৎকার ক'রে দোকান-কর্মচারীদের হুকুম দেয় একটা বাক্স খুলতে। কর্মচারীর গড়িমসি ভাব দেখে হাতের ইঁট ছুঁড়ে মারে সে সাজানো আলমারির কাঁচে। ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে জিনিস পত্তর ছিটকে পড়ে চারদিকে। 'বিদেশী জিনিস, শত্রুদের জিনিস!' হাঁক দিয়ে বলে নেতা।

ঘড়ি কলম প্রভৃতি সব জিনিস তুলে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তার ওপরে। যুবক সাথীরা দোকানের বাক্স পেটরা ভেঙ্গে সব বিদেশী পণ্য ফেলে দেয় রাস্তার

ওপরে। আশে পাশের চারদিকের লোকজন ছুটে এসে নিতে থাকে ঐসব পড়ে-পাওয়া জিনিস। এত সব ভাল পণ্যের এই নষ্ট দেখে মৃদু কণ্ঠে দু'একটা কথা বলে দু'চারজন ক্রেতা, আবার সুযোগ বুঝে তাদের কেউ কেউ হাতের কাছের জিনিস নিয়ে দেয় চম্পট। যুবকদের চোখে যখন এলো এটা, দ্বিগুণ রাগে ছুটে গিয়ে পড়ল তারা ঐ লোকদের ওপরে। হাতের লাঠি ও ইঁটের ঘায়ে জন কয়েকের মাথা ভেঙ্গে দিয়ে দিল তাদের হটিয়ে। রাস্তার ওপরে পাহারায় দাঁড়িয়ে রইল দু'চারজন যুবক, আর বাকী অন্যরা সব রাস্তার ওপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্তূপীকৃত ক'রে ফেলল উলীনের দোকানের সব বিদেশী পণ্য। তারপর দিল তাতে আগুন ধরিয়ে। হতবাক লোকদের চোখের ওপরে আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়তে লাগল সার্ট কোট কম্বল জুতো টুপি। চোখের ওপরে এত নষ্ট, কিন্তু সাহস ক'রে কেউই কোন কথা বলতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা হ'য়ে দেখল লাও-এর, কিন্তু একটি কথাও বের হ'ল না তার মুখ দিয়ে। একলাই বা সে কি বলবে? ধারে কাছে কোথাও উলীন কিংবা তার কর্মচারীদের কাউকে দেখল না সে। চিন্তাকুল লাও-এর গাঁয়ের পথে পা বাড়াল।

শহরের অর্ধেক পথ যখন সে চলে এসেছে, হঠাৎ তখন মনে পড়ল বইয়ের কথা। আবার ফিরে এসে সে গেল বইয়ের পাড়ায়। বিদ্রূপ জর্জরিত হ'য়ে যে-দোকান থেকে সে ফিরে এসেছিল আগে, সেই দোকানীর চোখের ওপরে তারই পাশের দোকানে গিয়ে সে চাইল তার বই। পুরোনো ব্যবহৃত অপরিষ্কার সুবৃহৎ বই একখানা এনে দোকানী দেখাল লাও-এরকে।

'এঃ, এরকম নোংরা বই! দাম নিশ্চয়ই কম!' নোংরা দাগগুলো দেখতে দেখতে লাও-এর বলে।

'কিছুদিন আগে হ'লে কম দামেই পেতে। কিছুদিন হ'ল, কেন জানি, ছাত্ররা দলে দলে আসছে আর এই বই কিনছে। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝি না। যেন সব পাগল হয়ে উঠেছে। আর ছাত্রীগুলো—' ওয়াক থু ক'রে মেঝের ওপরে কতকগুলো গয়ের ফেলে পা দিয়ে ঘসতে থাকে দোকানী।

'দাম কত?' লাও-এর জিজ্ঞেস করে।

'তিন টাকা।'

•হা ক'রে তাকিয়ে থাকে লাও-এর। 'একটা বইয়ের দাম?'

'একটা বই না তো কি? একটুকরো শুয়োরের মাংসের জন্য তো খরচ কর এত! কি তার থাকে শুনি? পেটে ঢুকালে আর বের ক'রে ফেলে দিলে,

বাস। কিন্তু বই! পড়লে আর মনের পটে সেটা গাঁথা হ'য়ে রইল। যদি ভুলে যাও, তবে বইয়ের পাতা উল্টে আর একবার পড়ে নাও। কতকিছু ভাবতে পার তারপরে। চাই কি সৌভাগ্যের রাস্তাও খুলে যেতে পারে।'

কোমর থেকে থলি বের ক'রে লাও-এর টাকা দিয়ে বই নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। গাঁয়ের পথে পা বাড়ানোর আগে আর একবার ভগ্নীপতির দোকান দেখে যাওয়া উচিৎ মনে করে লাও-এর। ডাকাত ব্যাটারা এখনও আছে, না, গেছে, দেখা দরকার। উলীনের দোকানের কাছে এসে দেখে দোকানের দরজা কাঠ মেরে বন্ধ করা আর রাস্তার ওপরে ছাইয়ের গাদার ওপরে একদল ভিক্ষুক ও ছোট ছোট ছেলে খুঁজে খুঁজে দেখছে বোতাম কিংবা আর কিছু পায় কিনা। ভ্রূক্ষেপহীন পথচারীরা যে যার কাজে চলেছে, যেন এ-ঘটনা এ-শহরের নিত্যনৈমিত্তিক।

ভেতরে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে কি গাঁয়ে ফিরবে সে ? কিন্তু কাঠ মারা দরজার ওপরে সাদা খড়িমাটি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে কি সব লেখা রয়েছে। অক্ষর-গুলো দর্শকদের যেন গিলে খেতে চায়। অনেকক্ষণ হা ক'রে ঐ অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লাও-এর কিন্তু কিছুই ঢুকল না তার মাথায়। এর মধ্যে গিয়ে নতুন বিপদের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা কি সমীচীন হবে, লাও-এর ভাবে। পুত্র হিসেবে তার প্রথম কর্তব্য হ'ল বাপ-মাকে দেখা। যদি সে কোন বিপদে পড়ে, তা হ'লে তো তারা মনোবেদনায় দুঃখ পাবে। কিন্তু লেখা-গুলো কি ? তার পাশ দিয়ে লম্বা জামা পরিহিত জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। দেখে মনে হয় পণ্ডিত। তাকে লাও-এর জিজ্ঞেস করল : 'আদাব বাবু মশায়! একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঐ সাদা লেখাগুলো কি ?'

ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে নিচের পকেট থেকে চশমা বের ক'রে চোখে এঁটে নিজের মনে মনে লেখাটা পড়লেন। তারপর লাও-এরকে বললেন :

'এই লেখাগুলোয় আছে যে, যারা বিদেশী শত্রুদের পণ্য কেনা-বেচা করবে, তাদের অবস্থা হবে এই রকম। তাতেও যদি না হয় তবে এই সব শত্রু-দালাল-দের প্রাণ পর্যন্ত নেওয়া হবে।'

ভীত লাও-এর ধন্যবাদ জানায় বৃদ্ধকে। বিকটাকার অক্ষরগুলোর অর্থও চেহারার মত হিংস্র। এই অবস্থায় এ-বাড়ির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক রয়েছে, কোন মতেই তা প্রকাশ করা চলে না। তাড়াতাড়ি গাঁয়ের গৃহের নিভৃতে হাঁপ ছাড়তে পারলে যেন সে বাঁচে। আর, বাপ-মায়ের ওপর কর্তব্যও তার আছে। কাঁধের

নীল গামছাটাতে নীলার বইটি জড়িয়ে নিয়ে সে পা বাড়াল গৃহপানে। কি যে সব দিনকাল পড়েছে, কীই না ঘটল আজ সকালে চোখের ওপর! যে শহরে এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে তার ত্রিসীমানার বাইরে যত তাড়াতাড়ি পারে সে ছুটে যাবে। গাঁয়ের পথে নির্মল আকাশের নিচে হরিতশ্রী ক্ষেতের পানে তাকাতে তাকাতে হৃষ্টমনে সে গৃহে ফেরে।

নীলার হাতে বইখানি সে দেয়, কিন্তু বইয়ের কথাও ভুলে যায়।

গৃহ-প্রাঙ্গণে এসে সকলে শোনে লাও-এরের কথা। ছোট বোন প্যানসিয়াও তাঁত বন্ধ রেখে উঠানে এসে শোনে দাদার কথা। হুঁকো টানতে টানতে চিন্তামগ্ন বৃদ্ধ লিংটান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে: 'শত্রুর নাম জিজ্ঞেস করেছিলি?'

'না, আমার মাথায় একদম আসেই নি সে-কথা!'

অতি সাধারণ স্বাভাবিক এই প্রশ্নটি তার মনে জাগে নি বলে নিজের বোকামির জন্য লজ্জিত হয় লাও-এর।

কিন্তু গ্রামের এই গৃহ থেকে শহর তো অনেক দূরে। শহরের ঘটনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মন খারাপ করে কি লাভ? ধীর পদক্ষেপে সন্ধ্যা এসে ঘোমটা টেনে দেয় গাঁয়ের মাঠ-ঘাটের ওপরে। আহার-অন্তে যে-যার ঘরে যায় শুতে। শহরবাসীরা হানাহানি ক'রে মরলেও গাঁয়ের এই শান্তির পারাবারে কেউ পারবে না নাড়া দিতে। তবুও পাশাপাশি শুয়ে উৎকণ্ঠিত লিংটান ভাবে তার বড় মেয়ের কথা। ব্যবসায়ী উলীনের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে যদি গাঁয়ের কোন কৃষাণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিত লিংটান, আজ কি মেয়েটা এই বিপদে পড়ত? লিংসাও কি আর বোঝে সে-কথা? ভাল ঘর ভাল ঘর ক'রে লিংসাওর ঐ জেদের জন্যই না মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল শহরে উলীনের সঙ্গে।

স্বামীকে সান্ত্বনা দেয় লিংসাও: 'অত দুশ্চিন্তার কি আছে? দু'দুটো সন্তানের মা হয়েছে বড় মেয়ে, ওর সমস্ত কিছু,—চিন্তা ভাবনা, ভার—সব এখন জামাই উলীনের। আর সত্যি সত্যিই যদি বেশি কিছু বিপদ হয়, কাল নিশ্চয়ই খবর পাঠাবে জামাই। অনেক রাত হয়েছে, ভাবনা চিন্তা রেখে এখন ঘুমোয় তো।'

স্ত্রীর কথায় কিছুটা দুশ্চিন্তা লাঘব হয় লিংটানের। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবে গ্রাম জমি বাড়ির কথা যেখানে তারা বাস করছে পুরুষানুক্রমে, যে-মাটি যোগিয়েছে তাদের মুখের অন্ন। যা কিছু ঘটুক না কেন, এই ধরণী তাদের। তারপর আস্তে আস্তে এক সময়ে নিস্তব্ধ নিশীথিনীর সুপ্তির কোলে সঁপে দেয় তারা নিজেদের।

নিজেদের ঘরে শুয়ে লাও-তা ভাবে দিদি ও ভগ্নীপতির কথা। শিশুর মুখে মাই দিয়ে পাশে শুয়ে আছে প্রিয়া। আস্তে আস্তে সে বলে:

'বুঝলে গো, দেখলাম, এসব হচ্ছে বিদেশী শিক্ষার কুফল। আজকাল এই সব ছাত্ররা আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-সাধুতা গেছে একেবারে ভুলে। ফলে, বিচার শক্তি ফেলেছে হারিয়ে। আজ যা ওদের মনে হয় ভাল, কাল মনে করে তা ভুল। কার পক্ষে কোন্‌টা যে সঠিক তা কি বলা সম্ভব? এই সোজা কথাটা এরা বিশ্বাসই করে না। অল্প বিদ্যার সবজান্তা গর্ব নিয়ে এই ছাত্ররা যা ক'রে বসে, তা খারাপ ছাড়া ভাল হয় না কখনও।'

'হুঁ, আমাদের ছেলেদের কখ্‌খনও ঐসব ইস্কুলে পাঠাব না—' স্বামীর কথার উত্তরে নিদ্রাতুর অর্কিড বলে। মাই মুখে বুকের শিশু তখনও দুধ খেতে থাকে। অর্কিড ঘুমিয়ে পড়ে।

'হ্যাঁ, কখ্‌খনও পাঠাব না—' আবার চিন্তায় ডুবে যায় লাও-তা। মনের চিন্তা মুখের ভাষায় ফুটিয়ে তোলার কঠিন পরিশ্রমে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে সে। চিন্তাকে গ্রথিত করা যেন প্রস্তরাকীর্ণ মাঠে লাঙ্গল দেওয়ার মত কঠিন: অনেকক্ষণ ভেবে সমস্ত চিন্তাগুলোকে এক সঙ্গে গেঁথে অবশেষে লাও-তা আবার বলে: 'বাড়ী-ঘর ছেড়ে কারও বাপু বাইরে যাওয়া উচিত নয়। বাড়িতে থেকে যে-যার কাজ যদি করে, তবে তো কারও কোন বিপদই হয় না। সকলেই যদি তাই করে তবে শত্রুরা কি করতে পারে আমাদের?'

স্ত্রীর উত্তরের প্রতীক্ষা করে লাও-তা। মনের চিন্তাগুলোকে একসঙ্গে গেঁথে ভাষায় প্রকাশ করেছে সে, প্রিয়া বুঝে কদর করবে। কিন্তু নীরব প্রিয়ার নাক থেকে মৃদু গুঞ্জন শুধু শোনে। একটু রাগ হয় লাও-তার, তার চিন্তার সমস্ত পরিশ্রমটাই ব্যর্থ হলো! কিন্তু তাই বলে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ডেকে তুলে মনের কথা শোনাতে চায় না লাও-তা। সরল শান্তিপ্রিয় লাও-তা স্ত্রীকে জাগায় না আর। তারপর ভাবতে ভাবতে কখন নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শহরের বর্ণনা ভাবতে থাকে প্যানসিয়াও। স্বপ্নের মত মনে হয় সব কিছু। গ্রামের বাইরে পা দেয়নি সে কোন দিন, তার কাছে শহর স্বপ্নের রাজ্য। বাপ-মায়ের সব কনিষ্ঠ সন্তান এই মেয়েটি— লিংসাওর চল্লিশ বছর পেরিয়ে যাবার পর ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। গাঁয়ের গৃহিণীরা ঠাট্টা ক'রে সে-দিন বলেছিল লিংসাওকে: 'তোমাদের বাপু আর কামাই নেই! এত বয়সেও কি তেজ! শুয়োরের মত বিয়োচ্ছো কেবল!' গাঁয়ের

কোন কথাই তো আর গোপন থাকে না। প্যানসিয়াও বড় হ'য়ে এই ঠাট্টার কথা শুনেছিল। তা ছাড়া তার নামেই যেন এই ঠাট্টাটা মিশে আছে, যদিও নাম রাখবার সময় অত ভেবে চিন্তে অর্থ বিচার ক'রে বাপ-মা দেখেনি তখন। লিংটানের পণ্ডিত ভাই একটি সুন্দর শ্রুতিমধুর নাম খুঁজে দিয়েছিল মেয়েটির জন্য : 'প্যানসিয়াও'—'সুস্মিতা।' চাষীর ঘরের মেয়ের পক্ষে যেন বড় বেশী কেতাবী নাম। লিংটানও অত ভেবে চিন্তে না দেখে ঐ নামই গ্রহণ করেছিল মেয়ের জন্য। আর সন্তান যখন মেয়ে, তখন নামের জন্য অত ভাববারই বা কি আছে? প্রৌঢ় লিংটান দম্পতির কনিষ্ঠ কন্যার এ-নাম শুনে মৃদু হেসে গ্রামবাসীরা কিন্তু নতুন অর্থ ক'রে নিয়েছিল : বুড়ো বয়সের মেয়ে ব'লে বুঝি মেয়ের নাম রাখা হয়েছে প্যানসিয়াও—মমতা মাখানো ঈষৎ হাসি-মাখা মেয়ে—সুস্মিতা!

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুস্মিতাও বেড়ে ওঠে তার নামেরই মত : বিনয়ী বিনোদিনী কিশোরী কন্যা, মুখে মৃদু হাসি, সর্বসত্ত্বায় জড়িয়ে থাকে মমতার মাধুরী...একেবারে আত্মহারা হ'য়ে কোন স্থানেই পারে না মিশে যেতে। তাই নতুন পরিবেশে পড়লে সে চেষ্টা করে অন্যের মনোরঞ্জনের। ক্ষীণাঙ্গ ব'লে অন্য ভাই-বোনদের মত শক্ত সমর্থ ছিল না সে, কাজের চাপে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ত তাড়াতাড়ি। মেজদার কথা তাই সে শুধু হা হ'য়ে শুনেছিল মাত্র : শ্রান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিদ্রার সায়রে গেল ডুবে।

এবং লাও-এর ও নীলারও কি মনে আছে এখন শহরের এসব কথা? প্রদীপের আলোয় বই খুলে বসেছে নীলা। আস্তে আস্তে গলার স্বর বাড়িয়ে পড়ছে সে, আর আশ্চর্য হ'য়ে হা ক'রে তাকিয়ে আছে লাও-এর তার পরম প্রিয়ার বিম্বাধরের পানে। তার চোখে যে লেখাগুলো মনে হতো কেবল কালি-মাখা পায়ে আরসোলার হেঁটে যাওয়ার দাগ, সেই লেখাগুলোই প্রিয়ার চোখের মণিতে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে কেমন সুন্দর শ্রুতিমধুর বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত হ'য়ে সুধা বর্ষণ করে তার কানে। উদগ্র মন নিয়ে সে চেয়ে থাকে প্রিয়ার চোখের দৃষ্টিপথে, আশ্চর্য হ'য়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, উপর থেকে নিচে অক্ষর-গুলোর লম্ব-গতির সঙ্গে নীলার দৃষ্টির সঞ্চলন। নরম হাতের ছোট ছোট আঙুল মৃদু মৃদু নড়ছে বইয়ের পাতার উপর। গাঁয়ের মিষ্টভাষী কথকদের মত সুধামাখা কণ্ঠে নীলা পড়তে থাকে নতুন কেনা বই, আনন্দে আত্মহারা লাও-এরের গর্ব-স্ফীত বুকের সমস্ত আবেগ উঠে এসে গলায় চেপে বসে। নিজেকে আর চেপে

না রাখতে পেরে অবশেষে বলে ফেলে : 'তোমায় যে কি ভালবাসি...বাবা মার থেকেও তোমায় বেশী ভালবাসি...'

আরক্তিম মুখে লাও-এরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে নীলা...লজ্জাবনত স্মিত মুখে ধীরে বলে :

'আমার মুখের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকলে আমি পড়ি কি ক'রে!'

'বইয়ের অক্ষরের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো কিছু বুঝব না, তাই তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি,' বলে লাও-এর।

লজ্জা কাটিয়ে নেবার জন্য নীলা হঠাৎ বলে ওঠে : 'ও—! তোমাকে তো বই পড়াতে শেখাব ঠিক করেছিলাম—' তাড়াতাড়ি বইয়ের উপরে নুইয়ে পড়ে অক্ষর চেনাতে সুরু করে স্বামীকে। লাও-এরও বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে অক্ষর চিনতে সুরু করে। কিন্তু পড়ায় তার মন কই? গভীর নিশীথে বিছানায় প্রিয়ার পাশে শুয়ে মনে হয় লাও-এরের দুনিয়ার সব কিছু সর্ব-আনন্দের আগার হ'লো তার এই জন্মভূমি, এই গ্রাম, এই গৃহ। একবারও তার মনে পড়ল না দিনের বেলার সেই হৃদয়-বিদারক অভিজ্ঞতার কথা।

শহরের ঘটনা নিয়ে শুধু ভাবে সেজ ভাই লাও-সান। বাঁশের মাচার ওপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ভাবে, ভগ্নীপতি উলীনের সুন্দর সাজান দোকানে কেন হামলা করল এক দল যুবক! কারা ঐ যুবকরা? . শত্রুরাই বা কারা? লাও-সানের খেয়াল হয় : তাইতো এ-দুনিয়ার কিছুই তো সে জানে না! গ্রামের এই গৃহে এইভাবে জীবন যদি কাটিয়ে দেয় তো কোন দিনই সে কিছুই জানতে পারবে না। নিদ্রাহীন অস্থির চিত্তে সে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর মোষটার পেটের কাছে কিছু বিচালি ছড়িয়ে তার লোমশ গা ঘেঁসে শোয়, পরিচিত পরিবেশে চিত্তের অস্থিরতা কমলে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যান্য রাত্রে ঘুম না হ'লে এই রকম করত লাও-সান।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রির কোলে গাঁয়ের বিস্তীর্ণ মাঠ-ঘাটের মাঝে গোরস্থানের নীরন্ধ্র নীরবতা বিরাজ করে লিংটানের গৃহে...সমাধি নয়, প্রাণবন্ত অমর জীবনের সুষুপ্ত আগার। আকাশের ক্ষীণাঙ্গী চাঁদ ভেসে ওঠে মাঠের জলে, কৃষাণের চালে...হাজার হাজার বছর ধরে যে-ভাবে সে উঠেছে, ভেসেছে আকাশের গায়ে তার যৌবন-শ্রীর পাখা মেলে কিংবা ক্ষীণাঙ্গের রেখা এঁকে।

॥ তিন ॥

গ্রামের বাইরে কদাচিৎ পদার্পণ করলেও লিংটান কিন্তু জীবনের প্রতি পরতের বিস্তৃতি ও গভীরতায় অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। নাই বা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে দেখল লিংটান, তার ধারে কাছে চারদিকের সব কিছুই তো সে দেখেছে। বাপ ঠাকুর্দার কর্ষিত জমি আজ যা সে চাষ করছে, সে-ক্ষেত তো তার কাছে শুধু মাত্র জমি নয়, তার অভ্যন্তরের প্রাণসম্পন্ন শ্রী-সমৃদ্ধ বসুমতীর প্রতিটি রেখাকে সে জানে, সে ভালবাসে। মাঠের ওপরের বিস্তৃতির মালিকানাই তো শুধু তার নয়। নরম কালো মাটিতে হল দিতে দিতে ঈষার ওপর হাত রেখে কিংবা নবোদ্ভিন্ন চারা-ধানের জমি নিড়োতে নিড়োতে কতদিন মনের প্রশ্ন নিয়ে সে ভেবেছে, কালো মাটির অভ্যন্তরে অঙ্কুরোদ্গম হয় যেখানে কি আছে তার নিচে?

যুবা বয়সে বাপের নির্দেশে লিংটান একবার কুয়ো খুদেছিল তাদের জমিতে। সেবারই সর্বপ্রথম সে দেখেছিল সুফলা মাটির নিচে পরতের পর পরতের কী অপূর্ব সৌন্দর্য! প্রথমে উঠেছিল নিবিড় নরম মাটির স্তর...যুগের পর যুগ তারই পূর্বপুরুষের হালে ও সারে কর্ষণ-সমৃদ্ধ হ'য়ে যা ফলে ফলে ভরিয়ে দিয়েছে উপরের ক্ষেত। পূর্ণ যৌবনা নারীর মত উর্বরা প্রাণবন্ত সেই জমি নব-জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকত সব সময়ে।

বসুমতীর এই স্তর সে জানে। এরই নিচে উঠেছিল কঠিন হল্‌দে এঁটেল মাটি, কলসীর তলার মত যে-মাটি বৃষ্টির জল ধরে রেখে উপরের শিকড়কে পান করায়। কি ক'রে এল এখানে এঁটেল মাটির স্তর? লিংটানের বৃদ্ধ বাপও জানত না, সেও জানে না। এই স্তরের নিচে লিংটান দেখেছিল প্রস্তরাকীর্ণ তবক—বিরাট প্রস্তরের চাক নয়, গুড়ো গুড়ো এবং তারই মাঝে মাঝে ধূসর বালি মেশানো। আরও খুদতে খুদতে পরের স্তরে উঠেছিল ভাঙ্গা মাটির বাসনের টুকরো ও নীল রঙের চীনে-মাটির খণ্ড। আশ্চর্য হ'য়ে আরও খুদতে খুদতে তার হাতে পড়েছিল কোন্ সাবেক কালের রৌপ্য মুদ্রা যা তারা জীবনেও দেখেনি কোনদিন। তারপর উঠেছিল চীনে-মাটির সাদা বাসন ও একটা ধূলো ভরতি চকচকে ধূসর রঙের কলসী। উপরে বাপের কাছে ওগুলো নিয়ে এলে তারা দুজনেই আশ্চর্য হ'য়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল ঐগুলোর দিকে। বৃদ্ধ বাপ তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল:

'এসব আমাদেরই পূর্বপুরুষদের ব্যবহার করা জিনিস রে। তাঁদের কবরেই

এগুলো রেখে দেওয়া উচিত।' সেদিন তাই তারা করেছিল। তারপর আরও মাটি খুদতে খুদতে একদিন সকালে স্বচ্ছ জল বের হলো কুয়ো'য় এবং সেই দিন থেকে আজও সেই স্বচ্ছ সুশীতল জল তারা পাচ্ছে।

লিংটানের চিন্তা আরও এগিয়ে যায়। নদীর নিচেও এই মাটি রয়েছে। পূর্ববর্তী কত লোক বাস ক'রে গেছে, ভোগ করেছে এই মাটি। গাঁয়ের প্রবীণদের মুখে তাই শোনা যায় যে মাটি খুদতে খুদতে যদি গভীর অন্তস্তলে যাওয়া যায়, তবে বহু প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ ও শহরের ভগ্নাবশেস পাওয়া যেতে পারে। লিংটানেরই ঠাকুর্দাদা তার বাবার কবর খুদতে গিয়ে একটি সোনার ড্রাগন পেয়েছিল—হয়তো কোন্ প্রাচীন প্রাসাদ-চূড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল সেটা। ঠাকুর্দাদা সেই ড্রাগন বেচে যে প্রচুর অর্থ পেয়েছিল তাই দিয়ে সে কিনেছিল জমি-জমা এবং সেই সঙ্গে মনের ও দেহের সাধ মিটাবার জন্য রেখেছিল উপপত্নী। শোনা যায় ঐ উপত্নীই হয়েছিল যত অনিষ্টের মূল...সংসারের শান্তি সম্পদ ও শ্রী গেল উড়ে, যে-মাটির দৌলতে তার প্রতিষ্ঠা, তা পর্যন্ত বেহাত হ'তে সুরু হলো। উপপত্নী-পাগল গৃহকর্তা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না। অবশেসে সমূহ বিপদের মুখে স্ত্রী বুদ্ধি ক'রে বিস খাইয়ে খতম ক'রে দিয়েছিল সেই ডাইনী মাগীকে। মাটিতো রক্ষা পেল, ছেলেরা তো পথে বসল না, সংসার তো বাঁচল! কিন্তু শোক-মূহ্যমান গৃহকর্তা সইতে পারল না তার অন্ধ-প্রেমের বিরহ। আত্মহত্যা ক'রে দেহ ও মনের সকল জ্বালা সে জুড়ালো। সেই থেকে গ্রামে একটা কথা চলিত আছে যে বুড়োর ঐ উপপত্নী ছিল পরী যাকে ভর করেছিল ঐ সোনার ড্রাগনের মধ্যের কোন শিবা-প্রেত, আসলে 'ওটা ঠিক মঙ্গলদায়িনী ড্রাগন ছিল না।

এই সব কিংবদন্তীর মূলে কতট সত্য ছিল তা লিংটান জানে না। কিন্তু সে পেয়েছে মাটি যার বিস্তার ঐ ঝরণা ঘিরে নদীর বাঁক ঘেঁসে পাহাড় পর্যন্ত। লিংটান আজ এই জমির মালিক, ভবিষ্যতে ছেলেদের হবে এই জমি।

এই পৃথিবীর আকৃতি বলে গোল—অন্ততঃ তাই তো সে শুনেছিল সেবার নবান্ন উৎসবের সময়ে এক যুবক-বক্তার মুখে। এরা গাঁয়ে আসে চাষীদের জ্ঞান বিতরণ করতে। নবান্ন উৎসবের সময়ে লোকজনের কাজকর্ম থাকে না, তারা মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের বক্তৃতা শোনে। সেইবারই বক্তা বলেছিল পৃথিবীর আকৃতি গোল ব'লে আর বাঘের মত বড় বড় ছবি ঝুলিয়ে বোঝাচ্ছিল মশা-মাছির সর্বনাশা রূপের কথা। মশা-মাছির সেই চেহারা দেখে মেয়েরা ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠেছিল সেদিন। লিংটান তখন বুঝিয়েছিল তাদের যে এইসব

বড় বড় মশা-মাছি এদেশের নয়, বিদেশে বোধহয় এই রকম বড় বড় হয়। এখানে তো ছোট ছোট মশা-মাছি, ইচ্ছে হ'লে টিপে মেরে ফেল্লেই হ'লো।

কিন্তু পৃথিবী যে গোল,—যুবক-বক্তার একথা লিংটান ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি। সেই যুবক-বক্তার কথা মনে হলেই লিংটান ভাবত, বোধহয় দেবতার কাছে এই ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জ্ঞান বিতরণ করার মানত করেছিল যুবকটি। গোলাকৃতি তরমুজ হাতে পেলে লিংটান ভাবত : 'হুঁ, এই যে ছোট্ট পৃথিবী!' কিন্তু কোন মতেই সে ভেবে পেত না পৃথিবী যদি গোলই হবে তবে লিংটানের উল্টো দিকের দেশের লোকেরা মাটিতে হাঁটে কি ভাবে? একদিন গাঁয়ের চা-খানার আড্ডায় এই নিয়ে যখন লিংটান কথা উঠালো, তখন ভেবে-চিন্তে পণ্ডিত বললে : 'তা হবে, শুনেছি সোজা বুদ্ধিতে যা করা উচিত ব'লে আমরা মনে করি, ঠিক তার উল্টোটি করে ঐ বিদেশীরা। যেমন ধর, জন্মানোর সময় ওদের ছেলে-মেয়েদের মাথার চুল বলে সাদা হয়। তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয় কালো। কাঠ কাটতে গেলে ওরা করাতটাকে আমাদের মত না টেনে সামনের দিকে ঠেলে। আমরা বিছানায় চাদর বিছাই, আর ওরা করে কি জান? ওরা আবার ঘরের মেঝের ওপরেও মোটা রঙিন চাদর পাতে। ওদের কাজকম্মের কি আর কোন মাথামুণ্ডু বোঝা যায়? হয়তো হতেও পারে যে ওরা পায়ে না হেঁটে হাঁটে মাথা দিয়ে!'

ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে দিতে এই ভাবেই বিদেশীদের সম্বন্ধে আপন মনে ভাবে লিংটান। ছাত্রদের কথামত পৃথিবীটা যদি সত্যি সত্যিই গোল হয় তবে তার এই জমির উল্টো দিকে নিশ্চয়ই বিদেশীরাও জমি চষে এই ভাবেই ফসল ঘরে তুলে নেয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লিংটানের মুখে হাসি ফুটে উঠে : 'হুঁঃ, ওদের কাছে তো জমির খাজনা চাইতে হবে!

বাপের মুখে হাসি দেখে বড় ছেলে জিজ্ঞেস করে হাসির কারণ। হাসতে হাসতে বুড়ো বলে : 'কোন রকম নজরানা খাজনা না দিয়েই আমাদের জমির উল্টো দিকে বিদেশীরা বে-আইনীভাবে জমি চষছে। পথ-ঘাটটা জানতে পারলে ব্যাটাদের নামে দিতাম এক নম্বর ঠুকে!'

মনের আনন্দোচ্ছ্বাসে বুড়োর চোখ চক চক করে। ছেলেরাও মন খুলে হেসে ওঠে। আজ পর্যন্ত কোন বিদেশীকে দেখে নি তারা। শুনেছে শহরে বলে কিছু কিছু বিদেশী ব্যবসাপত্তর নিয়ে বাস করে। কিছু দিন আগে এক বিদেশী সাহেবের বাবুর্চি তাজা ডিম কিনতে এসেছিল লিং গাঁয়ে। লিংটান

জিজ্ঞেস করেছিল তাকে তার সাহেব হাঁটে পা দিয়ে, না, মাথা দিয়ে। বাবুর্চির কাছে যখন শুনল যে সাহেব পায়েই হাঁটে, তখন লিংটান মনে মনে তারিফ করল বিদেশীদের এই ব'লে যে এরা বিদেশে এসে সেই দেশের দেশাচার মানে তাহ'লে। কিন্তু লিংটানের গৃহে বিদেশীদের নিয়ে নানা রকমের গাল-গল্প হাসি-ঠাট্টা চলত প্রায়ই। জমির জল শুকিয়ে গেলে লিংটান রাগের ভাব দেখিয়ে মন্তব্য করত : জমির উল্টো দিকের বিদেশীরা তার জমির জল শুষে নিয়েছে বলেই এই জলাভাব হয়েছে! ক্ষেতের ওলকপি যদি আকারে ছোট হতো, লিংটান হাসতে হাসতে বলত : 'হুঁ, ব্যাটারা দেখি ওলকপির শিকড় ধরে টান মেরেছে!' বিদেশীদের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় না হলেও লিংটানের পরিবারে তারা বেশ আনন্দ-আলোচনার বিষয়ই হ'য়ে রইল। আলোচনায় আলোচনায় বিদেশীরা আজ লিংটানের মন-জগতে এত পরিচিত যে আজ যদি কোন অচেনা লোক নিজেকে বিদেশী বলে হাজির হতো লিংটানের গৃহে, তারা তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে চর্ব্যচোষ্য সাজিয়ে ভুঁড়িভোজনে আপ্যায়িত করত।

ধরিত্রীর উপরের মাটি কিংবা তার অভ্যন্তরের থরো থরো সাজান স্তরই কি শুধু লিংটানের? তার সোনার মাটিকে আবৃত ক'রে উর্দ্ধ গগনে উঠে গেছে যে সমীরণ, সেও তো লিংটানের। মাথার উপরের রাত্রির কালো আকাশের কোলে চিকমিক ক'রে হেসে ওঠে যে নক্ষত্র রাজী, সেগুলোও তো তারই। তারও ওপারের নভোমণ্ডলের সব কিছুই তার। হোক অজানা—কেই বা জানে সব কিছু—তবুও ওগুলোকে বড় আপন মনে হয় কৃষাণ লিংটানের। মেয়েদের কর্ণাভরণের মত উপরের ব্যাপ্তির শূন্যতাকে ভরিয়ে রেখেছে তারার আলোকমালা...মানুষের কোন ক্ষতিই তারা করে না, ভাল কিছু করে কিনা লিংটান জানে না। ভাল করুক আর নাই করুক, রাত্রির মসীলিপ্ত আকাশকে রাঙ্গিয়ে রাখে তো এরাই! হয়তো চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে এরা চলে, কিংবা হয়তো সূর্য-অঙ্গ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়েছে তারা। সূর্য ও চন্দ্রের বিবাদ-কাহিনী তো সকলেই জানে। লিংটানের জীবনেই তো দু'তিন বার দেখল এদের সেই সর্বনাশা ঝগড়া...এতদূর পর্যন্ত সে-ঝগড়া গড়িয়েছিল যে একে অন্যকে প্রায় পূর্ণগ্রাস ক'রে ফেলেছিল। আবার বিবাদ বাধবে কিনা কে জানে। সেই ঝগড়া দেখে নিচের ধরার মানুষেরা হৈ হৈ চিৎকার ক'রে, শঙ্খ, কাশর, ধামা, কুলো, বেতের বড় বড় খালি জালা বাজিয়ে বাজিয়ে তাদের মারাত্মক সংগ্রাম বন্ধ করবার চেষ্টা করে। অবশেষে সেই শব্দে সূর্য চন্দ্রের চেতনা যেন ফিরে আসে,

পরস্পরকে ছেড়ে দিয়ে তারা আবার নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে সুরু করে। ধরার মানুষের চিৎকার ও শব্দ যদি না হতো, হয়তো তারা এইভাবে মারামারি ক'রে একজনকে শেষ ক'রে ফেলত। ফলে আকাশ থেকে অর্ধেক আলো চিরদিনের জন্য শেষ হ'য়ে যেত। আর সত্যি সত্যিই যদি চন্দ্র সূর্যকে গিলে ফেলত, পৃথিবীর মানুষের বিপদ হ'ত আরোও বেশী। তার জমির ওপরের তারাগুলোকে নিজের বলে ভাবতে ভাল লাগে লিংটানের। যদি একটা তারা ঐ আকাশের শূন্য থেকে পেড়ে নিয়ে নিজের হাতেব তেলোয় তুলে নেওয়া যায়, তবে কি তখনও সেই তারাটি ঐরকম চিক্‌মিক্ করবে?

এই ভাবেই লিংটান ভাবে। তার এই ভাবনার সঙ্গে মিশে থাকে চাসের হিসাব, উদ্‌বৃত্ত শস্যের দামের অঙ্ক। একদিন তার মনে হয় তার জীবিত অবস্থায়ই জমি-জমা ছেলেদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবে কিনা, না, বড় ছেলেকে জমি-জমা দিয়ে মেজকে বলবে দাদার সঙ্গে থাকতে। কিন্তু লাও-সানের বিয়ে হ'লে, তার ছেলেপিলে নিয়ে কি সে নির্ভর করতে পারবে এই পৈত্রিক মাটিতে? পেট পুরে খাবার ব্যবস্থা না থাকলেই তো পারিবারিক অশান্তি সুরু হয়, ঝগড়া-ঝাটি লাগে। কারণ, লিংটান তো দেখেছে যে যতদিন উদর-ভরতি খাবার পাওয়া যায় জমি থেকে, ততদিন সংসারে ঝগড়া-ঝাটি বিশেস হয় না! যা দু'-একটা সামান্য ছোট-খাট বিষয় হয়, তা রাত পোহালেই আবার ঠিক হ'য়ে যায়, অশান্তি আর থাকে না। এই তো সাধারণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু জমি নিয়ে মনোমালিন্য সুরু হ'লে খুন জখমেও সে-ঝগড়া মেটে না।

একদিন বড় ছেলেকে ডেকে এই কথাই বলল সে। বৃদ্ধত্বের জন্য গতরে দুর্বল হয়েছে ব'লে কথাটি উঠাল লিংটান, তা নয়। সংসার ভরে উঠেছে, জীবনের প্রান্ত-সীমায় দাঁড়িয়ে আর কেন মিছে আঁকড়ে থাকা! ছেলেদের সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এখন ভাবনা-রাজ্যে বিচরণ করার সময় তো এলো। শক্ত সমর্থ দেহে পূর্ণপ্রাণের ভরা-কল্পনার জীবন-দর্শন মার্গে সে ঘুরে বেড়াবে এখন।

লাও-তা কুয়ো থেকে জল তুলছিল। লিংটান তাকে জিজ্ঞেস করল:

'হ্যাঁরে, একটা কথা বলব তোকে। আমি মরে গেলে আমাদের এই জমি-জমায় কি তোদের তিন ভাই বৌ ছেলেপিলেদের চলবে?'

বাপের প্রশ্ন শুনে লাও-তা তক্ষুণি উত্তর দিল না। জল তুলে বেশ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে কিছুটা পান ক'রে আস্তে আস্তে বলল:

'হ্যাঁ, চলবে বৈ কি! যদি দরকার হয় নিজের সুখ সুবিধা ছেড়ে দিয়েও আমি ভাইদের নিয়ে শান্তিতে বাস করব বাবা।'

লিংটান তাকিয়ে দেখল ছেলের চোখের দিকে। সরল দৃষ্টি দেখে ছেলের বক্তব্যে সুখী হ'লো। ওর হাতে জমি-জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ভাই-দের ও ঠকাবে না। তবে অন্য ছেলেরা যদি এই ব্যবস্থা পছন্দ না করে তবে তারা ভিন্ন পথ দেখুক। তাতে তার দুঃখ বিষাদ নেই। তার কাজ তো সে ক'রে গেল।

লিংসাওর চিন্তা-রাজ্যে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের অত আনাগোনা নেই। ওসবের দিকে ভাবনা দেবার সময় কোথায়ই বা তার? সংসারের কোন্ কাজটা তার নজর না দিলে হয়? সব কয়টা প্রাণী তো তার মুখ চেয়ে বসে থাকে। যেখানে লিংসাওর নজর পড়বে না সেখানেই তো অচল। ছোট্ট নাতিটি পর্যন্ত জানে না কে তার মা। যার নরম বুকের সুধা পান করে, সে—, না, যার কাঁকে চ'ড়ে চড়ে খোকা সব সময় ঘুরে বেড়ায়, চিবিয়ে চিবিয়ে ভাত নরম ক'রে যে তাকে খাওয়ায়, সেই তার মা। মা ও ঠাকুমা খোকার কাছে অভিন্ন। ছেলেদের বেলায়ও তাই। ঘরে বৌ থাকলে কি হবে, যে-কোন জিনিসের প্রয়োজনে তারা সেই শিশু-বয়সের মতই ডাকে "মা, মা" বলে। ভাল লাগে লিংসাওর এই ডাক। যুবতী বৌরা যে তার স্থানে কোন মতেই আসতে পারে না, বোঝে সে। উত্তরও দেয় লিংসাও সেই ভাবেই: 'কিরে গোপাল, কি চাইরে,'—! বড় ছেলে লাও-তার ডাকে এ-ভাবে জবাব দিলে বাড়ির কেউ-ই আশ্চর্য হয় না। হোক্ না সে বৃদ্ধার নাতির বাপ, তবু তো সে তার সেই লাও-তা! জামার বোতাম কিংবা পায়ের চটি ঠিক ক'রে দিতে ছেলে তাকে এইভাবেই ডাকে। আর অর্কিড! এক ধাতের মেয়ে আছে যারা প্রসবের পর কেবল বসে বসে শিশুর দিকে হা ক'রে তাকিয়ে থাকে। ঘুমন্ত নবজাত নিঃশ্বাস ফেলছে কিনা, ঘুমের মধ্যে তার হাসি বসে বসে নতুন মা কেবল দেখবে। এই দেখাতেই তার কত পরিশ্রম, কত সময় চ'লে যায়! ঘর নিকনো ও ঝাড়পোছ করার সময় কোথায় তার! স্বামীর জামার বোতামই বা লাগাবে কখন! মনে মনে লিংসাও বড় বৌর ওপর চটে যায়। এক রাত্রে লিংটানকে বললে গৃহিণী:

'এ এক অদ্ভুত ব্যাপার বাপু! ছেলেপিলে যেন আর কারও হয় না! বিয়োবার পর থেকে দিন রাত হা ক'রে তাকিয়ে থাকবে ঐ গ্যাদা বাচ্চার দিকে! সংসারের

কোনো দিকে আর নজর দেবার সময় নেই।...বড় বৌর কথা বলছি—। আমি না থাকলে তো লাও-তাকে দেখছি ন্যাতা গায়ে ঘুরে বেড়াতে হোত! সবে তো বাপু দুটো বিইয়েছিস, আরও তো বিয়োবি। এই গ্যাদা যখন বড় হ'য়ে এদিকে ওদিকে হুটোপাটি ক'রে বেড়াবে, আরও যখন দুচারটে পেটে আসবে, তখন চারদিক সামাল দিবি কি ক'রে! আমি তো আর তোদের সংসার চিরদিন আড়াল দিয়ে থাকব না।...আমারও তো বাপু বাচ্চা হয়েছে। পেটে বাচ্চা নিয়ে সংসারের সব কিছুই তো আমি একা করেছি। কেন, তোমার মনে নেই, লাও-এরকে পেটে নিয়ে ধানও কেটেছি, তারপর বিয়োবার পরে গ্যাদা দুটোকে গামলায় শুইয়ে রেখে ক্ষেতের ও সংসারের সব কাজ দু'হাতে করেছি। কই, কোন অমঙ্গলই তো হয় নি। আর দেখগে, অর্কিড বসে বসে দেখছে ওর ছেলের নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা, রোদের আলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওর ছেলে ধুলো খেয়ে ফেললে কিনা!'

তন্দ্রাচ্ছন্ন লিংটান বলে: 'তা বটে! তা' তোমার মত আর কে হয় বল!'

'আর নীলা! ও যে কী করবে—! রাতদিন বই মুখে বসে আছে। সেই যে বইখানা এনে দিল লাও-এর। হুঁঃ, ওর বাচ্চা হবার সময় বোধ হয়—'

লিংটানের তন্দ্রা টুটে যায়। 'মেজ বৌর বাচ্চা হবে নাকি?'

অন্ধকারের মধ্যে লিংসাও জিভ দিয়ে ঠোট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে বলে: 'মাসিক তো বন্ধ হয়েছে। মাসিকের সময় পার হয়ে দশ দিন চলে গেল।' সুগৃহিণী হিসেবে বৌ-ঝির এসব দিকেও নজর রাখত লিংসাও। 'হুঁ—, ও যে কী করবে আমি বুঝি না। প্রসবের সময়, বুঝলে, আমি তোমায় বলে রাখছি, প্রসবের সময়ও দেখবে মুখের কাছে ও এক হাতে বই তুলে ধরে থাকবে। বৌ-ঝির হাতে যখন বই ওঠে তখন কিছু একটা অঘটন অমঙ্গল না হ'য়েই যায় না। মেয়েছেলের বই পড়া! বাপের জন্মেও বাপু শুনি নি। এর থেকে আফিং-এর নেশা ছিল ভাল।'

'উঁহুঁ, উঁহুঁ, আফিং নয়। মাকে তো দেখেছি, আফিং-এ যে কি সর্বনাশই করে—!' লিংটান বলে।

'আচ্ছা, আফিং-এর নেশা না হয়, না হ'লো।' স্বামীর প্রতিবাদ মেনে নেয় লিংসাও। শাশুড়ীর কথা মনে পড়ে তার। ছয়চল্লিশ বছর বয়সে তিনি আফিং ধরেছিলেন তার জরায়ুর কি-একটা ব্যাথা উপশমের জন্যে। গায়ে জামা কাপড় থাকুক আর নাই থাকুক, মুখে অন্ন পড়ুক কি নাই পড়ুক, আফিং-এর রতি তাঁর

চাই-ই চাই। দিন রাত্রি অর্ধ নিমিলিত চোখে তিনি পড়ে থাকতেন: নেশার একটু এদিক-ওদিক হলেই তাঁর নেশা যেত টুটে, ব্যথায় চিৎকার সুরু করতেন। ব্যথার সে কি দাপুনি, বুকভাঙ্গা ক্রন্দনের সে কি চিৎকার! নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে চোখ উল্টে গোঙাতেন। সাত-সাতটি বছর বৃদ্ধার এই দুর্দশা তাদের দেখতে হয়েছে। গৃহে শান্তি ব'লে কিছু ছিল না। তখন আবার আফিং কেনা বেচা সরকারী হুকুমে বন্ধ। তাই নিজের জীবন হাতে নিয়ে স্ত্রীর জন্য সেই নেশা সংগ্রহ করতে হতো লিংটানের বুড়ো বাবাকে। শত বলিরেখাযুক্ত বর্ষিষ্ঠ পিতার স্নেহমাখা মুখমণ্ডল বারে বারে ভেসে উঠত স্মৃতির পটে। তারপর হঠাৎ একদিন কলেরার মড়কে এঁরা দুজনেই আগু-পাছু ইহজগত ছেড়ে চলে গেলেন। আগে গেলেন বৃদ্ধা। তাতে মরণের সময়েও বৃদ্ধ একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পেরেছিলেন যে আফিং জোগাড়ের কঠিন কাজ আর তার ছেলেকে করতে হবে না। সেই থেকে আফিং-এর দুষ্প্রাপ্যতা যত বেশী হতো লিংটান মনে মনে তত খুশি হত। আজকাল তো আফিং প্রায় পাওয়াই যায় না। খুব বড় লোক যারা, তারাই শুধু এখনও আফিং-এর পাইপ মুখে দিয়ে দিন-ভর ঝিমুতে পারে।

লিংসাওর লাগামহীন চিন্তা দৌড়তে থাকে। কিশোরী কন্যা প্যানসিয়াওর বিয়ের ব্যবস্থা দেখতে হয় এখন। 'কি গো ঘুমোলে নাকি? প্যানসিয়াওর বিয়ের কথা তো ভাবতে হয় এখন। ওর বিয়ের পরে তাঁতে বসবে কে? নীলাকে বসাতে হবে তাঁত ঘরে। লাও-সানের বিয়ে দিয়ে, একজন শক্ত সমর্থ বৌ আনতে হবে, বুঝলে, যাতে ক্ষেতের কাজে কিছু সাহায্য করতে পারে।'

লিংটান উত্তর দেয় না। নিদ্রার গভীরতায় সে যায় ডুবে। লিংসাও বিড়-বিড় ক'রে বলে বলে: 'বড় মেয়ের একবার খোঁজ খবর নিতে হয়। জামাইর দোকান আবার ঠিকমত চলছে কিনা—'

লিংটানের নাসিকা-গর্জন সুরু হয়।

'দেখলে, মিনসে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল! আশ্চর্য, এই পুরুষগুলো কি! কেবল লম্বা লম্বা কথা। সমস্ত চিন্তা, সংসারের সব কিছু করতে হবে তার, আর বুড়ো-শিশু নির্ভাবনায় নির্ভর ক'রে থাকবে তার ওপর!' সংসারের কিছু করতে হ'লে মেয়েদেরই দেখে শুনে করতে হয়, এই তো জীবন-ভর অভিজ্ঞতায় দেখেছে লিংসাও। পুরুষগুলোর বয়স বাড়লে কি হয়, ওরা সব সময়ে ছেলে মানুষই থাকে। লিংসাও ঠিক করে, কাল ভোরে উঠে সে যাবে শহরে মেয়ে জামাইকে দেখতে। শহরে গিয়ে যদি দেখে যে ঐ ছাত্র-ছোকরারা উলীনের দোকান

আবার ভেঙ্গে দিয়েছে, তাহ'লে ও নিজে ওদের পিছু ধাওয়া ক'রে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে লাঠি পেটা করবে। বুড়ী লিংসাওকে ওরা আর কি করতে পারে?...তারপর এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

শেস রাত্রে লিংসাওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আকাশের কোলে মাঝরাত্রের মত তারা জল জল করছে তখনও। রাত্রিও খুব বেশী বাকি নেই। সমস্ত দিন সে অনুপস্থিত থাকবে, সুতরাং বেরোবার আগে সংসারের সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক ক'রে যেতে হবে। ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে, রান্নার চাল ধুয়ে রেখে, হাতে-মুখে জল দিয়ে সে তৈরি হ'য়ে নিল ভোরের মোরগ ডাকবার আগেই।

মোরগের ডাক শুনে লিংটান চুপচাপ কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকবে, আর ঘুম হবে না, তন্দ্রা বিজড়িত চোখে বিছানায় পড়ে থেকে শেস আরামটুকু ভোগ করবে। উনুনে আঁচ দেওয়ার সময় হয়নি এখনও। লিংসাও ঘরে ঢুকে একটা ছোট বাক্স থেকে কাঁকই বের ক'রে প্রদীপের পাশে চুল আঁচড়াতে বসল। নিজেরই তৈরি গন্ধ তেল চুলে মেখে একটা লাল ফিতে দিয়ে খোঁপা বেঁধে নিল। ওর বিয়ের সময়কার রূপোর কাঁটা দিল খোপায় গুঁজে। ছোট্ট আরশির উপরটা কাপড় দিয়ে ঘসে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে সামনে ধরে মুখটা বেশ ক'রে মুছে ফেলল। কুটুম বাড়ি যাচ্ছে, একটু পরিষ্কার হ'য়ে যেতে হয়। উসার আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নিভিয়ে লিংসাও উনুনে আগুন দিয়ে ভাত চাপিয়ে দিল। বাড়ির সকলে একে একে বিছানা ছেড়ে উঠল এবার। সব থেকে শেসে ওঠে নীলা ও লাও-এর। নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের, তাই লিংসাও এখনও কিছু বলে না। বছর পার হ'লে এই বেলায়-ওঠা লিংসাও হতে দেবে না।

লিংসাওর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয় সকলেই। লিংটান জিজ্ঞেস করে: 'কি গো, ব্যাপার কী?'

'একবার শহরে যাব মেয়ে-জামাইর বাড়ি। রাত্রে ওদের কথা মনে হয়েছে বারবার। নাতিরা সব কেমন আছে, নিজে গিয়ে দেখে আসব একবার।'

খাওয়া-দাওয়া শেস ক'রে, মেয়ে বৌদের ডেকে কার কোন্ কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দেয় লিংসাও। 'তোমরা সবাই খেয়ে নিও, আমার জন্য কিছু রেখ না। আমি গেলেই তো মেয়ে মাংস রাঁধবে, মিঠাই মণ্ডা কত কিছু তৈরি করবে—'

ঘরের মধ্যে থেকে লিংটান কিছু টাকা এনে দেয় লিংসাওকে। সে নিতে

রাজী হয় না। 'কেন মিছে টাকা নষ্ট করব?' বলে লিংসাও। হাসতে হাসতে লিংটান টাকা গৃহিণীর হাতে গুঁজে দেয়।

গোটা কয়েক ডিম ও কিছু ফল পুঁটলিতে বেঁধে লিংসাও রওনা হলো এবার। বাড়ির দোরে এসে দাঁড়াল সকলে।

পাহাড়ের মাথা ছাপিয়ে সূর্য ওঠে। লিংসাও গাঁয়ের পথ দিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে থাকে। দু'চারজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় পথে। কেউ চলেছে শহরে তরকারি বিক্রি করতে, কেউ চলেছে বিচালি বেচতে। লিংসাওকে দেখে তারা প্রশ্ন করে: 'অত ভোরে কোথায় চলেছ? লিংটান খুড়ো কেমন আছে?' উত্তর দিয়ে তাঁদের বাড়ির এর-ওর কথা জিজ্ঞেস ক'রে হৃষ্ট মনে সে হাঁটতে থাকে। শহরের ফটকে এসে একটু বসে বিশ্রাম করতে করতে একটা ফুটি কিনে খেয়ে নেয়। তারপর মেয়ের বাড়ির দোরে এসে হাজির হয়।

উলীনের দোকানের দোর খুলে দু'জন কর্মচারী বসেছিল। দোকানটা খালি খালি, ভাঙ্গা কাচগুলো তখনও সারানো হয়নি। চারদিকে ভাল ক'রে দেখে নেয় লিংসাও। তাইতো, কিছুই তো নেই দোকানে। দু'চারটে জিনিস যা আছে, তা তো গাঁয়ের দোকানেও পাওয়া যায়। সুন্দর সুন্দর রঙ-বেরঙের বিদেশী জিনিসগুলো, টর্চ, ফুল আঁকা পেয়ালা পিরিচ, সোলার টুপি, রবারের জুতো, কতরকম খেলনা ছিল দোকানে। সেসব আজ কিছুই চোখে পড়ল না লিংসাওর। খুবই ক্ষতি হয়েছে তবে উলীনের। এত দিনের মধ্যেও যখন আর দোকান সাজায়নি, তবে কি আরও গোলমালের আশঙ্কা করছে উলীন?

চিন্তিত মনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে লিংসাও। বাইরে দোকানের যে-ক্ষতি দেখে এল, ভিতরে এসে তার থেকেও বেশি বিপদ দেখল। আশাহীন জামাই জড়থব হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। তার সেই সুবিশাল বপু চুপসে গেছে, গায়ের চামড়া থলথলে হ'য়ে পড়েছে, ভুঁড়ির চামড়া থলের মত ঝুলে পড়েছে। মানুষের চেহারার এই অদ্ভুত পরিবর্তন সে আগে কোন দিন দেখেনি। পাশে বসে মেয়ে হাত-পাখা দিয়ে স্বামীকে আস্তে আস্তে বাতাস করছে। মাকে দেখে মেয়ে ইশারায় নীরব থাকতে বলে হাওয়া করতে থাকে। চিন্তিত লিংসাও মেয়ের কানে কানে প্রশ্ন করে: 'কী অসুখ করেছে? এরকম চেহারা হলো কি ক'রে?'

'দুঃসময় সুরু হওয়ার পর থেকে এই রকম অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন, একেবারে কিছু মুখে নেন না।'

লিংসাও জানে যে যখন কেউ খাওয়া বন্ধ করে, তখন নিশ্চিত মৃত্যুর পথে সে

এগোয়। উলীনের মৃত্যুর কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। এই বয়সে তার মেয়ে বিধবা হবে? মাথা ঘুরে ওঠে লিংসাওর। আর কোন দিকে সে তাকায় না, নাতি-নাত্নীর খোঁজ খবর কিংবা বেয়াইনের সঙ্গে দেখা করা,—সব কিছু ফেলে রেখে সে যায় রান্নাঘরে। পাচিকাকে কোন সম্ভাষণ কিংবা অন্য কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সোজাসুজি আদেশ করে উনুনে আঁচ দিতে। যে তাজা ডিম সঙ্গে ক'রে সে নিয়ে এসেছিল, তাই ভেঙ্গে, কিছু পেঁয়াজ রসুন কুচিয়ে নিয়ে বেশ ক'রে মিশিয়ে চাপিয়ে দিল উনুনে। রান্নার যে সুগন্ধ ছাড়ল তাতে উলীন জেগে ওঠে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল:

'এত ভাল রান্নার গন্ধ কোথা থেকে আসছে?'

'মা এসেছে। সঙ্গে যে ডিম এনেছে তাই দিয়ে তরকারি রান্না করছে।'

'গন্ধেই খেতে ইচ্ছে করছে—' বলে উলীন।

স্বামী নিজে থেকে খেতে চেয়েছে এতদিন পরে! রান্না ঘরে ছুটে গিয়ে মাকে বলে: 'মা শীগগির, উনি খেতে চেয়েছেন!'

তাড়াতাড়ি প্লেটে ক'রে খাবার এনে দেয় উলীনের সামনে। ক্ষুধার্ত উলীন গোগ্রাসে তাই খায়। মা মেয়ে পরমানন্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে। লিংসাও বলে:

'আমাদের সেই কালো মুরগীটার ডিম, তাই এত ভাল। ওটা তো যখন তখন ডিম দেয় না, যখন দেয় তখন এই রকম ভাল ডিম পাড়ে।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে: 'যা তো রে, খুব গরম চা এনে দে জামাইকে। এখন দেখবি চট ক'রে ও ভাল হ'য়ে উঠবে।'

মেয়ে চা আনতে গেলে, লিংসাও চেঁচিয়ে বলে কোলের নাতিকে দিয়ে যাবার জন্য। লিংসাওর মত গৃহিণীরা কোলে-কাঁকে ছোট ছেলে মেয়ে না থাকলে কিছুতেই স্বস্তি পায় না, তাদের সবকিছু যেন কেবল খালি খালি মনে হয়। ন্যাংটো নাতিকে কোলে নিয়ে জামাইর চা-পান দেখে লিংসাও। তারপর জামাইকে বলে: 'এভাবে না-খেয়ে থাকলে তো চলবে না বাবা উলীন। সময় ভাল মন্দ সকলেরই আছে। তাই বলে না খেয়ে শরীর নষ্ট করা তো উচিত নয়। তোমার মা রয়েছেন, তোমার ছেলে রয়েছে, তাদের দিকে তো তোমায় তাকাতে হবে। এভাবে নিজেকে নষ্ট করলে পরিবারও যায়, দেশও যায়।'

'আর দেশ! দেশ কি আর রক্ষা পাবে?' শাশুড়ীর কথায় উলীন দু'চোখ মেলে বিষাদ কণ্ঠে জবাব দেয়।

লিংসাও কিছু বুঝতে পারে না। মেয়ের দিকে তাকায়।

'ঐ তো এক কথা কেবল ওঁর মুখে। 'এ-দেশ থাকবে না, এ-জাতি ধ্বংস হ'য়ে যাবে।'

হাতের পাখাটা একটু দ্রুত সঞ্চালন ক'রে আস্তে আস্তে চিন্তিত লিংসাও জামাইকে বলে: 'দেশের সাধারণ লোক নিয়েই তো জাতি। আর আমরাই তো সেই সাধারণ লোক। তোমার ও-ভাবে ভাবা তো উচিত নয়। দু'একদিনের দুর্ঘটনায় এ-ভাবে মুষড়িয়ে পড়লে হবে কেন! আরও জিনিস-পত্তর দিয়ে দোকান সাজিয়ে ব'স। বিপদ এলে মুষড়িয়ে পড়ো না উলীন।'

কিন্তু উলীন মনে জোর পায় না। বলে: 'আরও খারাপ খবর যে আছে। তিন দিন আগে সে-খবর আমি শুনেছি। আগামী কাল চতুর্থ দিন, সেদিন—'

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বলে: 'ঐ তো তোমাদের ভুল। খারাপ কথা কেউ মনের মধ্যে পুসে রাখে? তাতেই তো শরীর নষ্ট হয়। ক্রোধ, দুঃখ ও দুঃসংবাদ কখনও মনের মধ্যে জমিয়ে রাখতে নেই।'

'এ-দুঃসংবাদ তো শুধু আমার একলার না, সকলের। পূব সাগর পারের বামনরা জাহাজ ক'রে আমাদের দেশের উপকূলে নেমে আক্রমণ করেছে। আমাদের সৈন্যরা বাধা দিচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের সে-শক্তি কোথায়?'

উলীন বুঝতে পারে যে এরা কেউই তার কথা বুঝতে পারে নি। শাশুড়ী ও বৌ কেউই তো এই শহর ও তাদের গ্রাম ছাড়া কোথাও যায় নি আজ পর্যন্ত। সমুদ্রোপকূল ও এই শহরের দূরত্বের হিসাবও তারা জানে না। তাদের কাছে দুশো মাইল যা, দু'হাজার মাইলও তাই। তারা কোনোদিন ট্রেনেও চাপে নি, বিদেশী মটর গাড়ীও দেখে নি। মাইল সাতেক দূরের নদীর বন্দরে বিদেশী জাহাজও দেখে নি। শুধু একটা কথা হয়তো ভাসা ভাসা তাদের মনে থাকতে পারে: বহু বছর আগে এই শহরে কিছু বিদেশীদের আটকিয়ে রাখা হয়েছিল ব'লে বিদেশী জাহাজ থেকে কামান দাগা হয়েছিল। সেই গুম গুম শব্দ নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত গাঁয়ের কৃষকরা নিজেদের মধ্যে নানা-ধরণের আলোচনা করেছিল। সেই কথা মনে ক'রে উলীন বলল:

'সেই কামানের গুম গুম শব্দে মনে পড়ে? সেই রকম কামান দাগা হচ্ছে এখন সমুদ্র-পারে আমাদের বন্দরের ওপর। এ কয়দিনে সে-শহর বোধহয় ধ্বংস হ'য়ে গেল।'

'হুঁ, হুঁ, মনে পড়েছে। আমি তখন বোকনা মাজছিলাম। উঃ, সে কি

শব্দ! হাতের বোকনা খুলে পড়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল ভূমিকম্প। কিন্তু তারপর আর কোন কিছু ক্ষতি হয় নি।'

'কিন্তু ক্ষতি, বিরাট সর্বনাশ আসছে।' উলীন বলে।

'ওসব নিয়ে মন খারাপ করো না, উলীন। সমুদ্র এখান থেকে অনেক দূরে। আর ঐ নদীও কাছে নয়,' সান্ত্বনা দিয়ে বলে লিংসাও।

'কিন্তু ওদের উড়ো-জাহাজ আছে। জাহাজ থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে উড়ে এসে এই শহরের ওপর ডিমের মতন বোমা ফেলে বাড়ি ঘর সব ধ্বংস ক'রে দেবে। ওদের বিরুদ্ধে কি করব আমরা?' আশ্চর্য, এরা এতটুকু ভয় পায় না! উলীন চেয়েছিল যে ওর মনের ভীতির ছোঁয়া লাগুক এদের মনে।

'অত ভাবনা কিসের? আমাদের বাড়িতে সব চলে আসবে। শহর আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, আপদ বিপদ সবসময় যেন লেগেই আছে। আর আমাদের ওখানে থাকলে আমার এই দাদুমণিকে আমি সবসময় দেখতে পাব। ...ও হরি! একেবারে ভিজিয়ে দিলে— !' তাড়াতাড়ি কোলের নাতিকে তুলে ধরে লিংসাও। মেয়ে এসে শিশুকে তুলে নিতে চায়। লিংসাও কোল ছাড়া করে না, বলে: 'একটু ভিজিয়েছে বলেই দাদুমণিকে ছেড়ে দেব? ও এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।'

কথা শুনে বেয়াইন উসাও আসে এঘরে। তাকে দেখে লিংসাও বলে: 'এই যে দিদি! আপনাকে একটু জ্বালাতে এলাম।...জামাইর দোকান লুটের খবর শুনে নিজের চোখে দেখতে এলাম কি ব্যাপার। আপনার ছেলেকে বললাম অত মন-মরা হ'লে তো চলবে না বাছা! তোমার বৌ ছেলে রয়েছে, বুড়ী মা রয়েছেন! কি বলেন দিদি, ঠিক বলেছি না? ও-ভাবে না-খেয়ে না-খেয়ে শরীর নষ্ট করলে চ'লবে কেন?'

বিপুলা দেহা উসাও এত স্থুলাঙ্গী যে এক সঙ্গে সে দু'চার পা পর্যন্ত হাঁটতে পারে না। একটু হাঁটলেই হাঁফিয়ে পড়ে। কথাও বিশেষ বলতে পারে না, গলা দিয়ে স্বর বের হয় না, হুস্ হুস্ শব্দ শুধু বেরিয়ে আসে। তাই কথার উত্তরে শুধু মৃদু হেসে মাথা নাড়ে।

উলীনের কিছু ভাল লাগে না। অবুঝ মেয়েদের মাঝে বসে থাকতে বিরক্ত লাগে। দোকানে যাবে ব'লে সে উঠে পড়ে।

উলীনকে কেউ বোকা বলবে না। মাঝে মাঝে সে খবরের কাগজও পড়তো। শহরের বড় রেস্তোরাঁয়ও সে যেত নানা রকম খবর শুনবার জন্য।

সুতরাং যুদ্ধের গুজব সম্বন্ধে সে যে শুনেছে, তা যদি সত্যি হয়, তার পরিণতি সম্বন্ধে সে চিন্তিতই হয়। যুদ্ধের মধ্যে তো ভাল কিছু থাকতে পারে না। শান্তি বিরাজ করলেই তো মানুষ সমৃদ্ধিতে বাস করতে পারে। তারপর আক্রমণ করেছে পুব-সাগর পারের বামনরা, যাদের দেশের পণ্য বিক্রি করেই উলীন দুটো পয়সা পায়। মন থেকে ঠিক ঘৃণাও করতে পারে না। সে একটু ভীত হ'য়ে পড়ে। চা-খানায় বিদেশ সম্বন্ধে অনেক গল্পই শুনেছে সে। শুনেছে যে বিদেশে যুদ্ধটা বলে ব্যবসা। কিন্তু এদেশে ঠিক তা নয়।

দোকানেও তার মন টেকে না। সে ঠিক করে একবার চা-খানায় যাবে। চা-খানায় এসে একটি কোণ দেখে সে বসল। তার দোকান লুণ্ঠনের খবর বন্ধুরা নিশ্চয়ই জানে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই তার খোঁজ নিতে আসে নি। তারা কি আগের মতই তাকে ব্যবসায়ী বন্ধু হিসেবেই মনে করে. না, মনে করে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ব'লে ?

সেই পুরোনো রেস্তোরাঁ যেন আর নেই। লোকজনের যাতায়াত আছে প্রায় আগের মতই। চা-খানার সেই ভিড় ঠিক আছে আগের মতই, কিন্তু লোকজনের সে-হাসি হুল্লোড় গেল কোথায় ? লোক আসছে, নীরবে চা খেয়ে চলে যাচ্ছে। সেই হুটোপাটি, মদের গেলাস ও বোতলের ঠুন ঠুন শব্দ, দিল-খোলা হাসি যেন সব বন্ধ। মনমাতানো সুগন্ধ খাদ্যের পাত্রের উপর কত গুঞ্জন শোনা যেত। আজ সব নীরব। কেমন যেন দম-বন্ধ-করা ভীতির আবরণ পড়েছে চারদিকে।

কোণের টেবিলে বসে বসে উলীন লক্ষ্য করে কেউ তাকে সম্ভাষণ জানায় কি না। চা আনতে ব'লে সে অপেক্ষা করে, পরিচিত কেউ তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলে কি না। যদি কেউ তা না করে তা হ'লে উলীন বুঝবে যে সে বিশ্বাসঘাতক ; দেশদ্রোহীর নামের তালিকায় তার নাম উঠেছে। এই ছাত্ররা শুধু দোকান ভেঙ্গে দিয়েই চুপ ক'রে থাকে না, সমস্ত শহরে বড় বড় ক'রে কাগজে লিখে দেয়ালে সেঁটে দেশদ্রোহী ব্যবসায়ীদের নামও জানিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বার চা নিয়ে বসেছে উলীন। দেখে তারই পরিচিত সম-ব্যবসায়ী একজন। এক সঙ্গে কতবার তারা খাওয়া দাওয়া করেছে এই রেস্তোরাঁতেই। পুরোনো দিনে উলীনকে দেখে সে এতক্ষণ চিৎকার ক'রে সম্ভাষণ জানাত। কিন্তু আজ উলীন যেন প্রাণহীন প্রস্তর মূর্তি। তার উপর দিয়ে নবাগত শুধু চোখ বুলিয়ে নিল। একটি কথাও বলল না।

বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে উলীনের : 'উলীন বিশ্বাসঘাতক!' দুদিন আগে যে উলীন পরিচিত ছিল ব্যবসায়ী ব'লে, আর আজ সে বিশ্বাস-ঘাতক? গলা দিয়ে চা আর নামতে চায় না। সব কিছু বিস্বাদ ঠেকে। পয়সা রেখে সে বেরিয়ে আসে। ফিরতি-পথে বইয়ের পাড়ায় ঢুকে একখানা খবরের কাগজ কিনে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। শত্রুর হামলায় সমুদ্র তীরবর্তী শহরের অবস্থার সংবাদ। বড় বড় দোকান কি ভাবে আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, শত্রু-সৈন্যের আক্রমণে ধ্বংস হ'য়ে গেছে, তারই বিবরণ। দোকানগুলো কেন ধ্বংস হ'ল উলীন :বুঝতে পারে না। মাত্র একমাস আগে উত্তরাঞ্চলে একটু গোলমাল হ'য়েছিল। তার আগে কয়েক বছর ছাত্ররা ঐ বামনদের বিরুদ্ধে অনর্গল বকে গেছে। কিন্তু ছাত্রদের কথায় আর কোন্ ব্যবসায়ী কান দিয়েছে? ব্যবসা তারা করেছে, পূব-সাগর পারের বামনদের দেশের পণ্য বিক্রি ক'রে তারা মুনাফা পেয়েছে। তাদের দু'চারজনের সঙ্গে উলীনের দেখাও হয়েছে। বেশ ভদ্র অমায়িক মনে হয়েছে তাদের। তাদের সঙ্গে ঝগড়া মনোমালিন্য সেদিনও তার হয়নি, আজও নেই। আর ঝাগড়া থাকবেই বা কেন?

কাগজটা মুড়ে সে ফিরে এল তার বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকে শোনে মেয়েদের সেই গাল-গল্প চলেছে ঠিক একই ভাবে। স্ত্রীকে ডেকে খাবার আনতে বলে সে ঠিক করল নিরিবিলিতে খাওয়া শেষ ক'রে সে যাবে দোকানে ব্যবসার অবস্থা দেখতে।

এত কিছুর কিছুই জানল না লিংসাও। মেয়ে মাংস রেঁধেছিল। পরমানন্দে পেট পুরে খেয়ে দেয়ে নাতি নাত্নীদের আদর ক'রে দিন কাটিয়ে দিল সে। বে-য়াইন উসাও ঘুমিয়ে পড়লে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল তার-ঘর সংসারের কথা।

'সাংসারিক ব্যাপারে এবং তোর ওপরে উলীনের মন মেজাজ কেমন রে?' জিজ্ঞেস করে লিংসাও।

মৃদু হেসে উত্তর দেয় মেয়ে : 'বেশ ভালই। সব কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করেই তো উনি করেন। দোকান লুটের আগে আমাকে বেশ সুন্দর একটি রেশমী কাপড় দিয়েছিলেন। লুটের পর প্রায়ই বলেন, যদি আরও বেশী ক'রে আমাকে কাপড়টা দিতেন!'

'আচ্ছা, রাতে-বেরাতে তো বাইরে বের হয় না উলীন?' ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে মুছে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে লিংসাও। এত ভালবাসাবাসি যেখানে,

সেখানে একটু নজর রাখাও উচিত। দোষ ত্রুটি সারবার জন্য অনেক সময় পঞ্চমুখে স্ত্রীর প্রসংসা ক'রে থাকে স্বামীরা।

একটা গর্বের কণ্ঠেই উত্তর দেয় মেয়ে : 'কখনও না।'

মায়ের মনের সন্দেহ যায় মুছে। মেয়ের উপর বিশ্বাস আছে লিংসাওর। কুটুম বাড়িতে আনন্দে সময় কেটে যায় লিংসাওর।...

পরম নিশ্চিন্তে লিংসাও গৃহে ফেরার কথা ভাবে এবার। যাবার আগে মেয়ে এক বাটী চা এনে দেয়, কাপড়ে বেঁধে দেয় কিছু বিদেশী খাবার। নাতিদের আর একবার চুমরিয়ে মুচড়িয়ে, গাল টিপে আদরে ডুবিয়ে দেয় দিদিমা ; ছোট নাদুস-নুদুস নরম দেহগুলো তুলে ঠোঁট দিয়ে নাক দিয়ে স্পর্শ-ঘ্রাণ গ্রহণ করে। বিপুলাদেহা বেয়ানইনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, মেয়ের শুভ কামনা ক'রে আশীর্বাদ করতে করতে বেরিয়ে পড়ে লিংসাও। দোকানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে জামাইব দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মনে মনে শুভাশীস জানিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। চারদিকে তাকিয়ে পরিবর্তনের কোন রেশই খুঁজে পায় না লিংসাও। দোকান পাট সব খোলা, ক্রেতার ভিড়ে সরগরম। লোকাকীর্ণ রাস্তাগুলো মুখর জনতার কাকলিপূর্ণ। গোধূলির ম্লান আলোয় লিংসাও পা ফেলে এগিয়ে চলে গাঁয়ের দিকে। এরই মধ্যে অনেকে রাস্তায় চারপায়া ফেলে শোবার ব্যবস্থা করছে, কেউ কেউ পাশে বসে রাত্রের খাওয়া শেস ক'রে নিচ্ছে। এ ওকে চিৎকার ক'রে ডেকে, হাসি ঠাট্টার মধ্যে শয়নের আগের শেষ সময়টুকু নিঃশেস ক'রে দেবার মাতামাতি সুরু করেছে। বড় ভাল লাগে লিংসাওর। তারই মত, তারই স্বামী পুত্রদের মত, এরা এ-দেশেরই লোক। 'হান্-এর লোক সব আমরা—একই রক্ত বয়ে চলেছে আমাদের ধমনীতে। প্রাচীর-ঘেরা শহুরে লোকের দুর্গন্ধ থাকুক এদের গায়ে, তবুও আমরা এক'—ভাবে সে।

দু'ধারের বিস্তৃত শ্যামলা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গাঁয়ের পথে হাঁটতে-হাঁটতে লিংসাও দেখে চারদিকের উর্বরা ধরণীর উসর কোলে নবোদ্ভিন্ন শস্য অঙ্কুরের উন্মেষ...আগামী প্রাচুর্যের ঘোষণা। অমঙ্গলের কোন চিহ্নই পড়ে না চোখে। গাঁয়ের আকাশে বাতাসে মাঠে সর্বকুশলতার বাণী পড়ে নিয়ে লিংসাও প্রবেশ করে নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণে।

উন্মুখ অপেক্ষায় সকলে বসে আছে গৃহিণীর প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে। কাউকে কোন কথা না বলে সকলের উপর দিয়ে নিজের মঙ্গলাকাঙ্খী দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় লিংসাও। বড় সুন্দর লাগে নীলাকে...সত্যিই তো, লাং-এর পাগল হবে না

কেন! অর্কিডের পানে তাকিয়ে মনে হয় কত নরম সরল মেয়েটি। ছোট মেয়ের হাত দু'টি নিজের হাতে তুলে নিয়ে আদর জানিয়ে বলে: 'কাল আর তোকে তাঁত চালাতে হবে না। হাত দুটোয় কাল একটু ভাল ক'রে তেল মাখবি বুঝলি।' সমগ্র গৃহে শান্তি পরিব্যপ্ত, হাসি আর গল্পের মুখরতায় ভরপুর। লিংসাও মেয়ের বাড়ির গল্প করে। কিন্তু কথার কথায় একেবারে বলতে ভুলে যায় উলীন যুদ্ধের বিষয়ে তাকে যেসব কথা বলেছিল তা বলতে।

রাত্রির গভীরতার সাথে সাথে যে যার ঘরে যায় শুতে। বসে থাকে শুধু লিংসাও আর লিংটান। দরজার বাইরে কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে, প্রাঙ্গণে মোষটি বেঁধে, ঘুমন্ত আদুরে কনিষ্ঠ পুত্রের বিছানা পেতে তাকে শুইয়ে তারা গেল নিজেদের বিছানায়। পাশাপাশি তারা শুয়ে...। সুপ্তির কোলে ঢোলে পড়েছে সমগ্র গ্রাম। চারদিকের নিথর নিস্তব্ধতাকে সামান্য দোলা দিয়ে মাঝে-মাঝে কোন্ ডোবার জলের ব্যাঙ গ্যাঁও-গ্যাঁও করে ডেকে ওঠে। সমস্ত দিনের বিরহ আকুল লিংটান নিজের উষ্ণ দেহকে সরিয়ে নিয়ে আসে লিংসাও-র দেহসংলগ্ন ক'রে। নিজের হাতটি বাড়িয়ে জড়িয়ে নেয় পরম প্রিয়াকে। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে: 'আমার প্রিয়তমা, রানী, দুনিয়ায় তোমার মত কেউ আর হয় না!'

ভুলে যায় লিংসাও স্বামীকে বলতে যুদ্ধের কথা, ভুলে যায় বলতে শহরের উলীনের কাছে শোনা যুদ্ধ-কাহিনী।

॥ চার ॥

পরদিন ভোর বেলা...

লিংটানের ঘুম ভাঙ্গল একটু দেরীতে। বিছানার পাশে হাত দিয়ে দেখে গৃহিণী কখন উঠে গেছে। বাইরে ছেলেদের হাতমুখ ধোয়ার শব্দ কানে আসতে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ছেলেদের সঙ্গে ভাতের থালা নিয়ে বসে পড়ে। খেতে খেতে ছোট ছেলে লাও-সানকে বলে মোষটাকে হালে জুঁততে, বাঁধাকপির চাষ দিতে হবে।...পরিচ্ছন্ন আকাশের কোলে কোথাও মেঘের রেশ পর্যন্ত চোখে পড়ে না। তিনদিন আগের বৃষ্টির জলে মাঠ-ঘাট ভিজে নরম হ'য়ে উঠেছে। চাষ দিয়ে আগামী কাল চারা দেবে বুনে। তারপর যদি আকাশ ভেঙ্গে নামে জল, বাঁধাকপির চারা উঠবে কোমর বেঁধে।

মাঠে যেতে যেতে লিংটানের কানে এল গৃহিণী নীলাকে ডেকে বলছে : 'তাঁতটা পেতে বসো তো, স্থতো মুখে মাকু কিভাবে ছুঁড়তে হয় তোমায় দেখিয়ে দি। প্যানসিয়াও বাচ্চাটাকে ধর—'

মাটির বুকে চকচকে ফলা বসিয়ে শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরে লিংটান, আর লাঙ্গলের সঙ্গে জোঁতা অনিচ্ছুক মোষটার নাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলে লাও-সান। পাশের ক্ষেতে বড় দুই ছেলে সযত্নে ধানের চারাগুলো নিড়িয়ে দেয়। এদিক ওদিক সবদিকের মাঠে-ক্ষেতে চাষের কাজ ক'রে চলেছে লিংটানের অতি পরিচিত নিত্য-সহচর স্বজনেরা সব। রোদ-বৃষ্টির প্রয়োজনীয় পরিবেশে চাষের কাজ এমনিভাবে বছর ধরে এগিয়ে চলে।

বেলা গড়িয়ে চলে মধ্যাহ্নের দিকে। হঠাৎ একটানা শোঁ শোঁ শব্দ শুনে সবগুলি মাঠেই সচকিত মুখগুলি উপরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, উড়ো জাহাজের ওড়ার পথে সকলেই তাকিয়ে দেখে। বহু উঁচু দিয়ে মেঘের মাথা ছুঁয়ে দু'একটা এরোপ্লেন উড়ে যেতে আগেও তারা দেখেছে। কিন্তু এই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে তো তারা কেউই পরিচিত ছিল না। এক ঝাঁক রূপালী পাখীর মত এদের আলো ঝলমলানি আগে কেউই দেখেনি। প্রথম মনে হয়েছিল, এক ঝাঁক বেলে হাঁস। কিন্তু বেলে হাঁস তো উড়ে আসে উত্তর থেকে, এগুলো আসছে সোজা পশ্চিম থেকে। আর এত দ্রুত তো হাঁস উড়তে পারে না।

মুহূর্তের মধ্যে রূপালী পাখীগুলি শোঁ শোঁ ক'রে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। নিচে কৃষাণরা হা ক'রে তাকিয়ে রইল উপরের দিকে। বিন্দুমাত্র ভয় নেই তাদের...গতি আর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে তারা তাকিয়ে রইল ওপরের দিকে। হঠাৎ তারা দেখল একটি লৌহ বিহঙ্গের গর্ভ থেকে কি যেন ছিটকে বেরিয়ে একটু দূরে হেলে শোঁ শোঁ ক'রে নিচে পড়ল, তারপরেই সব পাখীগুলো সোজা উড়ে গেল। বিরাট শব্দে একটা ধানের ক্ষেতে পড়ে কালো মাটির চাকা এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলে ওটা মাটির গহ্বরে গেল মিলিয়ে। ভয়-ডরহীন মানুষগুলো ছুটল সেই গহ্বর দেখতে। দু'একটা লোহার টুকরো ছাড় তাদের চোখে আর কিছুই পড়ল না। বিরাট গহ্বরের দিকে তাকিয়ে সেই ক্ষেতের মালিক বলে উঠল :

'কতদিন ভেবেছি একটা পুকুর কাটাবো, কিন্তু হ'য়ে ওঠে নি। হাঃ, হাঃ, হা—আজ আপনি আপনি কাটা হ'য়ে গেল।' সকলে ভাবল বিনা আয়াসে পুকুর-কুয়ো বোধহয় বিদেশীরা এই ভাবেই কাটে। যার ক্ষেতে এই গহ্বর

হয়েছে ওরা তারিফ করল তার ভাগ্যের। নিজেদের কথায় এত মশগুল ছিল তারা যে আর কোথাও কিছু ঘটল কিনা জানতেও পারল না। হঠাৎ একজনের কানে এল বিরাট কর্ণভেদী শব্দ। শহরের দিকে ঘুরে তাকিয়ে তারা দেখল সেই কান-ফাটা শব্দ আসছে ঐদিক থেকে। আকাশের বুক চিরে ধূম্র-কুণ্ডলীর কালো রেখা ভেসে উঠেছে ঘন-ঘোর বর্ষার বজ্রমেঘের মত। শহরের পাঁচিলের ওদিক থেকে উঠছে আটটি ধূম্র-কুণ্ডলী আর এদিক থেকে উঠছে একটি। বোধহয় আগুন লেগে ঐ লৌহ-বিহঙ্গগুলো জ্বলে পুড়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ল বহু উচ্চে সূর্য কিরণে একবার ঝলক মেরে ওগুলো মেঘের কোলে লুকিয়ে গেল।

শহর জ্বালিয়ে আগুনের শিখা উঠছে। চাষ-বাসের কাজকর্ম বন্ধ রেখে শহরে আগুন দেখবার জন্য যাওয়ার যুক্তি খুঁজে পায় না তারা। সাংঘাতিক রকমের দুর্ঘটনা কিছু ঘটে থাকলে একদিন না একদিন সে সংবাদ গ্রামে এসে পৌঁছুবেই। সুতরাং যে-যার কাজে লেগে থাকে তারা। তারপর দিনের শেষে গৃহে ফিরে খেতে খেতে আলোচনা করে বোমার ঘায়ে যার মাঠে গহ্বর হয়েছে তার সৌভাগ্য নিয়ে।

গভীর রাত্রে শুক্লপক্ষের নতুন চাঁদ যখন আকাশের কোলে ডুবে গেল, লিংটানের কানে এল কুকুরের ডাক। ঘুম যত গভীরই হোক্ না কেন, রাতে পোষা কুকুর চিৎকার ক'রে উঠলে গৃহস্থের ঘুম ভেঙ্গে যায়ই। কয়েক মিনিট পরেই ডাক বন্ধ হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুনল দোরে করাঘাতের শব্দ। চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে লিংটান ভাবে, কুকুরের ডাক যখন থেমে গেছে, তখন হয় চেনা লোক এসেছে, না হয়, ওটাকে চোর-ডাকাত মেরে ফেলেছে। নিশি-ডাকে হঠাৎ গিয়ে দোর খোলা কোন মতেই সমীচীন নয়। আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে স্ত্রীকে জাগিয়ে লিংটান তাকে জোর ক'রে ধরে রাখে। কোন কিছুতেই তো লিংসাওর ভয়-ডর নেই! হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে হয়তো দোর খুলে দাঁড়াবে। আস্তে আস্তে স্ত্রীকে জাগিয়ে সব কথা বলে: 'হঠাৎ গিয়ে দোর খোলা ঠিক নয়, বুঝলে। ঘুম-চোখে দোর খুলতে গিয়ে কত লোক তো খুন হ'য়ে গেছে...'

পরস্পরকে ধরে তারা চুপচাপ শুয়ে থাকে। দোরের করাঘাত আরও শব্দায়মান হ'য়ে ওঠে। ছেলেরাও যার যার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লিংটান প্রদীপ জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। চুপচাপ, কেউই কোন শব্দ করে না। কুকুরের গোঙানিও কানে আসে না, আসে কোনো কিছু পেলে

কুকুরের স্বাভাবিক আনন্দের কুঁ কুঁ শব্দ। লাও-তা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে: 'বোধ হয় মাংস টাংস কিছু খেতে দিয়েছে কুকুরটাকে।'

দোরের ওদিক থেকে মেয়েলী কণ্ঠের আওয়াজ আসে : 'ব্যাপার কি গো, এত ধাক্কা ধাক্কিতেও কেউ উঠছে না—'

শোনার সাথে সাথে লিংসাও দোরের দিকে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে : 'এ্যাঃ, এত রাতে, এত রাতে কেন রে?—' তাড়াতাড়ি দোর খুলে দেখে, বড় মেয়ে ও জামাই উলীন ছেলে-মেয়ে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশে কোন মতে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে বিপুলা-দেহা উলীনের মা, উসাও। কাপড়-চোপরের পুঁটুলি, বিছানা-পত্তর, কেতলি, কতগুলো সাদা প্লেট-ডিস, দীপদানী এবং ভাগ্যদেবীর একখানা পট পড়ে রয়েছে মাটির উপর। মা-বাপকে দেখে মেয়ে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে :

'সব গেছে মাগো, সব গেছে। কোনমতে বেচে এসেছি। আর দশ হাত যদি রাস্তার ধারে থাকতাম তো দেয়াল চাপা পড়েই মরতাম...। অর্ধেক দোকান উড়ে গেছে...দোকানের দু'জন কর্মচারী দেয়াল চাপা পড়ে মরেছে, বাড়ির চাকরটাও শেস হ'য়ে গেছে।... আ-হা-হা-হা সব গেছে, সব গেছে—'

গৃহ-প্রাঙ্গণে সকলে প্রবেশ করলে লিংটান তাড়াতাড়ি দোর দেয় বন্ধ ক'রে। ডাকাত, ডাকাত, চারদিকে ডাকাতি-লুণ্ঠন সুরু হয়েছে। কি যে হ'লো দেশে! বাপ-ঠাকুরর্দার জন্মেও কেউ কোনদিন এসব কিছু শোনে নি। গল্পে শোনা যায় যে সেই সুপ্রাচীন কালে পাহাড় দেশ থেকে ডাকাতরা আসতো লুঠ করতে। কিন্তু আজ, আজ এ কোন্ ডাকাতি? চিন্তামগ্ন লিংটান প্রশ্ন করে : 'শহরের দরজা বন্ধ ছিল না?'

'আকাশের দিকে তো আর দরজা নেই। এ যে দিনদুপুরে ওপর থেকে পড়েছে,' উত্তর দেয় উলীন। দীর্ঘ রাস্তা কোলের ছেলেকে বয়ে আনতে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। ছেলের পেচ্ছাবে পরনের জামা কাপড় সব ভিজে গেছে।

প্রদীপটি তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে লিংটান এগিয়ে আসে :

'ওপর থেকে? কি বলছ?—'

'কেন শহরে বোমা পড়েছে শোন নি?'

'বোমা?' লিংটান বিড় বিড় বিড় ক'রে বলে ওঠে। তার এই দীর্ঘ জীবনে এমন কোন কথা তো সে শোনে নি।

পাশ থেকে মেয়ে ফেটে পড়ে : 'আজ সকালে উড়ো জাহাজ শহরের উপর উড়ে এসে চক্কর মারতে থাকে। মামুলী ব্যাপার মনে ক'রে যে-যার কাজ

নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম আমরা। দোকানের একজন কর্মচারী এসে আমায় বললে : দেখুন দেখুন, কী সুন্দর ঝাঁক বেঁধে ওগুলো উড়ছে। ভগবান বাঁচিয়েছিলেন ! কোলের বাচ্ছাটিকে সেইসময় মাই দিচ্ছিলাম, তাই দেখতে যেতে পারি নি। উঁ-ও তখন ঘুমিয়ে, শাশুড়ীও বিছানায়, আর বড় ছেলেটাও আমার পাশে। তারপরই কানকাটা শব্দ 'ফু-ট্টাং !' কী যে হ'লো। চারদিকে চিৎকার-ক্রন্দনে, হৈহুল্লড়ে আকাশ-বাতাস ফেটে পড়ল। পায়ের নিচের মাটি থরথর কেঁপে উঠল, হঠাৎ আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমার মাইয়ের বোঁটা কেটে নিয়ে কোলের ছেলে পড়ল ছিটকে। দেয়ালের আস্তর-ইঁট খসে ছুটতে লাগল। ওপর থেকে লোহার বড়গা ভেঙ্গে পড়ল টেবিলের উপর…। উঃ বাপ…কিন্তু এখানেই শেস নয়… সমস্ত দোকানটা থরথর কেঁপে, ফেটে ভেঙ্গে, ছিটকে পড়তে লাগল। দেয়াল ধ্বসে পড়ল, আর তারই নিচে চাপা পড়ল দোকানের দু'জন কর্মচারী, জিনিষপত্তর…। ওদের একজন এই সেদিন কেবল বিয়ে করেছিল। অমন বিশ্বস্ত লোক কোথাও আর দেখা যায় না।—'

'হুঁঃ, আর বিশ্বস্ত ! দোকানপাট ব্যবসাই যদি নষ্ট হ'য়ে গেল তো বিশ্বস্ত লোক দিয়ে কি হবে ?' উলীন গুমরিয়ে ওঠে।

এসব কথার বেশীর ভাগই লিংসাওর বোধগম্যের বাইরে। কিছুক্ষণ বুঝবার চেষ্টা ক'রে শুনল ধ্বংসের কাহিনী, তারপর নিজের আশু কাজে মনোনিবেশ করল। পথক্লিষ্ট, শ্রান্ত, ভীত মেয়ে জামাই নাতি নাতনীদের ক্লান্তি দূর করাই তো আশু প্রয়োজন। পুত্রবধূদের ডেকে বলল :

'নীলা, উনুনটা জ্বালিয়ে একটু চায়ের জল গরম চাপাও তো। অর্কিড, কিছু ময়দার সেমুই ভিজিয়ে এদের খেতে দাও। আজ রাতের মত ঐ কিছু মুখে দিয়ে ওরা সব শুয়ে পড়ুক, কাল ভোরে উঠে বিপদ-আপদের কথা সব শুনে বুঝে কি করা যায় দেখা যাবে।'

নিজের মনে লিংসাও ভাবে : এ নিশ্চয়ই সেই বদমায়েস ছাত্র-ছোকরাদের দুষ্কর্ম, যারা এর আগে একবার উলীনের দোকান ভেঙ্গে দিয়েছিল…। সমগ্র শহরে, লিংসাও ভাবছিল, একমাত্র উলীনের দোকানটাতেই আকাশ থেকে বোমা না কি বলল উলীন, তাই ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছে।

…কিন্তু নীলা বুঝেছিল কি ব্যাপার। একটি কথাও না বলে সে রান্না ঘরে ঢোকে। পিছনে পিছনে প্রবেশ করে লাও-এর। উনুনের সামনে নীলার পিছনে হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই নীলা জিজ্ঞেস করে :

'এ হ'লো সেই ওরা, বুঝলে ?'

'হুঁ—'

আহার শেষে সকলে যখন শুয়ে পড়েছে, নীলা আর লাও-এর নিজেদের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা কয়।

নীলা বলল : 'এর মানে হ'লো আমাদের দেশ-গাঁ দখল হ'তে সুরু হয়েছে।'

'অর্থাৎ, আমরা সব মরব, আমাদের ধন-প্রাণ সব শেষ হ'য়ে যাবে হয়তো—' গম্ভীর কণ্ঠে বলে লাও-এর। কিন্তু নীলার মৃতদেহ, তার পরম-প্রিয়ার সুসমামণ্ডিত তনুদেহ হ'য়ে যাবে নির্জীব নিঃসাড় নিঃশেষ...ভাবতে পারে না লাও-এর। দু'হাতে জড়িয়ে দেহলীন ক'রে নেয় নীলাকে...দেহালিঙ্গনে থাকে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে, কিন্তু কামনার স্পর্শকাতরে রোমাঞ্চিত নয়, কেমন এক নিষ্ফলা অসহায় ঘৃণা আর ক্রোধে তাদের মন ভ'রে ওঠে। প্রতিবিধানের কোন কিছুই পায় না খুঁজে। জীবনের জীবন্ত-সুসমা নিয়ে তারা বেঁচে এসেছে, ধ্বংসের অস্ত্রের সন্ধান তো করেনি কোনদিন।

সুন্দর জীবন, নতুন জীবনের অঙ্কুর গড়ে উঠছে নীলার দেহাভ্যন্তরে। কত আনন্দ, কত সুখ...নূতন জীবন...কত শিশু-ভগবান আসবে এই ধরাধামে... তারই এক-একটির উন্মেষ হবে এই ভাবে তারই দেহে...এই তো জীবন...সুখের প্রতিটি পল প্রাণ ভরে ভোগ করবে নীলা। কেন, কেন তবে এই ধ্বংস, নব-জীবনের পথে কেন এই ধ্বংসের বিশান !

'সমগ্র দুনিয়াই যদি এই ধ্বংসের অস্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ওঠে, তবে তো আমাদেরও ধরতে হবে সেই পথ,' অনেকক্ষণ চুপ থেকে ধীর কণ্ঠে নীলা বলে।

'না, না, তবুও তা অন্যায়—' নিশ্চিন্ত দৃঢ় কণ্ঠে লাও-এর জবাব দেয়।

নিস্তব্ধ-রাত্রির প্রতিটি পল গুনে তারা জেগে থাকে। তারপর কোন্ এক সময় সুপ্তির কোলে দেয় নিজেদের সঁপে।

ভোরে উঠে দৈনন্দিন কাজে কেউ গেল না আজ। জামাইমেয়ে এবং মাঝে মাঝে বিশালদেহা বেয়াইন উসাওর শহুরে ঘটনায় ইতিবৃত্ত শুনল তারা বার বার। 'উঃ সে কী আওয়াজ, সে কী কানফাটা গুড়গুড় শব্দ !'

এতক্ষণে লিংসাও বুঝল, এ শুধু একটা কি দুটো দোকান ধ্বংস নয়। যেখানে যেখানে সেইসব রূপের ডিমগুলো পড়েছে, সেইখানেই অবতারণা হয়েছে এই ধ্বংসের, চূর্ণ-বিচূর্ণ ধূলো হ'য়ে গেছে সব।

'কিন্তু শহরের সাধারণ লোকদের কি হয়েছে ?' লিংটান প্রশ্ন করে।

'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন সব মাটির পুতুল...এখানে হাত, ওখানে পা, সেখানে মাথা, নাড়ীভুঁড়ি, হাড়গোড় রক্ত—' উলীন বলে।

হা হ'য়ে সকলে শোনে, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ওই ধ্বংসের চিত্রের বীভৎসতা।

'কিন্তু, কেন, কেন এই ধ্বংস ?' নীলা হঠাৎ চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে।

'কে জানে ? আমাদের সকলের মাথার উপর তো একই বিশ্ব-আকাশ...।' ধীরে জবাব দেয় উলীন।

মৃত্যুর আর ধ্বংসের কালোছায়ার বিতাড়নে কেঁদে আকুল হয় শহরাগতা বড় মেয়ে। সঙ্গে কাঁদে অর্কিড আর প্যানসিয়াও। স্থূলাঙ্গী উসাওর মাংসল গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোটা ফোটা লবণাশ্রু। সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পায় না কেউ...মৃত্যুর আকস্মিকতায় বিমূঢ় সকলেই...সান্ত্বনার ভাষা গেছে হারিয়ে। অমোঘ মৃত্যুর না-চাওয়া পদক্ষেপ তারা দেখেছে...তার চুপি চুপি অতি ধীর আগমনের সঙ্গে তারা অপরিচিত নয়। দুঃস্বপ্নের মত চুপচাপ এসে প্রিয়জনার জীবনের যবনিকা টেনে দিয়ে চলে গেছে মৃত্যু...রেখে গেছে চিরনিদ্রামগ্ন যে নশ্বর দেহ, তাকেই সম্মানের সঙ্গে ফুল-আতরে গন্ধে সাজিয়ে আত্মীয়রা শুইয়ে দিয়েছে কত সযত্নে, কত স্নেহে, মাটি মায়ের গভীর শীতল কোলে...ভক্তি-শ্রদ্ধা হা-হুতাশের স্মৃতি হ'য়ে থেকেছে তাই চিরদিন মনের ভিতে। কিন্তু আজের এ-মৃত্যু ? বিভীষিকাময়ী ধ্বংসের গগনবিহারী উল্কা এ যে! সরল মানুষের কল্পনা পায় না খুঁজে এর দিক্-নিশানা। এ-মৃত্যু, এ-বীভৎসতার তুলনা কোথায় ?

নীরবে সকলে উঠে যে-যার কাজে গেল। মেয়েরা গেল রান্নার জোগাড়ে। লিংটান গেল ছেলেদের নিয়ে মাঠে। রইল কেবল একা বসে উলীন। চাস-বাসের সব কিছুই তার অজানা। ব্যবসায়ী উলীন, আজ সে একেবারে নিষ্কর্মা। আর নিষ্কর্মা মানুষের অলস মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে যতসব আজে-বাজে চিন্তার হিজিবিজি। এ আলসেমির যেন আর শেস নেই।

পুকুরের ধারে ছায়া-ঘেরা বৃদ্ধ উইলো গাছের নীচে লাও-এর আর নীলা তাদের দৈনন্দিন ভরা-দুপুরের মিলনের স্থান খুঁজে নিয়েছিল। দিন-দুপুরে লজ্জার মাথা খেয়ে আত্মীর-স্বজনের সামনে নিজেদের ঘরে তো যাওয়া যায় না। লোকে শুনে যে হাসবে। অথচ সমস্তদিন পরস্পরকে না দেখেও তো থাকা যায় না। সেই যুবক বক্তার সভা থেকে নীলাকে ধরে নিয়ে আসার

পথে এই ছায়া-ঘেরা স্থানটি তারা আবিষ্কার করেছিল। পর্দার মত গাছের পাতা-গুলো নেমে ঘন আবরণ সৃষ্টি করেছে চারদিকে। প্রতিদিন তারা এসে মেলে এই স্থানে। পরস্পরের দিকে হয়তো শুধু তাকিয়ে থাকে...তৃপ্তির মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তাদের ঠোঁটে...হয়তো স্পর্শকাতর কোমল কর তুলে দেয় দয়িত দেহের 'পরে। ভরাডুপুরের শ্লথগতি দিন যেন মুহূর্তে ছুটে চলে যায় দিনান্তের পথে।

আজ কাজে বেরোবার আগে চোখের ইশারায় লাও-এর নীলাকে আহ্বান জানিয়ে গেল দুপুরে উইলো গাছের নিচে আসতে। দুপুরের কিছু আগেই নীলা এসে সেই ছায়া-ঘেরা মিলন-স্থানে নরম দূর্বার উপরে বসে থাকে তার পরমপ্রিয়র প্রতীক্ষায়। নীলার আগমনে নিথর নিস্তব্ধতার বুক চিরে হঠাৎ একটা ব্যাঙ ঝপাং ক'রে লাফিয়ে পড়ে পাশের ডোবার জলে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু হয় ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিল্লিরব। প্রশান্তির ছোট কোণটিতে বসে নীলা ভাবতে পারে না দুনিয়ার বুকে ঝড়-ঝাপটার কেন এই অকারণ আক্রমণ। কিন্তু বুঝতে পারে...তার চোখ খুলে দিয়েছে সেই বইখানা...স্বার্থের সংঘাতে মানুষ পারে নেমে যেতে পঙ্কের নিম্নে, শান্তির শুভ্র-পর্দা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অশান্তি ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বর্বর স্বার্থান্বেষী মানুষ পারে জিঘাংসার চরম চরিতার্থতা করতে, চরম পশুত্বের কাছে দেয় তখন নিজেদের বিলিয়ে...শয়তানের পাশবিক অপকর্ম থাকে না কিছু বাকি, মানুষ তখন খায় মানুষের মাংস...

নিজের মনে নীলা ভাবে: 'কি ক'রে বাঁচব সকলে আমরা, কিভাবে বাঁচাব আমাদের শিশুকে?'

চকিতে ভেসে ওঠে তার মনের পর্দায় চা-খানার সম্মুখবর্তী মাঠে সেই যুবক বক্তার বক্তৃতা: "...যদি নিজের হাতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পার নিজের হাতে ফলানো শস্য, গোলাভরা ধান...শত্রুর হাতে যাতে ওগুলো না পড়ে—তবেই আমরা পারব শত্রুকে ধ্বংস করতে...তারই জবাবে নীলা বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমরা পারব'...।"

'কিন্তু তখন তো আমার গর্ভে নবশিশু এসে নতুন বিস্ময় রচনা করে নি...এখন যে জীবনের জন্য বড় মায়া এসে গেছে, নতুন জীবনের ভ্রূণ প্রতিপলে যে বেড়ে চলেছে আমার দেহের অভ্যন্তরে।'

গাছের ছোট ছোট ডালগুলো দু'হাতে সরিয়ে প্রবেশ করে লাও-এর। নীলার পাশে ব'সে হাত দিয়ে তামাটে বর্ণের শরীরের ঘাম মুছে ফেলে।

স্বামীর উপর নির্ভরশীল দৃষ্টি রেখে নীলা বলে :

'প্রতি মুহূর্তে আমার দেহের পরিবর্তন দেখে আমি নিজেই বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছি। সারাদিন নতুন ছেলের সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি।'

'তাই হয় গো! যদি তাই না হতো সৃষ্টিরই কোন মানে হতো না। আমিও যখন মাঠে কাজ করি, তখন আমার মনের চারিভিতে ঐ একই চিন্তা বারে বারে উঁকি দেয়।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলে : 'ভেবে চিন্তে দেখলাম, বুঝলে নীলা, আমাদের এ-গাঁ থেকে এখন চলে যাওয়াই উচিত। শত্রু যেখানে পৌছুতে পারবে না, সেইখানে আমরা চলে যাব। সেইখানে তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে।

'শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যাব অন্য গাঁয়ে? তোমার বাবা কি বলবেন?' মৃদু কণ্ঠে নীলা প্রশ্ন করে।

'এক্ষুণি তাঁকে কিছু বলছি না, ভেবে চিন্তে দেখি কি ভাবে বলা যায়।' লাও-এর আলতো তুলে নেয় নীলার কোমল করখানি নিজের হাতে। কত সুন্দর কত স্পর্শকাতর কত পেলব নীলার সুসমা-মণ্ডিত দেহখানি...সৃষ্টির সুমধুর বার্তা তার সর্বাঙ্গে। স্বামীর সুগঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে নীলা ভাবে কত নির্ভরশীল স্বামীর এই বক্ষ। স্বামীর ঐ ব্যস্ত-রক্ষা দৃষ্টি কত সুমধুর। বলল :

'তুমি যা চাইবে আমি তাই করব।'

'হ্যাঁ, আমি আর তুমি দু'জনা মিলেই তা করব।'

তারপর তারা উঠে দাঁড়াল। লাও-এর ফিরে গেল মাঠে, নীলা ফিরে এল তার অসমাপ্ত তাঁতের কাজে। হয়তো এ-তাঁত চালানোর শিক্ষা কোন কাজেই আসবে না। কোথায় কোন্ সুদূর গাঁয়ে তারা যাবে চলে।...কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন এ-শিক্ষা কাজে লেগেও যেতে পারে—, নীলা ভাবে।

খিড়কির দরজা দিয়ে নীলাকে আসতে দেখে লিংসাও চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে : 'কোথায় গিয়েছিলে বৌ তাঁত ফেলে?'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।' শান্ত কণ্ঠে নীলা জবাব দেয়। লজ্জার কোন রেশ নেই তার কণ্ঠে। একটু আশ্চর্য হ'য়ে লিংসাও তাকিয়ে থাকে নীলার দিকে, তারপর চলে যায় নিজের কাজে।

বিধ্বস্ত শহরের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নতুন ভাবে একটু একটু ক'রে গড়ে তুল-

বার চেষ্টা আবার সুরু হ'লো। ধ্বংসের পুনরাবর্তন সম্বন্ধে কারও মনে যেন আর কোন সন্দেহই রইল না। ভূমিকম্প কিংবা ঝড়-ঝাপ্টা তো প্রত্যেক দিনই হয় না, আকাশ থেকে এই ধ্বংস-বৃষ্টিও প্রতিদিন হবে না নিশ্চয়ই। উলীন লিংটানের মনেও এ-প্রশ্ন এল না, লাও-এর লাও-তা'ও ও-নিয়ে আর ভাবল না।

একদিন সকালে ছেলেদের ক্ষেতের কাজে যেতে বলে বিধ্বস্ত শহরটি একবার দেখে নেবার জন্য লিংটান নিঃশঙ্কচিত্তে শহরের দিকে পা বাড়াল। এমন সময় কার দৌড়ে আসার শব্দ শুনে পিছনে মুখ ফিরিয়ে দেখে ছোট ছেলে। একটু বিরক্ত হ'য়ে ঝাঁঝাল স্বরে জিজ্ঞেস করল : 'কি রে, কি ব্যাপার ?'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলে বায়না ধরে।

'কেন, কি জন্য, শুনি ? আজ তো হাটের দিন না—'

পায়ের গোড়ালির উপর ঘূর্ণি খেয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে গোলাকৃতি আঁকতে আঁকতে ছেলে বারে বারে বলে : 'আমি যাব, আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

যাত্রার মুহূর্তে ছেলের সঙ্গে খেঁচাখেঁচি করা সমীচীন নয় মনে ক'রে, আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বৃদ্ধ বাপ বলে : 'নে চল্! তোর আব্দারের আর শেষ নেই বাপু —'

ভারী আকাশের কোলে জলভরা কালো মেঘ ঝুলে রয়েছে মন্দির প্যাগোডার মাথা পর্যন্ত। গতকালও গেছে এই ভাবে, থমথমে মুখভারী আকাশ। বাপ আর ছেলে গাঁয়ের পথ ধরে শহরের দিকে এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ চলার পর মেঘ গেল কোথায় উড়ে, নীল আকাশের নির্মল আলোয় বাপ-ছেলে হৃষ্টমনে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে। এ যেন ঠিক মধ্য-গ্রীষ্মের দিন নয়, বসন্তের আমেজ রয়েছে বাতাসে। মাঠের বুকে ধানের শাঁস-সমৃদ্ধ শিষে যে দোলা ওঠে, তার ছোঁয়াচ এসে লাগে তাদেরও মনে। চারদিকের লক্ষ্মীশ্রীতে চোখ যায় ভরে।

দক্ষিণদ্বারী ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করে তারা। পরিবর্তনের কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না তাদের। শুধু লোকজনের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় সকলেই কেমন যেন বিমর্ষ।

অতি পুরাতন এই শহরের বিলাস-ব্যসনও নাম ডাকের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত শাসক এসেছে গেছে, কত নবাব-বাদশা' প্রজার অর্থে বিলাসের প্রাচুর্যে অতলে ডুবে গিয়ে আবার সেই অর্থ যেন মুক্ত হস্তে দিয়ে গেছে ছড়িয়ে বিলাসে-ব্যসনে। যার ক্ষমতা আছে ভাসাও দেহ-গেহ সেই

অতল জলে...দিন-রাত্রিভর গান-বাজনার ফোয়ারা, সুন্দরী বারবণিতার সঙ্গে হলদে তুলতুলে কামজ ব্যসনাসক্ত অর্থবান নন্দনদের লীলা খেলা, হ্রদের জলে সুন্দর সাজানো রঙীন বজরা নৌকো...দারু-নির্মিত মন্দির প্যাগোডার কারুকার্য ...কতকিছু ছিল এই শহরে। কিন্তু সে-সব তো প্রাচীন কালের।

বিপ্লবের পরে রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশা' সব গেছে...কিন্তু তার স্থানে এসে বসেছে নতুন শাসক। তারাও বড় বড় ইমারত গড়ে তুলেছে। সেই সব সুবৃহৎ ইমারতের দেয়ালের ভিতর দিয়ে নল বেয়ে জল যায়, দেয়ালে বসানো বোতাম টিপলে চারদিকে ঝলমলিয়ে আলো জ্বলে ওঠে। এরাও সাধারণের কাছ থেকে অর্থ নেয়, আর তার পরিবর্তে দোকানে দোকানে খাবার, পানীয় আর আনন্দ বিতরণ করে। কতরকম মনোহারী পণ্যের পশরা সাজিয়ে কত বিপণি বসেছে রাস্তার দু'ধারে, হরেক রকম মন-মাতানো কত সব জিনিস তাদের ভাণ্ডারে...সাধারণ মানুষ বাপের জন্মেও কল্পনা করতে পারে নি ঐ সব পণ্যের। গাঁয়ের কিসাণ-ছেলে শহরে এসে রিক্‌সা টেনে তাজ্জব কলের বাতি কেনে, ঝড়-ঝাপটায় পুরোনো কাগজের লণ্ঠনের মত সেগুলো নিভে যায় না, বোতাম টিপলেই ঝপ ক'রে আলো ঠিকরে বের হয়। প্রতিদিনই নতুন কিছু দেখা যায় দোকান-গুলোতে। গাঁয়ের মানুষ হা হ'য়ে এসব দেখে আর মনে মনে তারিফ করে বিদেশী কারিগরদের। কেমন সস্তায় তারা এসব জিনিস তৈরি ক'রে পাঠিয়েছে এখানে! কিন্তু এ সব তো বিদেশী উড়ো জাহাজ আসবার আগের কথা।

পথের ধারের একটা চা-খানায় প্রবেশ ক'রে নিজের আর ছেলের জন্য দু'কাপ চা নিয়ে বসে সর্বপ্রথম লিংটান শুনল শহরে লোকজনের মুখে কেমন বেসুরো কথা। 'কোন দরকার নেই তাদের কাছ থেকে এই সব বাহারী জিনিসপত্রের যারা এই ভাবে চারদিকে ধ্বংস করতে পারে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কথাবার্তা শুনে লিংটান দোকানীকে জিজ্ঞেস করল: 'কোথায় ধ্বংস হয়েছে ভাই?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দোকানী বলে: 'উত্তরদ্বারী পুলের রাস্তায় সেই যে ধনী লোকটির বড় ইমারতটা ছিল, তারই দেয়াল ঘেঁসে ছিল আমার ছোট্ট বাড়ি। বোমা পড়ল ঐ বড় ইমারতের ওপরে। তারই ঘায়ে সেটাও গেল, আমারটাও শেষ হ'ল। ঐ বড় বাড়ির কে কে মারা গেছে বলতে পারব না, কিন্তু আমার যে সব গেছে...হা—হা—হা...আমার দু' ছেলে, বৌ...সব গেছে, সব হারিয়েছি। সে-সময়ে বাড়িতে থাকলে আমিও মরতাম...কেন যে

মরলাম না, হা হা—, যদি মরতাম তো এই সব-হারানোর ব্যথা, মনের এই জ্বালা তো সইতে হতো না...হা হা—হা—'

সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না লিংটান! জেব্ থেকে তাড়াতাড়ি চায়ের দামের বেশি পয়সা বের ক'রে শোকাহত দোকানীকে দিয়ে উত্তরদ্বারী পুলের দিকে এগোল। পৌঁছে ধ্বংসের বিকট চেহারা দেখে সে হতভম্ব হ'য়ে গেল। এ কি ধ্বংস! একশ' দিন ধরে হাজার মানুষ যা তৈরি করতে পারে না, এক লহমায় তার সবশেষ! হা হ'য়ে লিংটান তাকিয়ে দেখে লোহার গরাদ, কাঠের ভাঙ্গা দরজা-জানালা, ইঁট সুরকীর ধ্বংস-স্তূপ জমে উঠেছে রাস্তার উপরে। বাড়ির একটা কোণ কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে, বড় বড় ফাটলগুলো হা ক'রে যেন গিলতে চায় দর্শকদের! তারই মধ্যে হাতড়িয়ে খুঁজে চলেছে তখনও কত লোক তাদের প্রিয়জনদের শেষ চিহ্ন। লিংটানের চোখের উপরেই একটি স্ত্রীলোক তার স্বামীর পায়ের একটি টুকরো হাতে তুলে নিয়ে গগনভেদী চিৎকারে কেঁদে উঠল: 'এ যে আমার অতি প্রিয়জনের চিহ্ন, এ আমি চিনি না? কোথায়, কোথায় গেলে গো তুমি? শয়তানরা যে আমার—' ক্রন্দন-আকুল স্ত্রী বারে বারে বুক চাপড়িয়ে বলে। কিন্তু স্বামীর দেহের আর কোন অংশই খুঁজে পাওয়া গেল না ঐ ধ্বংসস্তূপে।

যা দেখেছে তারই টোল সামলাতে লিংটান থর থর কেঁপে ওঠে। হঠাৎ বমির ওয়াক শুনে পিছনে ঘুরে দেখে ছেলে বমি করছে। তাড়াতাড়ি ছেলেকে ধরে বলে:

'ওয়াক তুলে বমিটা বের ক'রে ফেলে দে, না ফেললে পেট পাকাবে। ওঃ, যা বীভৎস দৃশ্য, এ কী আর দাঁড়িয়ে দেখা যায়!' তারপর ছেলেকে নিয়ে চা-খানায় গিয়ে ভাল ক'রে ধুইয়ে মুছে চোখে-মুখে জল ছিটিতে দিয়ে, শূন্য পেটে আর একটু চা খেয়ে নিতে বলে। সকলের সামনে বমি হয়েছে বলে ছেলের লজ্জিত ভাব দেখে লিংটান আবার বলে: 'এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই রে। মানুষের ব্যাটা হ'লে রাগ হবেই। আর যদি পশু হয় তো তার মনে নির্দোষ লোকের ওপর এই শয়তানি দেখেও কোন দাগ কাটবে না।'

গম্ভীর হ'য়ে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তারা দু'জনে বসে বসে ভাবে: 'এ কেন হ'ল? কারা করল?' এমন সময়ে দোকানে একটি যুবক-ছাত্র ঢুকে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করল। যেখানেই পনের কুড়ি জন লোক জমে ওঠে, সেখানেই এরা বক্তৃতা দিয়ে বোঝায়!

'আপনারা যারা দেশকে ভালবাসেন, শুনুন! গতকাল শত্রু আমাদের এই শহরের ওপর উড়ে এসে বোমা ফেলে আমাদের মা-ভাই-বোনদের হত্যা করেছে। লড়াই তারা সুরু করেছে। আমাদেরও তৈরি হতে হবে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের চালাতে হবে। লড়াই করতে করতে আমরা যদি খতম হ'য়ে যাই, তাতেও পরোয়া নেই। আমাদের শূন্য জায়গায় এসে দাঁড়াবে আমাদের ছেলেরা। আমাদের দেশের লোকেরা বীর। প্রথম প্রথম হয়তো শত্রুরা সাময়িক ভাবে বিজয়ী হ'তে পারে...সমুদ্রতীর থেকে একশ মাইল পর্যন্ত ভূমি আজ শত্রু কবলিত হ'য়ে পড়েছে ...কিন্তু আমরা তৈরি থাকব এই পণ নিয়ে যাতে তারা আর পরের একশ মাইলের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই—এই হ'ল এখন একমাত্র আওয়াজ।'

যুবক-বক্তার বক্তৃতা শুনে লিংটানের ছেলে মাথা নেড়ে বলে উঠল: 'ঠিক!' সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক যুবক-শ্রোতা বলে উঠল: 'ঠিক!' সকলের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিজের খালি হাতের দিকে তাকিয়ে লিংটান চেঁচিয়ে ওঠে: 'লড়াই তো বুঝলাম, কিন্তু খালি হাতে লড়াই হবে কি ক'রে?' সেই নীরবতার মধ্যে, লিংটানের প্রশ্নের আগেই, কর্মব্যস্ত যুবক-বক্তা বেঞ্চি থেকে নেমে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেছে। লিংটানের প্রশ্নের কোন জবাব এল না। প্রশ্ন শুনে সকলেই নিজের নিজের খালি হাতের দিকে শুধু তাকিয়ে দেখে। যেন খালি হাতগুলোকে বিদ্রূপ করার জন্যই পূবদিক থেকে এমন সময় এরোপ্লেনের শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে এল, যে শব্দ আজ তাদের কাছে বুকের ধুক্-পুকের শব্দের মতই সুপরিচিত।

'হাওয়াই জাহাজ—এরোপ্লেন—' চিৎকার দিয়ে নিমেষের মধ্যে যে যেদিকে পারল দিল ছুট। ঘটনাটি বুঝবার আগেই লিংটান দেখল ঘর খালি। পুত্রসহ সে আর দোকানী, এই তিনজন ছাড়া সকলে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

'আপনি মশাই এখানে লুকোন!' লিংটানকে ডেকে দোকানী বলে।

'কিন্তু শয়তানদের মারণাস্ত্র থেকে লুকোব কোথায়? আর তুমিই বা লুকোবে কোথায়?' লিংটান চেঁচিয়ে বলে।

'আমি লুকিয়ে কি করব! যার সব গেছে তার আবার ভয় কি?' উত্তর দিয়ে দোকানী আস্তে আস্তে চায়ের কাপগুলো থেকে আধা-খাওয়া চা ঢেলে ধীরে সুস্থে টেবিল চেয়ার মুছে ঠিক ক'রে সাজিয়ে রাখতে থাকে—তাড়াতাড়ির কোন প্রয়োজনই যেন তার নেই। উড়ো জাহাজের শোঁ শোঁ শব্দ ক্রমেই কাছে

এগিয়ে আসে। ছেলেকে সাহস দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল লিংটান, কিন্তু উপরের শব্দে তার ডাক গেল ডুবে। ভয়ে থ' বনে গেছে ছেলেটা। ছেলেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুপ ক'রে মেঝের উপর বসে থাকে লিংটান। দোকানী এসে আস্তে আস্তে তাদের ধাক্কা দিয়ে টেবিলের নিচে বসিয়ে দেয়। যদি উপর থেকে টালি খুলে পড়ে তো আঘাত লাগবে না। চুপচাপ তারা বসে রইল ; আর দোকানীর যেন পরম নিশ্চিন্তে দোকান ঝাড়-পোঁছ করবারই সময় এটা। চা ফেলে যারা প্রাণের দায়ে পালিয়ে গেল, তারা ফিরেই যেন তৈরি চা পায় তারই ব্যবস্থা নিয়ে দোকানী ব্যস্ত।

বজ্রপাতের মতন কর্ণভেদী বিরাট শব্দে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাদের গাঁয়ে মাঠের মধ্যে এ-শব্দ লিংটান শুনেছে। দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে লিংটান বসে থাকে। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয় এই বুঝি সব শেষ হ'য়ে গেল, এই বুঝি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ছিঁড়ে চারদিকে ছিটকে উড়ে গেল। কর্ণ-পটাহ গেল বুঝি ফেটে, ঝাঁকুনিতে চোখের মণি বোধ হয় খসে পড়ে গেল। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কতলোক গেল মরে। ছেলের দিকে এক ফাঁকে তাকিয়ে দেখে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে মাটির উপর প্রায় উবু হ'য়ে প'ড়ে হাত দু'টো দিয়ে কান ঢেকে সে পড়ে আছে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তারা গুনে গুনে সহ্য করে এই বর্বরতার আঘাত। তারপর হঠাৎ চুপচাপ... শয়তানরা কি চলে গেল ? চারদিক নীরব, নিথর...তারপর আবার আর এক শব্দ। এবার আগুনের করাল জিহ্বা চারদিকে লেলিহান শিখা বাড়িয়ে ছুটছে সব কিছু গ্রাস করতে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে লিংটান চেঁচিয়ে ডাকে : 'ওরে আয়, তাড়াতাড়ি আয়। বাড়ী চ', এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।'

কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে ছেলের হাত ধরে লিংটান ছোটে শহরের রাস্তা পার হ'য়ে গাঁয়ের দিকে। কিন্তু কি ক'রে সে চোখ-কান বন্ধ করবে রাস্তার ছিন্ন-বিছিন্ন আঘাতপ্রাপ্ত জনতার ক্রন্দন-বিলাপ থেকে ? ধ্বংস-প্রাপ্ত গৃহগুলির চারদিকে জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা থেকে কোনমতে নিজেদের বাঁচিয়ে তারা ছোটে। প্রিয়জনার হারানোর আকুলতায় কতজনের বিলাপ ধ্বনি তাদের পথ রুখে দাঁড়ায়। লিংটান দাঁড়িয়ে পড়ে। ছেলেকে ডেকে বলে : 'আয় তো রে, দেখি কিছু করা যায় কিনা।' কিন্তু এই ধ্বংস-লীলা ও দাবানলের মাঝে কি করতে পারে দু'একজন ? দু'চারজন কোথা

থেকে দু'চার বালতি জল ঢেলে আগুন নেবাবার পাগলামী করে মাত্র। তাতে আগুন যেন অট্টহাসি হেসে তাদের দিকে ধাওয়া করে। আশাহত মানুষ ব্যর্থতায় চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনা মনে ক'রে চোখের সামনে দেখে অগ্নি-তরঙ্গ ছুটেছুটে প্রশস্ত রাজপথের ধারে এসে সব কিছু পুড়িয়ে ছাই হ'য়ে অবশেষে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ধীরে ধীরে গেল ডুবে। এই সুপ্রশস্ত রাজপথই দাবানলের পথ রুখে দিল। বিপ্লবের পর নতুন শাসকশ্রেণী যখন শহরে সোজা সোজা প্রশস্ত রাজপথ তৈরি সুরু করেছিল, কত গৃহ-মন্দির ভেঙ্গে ধুলিসাৎ ক'রে দিয়েছিল এই পথ প্রস্তুতের জন্য, তখন শহরের অনেকে বাঁধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। বন্দুক ছিল না হাতে, কি করবে? আজ প্রশস্ত পথের অন্ততঃ একটা উপকার তারা চাক্ষুস দেখল।

ছেলের হাত ধরে লিংটান শহর থেকে বেরিয়ে এল। গাঁয়ের পথে পা দিয়ে, মাঠ-ঘাটের খোলা বাতাসে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। জোরে জোরে বুক ভরে নিশ্বাস টেনে তাদের দেহ-মন ঠাণ্ডা হ'ল। আগে হাঁটে বাপ, পেছনে ছেলে। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় গাঁয়ের প্রধান সড়ক দিয়ে যেতে যেতে গ্রামবাসীর প্রশ্নে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলেই জানতে চায় শহরের অবস্থা। পথের উপরে দাঁড়িয়ে লিংটান বর্ণনা করে সেই বীভৎস নারকীয় ঘটনার ইতিবৃত্ত, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা সে দেখে এল এইমাত্র। নিশ্বাস চেপে উদগ্র মনে শোনে সকলে সে-কাহিনী। লিংটান চুপ করবার পরেও স্তব্ধবাক শ্রোতারা দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে গাঁয়ের সর্বজ্যেষ্ঠ নব্বুই বছরের বৃদ্ধ বলল :

'আমাদের কালই ছিল ভাল, সেই পুরোনো কাল—যখন সকলেই যে যার দেশে থাকত, বিদেশীরাও তাদের দেশ ছেড়ে বেরোত না। শুনি, অনেকে বলে বিদেশীদের ভাল বলে, কিন্তু আমি তো বাপু দেখেছি, দুর্দিন-শয়তানী সুরু হয়েছে সেই দিন থেকে যেদিন এই বিদেশীরা তাদের নিজেদের দেশ ছেড়ে পরের দেশে হানা দিতে সুরু করেছে। কি জানি, ভাল বলতে ওরা কি বোঝে! ভাল তারা যেটুকু ক'রেছে, তার থেকে ক্ষতি ক'রেছে অনেক বেশী। তাদের দেওয়া ভাল জিনিসের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। ভগবান তাদের যে-দেশ দিয়েছেন সেখানেই তারা থাকুকগে না, সেই সাত সমুদ্রের ওপারে। সমুদ্র তো ভগবান আর অমনি তৈরি করেন নি, তার একটা অর্থ আছে, বুঝলে না। আজ ভগবানের এই বিধান ভেঙ্গে দিয়ে বিদেশীরা পরের দেশে হানা দিচ্ছে বলেই তো এত বিপদ, এত ধ্বংস।'

সম্মানের সঙ্গে বয়োবৃদ্ধের কথা শুনে মনে গভীর বিষাদ নিয়ে যে যার ঘরে ফেরে। লিংটানও বাড়ি ফিরে এল। তার নিরানন্দ গৃহের দীর্ঘনিশ্বাস শুনে মনে হয় এ-গৃহে কেউ বোধহয় মারা গেছে। কিছুক্ষণ পরে গৃহকর্তা লিংটান এই অবসাদ কাটিয়ে দেবার প্রয়োজন বুঝে সকলকে ডেকে এক জায়গায় বসতে বলল।

ছেলে মেয়ে বৌ সব একসঙ্গে এসে বসল। তাদের অবসাদগ্রস্ত ম্রিয়মাণ মুখের দিকে তাকিয়ে লিংটান ভাবে: 'এদের বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য কীইবা আমি করতে পারি? রোগ শোক, দুর্ভিক্ষ, মহাজনের তাগাদা কিম্বা শাসকের অত্যাচার হ'লে তার থেকে বাঁচবার চেষ্টা করা যায়: কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ নতুন উৎপাত, নতুন বিপদ।'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে লিংটান অবশেষে মৃদু গম্ভীর স্বরে বলে:

'কি ক'রে যে তোমাদের বাঁচাব, আমি বুঝে উঠতে পারছি না। যে বীভৎসতার কথা উলীন বলেছিল, সে-বিপদের সাংঘাতিক রূপ আমি নিজে আজ দেখে এলাম। এ যে কি বীভৎসতা, চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। এর শেষ যে কোথায় কেউ বলতে পারে না। আজ এবং কাল যা হ'য়ে গেল আগামী কালও নিশ্চয়ই আবার তা ঘটবে। এই বিদেশী অস্ত্র থেকে বাঁচবার তো কোন উপায়ই দেখি না।...মানুষ যে এত শয়তান হবে, এই সব ধ্বংসের অস্ত্র দিয়ে নিজেরাই পরস্পর হানাহানি করবে, এ যদি ভগবান জানতেন তো নিশ্চয়ই মানুষকে কচ্ছপের মত দেহ ঢাকবার জন্য শক্ত আবরণ দিতেন। কিন্তু ভগবান তো তা চান নি, মানুষের কাছ থেকে এ-শয়তানী, এ-হিংসা কল্পনাও তিনি করেন নি। হঠাৎ বিপদের মুখে পড়ে কচ্ছপের মত দেহের উপর আবরণ তো মানুষ টেনে দিতে পারে না, যে-বিপদ আসবে চুপ ক'রে তা সহ্য করা ছাড়া কোন উপায়ই দেখছি না। বাঁচা মরা তো আমাদের উপর নির্ভর করে না।'

প্রিয়জনার প্রত্যেকের মুখের উপর দিয়ে লিংটান দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। সকলেই যেন সমস্ত প্রশ্নের জবাব তার মুখে খুঁজে দেখছে। লিংটান আবার বলে: 'লাও-তা, লাও-এর, অবস্থা বুঝবার মত বয়স বুদ্ধি তোমাদের হয়েছে; আর তুমি উলীন, তুমি এদের থেকে বয়সে বড়। তোমাদের কি মনে হয় বল।'

লাও-তা, লাও-এর ভগ্নীপতির দিকে তাকায়। খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে উলীন বলে: 'এ বিপদের মধ্যে পড়ে সত্যিই নিজেদের

বাচবার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর সব কিছু হারিয়ে এই দুর্দিনে আমি আবার ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে আপনাদের উপরে এসে পড়েছি। একমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া তো কোন-কিছুই জানি না আমি। কিন্তু এই চরম সঙ্কটের মধ্যে কেআর কেনা-বেচা করে? যুদ্ধের মধ্যে আমাদের মতন ব্যবসায়ীদের শান্তি কামনা করা ছাড়া তো কিছুই করবার নেই।'

লাঙ-তা বলে: 'আকাশ থেকে যদি এভাবে অগ্নিবৃষ্টি সুরু হয়, তার থেকে বাচতে হ'লে, হয় আমাদের পালাতে হবে, নয় তো, তাকে চুপ ক'রে সহ্য করতে হবে। বাবা, তুমি যা ঠিক করবে আমিও তাই মেনে নেব।'

'কিন্তু আমি এর থেকে পালিয়ে বাচব।' লাও-এর হঠাৎ বলে।

সকলের কথা শুনে গৃহকর্তা লিংটান তার কথার সমাপ্তি টানে:

'আজ যদি জমি-জমা না থাকত, বয়স যদি আমার কম হতো, হয়তো লাও-এরের মত আমিও চলে যাবার কথা ভাবতাম। কিন্তু আজ আমার কথা স্বতন্ত্র...। যদি কেউ দূরে চলে যেতে চায় নিশ্চয়ই সে যেতে পারে। যেখানে আমি জন্মেছি, যেখানে আমি বড় হ'য়ে উঠেছে, আমি থাকব সেখানেই। যাই হোক না কেন, শহর যদি শত্রুর হাতে যায়, এমন কি সমগ্র জাতিও যদি আজ পরাজিত হয়,—শহরে কে একজন বক্তা সেই রকমই যেন বলল—আমি থাকব এই গাঁয়ে আমার এই ঘরে। আমার সঙ্গে যারা থাকতে চায়, তারা থাকবে। আর যদি কেউ দূর দেশে চলে যেতে চায়, নিশ্চয়ই সে যেতে পারে। আমার সম্পূর্ণ মত আছে।'

লাও-এরের মনে হয় বাপের কণ্ঠে যেন তিরস্কারের সুর রয়েছে। ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে বলে: 'বাবা, আমি চলে যাবার কথা বলছি বলে কি রাগ করলে?'

'না, না, মোটেই না—' গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে লিংটান বলে: 'আমি মনে করি আমাদের একজনের দূরে যাওয়াই উচিত। আমরা সকলেই যদি এখানে থাকি আর তারপর সকলেই যদি মরে যাই, তবে বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। এখানে আমরা মরে গেলেও আমাদের বংশ বেঁচে থাকবে এ-দেশেরই অন্য কোথাও। তারপর যুদ্ধ-শেষে এসে এই পরিবারেরই জমি-জমা নিয়ে আবার চাষ-বাস করবে আমাদেরই কোন বংশধর।... শুধু একটা কথা বলব তোমাকে লাও-এর। যুদ্ধ-শেষে এসে খোঁজ নেবে আমরা বেঁচে আছি কিনা। যদি সব মরে যাই তখন মন্দিরে আমাদের নামে ধূপ-ধূনো দেবে, আর

জমি-জমাগুলো নিয়ে গাঁয়ে ঠিকঠাক হ'য়ে বসবে।... আমাদের বংশের প্রবাহ তো তবু বেঁচে থাকবে।'

নীরবে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাও-এর, তারপর বলে: 'হ্যাঁ আমি তাই করব বাবা।'

বাড়ির মেয়েরা শুধু শ্রোতা, তাদের এই আলোচনায় কথা বলা কিংবা মতামত দেওয়া চলে না। পরিবারের পুরুষদের কথা শুনে এক একজন নিজেদের ব্যবস্থা মনে মনে ঠিক ক'রে নেয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে স্বামীর কাছে তারা তাদের মনের কথা কয়। শহরে না গিয়ে এখন যে পিতৃ-গৃহে নিরাপদে থাকতে পারবে তাতেই উলীনের স্ত্রী আনন্দিত। দূর দেশে চলে যাবার কথাটা এমন দৃঢ় অথচ সুন্দরভাবে বলতে পেরেছে বলে লাও-এরকে প্রশংসা জানায় নীলা। শুধু শুয়ে শুয়ে অর্কিড ভাবে যদি বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সেও সুদূর দেশে চলে যেতে পারত যেখানে ঐ উড়োজাহাজ যেতে পারে না। স্ত্রীর কথা শুনে লাও-তা সান্ত্বনা দিয়ে বলে: 'ভাবছ কেন মিছিমিছি। সকলেই যদি আমরা দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যাই, তবে তো শত্রুরা এমনিতেই এসে দখল ক'রে বসবে। বাবা ঠিক কথাই বলেছেন, আমাদের নিজেদের জমি-জমা কামড়ে পড়ে থাকা উচিত। দেশ-গাঁ ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়।'

'কিন্তু নীলা তো চলে যাবে!' নীলার বিরুদ্ধে কেমন একটু ঈর্ষা অর্কিডের মনে বাসা বাঁধে আজকাল। রাতদিন সময় পেলেই বই মুখে নিয়ে বসে থাকা! যে মেয়ে অত পড়ে সে কি আর ছেলে বিয়োতে পারে? এতদিন পর্যন্ত এ-বংশের পুত্রের মাতা বলে নিজের মনে মনে গর্ব ছিল অর্কিডের। কিন্তু গর্ভবতী নীলাকে দেখে তার বারে বারে মনে হয় এ-গৃহ-সংসারে তার স্থান যেন কিছুটা সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল।

গৃহিণী লিংসাও হৃষ্টমনে স্বামীর প্রশংসা করে। সত্যিই তো বাড়ি-ঘর-দোর ফলে কে আবার কোথায় যাবে? আর দূর দেশে চলে গেলে গৃহের সব কিছু দখল ক'রে নেবে গাঁয়ের জ্ঞাতি শত্রুরা। বাড়ি দেখা শোনার নাম ক'রে এ-গৃহে মৌরুসী পাট্টা জাঁকিয়ে বসবে ওঁর পণ্ডিত খুড়তুতো ভাই ও তার স্ত্রী রত্নটি।

তারপর দিন বিদেশী হাওয়াই জাহাজ আবার উড়ে গেল শহরের উপর দিয়ে। তারপরের দিনও...তারপর প্রতিদিনই। এমনিভাবে চলতে লাগল মৃত্যু আর আগুনের লেলিহান শিখার তাণ্ডবলীলা। লিংটান কিম্বা তাদের গাঁয়ের আর কেউই শহরে গেল না সেই নারকীয় দৃশ্য দেখতে। প্রতিদিন চাষের

কাজে তারা লেগে রইল যেমন ক'রে প্রতি বছর এই সময় ব্যাপৃত থাকে শীতের খাদ্য আহোরণে। শুধু শত্রুর উড়োজাহাজ আকাশে দেখলে তারা ছুটে গিয়ে লুকোতো বাঁশ ঝোপের মাঝে। কারণ, একদিন মাঠে দাঁড়িয়ে মাথার উপরের উড়োজাহাজ যখন দেখছিল, হঠাৎ একটা নেমে এসে একজনের মাথাটা দেহ থেকে উড়িয়ে দিয়ে শোঁ ক'রে উপরে উঠে গিয়েছিল, যেন ঐ উড়োজাহাজের লোকদের কাছে এসব কিছুই না, শুধু একটা খেলা মাত্র।

॥ পাঁচ ॥

শত্রুর উড়োজাহাজের এই ধ্বংস-বৃষ্টির যেন আর শেষ নেই। এই দৈনন্দিন অগ্নি-বর্ষণ সেই দিনই শুধু বন্ধ থাকে যেদিন আকাশ ভেঙ্গে নামে মুষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যে শহরবাসীরা ছোট মন্দিরে, দেবতার পায়ে মাথা কুটে প্রার্থনা জানায়: 'হে ঠাকুর, আরও বৃষ্টি হোক, আরও বৃষ্টি হোক!' বৃষ্টির জমা জলে শহরের পথে যখন বান ডাকে, তখনই শুধু তারা প্রার্থনা থামিয়ে শত্রুর উড়োজাহাজের মৃত্যু-বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য শহরের বাইরে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে, পথে-প্রান্তরে, মন্দির-প্রাঙ্গণে, কবরস্থানে, গাছের তলে কিংবা কৃষাণের ঘরের দোরে কোন মতে দিন দেয় কাটিয়ে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যার যা ছিল সর্বস্ব পুঁটুলি বেঁধে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে গাঁয়ের পথে ঘুরে বেড়ায় আজ তারা। শুধু অল্প সংখ্যক বড়লোক পারে জিনিস-পত্তর বেঁধেছেদে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে দূর দূরান্তে পাড়ি দিতে। লিংটানের সুদীর্ঘ জীবনে এ-দৃশ্য চোখে পড়েনি কোন-দিন। উত্তর চীনে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় এর আগেও অনেকবার সাধারণ লোকজন ছুটে এসেছে তাদের এ-অঞ্চলে, কিন্তু এ-ভাবে সর্বস্ব বেঁধে ছুটে পালিয়ে বেড়ায়নি কেউই কোনদিন। অনাবৃষ্টির ধকল আর দুর্ভিক্ষের সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে তারা আবার ফিরে গেছে নিজেদের দেশে-গাঁয়ে, গিয়ে আবার জুতেছে' চাষ।

কিন্তু এবার তো শুধু কৃষাণ নয়—ধনী দরিদ্র সকলেই যে ছুটছে প্রাণের তাগিদে। ঘরে ফিরবার কোন নিশ্চয়তাই আজ তাদের নেই। সময় সময় লিংটানের মনে গরীবদের থেকে ধনীদের প্রতিই মমতা জাগে বেশি। কারণ, এই নরম তুলতুলে ননীর গোপালগুলো তো কোন কাজেরই নয়। কোথায় যে খাবার পাওয়া যায় তাও জানে না এরা। আজীবন শুধু হুকুম চালিয়েই খাবার

জোগাড় ক'রে এসেছে। সঙ্কটের কালে এরা একেবারে অপদার্থ। অল্প খেয়ে বাচে বলে গরীবরা এই সঙ্কটের মধ্যেও নিজেদের হারিয়ে ফেলে না। তার মধ্যে সাহস ক'রে এই দুর্দিনেও শহর আঁকড়িয়ে পড়ে থাকে যে সব গরীব, তারা বড় লোকদের খালি বাড়িতে ঢুকে যা পায় তাই নেয় জোগাড় ক'রে।

নদীর স্রোতের মত অগুন্তি লোকের কাফিলা চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে। বানের জলের মত শহরের লোকেরা বেরিয়ে প'ড়ে মেশে এই পশ্চিমগামী জন-স্রোতের সঙ্গে। পূর্ব উপকূলে হানা দিয়ে একটু একটু ক'রে জমি জায়গা গাঁ যখন শত্রুরা দখল করতে থাকে, লোকেরাও তখন প্রাণভয়ে ছুটে পালায় পিছনের দিকে। এই বিরাট জন-সমুদ্রের একটি লোকও জানে না কোথায় তারা চলেছে, কোথায় গিয়ে তারা থামবে; শুধু এইটুকু বুঝে নিয়েছে যে যদি এ-অঞ্চলে তাকে থেকে যেতে হয় তো অবধারিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে।

লিংটান তার বাড়ির দোর খুলে দিল এই দুর্ভাগ্য-তাড়িত জনতার জন্যে। দিনরাত্রি বাড়ির মেয়েরা ভাত রেঁধে খাওয়াল এদের...দুঃখে জানাল সত্যিকারের সমবেদনা। আহতদের সম্ভাব্য শুশ্রূষা ক'রে, মৃতপ্রায় শিশুদের যদি কেউ নিতে চায় তো তাদের দিয়ে, আর যারা মরে গেল কিংবা আধ-মরা হ'য়ে পড়ে রইল, তাদের ফেলে রেখে সমস্ত দল চলল এগিয়ে। হ্রদজঙ্গল পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তারা যায় এগিয়ে আরও পশ্চিমে যেখানে আলাদা হ'য়ে পড়বার ভয়ে শত্রু-সৈন্য যেতে সাহসী হবে না। লিং গ্রাম শত্রু-সীমানা থেকে দূরে নয়, সুতরাং এ-গ্রামে কাফিলার গতিরোধের কোন সম্ভাবনাই নাই।

লাও-এরের গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার এই তো সুযোগ। নীলা আর লাও-এর বিভিন্ন দলের লোকদের ভাল ক'রে দেখে দেখে বিচার করে কোন্ দলের সঙ্গে তারা ভিড়ে যেতে পারে। বৃদ্ধ পঙ্গু ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দলভর্তি জনস্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে লাভ নেই। প্রতিটি দল তারা বাছাই করে। তারপর একদিন এমনি ভাবে এল চল্লিশ জন যুবক-যুবতীর একটি দল। ছেলেদের মতনই মেয়ে-দেরও পা খোলা...দেখে মনে হয় কোনদিন তাদের পা বাধা পড়ে নি। নীলার চুলের মতই এদের চুল ছোট ক'রে কাটা, সঙ্গে তাদের ছোট ছোট বইয়ের পুঁটুলি। নীলার প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল:

'আমরা সব ছাত্র-ছাত্রী। আমরা চলেছি হাজার মাইল দূরে পাহাড়ের ওপারে...আমাদের শিক্ষকরা আছেন সেখানে...সেখানেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে গুহায় স্থাপিত হয়েছে নতুন স্কুল...'

এই ল..াইর মধ্যে নিজেকে বিনষ্ট করার কথা কেউই বলল না। লিংটান শুনে খুশিই হ'ল। চলতি পথে এক দুপুরে এরা তার বাড়িতে থেমে শুধু একটু চা চাইল সঙ্গের রুটি খাবে ব'লে। রাত্রিবাস তারা করতে চাইল না। রুটি খেতে খেতে লিংটান বলল :

'অশিক্ষিত লোকদের তো অত জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, তাদের দেহই সার। তাই তারাই হয় যুদ্ধের হাতিয়ার, তারাই চালায় লড়াই, হত্যাকাণ্ড। কিন্তু তোমরা— যারা মগজের মধ্যে কত কিছু জ্ঞান আহোরণ ক'রে রেখেছ, তোমাদের মাথা-গুলো তো নষ্ট হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধ-শেষে আমাদের আবার যখন সব কিছু ঠিকঠাক করবার সময় আসবে, তখন দেখবে তোমাদের ঐ জ্ঞান-বুদ্ধি কত কাজ দেয়। এখনকার এই দুর্দিনে বেঁচে থাকাই তো বিষম দায়, কার যে কখন কি হয় কিছুই তো বলা যায় না…যা দিন কাল পড়েছে, তাতে তোমাদের ঐ জ্ঞান-বুদ্ধি হয়তো কোন কাজেই লাগবে না। যদি বেঁচে বর্তে থাক তবে যুদ্ধের পরে অনেক কিছু করতে পারবে।'

এত লোকের স্থান তো বাড়ির উঠোনে হয় না, সুতরাং উইলো গাছের নিচে বসে লিংটান এদের নানা প্রশ্ন করে। ছেলেদের মত মেয়েরাও চটপট সব প্রশ্নের জবাব দেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কে যে জবাব দিল, ছেলে না মেয়ে, তা নিয়ে আর কোন খেয়ালই লিংটানের হয় না। তাদের কাছেই লিংটান ভালোভাবে শুনল শত্রুর আক্রমণে সমুদ্র উপকূলের গ্রাম, শহরগুলো কি ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, আর কেনই বা শত্রু এই শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বহুক্ষণ ধরে তারা নানা বিষয়ে কথা বলল।

হুঁকোয় টান দিতে দিতে জীবনের বহু অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ লিংটান বলে : 'জমি, বুঝলে, জমিই হচ্ছে মানুষের খিদের মূল। কারও জমি রয়েছে প্রচুর, অনেকের হয়তো অতি অল্প জমি আছে। এরই ফলে সুরু হয় মন কসাকসি, হাতা-হাতি, লড়াই। কারণ, জমি থেকে আসে দুনিয়ার যা কিছু সম্পদ—আমাদের খাদ্য, আমাদের গৃহ…জমি যদি না থাকে, মানুষের মন কুঁকড়ে যেতে বাধ্য।'

বৃদ্ধ কৃষকের কথা নবাগতরা শোনে বেশ সম্মানের সঙ্গেই, যেন ক্ষুণ্ণ না হয় কোনমতে বৃদ্ধ। কিন্তু ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোথায় তার এসব কথার? তবুও বিনয়ভাবটি বজায় রেখে কথার ইতি তাড়াতাড়ি টানবার জন্য বলে ওঠে : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছ চাচা।' বয়সের সম্মান জানানোর প্রাচীন রীতি ভেঙ্গে ফেলতে তাদের বাঁধে।

বৃদ্ধের কথা এরা বিশ্বাস করুক আর চাই নাই করুক, বৃদ্ধের তাতে কিছু যায় আসে না। লিংটান নিজের মত জানিয়েই খুশি। অপরাহ্নে সূর্য যখন ঢলে পড়ার মুখে, লাও-এর বাপের কাছে এসে জানাল যে তারা এই যুবক দলের সঙ্গেই যেতে চায়। এদের শক্ত সমর্থ শরীরের দিকে তাকিয়ে ক্ষণকালের জন্য লিংটান চিন্তা করে, তারপর সিদ্ধান্তে পৌছুবার আগে সে· স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বাড়ির ভিতরে যায়।

পুকুরের পাড়ে লিংসাও কাপড় কাচছিল। কোন সুদূর অচেনা দূর দেশে লাও-এর চলে যাবে একথা কোনমতেই সে মেনে নিতে পারছিল না। একখানা নীল কাপড় পিঁড়ির উপর ফেলে তার উপর একটা কাঠের টুকরো দিয়ে আস্তে আস্তে মারতে মারতে স্বামীর কথা শোনে লিংসাও। তারপর বলে :

'বৌ কেন যাবে বিদেশে বিভুঁয়ে ?...পোয়াতী বৌ, প্রসবের সময় কে দেখবে, শুনি ? ঝট্ ক'রে একটা কথা বললেই তো আর হয় না। আর, এ কোন্ দেশী কথা, নিজের বাড়ি ছেড়ে নাতি আমার জন্মাবে খরগোসের বাচ্চার মত মাঠে?...ছেলে যদি যেতে চায় তো যাক, বৌ যাবে না। নাতি জন্মাবে আমার ঘরে। ভীমরতি ধরেছে মিনসের ..আবোল তাবোল না বকে একটু ভেবে চিন্তে কথা ব'লো।'

চিন্তিত লিংটান গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বলে : 'তা তো বুঝি গো, তবে বুঝলে কিনা, এ দুর্দিনে অল্পবয়সের মেয়ে-ছেলে যত দূরে যায় ততই মঙ্গল। তারপর আমাদের নীলা হ'ল সুন্দরী। যে দুর্দিন সুরু হয়েছে চারদিকে—' আসবার আগে যুবক-দলের একজনের কাছে সে শুনেছে শত্রু সৈন্যদের হাতে যুবতী মেয়েদের নিগ্রহের কথা। সেকথা শোনার পর থেকে লিংটান মনে মনে চাইছে বাড়ির অল্পবয়সের মেয়েদের দূরে পাঠিয়ে দিতে। একমাত্র লিংটান থাকবে এখানে তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে যার উপর ঐ দানবরা দৃষ্টি দেবে না।

হাতের কাঠটি থামিয়ে লিংসাও স্বামীর দিকে ঘুরে তাকায় :

'তুমি কি বলছ ? দুর্দিনে শ্বশুর-স্বামীর ঘর নিরাপদ নয়, নিরাপদ হ'ল গিয়ে বিদেশ বিভুঁই ? আর আমার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে বৌ থাকবে ভাল ? ছেলে চলে গেলে দোর গলাটি পার হতে দেব না বাছাধনকে...ব্যাটাই তো বৌটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে, যা ইচ্ছে খুশি ক'রে যায়, কোন পরোয়া নেই। হুঁঃ, আমার কথা পর্যন্ত কানে তুলতে চায় না!...আজকাল আমি তো কিছু বলিই না। যে-ভাবে কথার পিঠে বৌদের রাখতে হয় তার সিকিটি পর্যন্ত কই না...

যাক্ না লাও-এর বিদেশে, ওই পরের বেটিকে দুদিনে ঠিক ক'রে দেব না! দরজাটি মাড়িয়ে দেখে যেন তখন একবার। কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমার—'

'কিন্তু অচেনা লোক যদি জোর ক'রে ঢোকে তোমার দরজা ভেঙ্গে,' ভাবনা-আকুল লিংটান প্রশ্ন করে।

'কী! অচেনা মিনসে ঢুকবে আমার বাড়ীর দোর পেরিয়ে?' কাপড়ের উপর কাঠ দিয়ে মারতে মারতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে: 'আসে যেন, তখন দেখবে কে আগে গিয়ে টুঁটি টিপে মারে, আমি, না, তোমার ঐ কুকুর!'

'থাকগে ওসব কথা...স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রীর যাওয়াই কর্তব্য। আর বৌ যদি না যায় তো ছেলের যত্নআত্তি করবে কে?' তর্কের ছলে লিংটান আবার বলে।

'বুঝলাম অন্য সময় হ'লে তা হতো। কিন্তু ওর পেটে এখন সন্তান...শ্বশুর-স্বামীর বংশের প্রতি কর্তব্য ওর এখন সব থেকে আগে।'

'আমি তা মনে করি না। লাও-এরের সঙ্গে নীলা যাক্—' তর্ক থামিয়ে লিংটান চলে আসে। বুড়োর তর্ক এড়িয়ে যাওয়া দেখে ক্রোধান্বিতা লিংসাও কাঠ দিয়ে কাপড়ের একস্থানে সমানে মেরে চলে। কাঠের বাড়িতে বাড়িতে নীল কাপড়টি ছিঁড়ে ফুটো হ'য়ে যায়। নিজের পোড়া মনের ওপর লিংসাও চেঁচিয়ে ওঠে।

ছেলেকে ডেকে লিংটান অনুমতি দেয় নীলাকে সঙ্গে নিয়ে যুবক-দলের সঙ্গে যেতে। যুবকদের কাছে সে শুনেছে সমুদ্রোপকূলের দুশো মাইল শত্রু কবলিত হ'য়ে গেছে, আর তাদের এ গাঁ পড়েছে তিন শো মাইলের মধ্যে। ছেলেকে বাপ উপদেশ দেয়: 'সন্তান হ'লে একটা খবর পাঠাবে। ছেলে হ'লে পাঠাবে লাল সুতো, আর মেয়ে হ'লে পাঠাবে নীল সুতো।' হঠাৎ লিংটানের মনে মনে ইচ্ছা হয় যদি তার ছেলে ঐ ছেলেদের মত লেখাপড়া জানতো তো চিঠি লিখেই ঐ সুসংবাদ পাঠাতে পারত। খুড়তুতো ভাইকে দিয়ে সে চিঠি পড়িয়ে নিত। কিন্তু কে জানতো যে ভবিষ্যতে পিতৃ-গৃহ ছেড়ে এভাবে ছেলেকে বেরিয়ে যেতে হবে কোন্ বিদেশ-বিভুঁয়ের পথে?

'সংবাদ তোমাকে বেশ ভাল ভাবেই পাঠাব বাবা। নীলা লিখতে জানে।' বেশ একটু গর্বের রেশ ফুটে ওঠে লাও-এরের উত্তরে।

আকাশ থেকে পড়ে লিংটান। 'তাই নাকি? কই, ঘটক ব্যাটা তো বিয়ের সময় তা' বলে নি?'

মিনমিন ক'রে লাওএর বলে: 'মেয়ের গুণের মধ্যে লেখাপড়া জানাটা তো ধরা হয় না।'

'দিনকালের এই পরিবর্তন না দেখলে আমিও কি আর কোনদিন একথা মানতাম ?' উঠানের কোণে ব'সে লিংটান হুঁকোতে গুড়ুক গুড়ুক টানতে টানতে অভিমত প্রকাশ করে। লাও-এর যায় নীলার কাছে যাওয়ার সংবাদ দিতে।

নীলা ইতিমধ্যে সেই যুবতীদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক ক'রে ফেলেছে যে এরাই হবে তাদের ঠিক সঙ্গী। ঘরে ফিরে এসে তাই তাড়াতাড়ি অতি প্রয়োজনীয় যা সঙ্গে না নিলে নয়, এমন কতগুলি জিনিসের দুটো ছোট্ট পুঁটুলি বেঁধে প্রস্তুত হ'য়ে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে ছিল। লাও-এরকে দেখে বড় বড় চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করে : 'আমাদের যাওয়া ঠিক তো ?'

'হ্যাঁ।' নীলার পাশে বসে আস্তে ক'রে তার হাতটি নীলার কাঁধের ওপর রেখে বলে : 'কিন্তু তোমার হাঁটতে যে বড় কষ্ট হবে। তোমার হ'য়ে পেটের বাচ্চাটাকে যদি আমি বয়ে নিতে পারতাম—'

'বইবেই তো, আর কিছুদিন পরেই !' আস্তে ব'লে নীলা উঠে দাঁড়ায়। লাও-এর দেখে নীলা এরই মধ্যে তৈরি হ'য়ে নিয়েছে। নিজের জন্য এক জোড়া জুতো, স্বামীর জন্য এক জোড়া ভারী স্যাণ্ডেল ঠিক ক'রে রেখেছে। কৃষাণ কন্যাদের শক্ত নীল কাপড়ের পোসাক সে পরে নিয়েছে।

'আমি তৈরি হ'য়ে নিয়েছি।' পুঁটুলি হাতে নিয়ে নীলা বলে। কিন্তু লাও-এবের যেন আর হয় না, অযথা দেরী করে সবকিছুতে।

'আমি ভাবতেই পারছি না যে আমাদের প্রথম সন্তান জন্মাবে আমাদের বাড়ির বাইরে, আমার জন্মস্থান থেকে দূরে—'

মৃদু হেসে নীলা বলে : 'নিজের জন্মস্থান নিজেই ঠিক ক'রে নেবে ছেলে আমার।'

'হ্যাঁ, তবে সেই জন্মস্থানটি আমাদের ঠিক মনে ক'রে রাখতে হবে। পাহাড় কিংবা সমভূমি, শহর কিংবা গ্রাম, জলের কিনারে, কি উপরে, উজ্জ্বল আকাশের নিচে কিনা, সে-দেশের লোকরা কেমন, তাদের ভাষা, ঠিক জন্মমুহূর্তটি —সব আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে, যাতে ছেলে বড় হ'য়ে জানতে চাইলে আমরা সব বলতে পারি।'

'হুঁ...চল, এবার বেরিয়ে পড়ি।' নীলা একটু ব্যস্ত হ'য়ে বলে।

কিন্তু তবুও লাও-এর দেরী করে।

অধৈর্য হ'য়ে নীলা তাড়া দিয়ে ওঠে : 'চল গো চল, তাড়াতাড়ি কর—'

লাও-এর বুঝতে পারে নিরাপদ স্থানে যাবার আকুলতার সন্তানবতী নীলা

ধৈর্যহারা হ'য়ে পড়েছে। নীলাকে সঙ্গে নিয়ে লাও-এর বেরিয়ে এসে বাপ দাদা ও বাড়ির অন্যান্যদের কাছে বিদায় গ্রহণ করে। মার খোঁজে তারা বাড়ির এদিক-ওদিক যায়, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা যায় না। বিদায়ের মুখে মার শুভাশীর্বাদ যে তারা পেতে চায় বড় বেশী ক'রে, কিন্তু মা-ও তো পারে না এ-বিদায় পর্ব দাঁড়িয়ে দেখতে। এদিকে যুবক-কাফিলা অন্যস্থানে রাত কাটাবে বলে তাগিদ দেয়। অগত্যা মার সঙ্গে দেখা না করেই বেরিয়ে পড়তে হয় লাও-এর ও নীলাকে। বারে বারে লাও-এর বলে : 'মাকে ব'লো যাবার আগে বারে বারে তাঁর খোঁজ করেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়া যে অশুভ লক্ষণ।'

'আমি বলব'খন—' লিংটান বলে ওঠে। তার পিতৃহৃদয়ে যে-সব কথা এসে জমা হচ্ছে, তার কোন প্রকাশই সে হ'তে দিতে পারে না। ঘর ছেড়ে ছেলে যাচ্ছে কোন্ সুদূর অজানা দেশে...আবার ফিরে আসবে কি ? হয়তো ফিরে আসবে, কিন্তু তারই মধ্যে যে কত কি ঘটে যাবে কে জানে ? পুত্র পুত্রবধূর পিছনে পিছনে বাড়ির সকলের সঙ্গে দোর গোড়ায় শেস-বিদায় জানাতে বৃদ্ধ এসে দাঁড়ায়। ব্যথার বেদনায় সমস্ত মন টন্ টন্ ক'রে ওঠে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ বেলার নীলাকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তারা চলতি কাফিলার দিকে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ দূরের ক্ষীয়মাণ শেস-রেখা চোখে ধরা যায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ...আকাশের কোলে পাহাড়ের গায়ে রূপামুখী বজ্রমেঘ জমে উঠেছে, গুড়্ গুড়্ ক'রে ডেকে বজ্রনিনাদে ফেটে পড়বে কিনা কে জানে...কাফিলা এগিয়ে যায়, দূরে বহুদূরে যায় মিশে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে লিংটান চারদিকে মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে একবার নেয় বুলিয়ে।

কই কোন পরিবর্তনের চিহ্নই তো চোখে পড়ে না। যুদ্ধ চলেছে...শত্রু-সৈন্য একশো মাইল দূরে...যুবকদের কথা কি সত্যি ? গর্ভবতী পুত্রবধূসহ লাও-এরকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হ'ল ? পিচ গাছে কোকিল ডেকে উঠল কু-উ—, পিচ্ ফলগুলো পেকে উঠেছে...বিদায়ী সূর্যের সোনালী আলোয় মাঠের ধান গাছগুলো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে...মেঘবরণ ধানগুলো ফিকে হ'তে সুরু করেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হ'তে সুরু করবে সোনালী আভায়। তারপরেই আসবে ধান কাটার পর্ব। কিন্তু লাও-এর তো থাকবে না এবার। অত চট্পটে, ধারালো বুদ্ধি, ফূর্তি-প্রাণ ছেলে তো চোখে

পড়ে না। লাও-তা'র মত যখন তখন ও হেসে ওঠে না।...আর ছোট ছেলেটা তো এখনও এসব কাজের অনুপযুক্ত। গোরু-মোষ চরানো ছাড়া আর কোন কাজই তো তাকে দিয়ে হয় না। নীলার কথা মনে পড়ে। বাড়ির মধ্যে সেই তো সত্যি সব থেকে গুণবতী, যাই বলুক না কেন লিংসাও। রীতি অনুযায়ী পুত্রবধূর সঙ্গে শ্বশুরের সোজাসুজি কথা বলা চলে না। আজ পর্যন্ত দু'বার মাত্র নীলার সঙ্গে সোজাসুজি সে কথা বলেছে। একবার বলেছিল নতুন বধূ হ'য়ে যেদিন নীলা এ-গৃহে প্রথম পদার্পণ করেছিল সেদিন, আর আজই বিদায় বেলায় আর একবার লক্ষ্মী-বধূকে আশীর্বাদ করেছে এই বলে : 'মা, কর্মে মতি রেখ। সতী-সাধ্বীর বিপদ কোনদিনই আসে না জেনো। আমার ছেলের উপর নজর রেখ, নাতি জন্মালে তাকে যত্ন-আত্তি ক'রো। জানো তো, সংসারে বৌরাই হল শিকড়, ছেলেরা গাছ। শিকড় শক্ত না হ'লে গাছ বাড়ে না। গাছের বৃদ্ধি শিকড়ের জোরে—সব সময়ে আমাদের এই প্রাচীন বাক্যটি মনে রেখ।' শ্বশুরের এ-কথা শুনে নীলার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা খেলেছিল। এ-কথা সে বিশ্বাস করেছিল কিনা, হাসির রেখা থেকে লিংটান বুঝতে পারে নি।

হেঁসেলে ধোঁয়া দেখে লিংটান ঘরে ঢুকে দেখে আনমনা লিংসাও একটি একটি ক'রে খড়-কুটো উনুনের গহ্বরে দিয়ে চলেছে।

'কোথায় ছিলে তুমি? যাবার বেলায় কত খোঁজাখুঁজি করল তোমাকে নীলা, লাও-এর।'

'ওদের ঘর-ছাড়াও কি আমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে?...ও আমি পারব না। ওরা যখন যাবেই তো যাক...'

'কিন্তু তুমি কাঁদছিলে?' লিংসাও-র অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে লিংটান প্রশ্ন করে।

'না, না, কাঁদব কেন? ধোঁয়ায় লাল হ'য়ে উঠেছে।'

লিংসাওর চোখ আবার ভরে ওঠে। নিশ্চল পাথরের মত লিংটান দাঁড়িয়ে থাকে...সান্ত্বনার কোন বাণীই সে পায় না খুঁজে। স্ত্রীর চোখে তো সহজে জল আসে না, কিন্তু যখন আসে কেমন বিহ্বল হ'য়ে পড়ে লিংটান, সমবেদনার ভাষা কোথায় যায় হারিয়ে।

শুধু দু'জনের বিদায়ে সমস্ত বাড়ি যেন শূন্য মনে হয়। শিশুদের সেই ছুটোপাটি, হাঁস-পায়রা নিয়ে সেই দৌড়দৌড়ি, যতক্ষণ পর্যন্ত বিরক্ত না হ'য়ে

ঘেউ ঘেউ ক'রে ওঠে, ততক্ষণ কুকুরের লেজ ধরে টানাটানি, সবই তো আছে আগের মতন। লাও-এরের ঘরে শোয় ছেলে মেয়ে নিয়ে মেয়ে-জামাই ; ছোট ছেলেকে উঠানে বাঁশের মাচায় শুতে দিয়ে তার বিছানায় ব্যবস্থা হয়েছে উলীনের বিপুলাদেহা মায়ের। তবুও সকলেরই সর্বসময়ে মনে হয় কি যেন নেই গৃহে। ভাই চলে যাওয়ায় লাও-তা কেমন ম্রিয়মাণ হ'য়ে গেছে। বাপের কথানুযায়ী সব কিছুই সে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন ক'রে যায় বটে কিন্তু নিজের সত্তা দিয়ে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে কিছু ক'রে উঠতে পারে না। সে যেন শুধু ছায়া মাত্র। কিছু না বললে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে লাও-তা কিছু করবে না। লিংটান বোঝে, সমস্ত দায়িত্ব এখন তার একলার ঘাড়ে। তার মনে হয়, অল্প বয়স হলেও লাও-এর তার ধাতে গড়া। পুত্রবধূটিও তাই, লিংসাওর মতন সব কিছু ঠিক ঠিক বুঝে কাজ করার মত ধারাল বুদ্ধি রাখে।

লিংসাও-ও পুত্রবধুর অভাব বোধ করে প্রতিমুহূর্তে, কিন্তু মুখ ফুটে চট্ ক'রে বলতে পারে না, কারণ, এরই নিন্দা সেদিনও সে করেছে। অবশেষে শোবার আগে কেশ বিন্যাস করতে করতে স্বামীকে একদিন বলল :

'আর পেরে উঠছি না বাপু ? কোন কাজটা কখন করতে হবে সেকথা না বল্লে বড় বৌ নিজের মাথা খাটিয়ে যে কাজগুলো করবে, তা হবে না। ওকে বলা যেন নিত্যকার কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমার। আর বড় মেয়েটাও ঐ এক পদের। ঘুরে ঘুরে এসে কেবল জিজ্ঞেস করবে, এর পর কোন্ কাজটা করতে হবে মা ? বলছি, উঠোনে গোবর জলের ছিঁটে দিয়ে, চালটা ঝেড়ে তুলে, রান্নার কাঠ-খড়টা ঠিক ক'রে রাখ। তারপর কাপড় জামাগুলো ধুয়ে ফেল, কি শুট্‌কি মাছগুলো রোদে দে, না হয়, শীতের দিনের জন্য গাজরগুলোয় নুন মাখিয়ে ঠিক ক'রে রাখ। তা নয়, এক একটা কাজ করবে আর দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করবে,—এরপর কোন্ কাজটা করব মা ! তোর নিজের সংসার চালাস কী ক'রে !...নীলা গেছে যাক্, ওই পরের বেটীর কথা আর মুখেও আনব না। কিন্তু পোড়া মনে যে বারে বারে ছেলের চিন্তা এসে যায়।'

লিংটান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে :

'ও যে তোমার মেয়ে, তুমিই তো তাকে শিখিয়েছ সব কিছু জিজ্ঞেস ক'রে করতে। তোমার কাছে থাকলে তোমার চোখ দিয়ে ও দেখে কিনা...। আর নীলা, সে-তো তোমার চোখে চোখে বড় হয়নি। ও নিজে নিজেই দেখে শুনে বড় হয়েছে, তাই তোমার মত বুঝে-সুঝে সবদিকে তাল রেখে কাজ করতে পারে।'

'সে-দোষ কি আমার?' চুলেব মধ্যে চিরুনি থামিয়ে দিয়ে ফেটে পড়তে চায় লিংসাও। বিবাহের বন্ধনে সখ্যতার নিবিড়তায় এরা দুটি প্রাণী বেড়ে উঠে নবজীবনের কত মহীরুহ বপন ক'রে বয়সের এই প্রান্ত সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনাই দু'জনের কাছে কত গভীর। তাই পারে না লিংসাও সহ্য করতে স্বামীর কোন রকম ভুল ধরিয়ে দেওয়া। সময় সময় স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগত —বলুক গে মিনসে যা ইচ্ছে,—কিন্তু কেন যেন পারত না। ওঁর দু'একটা কথা সমস্ত দিন লিংসাওর বুকে ধারাল ছুরির মত বিঁধে থেকে দিনের পর দিন তাকে পাগল ক'রে দেয়। লিংটানও বুঝতো কত গভীরভাবে তাকে ভালবাসে লিংসাও। সর্বসময়ে সে যেন চাইত লিংটানের ইচ্ছার রূপ দিতে। কিন্তু এ-কথার প্রকাশ সে সহ্য করতনা; সোজা মুখের ওপর বলত, কোনো পুরুষের মন রাখারাখির মধ্যে সে নেই। অভিমানী স্ত্রীকে সমীহ ক'রে ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে যাতে অভিমানের ঝড় না ওঠে তার দিকে সর্বসময়ে সজাগ থাকত লিংটান।

চট্ ক'রে লিংটান বলে: 'তোমার মত মা কোথায় কে খুঁজে পায় বলো তো? সাত সমুদ্রের ওপারে গেলেও কোন ছেলে পাবে না। তোমার ঐ রাগ দেখতে আমার ভাল লাগে :বলেই না তোমায় ক্ষেপাই!' ব'লে হেসে ওঠে।

গোপন আনন্দে লিংসাও পুলকিত হ'য়ে ওঠে। মাথায় চিরুনি টানতে টানতে ঠোঁটের মৃদু হাসির রেখার ভিতর দিয়ে নিজের মনের আনন্দ চাপা দিতে চায়। আবেগ চাপা দেবার জন্য বলে ওঠে: 'আমার বুড়ো শালিক...এস, এদিকে এস দেখি, তোমার গালের ওখানে আবার ফুলে উঠেছে কেন, ফোড়া-টোড়া উঠল নাকি?'

লিংটান বোঝে লিংসাওর এই আবেদনের অর্থ। এগিয়ে এসে স্ত্রীর সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে: 'ও কিছু না, মশা কামড়িয়েছে বোধহয়।' কিন্তু মনে মনে বোঝে যে স্ত্রী চায় তার স্পর্শ।

'থাক, চুপ্ করো তো, নিজের চোখেই আমি দেখছি—' প্রীতির দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পুলকিত লিংসাও স্বামীর কাঁধে মৃদু করাঘাত ক'রে বলে: 'মশা যখন বসে তখন কি ছাই বুঝতেও পার না? বাচ্চাদের মত কেবল কামড় খাও।'

দু'জনেই হেসে ওঠে।

লিংটান হঠাৎ ভাবে : যদি আমার আগে ও' মারা যায় আমি বাচব কি ক'রে ?...আর তারপর কি অন্য কাউকে ওঁর স্থানে আনা যায় ? স্ত্রী মারা গেলে ওর নিজের অবস্থা হবে শুকনো গাজরের মত। লিংসাওকে রাগাবার জন্য বলে :

'নীলাকে কেন তুমি সইতে পার না, জান ?'

চোখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে লিংসাও জবাব দেয় : 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি জানি, আমার কাছে আর মোড়লি করতে হবে না—'

'উহুঁ, তুমি জান না। নীলা হ'ল অনেকটা তোমার মত কিনা, সেই জন্যই তুমি ওকে সইতে পার না।'

'নীলা—!' মৃদু চেঁচিয়ে উঠে রাগ দেখাবার চেষ্টা করে লিংসাও। কিন্তু স্বামীর এই মন্তব্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গোপনে খুশিই হয়। নীলার মত সুন্দরী পুত্রবধূই বা গাঁয়ের কোন্ ঘরে আছে, আর অমন বুদ্ধিমতীই বা কোথায় ?

'তোমরা দু'জনাই বেশ নরম-গরম মেয়ে। এদেরই আমার ভাল লাগে।' লিংটান নিজের হাতটা স্ত্রীর ঘাড়ে রাখে। যুবা বয়সের শিহরণ জাগে ক্ষণেকের জন্য। চল্লিশোত্তীর্ণা নারীর এ-স্পন্দন তো শোভনীয় নয়। অতি ধীরে নিজের মাথাটি তাই লিংসাও সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। লিংটান হেসে ওঠে। উর্ধ্বে তাকিয়ে যখন চোখে পড়ে স্বামীর পীতাভ মুখ, তার স্মিত হাসির ভিতর দিয়ে সুন্দর শুভ্র দন্তপাটি, ক্ষণেকের জন্য ভুলে যায় লিংসাও বয়সের কথা, এতগুলি সন্তানের মাতৃত্বের কথা...দু'হাতে স্বামীর কোমড় জড়িয়ে ধরে টেনে নেয় নিজের দিকে, নিজের গালটি চেপে ধরে দয়িতের প্রসস্ত বক্ষে। স্বামীর বুকের প্রতিটি স্পন্দন কানে এসে লাগে, আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে যেন তার নিজের দেহের রক্ত প্রিয়দেহের প্রতিটি স্পন্দন আঁকড়ে ধরতে।

'নীলা আর লাও-এরকে কি আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না ? ওরা যে ঠিক আমাদেরই মত।' লিংটান বলে।

'লাও-এর হয়েছে ঠিক তোমার মতই।' আস্তে আস্তে উত্তর দিয়ে বন্ধন ঢিলে ক'রে দিয়ে কবরী বাঁধতে নিজের মন বাঁধে লিংসাও। সাময়িক উত্তেজনার মধুর পরশ দু'হাতে দেয় সরিয়ে। এই-ই ভাল।

পুত্র-পুত্রবধূর চলে যাওয়া সহনীয় হয়ে এল ধীরে ধীরে। ছোট ছেলেকে হালের কাজে এনে লিংটান মোষ চরাবার কাজে নিয়োগ করল গাঁয়ের একটি

ছোট ছেলেকে দিন এক আনা মাইনেয়। হালে যেদিন মোষ জুঁততে হতো না, সেইদিনই লাও-সান যেতো মোষ চরাতে।

নীলা চলে যাওয়ায় অকিডের কোনো মন-বেদনা হয় নি। বরং খুশি হয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আজ আর নেই। কিন্তু প্যানসিয়াও সত্যিই দুঃখিত নীলার বিদায়ে। শান্ত চাপা মেয়েটিকে গত কয়েক সপ্তাহ হ'লো নীলা লেখা-পড়া শেখাতে সুরু করেছিল। বাড়ির অনেকের কাছে মনে হতো খেলা, কিন্তু নীলা বুঝতো কি ভাবে মেয়েটি গ্রহণ করেছিল এই শিক্ষা। নীরব মেয়েটির দিকে কেউ নজর দিয়ে তো কোন দিন দেখে না। অবস্থাপন্ন বাপের ঘরে নীলাও তো এই ভাবে তার বাবার পত্নী-উপপত্নীর সতরটি সন্তানের হাটের মাঝে লালিত পালিত হয়েছিল। তবু তো উপপত্নী-বিহীন এ-বাড়িতে সকলেই দিলখোলা হাসি-কথার স্রোতে নিজেদের দেয় ভাসিয়ে। ছোট দেবরটি শুধু থাকে বাইরে বাইরে মোষ নিয়ে, আর এই মেয়েটি নীরবে তার দিনের প্রতিটি ক্ষণ যেন গুনে গুনে ব্যয় করে। নীলা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল: 'এই মেয়ে, লেখাপড়া শিখবি? লেখাপড়া জানলে বেশ মজা ক'রে কত কিছু পড়ে জানতে পারবি!'

'ও আমি পারব না, ঐ অত অক্ষর কি ক'রে মনে রাখব? মা যে কাজ করতে বলে তাই তো ভুলে যাই।' শান্ত কণ্ঠে প্যানসিয়াও জবাব দিয়েছিল।

প্যানসিয়াওকে বুঝিয়ে নীলা বলেছিল: 'ও ঠিক হ'য়ে যাবে, ঠিক পারবি। লেখাপড়া শিখলে দেখবি নতুন দুনিয়ার দোর খুলে গেছে তোর চোখের 'পরে।'

খুব তাড়াতাড়ি প্যানসিয়াও শিখে ফেলেছিল। একবার যেকথা নীলা তাকে বলে দিত, প্যানসিয়াও তাই মনে গেঁথে রাখত। ভুল করত না একবারও। তার পরেই নীলা গেল চলে কোন্ সুদূর দেশে।

প্যানসিয়াও শুধু পরিচিত অক্ষরগুলোর সঙ্গে বারে বারে নিজেকে আরও পরিচিত করে। জ্ঞানের খিদের তাগিদে সে গাঁয়ের এক চেনা ছাত্রীর কাছে সাহায্য চাইল। তার সাহায্যে সে আরও কিছু এগোল। তারপর আর একটি ছাত্রী তাকে আর একখানি বই দিয়ে বলল: 'নাও, এবার এই বইটি পড়তে আরম্ভ কর। দেখ, হারায় না যেন। এখন কিন্তু বই পাওয়া বড় মুস্কিল।'

অতি কষ্টে প্যানসিয়াও এগোয়, কিন্তু সব কিছু চট ক'রে রপ্ত করতে পারে

না। বুঝুক আর নাই বুঝুক, বইখানা শেষ করতেই হবে ঠিক ক'রে সে লেগে থাকে তার সাধনায়। পোড়া কাঠের কয়লা নিয়ে দিনের পর দিন অক্ষরের আঁক এঁকে এঁকে সে নিজেকে শিক্ষিত করার সাধনায় মগ্ন থাকে। কিন্তু সাজানো অক্ষরগুলো এখন যেন তার কাছে নিশ্চুপ, এখনও তারা খুলে মেলে ধরে না তাদের মনের কথা।

শত্রু বিমানের অবিচ্ছেদ দৈনন্দিন ধ্বংসলীলা ধীরে ধীরে সহনীয় হ'য়ে আসে লিংটানদের কাছে। বিধ্বস্ত নগরীর অর্ধেক লোক গেছে চলে, তারপর আরেক ঘায়ে পালালো আরও এক-তৃতীয়াংশ। বাকী যারা রইল প'ড়ে তাদের চলে যাবার সমর্থ-সামর্থ দুইয়েরই অভাব, কিম্বা রাজা-রাজরার যুদ্ধে কে শাসক হ'ল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। তারা শুধু দিন গোনে কবে শান্তির আগমনে তারা সুস্থ ভাবে দিন যাপন করতে পারবে, বোমারু বিমানের ধ্বংস-উৎপাত থেকে তারা বাঁচতে পারবে। মাইলের পর মাইল দেশের মাটি শত্রু-সঙ্গীনের মুখে পড়ে, আর এই সব শান্তিপ্রিয় নির্জীবের দল শুধু ক্ষণ গোনে : এই বারই বুঝি শেষ হ'ল ধ্বংস আর উৎপাতের। ধীরে ধীরে শত্রু-সৈন্যের আবেষ্টনে শহর পড়তে থাকে। শত্রু-কবলিত অন্যান্য শহরের কি হাল হয়েছে তার ইতিবৃত্ত এই শহরের কেউ জানতে পারে না। ঐসব শহর ছেড়ে যারা এই পথে পালিয়ে যায় তারা তো যায় শত্রু-সৈন্য প্রবেশের আগেই, পরের ঘটনা তারা বলতে পারে না। শহর শত্রু-কবলিত হ'লে, আশে পাশের গ্রাম তাদের হাতে গেলে, শুধু বিরাজ করে সাময়িক নীরবতা। শত্রুর রূপ—তারা নিষ্ঠুর কিম্বা সুশাসক, এরা কেউই জানতে পারে না। আগামী দিনের পথ চেয়ে চিন্তিতমনে তারা শুধু দিন গোনে।

লিংটানও দিন গোনে। কিন্তু কাজ ফেলে রাখলে তো চলে না। শত্রু-বিমান মাথার উপর দেখা দিলে কাজ ফেলে বাঁশ-ঝোপে পালাতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু খালি মাঠে একলা দাঁড়িয়ে থেকে মিছিমিছি মাথাটা মরণের মুখেও তো বাড়িয়ে দেওয়া যায় না। একদিন ছোট ছেলে মেয়েদের যখন বিছানায় জোর ক'রে শুইয়ে-দেওয়া হয়েছে, তাদের চিৎকার আর বৌ-ঝিদের কল-কাকলীর হাত থেকে অন্তত কিছুক্ষণের মত শান্তিতে থাকবার জন্য গাঁয়ের চা-খানায় গিয়ে হাজির হ'ল লিংটান। গ্রামের বয়স্করা সব জমা হয়েছে সেখানে। কিছুক্ষণ এ-কথা ও-কথা বলার পর লিংটান তাদের বলল :

'বুঝলে ভাই, খেটে-খাওয়া মানুষ আমরা...মাটির বুকে শস্য ফলিয়ে ঘরে তোলাই আমাদের কাজ...যুদ্ধ হোক আর নাই হোক, দিনের পর দিন এইভাবে কাজের সময় যদি বাঁশের বনে পালিয়ে থাকতে হয় তো কি ক'রে চলে বল তো ?'

ভিড়ের মধ্যে কে একজন মন্তব্য করে : 'আমাদের থেকে তোমরা এই চুপ ক'রে বসে থাকাকে বেশী ঘৃণা কর না—'

'হ্যাঁ, আমাদের করবারই বা কি আছে, বলতে পার ? শত্রু-বিমানের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে একজনকে ঐ বিমানের গুলির ঘায়ে মরতে তো দেখেছি। আর মরে গেলে তো মানুষ চিরকালের জন্য চুপ হ'য়ে যায় ! সকল আলসেমির বাড়া হ'ল তো এই মৃত্যু-আলসেমি !'

চারদিকে চাপা হাসির ঢেউ খেলে যায়। লিংটানও মৃদু হেসে বলে : 'আমার মনে হয় আমাদের এ-ভাবে বাঁশ-ঝোপে পালিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। বরং মাথার ওপরে হাওয়াই জাহাজ উড়ে এলে যে-যার কাজে লেগে থাকব, সমান ভাবে কাজ ক'রে যাব যেন ওসবে আমাদের চিন্তা ভয়ের কিছুই নেই। সকলকেই এভাবে দেখলে হাওয়াই জাহাজের লোকেরাও এক এক ক'রে প্রতিটি লোককে গুলি ক'রে হত্যা করা খুব একটা কাজের কথা মনে করবে না। তারা মাথার ওপর দিয়ে সোজা উড়ে চলে যাবে।'

লিংটানের কথায় সম্মতির গুঞ্জন ওঠে। তারপর থেকে হাওয়াই জাহাজ মাথার ওপর উড়ে এলেও তারা মাঠে কাজ ক'রে গেল, ওপরের দিকে একবারও কেউই তাকিয়ে দেখল না। মাথার টোকার উপর ঘন সবুজ ডাল পাতা বেঁধে নিত যাতে ওপরের উড়োজাহাজ থেকে তাদের নীল পা-জামার রংটাও চাপা পড়ত, পিঠের পীতাভ রংও দেখা যেত না।

ধাবমান জন-তরঙ্গের মাঝে লিংগ্রাম ছোট দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে থাকে। নতুন জলরাশির মত নিত্য নতুন জনস্রোত আছড়ে পড়ে তাদের গাঁয়ের উপ-কূলে, তারপর আবার পশ্চিমের স্রোতে মিশে গিয়ে চলে যেতে থাকে দিগন্তের পানে। • তাদের কাছেই লিংটান শোনে শত্রুর করালগ্রাসে কি ভাবে গিয়ে পড়ছে দিনের পর দিন দেশের একটির পর একটি গ্রাম। ক্রমশই পরিচিত গ্রামের নাম কানে আসে, তারপর নিকটের গ্রাম, নিকটতর গাঁয়ের উপর দিয়ে শত্রু-সৈন্যের সঙ্গীন ঝলমলানীর কথা শোনে। চেনা শহরের নামগুলোও শোনে, আর বোঝে একটু একটু ক'রে দেশের কতখানি স্থান বিজয়ী শত্রুর কুক্ষিগত হ'ল।

কাফিলার এক একজনকে ধ'রে সে বারে বারে প্রশ্ন করে :

'আচ্ছা আমাদের সৈন্যরা কি কিছুই করতে পারছে না ?'

প্রশ্ন শুনে কেউ কেউ ফ্যালফ্যাল ক'রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে : 'সুযোগ-সুবিধে বুঝে বেশ বড় ঘা দেবার জন্য বোধহয় এখন তারা কেবল পেছনে সরে যাচ্ছে।'

মনশ্চক্ষে লিংটান যেন দেখে সেই বিরাট প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে...তার গাঁয়ের অনেক পিছনে, ঐ সুদূর পাহাড়ের ওদিকে, চোখের দৃষ্টি যেখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়...চক্রবালের ধারে ধারে...। এ গাঁয়ের বুকের উপর দিয়ে শত্রু-সৈন্যের ভারী জুতো থপ্ থপ্ ক'রে যাবে, তাদের অস্ত্রের ঝলমলানী চোখের ওপর নেচে উঠবে...শত্রুদের শাসনে তাকে বাস করতে হবে।

শত্রুরা ভাল না মন্দ, কোন কিছুই বোঝা যায় না সঠিক ভাবে। কতরকম গল্প কাহিনী শোনা যায় তাদের বিষয়ে। জামাই উলীন তাদের চিত্রিত করেছে নম্র বিনয়ী ব'লে...ব্যবসার খাতিরে এদেরই কারও কারও সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল শত্রু-আক্রমণের আগে। আবার এ ঘটনাও কানে আসে...রেলগাড়ী ভর্তি ভীত পলায়মান জনতা শ্বেত পতাকা উড়িয়ে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চেয়ে যখন প্রার্থনা জানিয়েছিল, তারই জবাবে আকাশচারী বিমান থেকে শত্রুরা তাদের উপর মৃত্যু বর্ষণ করেছিল। কত লোক, শিশু, নারী শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, আহতদের হাহাকারে দিগন্ত মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল...। নবাগত শাসকদের কোন্ পরিচয় তবে ঠিক ? অসহায় লোকদের উপর যারা এইভাবে ধ্বংস বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে, তাদের মধ্যে ভাল কিছুর সন্ধান কি করা যায় ?

ঘন সবুজ গাছের ডাল মাথার টোকায় বেঁধে মাঠে কাজ করতে করতে লিংটান ভাবে এই সব কথা। মাথার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে শত্রু-বিমান যায় উড়ে। লিংটান ভাবে, কোনমতে দিন কাটিয়ে যাও, পরিবারের ভরণ পোষণ কোনমতে চালিয়ে যাও। সুখ শান্তি, নির্বিঘ্নে দিন যাপন আর বোধহয় হবে না শিগ্‌গির...।

এই ভাবেই গ্রীষ্মকাল গেল কেটে...এল শরৎ...

সুদূর প্রসারী মাঠভরা সোনালী ধানের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের সকলের মন-প্রাণ খুশিতে ওঠে ভরে...গত দশ বছরেও এত ফসল যে হয়নি! ফসল কাটার পরমানন্দে গভীর দুশ্চিন্তার শ্রান্তি-ক্লান্তি তারা যেন চায় ভুলে থাকতে। প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে শ্রান্তির অবসাদ তারা দুহাতে দেয় সরিয়ে।

এমন দিনে শহরের শেষ রক্ষী-বাহিনী লিং গ্রামে প্রবেশ ক'রে কৃষাণদের হুকুম করে তাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে, এবং মাঠের মধ্যে ট্রেঞ্চ খুঁদতে। কৃষাণদের মুখ কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। সৈন্যদের মুখের উপরে সোজা জবাব দেয়: 'যাও, যাও, নিজের কাজ নিজেরা করোগে। কোন কিছু করার মুরোদ নেই, থাকো তো পরগাছার মত আমাদের উপর, এখন এসেছ হুকুম চালাতে...আমাদের নিজেদের কাজকর্মই শেষ ক'রে উঠতে পারছি না, এখন যাও ওদের কাজে বেগার খাটতে...! ও-সব সৈন্য-টৈন্য আমরা জানি না...তোমাদের জ্বালাতনে এমনিতেই তো অস্থির...'

এ জবাব শুনে লিংটান মনে মনে খুশিই হয়। কিন্তু মনের কোণে কেমন যেন একটা খোঁচা অনুভব করে।...শস্য কাটা এগিয়ে চলে, রক্ষী-বাহিনী গ্রাম ত্যাগ ক'রে পেছিয়ে যায়।

লিংটান তার বাড়ির সকলকে ফসল কাটার কাজে লাগিয়ে দেয়। এক উলীন থাকে একলা চুপচাপ ব'সে...জীবনে কোনদিনও তো সে কাস্তে ধরেনি। বড় মেয়ে কিশোরী-বয়সের ধান কাটার স্মৃতি মনে ক'রে পুলকিত হ'য়ে ওঠে... শাঁস-সমৃদ্ধ নুইয়ে-পড়া ধানের শিষের পেলব স্পর্শ যেন সে অনুভব করে, ঘ্রাণে-গন্ধে তার বুক ওঠে ভরে।

দু'একদিন এইভাবে কাজ এগোবার পর গৃহের কোণে বর্ষণ-মেঘ জমে ওঠে। ফসল-কাটা শেষ ক'রে একদিন বড় মেয়ে যখন ঘরে ফিরছে, উলীন তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে মৃদু কণ্ঠে ফেটে পড়ে: 'তুমি আমার স্ত্রী, না, ঐ বুড়ো চাষার মেয়ে, শুনি? তোমার কাজকর্মগুলোও আমার করতে হবে নাকি? এরপর হয় তো বলবে বাচ্চাগুলোকে বুকের মাই দেওয়াও আমার কাজ—'

স্বামীর বিপুল দেহের থলথলে বুকের উপর নজর পড়ায় স্ত্রী হো হো ক'রে হেসে ওঠে। এমনিতেই গ্রীষ্মের গরমেও উলীন সহজে খোলা গায়ে কখনও বেরুত না। ঠাট্টা-বিদ্রূপ মেশানো গল্প সেও তো শুনেছে যে এমন মোটা পুরুষও দেখা যায় যে স্ত্রীর অনুপস্থিতে ক্রন্দনরত সন্তানের মুখে তার থল থলে বুক ঠেকিয়ে চুপ করিয়েছে। কর্মহীন উলীনের খিট্‌খিটে মেজাজ স্ত্রীর এ-হাসি সহ্য করতে পারল না। হঠাৎ ঝাঁ ক'রে স্ত্রীর মুখের উপর এক চপেটাঘাত দিল বসিয়ে, দাঁতের খোঁচায় নিচের ঠোঁট কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল, স্ত্রীর দাঁত বিঁধে তার নিজের হাতটাও গেল কেটে।

'কী, আমার হাত কামড়ে দিলে!' ঠাণ্ডা মেজাজের উলীন রাগে ফেটে

পড়ল। স্বামীর এ-রুদ্রমূর্তি আগে কোনদিন স্ত্রী দেখেনি। বাপের ঘরে বসে বেকার স্বামীর এ-দাপটও সে পারে না সইতে। ততোধিক জোরে সে-ও চেঁচিয়ে ওঠে।

'আমার বাপের ঘরে বসে বসে তো খাচ্ছ...তা, প্রয়োজনের সময়ে ভাত জোগাড়ের কাজে কেন খাটব না, শুনি?' তারপর হঠাৎ রাগে স্বামীর উপর ঝাপিয়ে প'ড়ে দাঁত-নখ দিয়ে কামড়ে-খিমচে স্বামীর মুখে দেহে রক্ত বইয়ে দেয়। এমন সময় দোর-ভেজানো ঘরে মেয়ে-জামাইর ঝগড়া শুনে লিংসাও আস্তে দরজা খুলে তাদের মাঝে প'ড়ে আলাদা ক'রে দেয়। মেয়েকে জোর ক'রে ঘর থেকে দেয় বের ক'রে।

'লজ্জা, লজ্জা! আমার মেয়ে হ'য়ে তুই স্বামীকে যাস্ মারতে! ছি, ছি! ...উলীন, বাবা, তুমি যদি রাগ ক'রে এ-মাগীকে তাড়িয়েও দাও তো আমার বলবার কিছুই নেই। সত্যিই বাপু, অত মেজাজ নিয়ে স্বামীর ঘর করা চলে না...'

মেয়ের উপর রাগ করতে করতে লিংসাও জামাইকে সান্ত্বনা দেয়। হঠাৎ এভাবে মেজাজ হারিয়ে ফেলাতে নিজেও খুব লজ্জিত হ'য়ে পড়ে উলীন। তাড়াতাড়ি তার হাতে একখানা হাত-পাখা দিয়ে লিংসাও যায় এক কাপ গরম চা এনে দিতে। যেতে যেতে প্যানাসিয়াওকে ডেকে বলে ছোট ছেলে মেয়েদের সামলাতে, যেন জামাইকে তারা বিরক্ত না করে। চা দিয়ে পিছনের ঘরে গিয়ে দেখে মেয়ে হাত মুখ ধুয়ে চুল বাঁধছে। প্রশ্ন ক'রে ক'রে তার কাছ থেকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনে লিংসাওর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। নিভৃতে মেয়েকে বলে :

'বুঝলাম তো সব...তবু ভুলবি না শ্বশুরের ঘরে বসে খেতে জামাইর এভাবে ভাল লাগে না...সরম লাগে সবসময়ে। ঠাণ্ডা মেজাজের জামাই হঠাৎ এভাবে রেগে যায় কেন? বুঝিস্ না? শহুরে লোক, গাঁয়ে এসে ওর অবস্থা হয়েছে ঠিক ডোবার জলে বিড়ালের মত। তাই বলে তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুদিনের সময় মাথায় ক'রে রেখেছে তোকে। আজ হঠাৎ দুর্দিনে পড়েছে বলে তুই তাকে এ-ভাবে খোঁটা দিয়ে কথা কইবি! মেয়েদের অত মেজাজ ভাল নয়...যে অবস্থাই আসুক না কেন, স্ত্রীর নজর সব সময় থাকবে স্বামীর ওপর... ওর এ-অবস্থা থাকবে না, আবার সুদিন এল ব'লে। মনে ব্যথা দিয়ে কোনদিন স্বামীর সঙ্গে কথা কইবি না ..। যা, উলীনের কাছে গিয়ে বোস, ক্ষমা চাইবি গিয়ে।'

মেয়েকে বুঝিয়ে জামাইর কাছে পাঠিয়ে দেয় লিংসাও।

লজ্জিত বিষাদগ্রস্ত উলীন গম্ভীর কণ্ঠে স্ত্রীকে ক্ষমা করে, মনের কোণে ক্ষোভের কালো মেঘ জমে থাকতে দেয় না।

রাত্রে শয়নকক্ষে লিংসাও স্বামীকে মেয়ে-জামাইর ঝগড়া-বিবাদের কথা বিশদ ভাবে বলে। তাদের গ্রাম্য মেয়ের হাতে শহুরে জামাইর দুরবস্থার কথা শুনে বৃদ্ধ বৃদ্ধা মন খুলে চাপা হাসি হাসে। জামাইর ফোলা দু'গালে মেয়ের নখের আঁচড়ের লাল দাগ কেটে বসেছে। এই দুর্দিনে যখন চারদিকে বিষাদের ছায়া, তার মধ্যেও সাময়িক হাসির খোরাক জুটিয়েছে সে। তাই ব'লে উলীনকে সংগোপনেও তারা একটুকুও ঘৃণা করে না…। তবুও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন দ্বন্দ্বই আসতে দেওয়া উচিত নয়। তাই পরের দিন ক্ষেতে যাবার সময় লিংটান বড় মেয়েকে মাঠে যেতে নিষেধ ক'রে বলল ঘরের কাজ দেখতে…। মেয়ের কাছে এইভাবে তুলে ধরল উলীনের কথার দাম। লিংসাও-ও কিছু মাখন এনে জামাইকে দিল গালে লাগাতে। সাতদিন গালে মাখন মাখাতে আস্তে আস্তে সেই আঁচড়ের দাগ গেল বিলীন হ'য়ে, আর উলীনও এ কয়টি দিন ঘরে বসে দিল কাটিয়ে।

ধান কাটার শেষে এবার সুরু হল মাড়াই আর ঝাড়াইর কাজ। বিছিয়ে দেওয়া ধানের শিষের উপর দিয়ে মুখ-বাঁধা গরু ষাঁড়গুলোকে হাঁটিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাড়াই পর্ব চলতে থাকে প্রতিটি কৃষাণের বাড়ির উঠোনে। যার গরু মোষ নেই, সে নিজেই ধানের গোছার উপর কাঠ দিয়ে বারে বারে মারতে থাকে। গোবর নিকনো শুকনো তনতনে উঠোনে ধানগুলো খসে খসে পড়ে…শারদীয়া সন্ধ্যায় বাড়ির মেয়েরা ঝেড়েঝেড়ে তোলে সেই লক্ষ্মী-শ্রী ধানের স্তূপ তাদের গোলায়। তারপর সেই ধান থেকে তারা শুক্তি-শুভ্র চাল নেয় বের ক'রে। …আর প্রতিদিন পূবের ছোট্ট পাহাড় ডিঙ্গিয়ে শত্রু-বিমান উড়ে আসে শহরের ধ্বংস-বৃষ্টি নামিয়ে দিতে…শুধু পারে না সেইদিন যেদিন আকাশ অঝোরে কাঁদে নিচের শহুরে লোকদের ব্যাকুল প্রার্থনায়।

পর্যপ্ত ধানের সবটা গোলায় তুলে রাখা যায় না। প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিক্রির ব্যবস্থা করতে শহরে যেতে হয় লিংটানকে। তাছাড়া ধ্বংস পর্ব চলা সত্ত্বেও শহরে যারা রয়ে গেল, তারাও তো চাল কিনে খাবে। লাও-এর আজ থাকলে এই চাল বিক্রির ব্যবস্থা তো সেই করতো। বড় বেশী ক'রে তার কথা আজ মনে পড়ে লিংটানের।

একদিন যখন আকাশ ভেঙ্গে জল নামল, চালের বোঝা নিয়ে লিংটান এগোল শহরের পথে। মাথায় বাঁশের টোকা দিয়ে তার উপর বেঁধে নিল সবুজ গাছের ডাল, গায়ের উপরে দিলে হোগলার তৈরি আবরণ, যার উপর থেকে বৃষ্টির জল হাঁসের পিঠের মতন আপনি গড়িয়ে পড়ে যায়। কিছুদূর এগিয়ে সে মাঠের কাদা ভেঙ্গে এগোয়। দ্বিগুণ সময় লাগলেও প্রাণের তাগিদে এ-পথ ছাড়া গত্যন্তর কই। শহরে পৌঁছে দেখে বিধ্বস্ত শহরের ধ্বংস স্তূপ গেছে আরও বেড়ে, শহরের ধনী বাসিন্দারা গেছে চলে সবটুকু আনন্দ নিংরিয়ে নিয়ে। যারা থেকে গেছে, মন-মরা দেহ নিয়ে তারা আছে কোনমতে বেঁচে। যুদ্ধ কিম্বা পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে না, এমন লোকের সাক্ষাৎও মেলে লিংটানের।

চালের বাজারে গিয়ে লিংটান দেখল অর্ধেক বাজার শূন্য। তবুও যারা আছে, দুর্দিন ব'লে তারাও ঠিক আগের মতই চালের দামাদামি করতে একটুও কসুর করে না। শহরের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, চালের ব্যাপারীরা ঠিক থাকবে এই শহরে, কারণ, শহরের সব লোকই তো আর চলে যাবে না ; আর চাল ছাড়া তারা খাবেই বা কি ? সুতরাং ব্যবসা তাদের চলবেই। একটু ভেবে চিন্তে লিংটান চলতি দামের চেয়ে চালের দাম কিছু বেশীই চাইল। আরও চাল আনবার প্রতিশ্রুতিতে ব্যাপারীও সঙ্গে সঙ্গে সেই দামেই রাজী হ'য়ে টাকা গুনে দিয়ে দিল। বেশ কিছু টাকা গেঁজে বেঁধে হৃষ্টমনে লিংটান ঘরে ফেরে।... কিন্তু ব্যাপারীর মুখে যে সংবাদ শুনল লিংটান, তাতে ঘনায়মান বিপদের স্পষ্ট কালো রেখা যেন সে দেখতে পেল দিগন্তের বুকে। শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে...। তারা তো বড় সহজে চলে যায় না !...

রাত্রে একথা শ্বশুরের মুখে শুনে উলীন ভেবে বলে : 'দু দশ জন শ্বেতাঙ্গ শহরে থেকে যাবেই, কারণ, এখানেই তারা বাড়ি ঘর বানিয়ে গোছ-গাছ ক'রে বসেছে। তবে খবরটা খুব ভাল নয়। আমরা যে খবর রাখি না, এই বিদেশীরা অনেক আগেই সে খবর পায়। আকাশ থেকে ওরা খবর ধরে, তারের ভেতর দিয়ে ওরা কথা কয়।'

উলীনের কথা শুনে অর্কিড হা হ'য়ে গেল।

উলীন বলে চলে, বিশেষ ক'রে অর্কিডকে শুনিয়ে : 'আমার দোকানে দু'চার বার এই শ্বেতাঙ্গরা এসেছে। আমাদেরই মত দু'হাত-পা...গায়ের রঙটা শুধু একেবারে শাদা...কথা বলে কেমন বাচ্চাদের মতন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায়...'

'বাবাঃ, আমি যেন কোনদিন ওদের সামনে না পড়ি।' অর্কিড বলে ওঠে।

লিংটানের দিকে ফিরে তাকিয়ে উলীন বলে : 'শত্রুর হাতে যদি শহর চলে যায় তো, তাড়াতাড়ি গেলেই ভাল...আমি ফিরে গিয়ে আবার দোকান সাজিয়ে বসতে পারি। শহর একবার ওদের হাতে গিয়ে পড়লে তো উপর থেকে আর বোমা ফেলবে না।'

কত লোকেরই তো দোকান এখনও খোলা আছে...উলীনও তো গিয়ে খুলতে পারে দোকান। কিন্তু সে-সাহস কই তার? বিপদের মধ্যে না পড়লে মানুষের সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনের কথা চেপে গিয়ে জামাইর কথার উত্তরে বেশ নম্র ভাষায় বলে :

'বোধহয় খুব বেশি দেরিও নেই সে-দিনের। যতদিন না সে-দিন আসে ততদিন নির্ভাবনায় তুমি এখানে থাক।'

তারই গৃহের পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী জন-স্রোতের যাকে পায় তাকে লিংটান বারে বারে বলে দেয় : 'বুঝলে গো, তোমাদেরই মতই আমার এক ছেলে তার বৌ নিয়ে ওদিকে গেছে। দেখবে বেশ লম্বা দোহারা চেহারা, চোখের মণি কালো কুচকুচে...পুত্রবধূটিও ছেলের মতই লম্বা, পোয়াতী...যদি দেখ তাদের ব'লো যে আমরা ভাল আছি...সে যেভাবে আমাদের দেখে গেছে, সেই ভাবেই আমরা বেঁচে আছি। যদি পারে তো তাদের কুশল যেন জানায়।'

যুবকদের অনেকেই তাকে আশ্বাস দিয়ে যায়, যদি সাক্ষাৎ মেলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বাপের কথা বলবে তাদের। লিংটানের মনেও আশা জাগে, হয়তো এদের কেউ আবার এই পথে ফিরে আসবে, তার কাছে পুত্র-পুত্রবধূর খবর পাবে। কিন্তু জনস্রোত পশ্চিমমুখী, কিনার ঘেঁষা উল্টো স্রোতেও কেউই ফেরে না এ-পথে।

বছরের দশটি মাস কেটে গেল...দশ মাসই কাটুক আর ন' মাসই কাটুক, তাতে কীইবা এসে গেল?

মাঠের উপর শারদীয়া নীলাকাশের উপর দিয়ে উড়ে এসে শাদা হাঁসের দল ফসল কাটবার পর পড়ে-থাকা শস্য খুঁজে খুঁজে খুটে খুটে খায়। পাহাড়ের কোলে লম্বা সবুজ ঘাসগুলো শুকিয়ে লাল হ'য়ে উঠছে। জ্বালানীর ব্যবস্থার জন্য লিংসাওকে সঙ্গে নিয়ে লিংটান সেই ঘাস কাটতে যায়। পরদিন বাড়ীর আর সকলে যায় পাহাড়তলীর জ্বালানী কাটতে, বড় মেয়ে শুধু থাকে গৃহকাজে, আর উলীন বসে প্রহর গোনে। দিনের পর দিন তারা ঘাস কেটে জড় করে, তারপর বোঝা বেঁধে মাথায় ক'রে ফিরে আসে গাঁয়ে। গৃহের এক কোণে বোঝাগুলো

সাজিয়ে লিংটান নিশ্বাস ফেলে ভাবে : 'ধান আর জ্বালানী জোগাড় হয়ে গেল, আর ভাবনা কিছু নেই।'

মাসের দশম দিনে গাঁয়ে নবান্ন উৎসব। সেই দিন গাঁয়ের পথে, চা-খানায় মৌমাছির মত প্রতি বছর আসে ছাত্রের দল। কত বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তারা গ্রামবাসীদের বোঝাতে চাইত...প্রত্যেকের লেখাপড়া শেখা উচিত...প্রতিদিন প্রত্যেকের স্নান করা দরকার...গৃহের চারদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে মশা-মাছি মেরে ফেলা উচিত, তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, রোগের বিস্তার হবে না... যদি কারও বসন্ত হয় তো রোগীকে তক্ষুণি আলাদা ক'রে ফেলবে, এবং তার কাছে অন্য কারো যাওয়া উচিত নয়...এমনি ধারা সব বক্তৃতা। ছাত্রদের এ-বক্তৃতা শুনে লিংসাও একবার বলে উঠেছিল : 'বলে কি এরা? অসুখ হ'লে আলাদা ক'রে দেব কী গো? রোগীকে মেরে ফেলতে বলে নাকি এরা?' বক্তৃতা শুনে গ্রামবাসীরা হাসে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কতই বা এদের বয়স, কীইবা এরা জানে...জীবনের অভিজ্ঞতা এদের কোথায়?...এরা যা বলে বাপ-ঠাকুর্দার অভিজ্ঞতার লিপি-খাতায় কোথাও তা খুঁজে পাওয়া যায় না।... কিন্তু এবারে নবান্ন উৎসবের দিনে গাঁয়ের পথে ছাত্রদের সে ভিড় নেই। লিং গ্রামে এল শুধু দুজন ছাত্র। এবারে তাদের বক্তৃতা মশা-মাছি মারা নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ নতুন বিষয়, কোনদিন এ-গাঁয়ের কেউ যা আগে শোনে নি। লম্বা ছিপছিপে পাঁশুটে চেহারা, বিদেশী কাঁচের চশমা চোখে, মাথার চুল লম্বা...কোনমতে বক্তৃতা শেষ ক'রে চলে যেতেই পারলে যেন তারা বাঁচে। তারা চেঁচিয়ে বলে :

'আমাদের বাপ খুড়োর বয়সী তোমরা...তোমাদের কাছে একটি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। মন দিয়ে শোন তোমরা। শত্রুরা এগিয়ে আসছে। তারা এসে পড়লে, এ-গ্রাম দখল করলে, কি অবস্থা হবে, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? শান্তির আশা তাদের কাছ থেকে ক'রো না। শাসন আর শোষন চালাবার জন্য তারা তোমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করবে। আফিং-এর প্রচলন ক'রে তারা তোমাদের ঘুম পাড়াবে, আর সেই সঙ্গে চলবে তাদের লুণ্ঠন...যেখানেই তারা গেছে সেখানেই তারা লুঠ করেছে, ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে যা-কিছু পেয়েছে নিয়ে গেছে ...মেয়েদের উপর এই পশুরা পাশবিক অত্যাচার করেছে...'

উৎসবের দিনে কর্মহীন গাঁয়ের এদিক-ওদিক ঘুরে বিকেলের দিকে চা-খানার সামনে লিংটান এসে দাঁড়াল। হয়তো আজ নতুন খেলা দেখাতে কেউ এসে থাকবে। দেখল দুটি যুবক-ছাত্র বক্তৃতা দিয়ে কি যেন বোঝাতে চাইছে। এমন

তো কত জনই কতবার কত কিছু বুঝিয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে তাকিয়ে দেখে পরিচিত গ্রামবাসীদের মধ্যে বসে রয়েছে স্ত্রী-পুত্র সহ তার সেই পণ্ডিত খুড়তুতো ভাই। যুবকদের বক্তৃতা শুনে লিংটান বলে উঠল :

'সৈন্যরা ওসব সবসময়েই ক'রে থাকে গো, স্বদেশী বিদেশী বাছ-বিচার নেই... আর আফিং-এর কথা বলছ? কেন, আগে আমাদের শাসকরাই তো আফিং প্রচলন ক'রে ট্যাকস্ আদায়ের ব্যবস্থা করেছিল।'

এ-কথায় যুবকরা যায় চটে। তারা বলে : 'তবুও এ ব্যবস্থা যখন শত্রুদের কাছ থেকে আসে, সেটা খারাপ।'

লিংটানের শিক্ষিত খুড়তুতো ভাইটি বলে : 'আমি একবার এই শত্রুদের এক-জনকে দেখেছিলাম। আমাদের মতই সে দেখতে...তবে গায়ের রংটা একটু বেশি হল্‌দেটে, আর আমাদের থেকে কিছু বেঁটে, পা দুটো খাটো খাটো...। হ্যাঁ, আমাদেরই মত দেখতে, তফাৎ এমন কিছু আছে ব'লে তো আমার মনে হয় নি। যদি আমাদের সঙ্গে কথা কইতে পারে তারা, তবে ঐ শয়তান-চোখী শ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের থেকে নিশ্চয়ই তারা খারাপ হবে না।'

কেউই বুঝল না, কেন একথায় যুবক দুজন রেগে গেল। একজনকে ডেকে আর একজন বলে উঠল : 'এই নির্বোধদের পেছনে সময় নষ্ট ক'রে কি লাভ? চল্ চলে যাই। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া যারা দেশ ব'লে আর কিছু বোঝে না, তারা দেশের শাসনকর্তা, স্বাধীনতা, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে কি ক'রে?'

এ-কথা শুনে গাঁয়ের লোক গেল রেগে। সর্বপ্রথম লিংটান রাগে ফেটে পড়ল :

'আমাদের স্বদেশী শাসকদের তো জানা আছে...ট্যাক্সর উপর ট্যাক্স চাপিয়ে তো তারা আমাদের হাড়-মাস পর্যন্ত চিবোচ্ছে। হিসেবের খাতায় যাদের খাদ্য বলে ধরা হয়েছে, তাদের কাছে খাদক বাঘ না সিংহ, তা চিন্তা ক'রে কি হবে হে শুনি?'

এই বলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে লিংটান একটা মাটির ঢেলা তুলে যুবক-বক্তাদের দিকে ছুঁড়ে মারে। দেখাদেখি আর সকলে ঐ ভাবে সুরু করে ঢিল তুলে তুলে মারতে। প্রাণের তাগিদে ঢিলের মুখে তারা দৌড়ে গাঁ ছেড়ে পালায়। উৎসব দিনের সমাপ্তি ঘটেছিল সেদিন এই ভাবেই।

বিকেলে লিংসাও উৎসবের শেষ-ভোজ তৈরি করল একটা মুরগী জবাই ক'রে। রক্তটা জমিয়ে বানাল পুডিং। অতি ভোজে নাতি দুটির পেট ছুটল।

আর পাল-পার্বণে যদি ছেলেপিলেদের পেটই না ছোটে তো আর উৎসবের খাওয়া হল কি!

পরের দিন ভোরে উঠে লিংটানের মনে হয় যেন অতি সাধারণ দিন আজও...

শীতের গম বোনার আগে ক্ষেতে হাল দিতে দিতে যুবকদের গালাগাল তার মনে পড়ে। বলে কি তারা! দেশকে, মাটিকে ভালবাসে না লিংটান? কর্ষণক্ষতা কালো মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে বলে ওঠে: 'এ মাটি আমার নয়? আমার চোখের মণি এ-মাটি...আমার নয়? লাও-এর, নীলার মত তোরাও তো এ গাঁ, মাটি, দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলি...কিন্তু আমি তো পারি না ছেড়ে যেতে...এ-যে নাড়ীর টান! যদি মরতে হয় তো আমি মরব এই মাটির উপরেই, পালিয়ে যাব না...কে বেশি ভালবাসে এই মাটিকে, আমার থেকে?' কিন্তু মনের কথা খুলে বলার মত কাউকেই তো সে দেখে না। জীবনের সাথী স্ত্রীও তো বোঝে না তার এই কথা। সংসারের অনেক কথা তার সঙ্গে আলোচনা করা চলে, কিন্তু গভীর চিন্তার এই সব কথা কি বুঝবে লিংসাও? গহন মনের এসব কথা বারে বারে ভাবে আর মনে মনে গেঁথে রাখে ...কোনদিন ভুলবে না সে এসব কথা।

বর্ষান্তব্ধ প্রতিটি দিনে চালের বোঝা শহরে নিয়ে গিয়ে লিংটান বেচে আসে! একদিন কথামত দু'ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেশি ক'রে চাল নিয়ে শহরের সেই ব্যাপারীর কাছে চাল বেচতে এল লিংটান। কাঁধের বাঁক নামিয়ে রেখে দোকানীর কাছে তারা শুনল যে বাধা-প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে বিজয়ী শত্রু এগিয়ে আসছে শহরের এদিকে।

দোকানীরা ছয় ভাই। পুরুষানুক্রমে তাদের এই ব্যবসা। বাপ-কাকারা চালিয়ে গেছে, এখন চালাচ্ছে তারা। বড় দোকানী বলে:

'এ-চাল যে কে খাবে ভগবান জানেন। শহর শত্রু-কবলিত হওয়ার আগে কি আর এ-চাল বিক্রি হবে? সমগ্র সমুদ্র-উপকূল আজ শত্রুরা নিয়ে নিয়েছে... কি যে কপালে আছে কে জানে? আমাদের সরকার বাহাদুর তো দেশের ভিতরে কোথায় যেন তাদের অফিস-কাছারী সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসেছে...'

সঙ্কটের আগে দোকানীরা ছয় ভাই মনে করেছিল, শহর ছেড়ে তারা কেউই যাবে না কোথাও। কিন্তু একই সঙ্গে সকলেই যদি মারা পড়ে, তবে পরিবারের নাম যে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হ'য়ে যাবে। শেষ মুহূর্তে তাই তারা ঠিক করেছে,

বড় আর ছোট ভাই থাকবে এই শহরে। দু'ভাই যাবে তাদের বৌ-ছেলে নিয়ে পশ্চিমে, আর দু'ভাই যাবে দক্ষিণে। এদের বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে লিংটান এসেছে চাল বেচতে। বাক্স-প্যাঁটরা, বোঁচকা-বুঁচকি ছড়ান রয়েছে দোকানের চারদিকে। ভবিষ্যতে পরিবারের সকলে আবার কোন দিন একসঙ্গে মিলতে পারবে কিনা কে জানে! হয়তো আর দেখা হবে না। আকুল হ'য়ে কাঁদে মেয়েরা, শিশুরা। এরই মধ্যে লিংটানের চাল মেপে নেয় দোকানী ভাইয়েরা। গম্ভীর লিংটান দামের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবে, যারা রয়ে গেল এই শহরে, কি গাঁয়ে, তাদের ভাগ্যলিপিতে কি লেখা রয়েছে? কোন্ সে-বিপদ, কোন্ ভাগ্য বিপর্যয়? দামের টাকা গুনে বুঝে নিয়ে লিংটান প্রশ্ন করে দোকানীকে: 'শত্রু কি তবে এসে গেল?'

'যদি আর কোন বাধা না পায় তো এক মাসের মধ্যেই এসে যাবে,' বড় দোকানী উত্তর দেয়: 'শত্রুর হাতে কত বন্দুক কামান...আমাদের শাসকরা যখন স্কুল আর রাস্তা তৈরি করতে ব্যস্ত, শত্রুরা তখন বড় বড় কামান আর হাওয়াই জাহাজ তৈরি করেছে। শুধু হাতে আর অমরা কি ক'রে তাদের রুখব?'

আর দ্বিতীয় কথা না বলে নতুন আগত শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে ছেলেদের নিয়ে লিংটান গৃহের পথে হাঁটতে থাকে। গভীর চিন্তামগ্ন লিংটান ভাবে: 'সত্যিই তো, বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে আর প্রাচীন কথকথায় তারা শিখেছে যুদ্ধ-বিদ্যা ভালমানুষের জন্য নয়...যুদ্ধপ্রিয় লোক হয় মনুষ্যত্ব হীন, তাকে কেউ সম্মান করে না, ভালবাসে না—একথাই তো তারা শুনেছে, বিশ্বাস করেছে মনে-প্রাণে। এখন পর্যন্ত লিংটান তাই বিশ্বাস করে। সত্যিই তো, হিংসা, যুদ্ধ থেকে শান্তিই তো সকলের প্রিয়...সকলেই চায় বাঁচতে, মৃত্যু আর কে চায়? ...হয়তো এ-সব প্রাচীন প্রবাদ অনেকেই আজকাল বিশ্বাস করে না...ঐ সব যুবক-বক্তারা কি আর বিশ্বাস করে?...আর ডাকাতরাও তো কোনকালেই করে না—। কিন্তু সত্য, সে চির সত্যই থাকে।'

বাড়ি ফিরে লিংটান গৃহের চারিদিকে বিশেষ নজর ক'রে দেখে। দোরগুলো ভাল শক্ত ক'রে মেরামত করে, বাড়ির চারদিকে বেড়াগুলো বেশ শক্ত ক'রে বাধে। হেঁসেলের বাইরের দিককার জানালাটা দেয় বন্ধ ক'রে। যদি শত্রু হানা দেয়, সে শুধু একলা বেরিয়ে আসবে। আগত বিপদের অজানা রূপের কথা মনে ক'রে সে যেন মাঝে মাঝে কেমন ভীত হ'য়ে পড়ে। শত্রুরা হানা

দেবার আগের প্রতিটি দামী মুহূর্ত মুমূর্ষু লোকের মত যেন সে গুনে গুনে দেখে। গাঁয়ের পথ-ঘাট, শস্য-শ্যামলা মাঠ, দূরের ঐ পাহাড়, নদী, নবরূপে এসে দাঁড়ায় প্রতি মুহূর্তে তার সামনে...বাড়ীর প্রিয়-পরিজন নতুন আবেগে এসে দাঁড়ায় তার মনের পটে। ছোট মেয়ের জন্য একটা নীল রেশমী কোট কিনে এনে দেয়, লিংসাওকে দেয় দশ গজ অতি সুন্দর সূতীর কাপড়। ছেলেদের হাতে দেয় দশটি ক'রে টাকা, বড় মেয়েকে সুন্দর কাপড়। অসময়ের এ উপহারের মধ্য দিয়ে নিজের মনের ভার কমিয়ে দিতে চায় লিংটান, পরিবারের অতি-প্রিয়জনদের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে ডুব দিয়ে শান্তির এই শেষ কয়দিন পরমানন্দে কাটিয়ে দিতে চায় সে।

আশ্চর্য হ'য়ে সকলে তাকায় বৃদ্ধ গৃহকর্তার দিকে। কেন এই অসময়ের উপহার?

'এখন পর্যন্ত তো দিতে পারছি, কে জানে পরে কবে আবার দিতে পারব।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে লিংটান।

আনন্দের সঙ্গেই সকলে উপহার গ্রহণ করে। কিন্তু কেমন যেন খচ্‌খচও করে মনের কোণে। এ যেন পর-পারের ডাক শুনে প্রিয়জনদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া...

রাত্রে শুয়ে লিংসাও স্বামীকে বারে বারে জিজ্ঞেস করে: 'তোমার শরীর ভাল তো? কেমন যেন তুমি হ'য়ে যাচ্ছো...খাওয়া দাওয়া কমে যাচ্ছে, আমি বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়ছি—'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ভেবো না মোটেই। আমার কোন পরিবর্তনই হয় নি, কোন পরিবর্তনই হবে না জেন। যেমন দেখছ আমায়, মরবার আগে পর্যন্ত ঠিক সেই ভাবেই থাকব আমি। আর খুব শিগ্‌গির মরবও না, ভয় নেই গো।' স্ত্রীর কথা মাঝ-পথে থামিয়ে দিয়ে লিংটান এমন স্বরে এ-কথাগুলো বলল যে লিংসাও হা ক'রে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কি যেন সে বলতে চাইল, কিন্তু চেপে গেল, বলল না কিছু। স্থির-সঙ্কল্প স্বামীর প্রতিটি কাজ দেখে লিংসাও জানে, লিংটান যা করে, ভেবে চিন্তেই করে। কোন কথা না বলে চুপ ক'রে থাকাই শ্রেয়; যা কিছু ঘটবে, পরিবারের পক্ষে তা ভালই হবে.. বিপদ-আপদ কিছু না হয় তার জন্যই তো স্বামী সর্বসময় উদ্‌গ্রীব নজর রাখে।

॥ ছয় ॥

দশটি মাস গেল কেটে। শত্রু আগমনের বিভীষিকার প্রতীক্ষা নিয়ে দিন গোনে সকলে। তারপর এগার মাসের সুরুতে শহরের ওদিক থেকে গুম্ গুম্ শব্দের একটানা আক্রোশ কানে এসে আঘাত করে...মাঝে মাঝে নির্মল আকাশের নিচে মৃদু হাওয়ার পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলে তীব্র গর্জন ফেটে পড়ে। মাঠে কাজ করতে করতে লিংটান এ-শব্দ শোনে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারে না। তারপর একদিন শুনল, কে বললো যে ঐ গুম্ গুম্ কর্ণভেদী শব্দগুলো হলো শত্রুদের বিরাট বিরাট কামানের গর্জন...

জনস্রোতের সে-জোয়ার আজ আর নেই। যাবার যারা তারা তো সব গিয়েছে চলে, আর যারা থেকে গেছে, তারা যাবার নয়।

সমস্তদিন মাঠে কাজ ক'রে রাত্রে বসে বসে শীতের জন্য খড় দিয়ে শক্ত বাঁধনের স্যাণ্ডাল তৈরি করে লিংটান। রাত্রে মাঠ-ঘাট আবৃত ক'রে পাতলা তুষার পড়েছে। তুষারের পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে বসুমতী...তারই নিচে নবজীবনের বার্তা আসে...গমের অঙ্কুরোদ্গম হয়...নিশাবসানে নতুন দিন আসে পুরোনো দিনের থেকেও দুঃসংবাদ বহন ক'রে।

...প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে সরকারী আমলারা শহর আর জনসাধারণকে লোক-দেখানো একদল রক্ষী-বাহিনীর ভরসায় ফেলে রেখে চলে গেল। শাসকরাই যদি যায় পালিয়ে, কোন্ ভরসায় দাঁড়িয়ে লড়বে ঐ রক্ষী-বাহিনী, আর কাকেই বা করবে রক্ষা? এ সংবাদ শুনে শহর ও গ্রামের অধিবাসীরা আমলার ওপর ব্যর্থ-আক্রোশে নিজেদের যা-কিছু হাতিয়ার ছিল তাই নিয়ে তৈরি হতে থাকে। বাপ-ঠাকুর্দার আমলের পুরোনো তলোয়ার কি ছোরা বের ক'রে ঘসে ঘষে পরিষ্কার করে। তাদের এই প্রস্তুতি শুধু শত্রু-সৈন্য রুখবার জন্যই নয়, তাদেরই দেশের পশ্চাৎগামী সরকারী সৈন্যের, শহরের ঐ রক্ষী-বাহিনীর লুটতরাজের হাত থেকে বাঁচবার প্রচেষ্টাও বটে। কারণ, পলায়মান বাহিনীর সৈন্যরা জানে যে এই লুটের জন্য তাদের কেউ দুষবে না। ভীত সন্ত্রস্ত বাহিনী পলায়নের পথে হাতের কাছে যা পাবে, লুটে নিয়ে যাবে, দৃষ্টিপাত করবে না কোন দিকে... প্রাণভয়ে ভীত পলায়মান সৈন্য বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে...। প্রপিতামহের আমলের একখানা চওড়া তলোয়ার লিংটানদের পরিবারে ছিল। তাই বের ক'রে লিংটান লিংসাওকে দিল ছাই দিয়ে ঘষে ঘষে ধার ঠিক ক'রে রাখতে। ঝকঝকে

অস্ত্রখানা বার কয়েক এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে পরখ ক'রে দেখল কাস্তে চালানোর মতই সহজ-সাধ্যে সে তলোয়ারখানাও চালাতে পারে। প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের-সুবিধের জন্য দোরের পাশে ঘরের বেড়ায় লিংটান তলোয়ারখানা ঝুলিয়ে রাখল।

ভীতি-আশঙ্কার মধ্য দিয়ে পনরটি দিন গেল চলে। নিঃশঙ্কচিত্তে গাঁয়ের পথে ঘুরে বেড়ানোর শেস-দিন বোধহয় ঘনিয়ে এল। প্রতিদিন আরও সুস্পষ্ট রণ-দামামার শব্দ কানে এসে বেঁধে। কামানের গর্জনে প্রতি ঘরে থালা-ডিস্‌গুলো থর থর কেঁপে ওঠে, ভীতি-বিহ্বল শিশু-সন্তানেরা বারে বারে কেঁদে ওঠে।

দুঃসবাদের যেন শেস নেই। উৎপাতের নতুন রূপ দেখে লিংটান থ' হয়ে যায়। শহরের শেস সীমানা আর এই লিং গ্রামের ব্যবধান মাত্র তিন মাইল। শহর রক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সহকারী সৈন্যরা দু'মাইল অন্তরায় যত গ্রাম ছিল, সব গ্রামবাসীকে দূর ক'রে সরিয়ে দিয়ে, গমের ক্ষেত জ্বালিয়ে দিয়ে শত্রু-সৈন্যের আক্রমন রুখবার ব্যবস্থা করেছে। দুর্ভিক্ষের দিনের ক্ষুধার্ত জনতার গত কাঁধে-কাঁকে ছেলে মেয়ে নিয়ে মা-বৌর হাত ধরে নিঃস্বম্বল কিষাণ লিং গাঁয়ের ওপর দিয়ে পশ্চিম মুখে পাড়ি দেয়। বারে বারে লিংটান তাদের জিজ্ঞেস করে :

'কেন, কেন, এমন হ'লো, কেন তোমরা জমি-জমা গ্রাম ছেড়ে চলে এলে ?'

'কি করি, ঘর-বাড়ি-গোলা, সব যে পুড়িয়ে দিয়েছে...গমের ক্ষেতে ধূ ধূ আগুন...কি করব থেকে, শত্রুর হাতে মরব শেসে ?' জবাব দিয়ে, লিংটানের মনে নতুন প্রশ্ন তুলে রিক্ত কিষাণরা তাড়াতাড়ি ছোটে তাদের পথে।

রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে চিন্তামগ্ন লিংটান বলে : 'বিছানার মত যদি জমি-গুলো জড়িয়ে নেওয়া যেত, তাহ'লে কাঁধে ফেলে আমিও চলে যেতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়...গভীর গহ্বরে মাটি-মায়ের নাড়ির সঙ্গে যে বাঁধা আমার সব কিছু। আমি তো এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে ওদের মতন পারি না চলে যেতে...। যেই আসুক না, যাই থাকুক কপালে, আমি থাকব আমার জমি নিয়ে—।'

'আমিও থাকব তোমার সঙ্গে—' ধীর কণ্ঠে লিংসাও বলে স্বামীকে।

বিপদের কালো মেঘ জমে উঠলেই সরকারী আমলারা পালায় সর্বাগ্রে। এতো আর নতুন কিছু নয়। দেশের লোক, কিষাণ, দেশের নাড়ির সঙ্গে যারা বাঁধা, তারাই তখন সম্মুখীন হ'য়েছে সেই বিপদের, শত্রুর মোকাবিলা করতে

হয়েছে একলা তাদেরই…। এমনি ভাবে ইতিপূর্বে দাঁড়িয়েছে তাদের পূর্বপুরুষরা…। যুদ্ধের গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে গাঁয়ের দিকে যেন ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে। ঝড়ো-হাওয়ার মত দুঃসংবাদ উড়ে আসে, শত্রু এসে পৌঁছল প্রায়…এল ব'লে…তিন দিনের পথ মাত্র বাকি। যেদিক থেকে শত্রু শহরে ঢুকবে, তার বিপরীত দিকে অবস্থিত এই লিং গ্রাম। সুতরাং শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ থেকে বাঁচবার আগে তাদের বাঁচতে হবে প্রাণভয়ে ভীত পলায়মান রক্ষী-বাহিনীর লুটতরাজের তাণ্ডবলীলা থেকে।

অবশেষে সেই দুর্দিনই এল। লিং গ্রাম পেরিয়ে যেতে যেতে সরকারী বাহিনীর একটি দল লিংটানের শক্ত দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে পাশের গৃহে দিল হানা। এই ভাবেই পথের উপরে বাড়িগুলোর গায়ে লুণ্ঠনের কালো দাগ আঁচড়ে রেখে গেল। এই দুর্দিনে সর্বস্বান্ত হ'য়ে ক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠল গাঁয়ের কতলোক.. কাল পর্যন্ত যার ঘরে ছিল গোলা-ভরা ধান, আজ সে পরের দোরে ভিখারী। দেশের সৈন্যের এই অপকীর্তির ক্ষোভে বারে বারে কপাল ঠুকে তারা হা-হুতাশ জানায় : 'আসুক, আসুক, আসুক ঐ শত্রুরা। হোক তারা এদেশের শাসনকর্তা। বিশৃঙ্খলার এই তাণ্ডবলীলা থেকে তো অন্ততঃ লোক বাঁচবে।'…ইতিমধ্যে অরাজকতার সুযোগে পুরোনো-কালের মতই চোর ডাকাতের উৎপাত সুরু হয়। ধান বিক্রি ক'রে কারও ঘরে কিছু টাকা আছে, এ-খবর যেন তারা কেমন ক'রে পেয়ে যায়, যেন টাকার গন্ধ বাতাসে ভাসে…তারপর গভীর রাত্রে সে-ঘর লুণ্ঠন ক'রে সব কিছু নিয়ে যায়। ফোঁড়ার ওপর বিস-ফোঁটের মত দুর্দিনের বিপদের উপর ডাকাতির নতুন আপদ দেখা দিল।

উলীনও চাইত যেমন ক'রে হোক আসুক শৃঙ্খলা, আসুক শান্তি। সরকারী বাহিনী গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে, সে রাস্তায় বেরিয়ে গাঁয়ের দোকান ঘরে দেখে এল। সব খালি, সব লুট হ'য়ে গেছে, শূন্য'ঘরে দোকানী কপালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। দোকানের লক্ষ্মীকৌটোর আধ্‌লাটি পর্যন্ত নেই। গৃহে ফিরে এসে উলীন বলে :

'শত্রুর দখলে শহর গেলেই আমি শহরে ফিরে গিয়ে দোকান খুলে বসব। আমার মনে হয়, তাদের শাসনে অবস্থা আমাদের ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।'

'তাই যদি হয়, শান্তি যদি ফিরে আসে, আমিও সে-শাসন মেনে নেব।' ক্ষুব্ধ লিংটান বলে ফেলে। পলায়মান সরকারী সৈন্যের আক্রমণ থেকে তার

গৃহ যখন বেঁচে গেল, ঘরের উঁচু চালের কোণে উঠে তারই পড়শীর গৃহের উপরে তাদের ধ্বংসলীলা সে দেখেছে। রাগে কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু উপায় ছিল না কিছু করবার। তাদের সেই হিংস্ররূপের দিকে তাকিয়ে বারে বারে তাঁর মনে হয়েছে সেই প্রাচীন প্রবাদ : সৈন্য-জীবনে প্রবেশ করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে ফিরে যায় পশুত্বে—যে পশু-জীবন থেকে মানুষ-জীবনে উন্নীত হওয়া যায় বহু সাধ্য-সাধনায়।

সরকারী সৈন্যের পলায়নের পর এবং শত্রু-সৈন্যের হানার আগে চারদিকের নিস্তব্ধ নীরবতার মাঝে লিংটান একদিন গাঁয়ের মাতব্বরদের পঞ্চায়েত ডাকল, কি ভাবে শত্রু-সৈন্যদের গ্রহণ করা হবে তাই ঠিক করতে। সময়ও তো আর নেই। চা-খানায় বসল পঞ্চায়েত। সেই সভায় লিংটান বলল :

'কোন রকম রক্ষা-ব্যবস্থাই যে গাঁয়ে নেই, শত্রু-সৈন্যেরা এসেই তা দেখতে পাবে, আর, ওদের আগমনকে যদি মেনে নেব ব'লে স্বীকার করি, তবে ওদের অত্যাচার-হামলা থেকে গ্রাম হয়তো বাঁচবে। কিভাবে সে-কথা শত্রু-সৈন্যদের জানানো হবে তারই উপরে আমাদের এই আলোচনা। তাদের আগমনকে মিথ্যা স্বাগত না জানিয়ে নম্রভাবে যদি বলা হয় যে অবস্থা বুঝে চলি বলেই তোমাদের শাসন-বিধান আমরা মেনে নিচ্ছি, আমার মনে হয়, সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

লিংটানের কথায় রাজী হ'লো সকলেই। কিন্তু কোথা দিয়ে কোন্ পথে শত্রু-সৈন্য গাঁয়ে প্রবেশ করবে, কে বলতে পারে? কি ভাবেই বা তাদের প্রথম সম্ভাষণ জানানো হবে? কেউইতো কোনদিন বিজয়ীর বেশে কোনো বিদেশীকে দেখে নি। আর, বিদেশীদেরই বা দেখেছে কয়জন এ গাঁয়ে?

গ্রামের অতিবৃদ্ধ নব্বুই বছরের বুড়ো এবারে বলল : 'আমাদের নিজস্ব রীতি নীতি ছাড়া আমরা কীইবা জানি। গাঁয়ে জমিদার এলে যেভাবে আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাই, সেই ভাবেই এদেরও জানাব।'

বৃদ্ধের কথা শুনে ঠিক হ'লো যে শত্রুরা গাঁয়ে প্রবেশ করলে গাঁয়ের বয়স্করা সকলে মিলে একসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে তাদের। প্রথমে থাকবে এই নবতিতম বৃদ্ধ, তারপর থাকবে অন্যরা। চা, পিঠে এবং অন্যান্য খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে। তারই মধ্যে এরা আর্জি পেশ ক'রে জানাবে যে শান্তি-শৃঙ্খলা চায় গ্রামবাসী, নবাগতরা সুশাসক হবেন, আশা করে তারা। এই ভাবে স্বাগত-পর্ব তারা পালন করবে।

এরপর চা-খানার দোকানীকে ডেকে চা-পিঠে-খাবার তৈরি রাখবার কথা ব'লে যে যার ঘরে ফিরে গিয়ে দিন গুনতে থাকে। এরই মধ্যে কেউ কেউ শহরে গিয়ে শক্র-পতাকা কিনে আনে, অভ্যর্থনার সময় হাতে রাখবে ব'লে। অনিশ্চয়তা থেকে নিজেদের মনে জোর পাবার জন্য আলোচনা করে শহরে শুনে-আসা কথা...দেশী শাসকদের চেয়ে বিদেশী শাসক অনেক ভাল...আইন-কানুন শৃঙ্খলা বিদেশীদের অনেক বেশী। আশা-নিরাশার দোলায় দুলে দুলে প্রতিটি ক্ষণ গুনে গুনে তারা প্রতীক্ষা করতে থাকে বিদেশী শাসকদের আগমনের।

বছরের একাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিবসের সুরু...

আগের মতই চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ...যুদ্ধের দামামা, শত্রু-কামানের গর্জন আজ যেন স্তব্ধ...আকাশের নির্মলতা যেন সেই পুরোনো দিনে ফিরে গেছে—সেই সমুদ্রোপকূলে শত্রু-হানা সুরু হবার আগের মত অবস্থা। শীতের কুয়াশাবৃত সকালে দিগন্ত-বিসারী মাঠ-ঘাট শুভ্র তুষারাবৃত হ'য়ে পড়ে আছে। চিন্তান্বিত লিংটানের রাত্রি কেটে যায় অর্ধ জাগরণে। বিছানা ছেড়ে দোরখুলে সাবধানী দৃষ্টি মেলে সে একবার দেখে নেয় গাঁয়ের পথ-ঘাট, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় তুষারাবৃত গমের ক্ষেতের ওপর দিয়ে। সবুজ গমের উপর শাদার প্রলেপ পড়েছে।...কে ঘরে তুলবে এই গম? লিংটান কি কাটবে নিজের হাতের ফলান এই শস্য? না, আর কেউ? এ-প্রশ্নের জবাব মনের মাঝে উঠবার আগেই তার দৃষ্টি চলে যায় গৃহের ওপরে। গলিত তুষারের গা থেকে রান্নাঘরে মেয়েদের জ্বালানো উনুনের ধোঁয়ার মত কুণ্ডুলী উঠছে শূন্যের বুকে। লিংটান প্রবেশ করে হেঁসেলে। দেখে লিংসাও উনুনে আঁচ দিয়েছে। স্ত্রীর পিছনে দাঁড়িয়ে সে বলে: 'আজ হ'লো সেই ভয়ের দিন—'

'হ্যাঁ, আমি জানি—।' লিংসাও স্থির চোখদুটি স্বামীর দিকে তুলে মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়। তারপর তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে: 'কোনো পুরুষকে আমি ভয় করি না।'

সেই পুরোনো কথা যেন নতুন অর্থ নিয়ে প্রকাশ পায় লিংটানের কাছে। সেও বলে: 'আমিও করি না।'

নীরবে হাত মুখ ধুয়ে নেয় লিংটান। সমস্ত বাড়িটার ওপর কেমন যেন পাণ্ডুর নীরবতা নেমে এসেছে। চুপচাপ এক একজনে নিজ নিজ কোঠা থেকে

বেরিয়ে এসে ভাতের থালার জন্য বসে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত আজ যেন কাঁদতে ভুলে গেছে।

সকলের খাওয়া হ'য়ে গেলে গৃহকর্তা লিংটান সকলকে ডেকে বলে :

'চারদিকের নিস্তব্ধতা দেখে মনে হচ্ছে যেন শহরের যুদ্ধ থেমে গেছে। আমাদের সরকারী সৈন্য বাহিনী চলে গেছে, আর এরই মধ্যে বোধহয় শত্রুরাও শহরে ঢুকে পড়েছে। আমাকে না জানিয়ে বাড়ির ত্রিসীমানার বাইরে তোমরা কেউ যাবে না, বিশেষ ক'রে, বাড়ির মেয়েরা তো কোনমতেই নয়। ছেলেপিলে-রাও যেন বাইরে একেবারে না যায়। আমি শুধু বাইরে থেকে কাজ-কর্ম কিছু কিছু করব আর নজর রাখব বড় রাস্তার ওপর। যদি কোন অচেনা লোক দেখি তো আমি তার সঙ্গে কথা কইব। আবার বলছি, ভুলেও কেউ তোমরা বাইরে আসবে না, বিশেষ ক'রে মেয়েরা। বারে বারে একথা বলছি, ভুল যেন না হয়...। যদি দেখ যে আমার কোনো বিপদ হয়েছে, কেবল লাও-তা তখন বাইরে আমার পাশে যাবে।'

লিংটানের বক্তব্য শেষ হ'লে যে যার কাজে গেল। ছেলেরা বসল খড়ের দড়ি পাকিয়ে শীতের স্যাণ্ডেল তৈরি করতে, মেয়েরা গেল গৃহ-কর্মে, উলীন গেল নিজের কোঠায়। বদ্ধ দরজার পাশে বসে গুড়ুক গুড়ুক হুঁকো টানতে টানতে লিংটান দোরের ফাঁক দিয়ে নজর রাখল সুদূর-প্রসারী মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে গ্রাম্য পথটির শেষপ্রান্তে যেখান দিয়ে আরও দূরে চলে যেতে হয় শহরের প্রান্ত-রেখায় পৌছুতে হ'লে।...কেনই বা এভাবে বসে থাকা—লিংটান ভাবে—শত্রুদের হানা সম্বন্ধে শুধু গুজবই শুনে আসছি, কিন্তু কোন কিছুই তো চোখে পড়েনি। বহুক্ষণ কেটে যায়...পরিত্যক্ত গ্রামের গোরস্থানের ছম-ছমে-নীরবতা লিংটানের সহ্য হয় না। দোরটা ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে বাইরের দিকে একটু ভাল ক'রে নজর দেয়। তুষার গলে গিয়ে মাঠের সবুজ গমগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিপদের সঙ্কেত জানাবার জন্য বাইরে কুকুরটি ছিল বাঁধা; প্রভু-দর্শনে লেজ নাড়তে নাড়তে মৃদু 'কেউ' 'কেউ' শব্দে লিংটানের পায়ের কাছে, হাঁটুতে, মাথা ছুঁয়ে আদর পেতে চায়। নির্জন গাঁয়ের কোনো স্থানে একটি প্রাণীকেও চোখে পড়ে না। লিংটানের মতই সকলে যে-যার ঘর সামলিয়ে গৃহকোণে বসে আগত বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য জপ করছে।

দোরটি আর একটু খুলে হুঁকো হাতে বেরিয়ে ভাল ক'রে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। শহরের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে লক্ষ্য করে..কই ধোঁয়ার

কুণ্ডলী তো চোখে পড়ে না। দোরের বাইরে লিংটানকে দাঁড়াতে দেখে পড়শীরাও একে একে অতি-সাবধানী দৃষ্টি চারদিকে ফেলে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর আরও কিছুক্ষণ ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এক এক ক'রে তারা এগিয়ে এল লিংটানের দিকে। এক, দুই...পাঁচ, ছয়...বার তেরজন গৃহকর্তা এসে জমলো লিংটানের পাশে।

'কিছু দেখলে কোথাও ?' লিংটান প্রশ্ন করে।

'কই কিছু তো চোখে পড়ল না—' জবাব দিল একজন।

'ব্যাপারটা কি, একবার একটু খোঁজ করলে হয় না ?' লিংটানের পণ্ডিত ভাইয়ের ছেলে বলে উঠল।

'করলে তো ভাল হয়, কিন্তু করে কে ? সকলেরই তো বৌ-ব্যাটা নিয়ে ঘর-সংসার...। এক তুই, তোর বিয়ে হয় নি এখনও।'

মাথার লম্বা চুলের গোছাটি ঝাঁকি দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিয়ে যুবক জবাব দেয় : 'হ্যাঁ, আমি যাব, ভয়-ডর আমি কাউকে বিশেষ করি না।'

'কিন্তু আমি তো তোকে যেতে বলতে পারি না। যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়, তার ঝক্কি নেবে কে ? তোর বাবাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে নে।' লিংটান বলে।

'বাবা কিছু বলবে না—' এই ব'লে একটু পরে সকলের সামনে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে সে শহরের দিকে চলে গেল।

একজন বলে ওঠে : 'ভাগ্যিস ও আমার ছেলে নয়।' অন্যরা মাথা নাড়ে। তারপর যে-যার গৃহে ফিরে এসে ভাল ক'রে দোর বন্ধ ক'রে আবার প্রতীক্ষা করতে থাকে। লিংটানও ফিরে আসে। খর-রোদের দুপুর গড়িয়ে যায় অপরাহ্নের স্তিমিত বেলায়। আবার সেই নিস্তব্ধ-নীরবতার পাষাণপ্রাচীর গিলে ফেলতে চায় সমগ্র গ্রামকে...হঠাৎ মাঝে মাঝে বহুদূর থেকে কামানের বজ্র-গর্জনের ধাক্কা এসে লাগে সমস্ত গ্রামের উপর...

বিকেলের দিকে বাড়ির ছেলে-মেয়েরা অস্থির হ'য়ে ওঠে। সমস্ত দিন বন্ধ বাড়ির উঠানে এবং ঘরের মেজেয় বড়দের চোখের ইশারায় নিশ্চুপ থেকে তারা দিন কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আর তো পারে না। শাশুড়ীর কাছে গাঁয়ের এক ছেলে শহরে গেছে শুনে উলীনও ঘরে আর আবদ্ধ থাকতে চায় না। জামাইর বাইরে বেরোবার ইচ্ছা শুনে প্রমাদ গোনে লিংটান। নধর কান্তি জামাইকে যদি শত্রুরা দেখে তো মনে করবে এই ধনী লোকটার গৃহে অনেক ধন-রত্ন খাবার পাওয়া যাবে। তারপরই হয়তো আসবে হামলা।

'দিনের পর দিন এভাবে যদি আবদ্ধ থাকতে হয়তো দম বন্ধ হ'য়ে যে সব মারা যাবে—' লিংসাও অবশেষে স্বামীকে বলে। ইতিমধ্যে দু'একটা গ্রাম্য দোকান তাদের ঝাপ খুলেছে, দু'চারটে বাড়ির সামনে ছোট ছেলে মেয়েরা বাপ-ঠাকুর্দার নজরের ওপরে রাস্তায় খেলছে। লিংটান নিজের দোরটি খুলে দিয়ে বলল সকলকে :

'দোরের সামনেই তোমরা সব থাকবে, অন্য কোথাও কেউ যাবে না। যদি দরকার হয় তো যেন ঝট ক'রে দোর বন্ধ ক'রে দিতে পারি।'

উৎফুল্ল মনে দোরের বাইরে এসে কোন পরিবর্তনই তারা দেখে না কোথাও, যেমন ছিল সব ঠিক তেমনি আছে। অর্কিড হেসে বলে :

'আমি ভেবেছিলাম বুঝি কী যেন না হ'য়ে গেছে...বোধহয় মাঠ-ঘাটের রঙও বদলে গেছে!'

অপরিচিত কোন কিছু যখন নজরে এল না, লিংটানের মনে হ'লো পণ্ডিত ভাইয়ের বাড়িতে একবার গিয়ে দেখে আসবে শহর থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরল কিনা। পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখে এ-বাড়ি ও-বাড়ির গৃহকর্তারা হেসে বলে : 'শত্রু-আক্রমণ যদি এই রকম হয় তো সে-আক্রমণ আমরা সইতে পারব, কি বল মোড়ল!'

এদের এ-মন্তব্যে মৃদু হেসে লিংটান খুড়তুতো ভাইয়ের গৃহপানে এগোয়। দেখে, তখনও ছেলের না ফিরে আসাতে উনুনের উপর ভাত চাপিয়ে ভ্রাতৃবধূ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এভাবে জ্বালানির অপচয় সে সইতে পারছে না। ছেলের কোন বিপদ হ'তে পারে সে-আশঙ্কা মায়ের মনে কোথাও নেই। হয়তো রাত্রে ফিরবে মনে ক'রে লিংটান ভ্রাতৃবধূকে সান্ত্বনা দিয়ে ভাইয়ের পাশে গিয়ে বসে। খাওয়ার পরে পুরোনো খবরের কাগজের উপর চোখ রেখে দাঁত খুঁটছিল পণ্ডিত ভাই। লিংটানকে দেখে বলল :

'উড়ো জাহাজ থেকে শত্রুরা গাঁয়ের উপরে ছাপা-কাগজ ছড়িয়ে দিয়েছে। তাতে বলছে : আমাদের তোমরা ভয় পেও না, আমরা তোমাদের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছি...'

'তা যদি হয় তো ভালই। আর, আজ তো দেখছি শান্তিতেই দিনটা কেটে গল।' লিংটান বলে।

গত রাত্রের নিদ্রা-হীনতা তার চোখে যেন হঠাৎ জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব করে সে। ভয়াবহ দিনের যে আশঙ্কা দিনের পর দিন

তারা সয়ে এসেছে, সে-দিনও গেল কেটে, কোথাও শত্রুর নিশানা দেখা গেল না। ভয়ে ভার হ'য়ে ওঠা বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে :

'যাই দেখি একটু ঘুমোই গে…তোমার ছেলে ঘরে ফিরলে একবার খবর দিও।'

খবরের কাগজের মধ্যে পণ্ডিত ডুবে ছিল। তার কাছে মুখের কথার থেকে লেখার দাম বেশী। তবুও লিংটানকে বিদায় জানাতে রীতি অনুযায়ী সে উঠে দাঁড়াল।

গোধূলির আধো-আলো রাত্রির অন্ধকারে ডুবে যাবার আগেই লিংটানের বাড়ির সকলের খাওয়া শেষ হ'য়ে যায়। ছেলেপিলেদের ঘুম পাড়িয়ে বড়রা যায় শুতে। শুতে গিয়ে আবার উঠে লিংটান স্ত্রীকে বলে একবার দোর গোড়াটা ঘুরে এসেই শোবে। দোর খুলে বাইরে একবার তাকায়। হঠাৎ মনে হয় কে যেন ব্যথায় গোঁ গোঁ করছে কাছেপিঠে কোথায়। ভয়ে লিংটানের বুক কুঁকড়ে যায়। প্রেতাত্মার ক্রন্দন, না, মানুষের কণ্ঠস্বর? তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করতে গিয়ে শোনে কে যেন অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকছে : 'কাকা!'

ঝটিতে দোর খুলে সেই শব্দের দিকে ছুটে বেরিয়ে যায় লিংটান। তক্ষুণি ফিরে এসে চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বলে : 'বাতিটা আনোতো শিগগির, বাতিটা—'

লিংসাও বাতি নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারা এগিয়ে যায়। দেখে খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে পথের উপরে পড়ে কি এক অসহনীয় যন্ত্রনায় গোঁ গোঁ করছে।

'দেখ, দেখ রক্ত পড়ছে!' চিৎকার ক'রে লিংসাও ছুটে যায় আহত আত্মীয়কে তুলে ধরতে। কিন্তু লিংটান শক্ত ক'রে স্ত্রীর হাত ধরে টেনে তাকে বাধা দেয়। বলে :

'আগেই ধ'রো না…বাতিটা ধর, আমি ওর বাপ-মাকে আগে ডেকে আনি। না হ'লে হয়তো আবার বলবে আমরাই এভাবে টানাটানি ক'রে ওদের ছেলের অবস্থা আরও খারাপ ক'রে দিয়েছি।'

বাতিটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে লিংটান দৌড়ে ছুটে যায় ছায়া-ঘন পথ দিয়ে খুড়তুতো ভাইয়ের গৃহে। দু'হাতে জোরে জোরে ধাক্কা দেয় বন্ধ দোরের উপরে। ঘেউ ঘেউ ক'রে কুকুর চিৎকার ক'রে ওঠে। ভ্রাতৃবধূ ভিতর থেকে জানতে চায় কে এত জোরে জোরে দোর ধাক্কায়। লিংটান চেঁচিয়ে ওঠে : 'আমি, আমি লিংটান। শিগগির বেরিয়ে এস। তোমাদের ছেলে জখম হ'য়ে আমাদের

দোরের কাছে পথের উপর পড়ে রয়েছে। কি ক'রে যে জখম হ'লো কিছুই জানতে পারিনি। গাঁয়ে ঢুকে প্রথম বাড়ি ব'লে বোধহয় কোনমতে ঐ পর্যন্ত এসে পড়েছে...এখনও আমরা তাকে ধরিনি। কৈ শিগগির এস তোমরা।'

চিৎকার ক'রে মা ডেকে ওঠে স্বামীকে। ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠে কোনমতে কোটটা গায়ে ফেলে দরজা খুলে ছুটে যায় তারা আহত সন্তানের পাশে। পিছনে পিছনে ছুটে চলে গৃহ-পালিত কুকুরটি। লাও-তা, লাও-সান এসে দাঁড়ায়, একে একে জড়ো হয় পাড়াপড়শী। কিন্তু মা বাপের অনুপস্থিতিতে আহত ছেলেকে ধরে তুলবার সাহস কারও হয় না। অঘটন কিছু ঘটলে দায়ী হবে কে তখন? পণ্ডিত বাপ ভয়ে কেমন অসাড় হ'য়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় ছেলেকে দেখে মা ছুটে গিয়ে ছেলের উপর নুয়ে প'ড়ে বুক চাপড়ে কেঁদে ওঠে। বাতির কম্পমান শিখার আলোয় আহত-পুত্রের যন্ত্রনা-পাণ্ডুর মুখ দেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে বারে বারে মা ডাকে:

'কে মেরেছে, কে আঘাত করেছে তোকে?' পথের উপরে জমা রক্তের গন্ধে কুকুরটি এগিয়ে গিয়ে রক্ত চেটে খেতে থাকে। দু'হাত তুলে কুকুরের মুখে কিল মেরে মা আবার কাঁদতে থাকে। ক্ষেপে গিয়ে কুকুরটির মাথায় এক লাথি মেরে শোকবিহ্বল বাপ চিৎকার করে উঠে: 'আমার ছেলের রক্ত চাটবি তুই, বদমাশ কুত্তা, খাইয়ে মোটা করেছি তোকে এই জন্যে?'

কিন্তু ক্রন্দন আর ক্রোধে তো ছেলেকে ফিরিয়ে আনা যায় না। লিংটান বলে: 'একটা বিছানায় ওকে শুইয়ে এক্ষুনি যে ডাক্তার দেখান দরকার...কোন্ জায়গায় আঘাত লেগেছে, কতটা গর্ত—' ব্যথিত হৃদয়ের সকরুণ প্রকাশ লিংটানের এই উক্তিতে। কিন্তু শোকাতুরা মা ক্ষেপে উঠে ফেটে পড়ল লিংটানের উপর:

'শুনলাম, তুমিই তো ওকে শহরে পাঠিয়েছিলে আজ সকালে। ও যেতে চায়নি কিন্তু তুমি ওকে—'

নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করে লিংটান। পড়শীদের দিকে তাকিয়ে একটু জোর গলায় অথচ না চেঁচিয়ে বলে:

'কি গো, তোমরাই তো সাক্ষী আছ...যাবার কথা আমি ওকে বলেছিলাম? ওতো নিজের ইচ্ছায়ই গেল। আমরা বরং বললাম বাপকে জিজ্ঞেস করতে—'

'ঠিক, ঠিক! লিংটান তো ওকে যেতে বলে নি। ও গেছে নিজের ইচ্ছেয়।'

শোকাতুরা মা চুপ ক'রে যায়।

ভ্রাতৃ-বধূর এ আক্রমণে লিংটান মনে কিছু করে না। শোকে বিহ্বলা মা, মাথা ঠিক নেই...। আর কিছু না বলে মাথার দিকটা সে তুলে নিয়ে ভাইকে বলে পা দুটো তুলে নিতে। মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে ছেলের কোমরটা উঁচু ক'রে ধরে। তারপর আস্তে আস্তে বহন ক'রে তাকে নিয়ে শুইয়ে দেয় নিজের ঘরে। কিন্তু ডাক্তার, ডাক্তার এখন পাওয়া যাবে কোথায়? তারা তো থাকে শহরে... আর এই দুর্দিনে তারাও কি আর শহরে বসে আছে? পালিয়ে যদি নাও থাকে, কে যাবে এখন শহরে ডাক্তার ডাকতে? আস্তে আস্তে সকলে কেটে পড়ল। শুধু থেকে গেল লিংটান।

আহত-আত্মীয়ের দিকে ভাল ক'রে নজর দিয়ে লিংটানের ধারণা হ'লো যে সে জীবিত। খুব বেশি রক্তক্ষরণের জন্য অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হলেও বুকের ধুক-পুকানি তো হাতে অনুভব করা যায়। কিছু গরম মদ নিয়ে আহত ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে আস্তে আস্তে ঢেলে দিয়ে ভাল ক'রে নজর রাখল প্রতিক্রিয়া দেখতে। কস্ বেয়ে কিছুটা মদ পড়ে গেলেও, কিছুটা গেল তার পেটে। তারপর আরও কতখানি ঢেলে দিল তার মুখে।

শোকাতুরা মা নিজের ভাগ্যের দোস দিয়ে শুধু বিলাপ করতে থাকে একটানা সুরে। বিলাপের তিক্ততা ক্রমশ নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে থাকে গাঁয়ের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে :

'আমি জানি না? সেই দিন থেকে ছেলে আমার বিবাগী হ'য়ে গেছে . ঐ বুড়ো মিনসে টাকার লোভে নীলাকে ছেড়ে দেওয়াতেই তো ছেলে আমার মন-মরা হ'য়ে গিয়েছিল...না খাওয়া, না পরা কোন দিকে নজর নেই—এ কেন হয়েছিল? গরীব বলেই না তুমি টাকা দিয়ে আমাদের কিনতে পেরেছিলে?' বিনিয়ে বিনিয়ে লিংটানকে জড়িয়ে নিয়ে চলতে থাকে তার বিলাপ। তার পুত্রবধূকে নিয়ে এত তিক্ততা জমে আছে ভ্রাতৃ-বধূর মনে? আশ্চর্য হয়ে ভাবে লিংটান।

ধীরে ধীরে লিংটান রেগে ওঠে। বইয়ের ওপর মন পড়ে থাকায় যখন সংসার অচল হ'য়ে পড়তো, লিংটান এগিয়ে আসতো এদের বাঁচাতে। চাল দিয়ে, আজ বেগুন কাল কপি দিয়ে, জ্বালানি দিয়ে এদের সাহায্য করেছে... আর তারই প্রতিদানে এই ভাষা? মনে আঘাত পায় লিংটান। আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে মদের ভাড়টি নামিয়ে রেখে সে বলে ফেলে :

'অভাব-অনটনে নিজের রক্ত-সম্বন্ধ বলেই না এত ক'রে এলাম তোমাদের

জন্যে, আর তারই প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি এই ভাষায়, বৌঠান ? আর নয়, আর কোনদিন কাউকে সাহায্য করব না।'

নিজের পড়া-শুনা নিয়ে ব্যস্ত পণ্ডিত-ভাই এই ঝগড়ায় বিব্রত হ'য়ে পড়ে। কিভাবে চালের জোগাড় হয় তা নিয়ে কোনদিনই সে মাথা ঘামায়নি। তাড়াতাড়ি উঠে স্ত্রীকে ধমকে বলে : 'কেন তুমি এ ভাবে কথা বলবে ওকে ?'

স্ত্রী এবার ঘুরে তার রোষবহ্নি ঢেলে দেয় স্বামীর উপরে। বিলাপ ক'রে বলতে থাকে কেন সে বিধবা হয় না, কেন ভগবান নেয় না এই নিষ্কর্মা বুড়ো মিনসেকে ..তা হ'লে তো তার হাড় জুড়োয়...তারপর ভাল মানুষ দেখে সে আর একটা বিয়ে করতে পারে।

বিলাপ আর চিৎকারে ছেলের জ্ঞান যেন ফিরে আসে। আস্তে চোখ খুলে সে ডেকে ওঠে :

'মা !'

বিলাপ-চিৎকার, ক্রোধ-ক্রন্দন মুহূর্তে উবে যায়। ছুটে গিয়ে তারা দাঁড়ায় ছেলের পাশে। মা জিজ্ঞেস করে বারে বারে : 'কী ভাবে আঘাত লেগেছে, কে মেরেছে তোকে ?'

উত্তর দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠে না। আস্তে আস্তে বহু কষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা ব'লে সে যা বলল তা হ'লো : অনেকের সঙ্গে ধরে নিয়ে প্রাচীরের পাশে দাঁড়া করিয়ে তাদের গুলি করে...মরে গেছে মনে ক'রে তাদের ওখানে ফেলে তারা চলে যায়...তারপর সুযোগ বুঝে রাত্রে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় এসে সে পড়ে থাকে...এক ধনী বৌদ্ধ শহর ছেড়ে পালাবার সময় দয়া ক'রে তাকে গাঁয়ের পথে নামিয়ে দিয়ে গেছেন...তারপর অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে লিংটানের দোরের কাছে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়, তারপর থেকে আর কিছু সে জানে না...

'কিন্তু গুলি করলে কেন ?' আশ্চর্য হ'য়ে লিংটান জিজ্ঞেস করে।

'আমরা দৌড়েছিলাম যে—' অতিকষ্টে শ্বাস নিতে নিতে সে বলে ঃ 'সেই সব সৈন্যরা এত ভীতু যে যাকে দৌড়োতে দেখেছে তাকেই গুলি ক'রে মেরেছে—'

নির্দোষী লোকদের এভাবে গুলি ক'রে মারবে কেন ? কিছুই বুঝতে পারে না লিংটান। এমন সময় প্রত্যুষের ক্ষীণ আলো দেখা দেয় দূর-চক্রবালে। বুকের ব্যাথায় ছেলে আবার চিৎকার ক'রে উঠে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। তাকে

আর ব্যস্ত না ক'রে একটা চাদর তার গায়ের উপর টেনে দিয়ে সরে আসে। জ্ঞান ফিরে এলে চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

লিংটানের এবার নিজের ঘরে ফেরার কথা মনে হয়। পণ্ডিতভাইকে ডেকে পরে একবার আসবে বলে সে বেড়িয়ে পড়ে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার উপর দিয়ে দূরে দৃষ্টি প্রসার ক'রে দেয় লিংটান। আজকের প্রভাত কেমন যেন মনে হয়...মনে হয় পোড়া হলদে খাকি রং যেন দিগন্তে মিশে আছে। নিজের বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে মনে হয় সেই কটা হলদে রং যেন নড়ছে। দোরে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হ'য়ে তাকিয়ে থাকে শহরের সীমানার দিকে ..আরও নজর দিয়ে দেখে...শহরের প্রাচীর পেরিয়ে কত লোক গাঁয়ের পথ ধরে যেন এগিয়ে আসছে। চট্ ক'রে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বাড়ির ভিতর ঢুকে দরজা ভাল ক'রে আটকে তালা বন্ধ ক'রে দেয়। স্ত্রীকে চিৎকার ক'রে ডাকে : 'কোথায় গেলে গো তুমি, কোথায় গেলে—?'

চুল বাঁধছিল লিংসাও। চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে লাল ফিতের এক দিক ঘাড়ের উপরে কেশ-গুচ্ছের গোড়ায় জড়িয়ে আর এক দিক দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে ছিল। তাই স্বামীর ডাকে উত্তর দিতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল স্বামীর সামনে। ভীত সন্ত্রস্ত লিংটান স্ত্রীর মুখ থেকে ফিতেটা টেনে বের ক'রে দিয়ে বলে :

'শত্রু আসছে...বিছানা থেকে সকলকে উঠে এক্ষুনি কাপড়-জামা পরে তৈরি থাকতে বল...বলা যায় না কি হয়!'

তারপরই বাড়ি থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ির সকলকে ডেকে নব্বুই বছরের বৃদ্ধকে খবর দিয়ে বলে সকলকে ভাল কাপড়-জামা পরে তৈরি হ'য়ে নিতে। চা-খানার মালিককে ডেকে তুলে তাকে বলে পিঠেখাবার টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে চায়ের জল গরম চাপিয়ে দিতে।

কনকনে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গাঁয়ের বয়স্ক পুরুষরা শত্রু দেশের পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়াল অভ্যর্থনা জানাতে। প্রথমে দাঁড়াল সেই বৃদ্ধ। অদেখা শত্রুদের অভ্যর্থনা জানাতে গ্রামের মহা সম্মানিত বয়োবৃদ্ধরা এভাবে দাঁড়িয়ে!... কেন যেন বারে বারে লিংটানের চোখ অশ্রুজলে ভরে ওঠে। মনে কাঁটার মত কি যেন খচ খচ করে, কিন্তু কি করবারই বা আছে?

কুয়াশার ভিতর দিয়ে কি যেন বিরাটকার সব এগিয়ে আসছে।

বৃদ্ধের পাশে এগিয়ে এসে লিংটান বলল : 'চল আমরা এগিয়ে যাই, কাকা।' তারপর সেই ক্ষুদ্র দলটি শত্রু-পতাকা হাতে নিয়ে মাটির রাস্তার উপর দিয়ে গাঁয়ের প্রান্তে দাঁড়াল এসে।

ঘরঘর শব্দে ছুটে-আসা বিরাটাকার জীবগুলি এগিয়ে আসে। পিঁপড়ের মত তাদের মাড়িয়ে দিয়েই ওগুলো এগিয়ে যেতো, যদি না তারা রাস্তার পাশে সরে দাঁড়াত। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, বেপরোয়া জীবগুলি এগিয়ে যায়। সকলে দেখে শিকল লাগানো চাকার উপরে সেই দানবগুলো সামনের সব বাধা উপড়ে ফেলে গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। শত্রু কি তবে এই লৌহ দানবগুলো? এদেরই কি অভ্যর্থনা জানাতে হবে? জীবনে যারা এসব দেখেনি কোনদিন, তাদের মনের এ-প্রশ্ন মনেই চাপা রইল। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বড় বড় চোখ মেলে লিংটানরা প্রতীক্ষা করে রইল। রাস্তার বুকে লোহার শিকলের দাগ কেটে কেটে লৌহ দানব ছুটে এগিয়ে গেল গ্রামের অভ্যন্তরে। কি করবে তারা, ঘরে ফিরে যাবে কী? হঠাৎ তাদের কানে আসে থপ থপ পায়ের শব্দ। কুয়াশা ভেদ ক রে লক্ষ্য ক'রে দেখে, বেটে-খাট একদল মানুষ...আসল শত্রু তবে এরাই! আরও ঘন হ'য়ে লিংটানরা চুপচাপ হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে, শত্রু-সেনারা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে তারা দাঁড়ায়...মাথার টুপি খুলে বৃদ্ধ আরম্ভ করে : 'হে আমাদের বিজয়ী বন্ধু—' কনকনে হিমেল বাতাস তার টাকে এসে বেঁধে। কিন্তু সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়, সমস্ত কথা আটকে যায় গলায়। শত্রু-সেনাদের মুখে যেন কেমন বর্বর হিংস্র হাসি ফুটে উঠছে। বৃদ্ধের অসম্পূর্ণ কথাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে লিংটান সুরু করে :

'আমরা এ গাঁয়ের চাষী, দু'একজন ছোট দোকানীও আছে আমাদের মধ্যে, আমরা শান্তি-শৃঙ্খলা চাই, যুক্তি দিয়ে অবস্থা বুঝি...দেখতেই পাচ্ছেন কোন রকম অস্ত্র-সস্ত্র আমাদের নাই...আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য পিঠে-খাবার-চা—'

'চায়ের দোকান কোথায়?' শত্রু সেনার একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

প্রথমটা লিংটান বুঝতে পারে না তার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা। তারপর একটু বুঝে বলে :

'গাঁয়ের মাঝে...ছোট্ট চা-খানা...গরীব গ্রাম...আমরাও গরীব—'

'নিয়ে চল আমাদের সেখানে।' হুকুম করে শত্রু-সেনার দলপতি।

হুকুমের কড়া-আওয়াজে লিংটান ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়...শত্রু-সেনাদের সে-হিংস্র দৃষ্টি যেন তাদের গিলে খেতে চায়। থপ থপ ক'রে কুয়াশার পর্দা ভেদ ক'রে তারা যখন কাছে এসে গাঁয়ের লোকদের এগোতে হুকুম দেয়, তখন তারা না এগিয়েই বা কি করে? লিংটানের পাশে পাশে বৃদ্ধকে সামর্থের বাইরে তাড়াতাড়ি লাফাতে লাফাতে এগোতে হয়; কিন্তু এত চেষ্টা করেও সে পারে না গতি রাখতে। পিছন থেকে শত্রু-সেনার একজন বৃদ্ধের পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা দিয়ে হুকুম করে আরও জোর কদমে চলতে। ব্যথায় বৃদ্ধ ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে...গাঁয়ের মহাসম্মানিত বৃদ্ধের গায়ে সঙ্গীনের খোঁচা! কেমন যেন খটকা লাগে বৃদ্ধের। লিংটানের দিকে ফিরে কেঁদে বলে:

'জখম ক'রে ফেললে, আমায় মেরে ফেললে!'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে শত্রু-সেনাদের মুখে ও চেহারার বীভৎসতার নিদারুণ ছাপ দেখে লিংটানের জিহ্বা কুঁক্‌রে অনড় হ'য়ে যায়। ক্রন্দনরত বৃদ্ধকে ধরে এগিয়ে চলে লিংটান। গৃহের কাছে এসে ছেলেকে দিয়ে বৃদ্ধকে গৃহাভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিয়ে তারা সব এগোল চা-খানার দিকে। দোকানী তার দুই ছেলেকে নিয়ে মুখে চর্বির মত ল্যাপটান হাসি ফুটিয়ে পিঠে-খাবার সাজানো টেবিল এগিয়ে দিয়ে সৈন্যদের অভ্যর্থনা জানালো।

শয়তানী আর হিংস্রতার মূর্তিমান প্রতিনিধির ছাপ ফুটে রয়েছে যেন এই বিজয়ী বিদেশীদের চোখে-মুখে। উপস্থিত গ্রামবাসীরা চা-খানার পিছনের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করে। দোকানীকে চা ঢালতে দেখে কেমন মৃদু বিদেশী কথার গুড় গুড় শব্দ ওঠে। লিংটানরা কিছু বুঝতে পারে না। হঠাৎ একজন সৈন্য কড়া মেজাজে চেঁচিয়ে ওঠে:

'মদ চাই, মদ—চা না!'

পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওই করে গ্রামের মাতব্বররা...এত সৈন্যের মদ জোগাবে কোথা থেকে তারা? কালে-ভদ্রে নবান্নের উৎসবে কিম্বা শহরে ধান-বেচার টাকা হাতে জমলে তারা একটু-আধটু মদ টানে বটে, কিন্তু মদ তো জমা থাকে না কারও ঘরে। তো তো ক'রে কোনমতে লিংটান বলে:

'মদ, মদ তো আমাদের গাঁয়ে নেই। বড়ই দুঃখিত আমরা।' কথা ব'লে পিছনের দোর ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায়।

দোভাষী সৈনিক সাথীদের এ কথা বলতে তাদের চ্যাপ্টা হলদে মুখ যেন

আরও ক্রূর হ'য়ে ওঠে। কী যেন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে দোভাষীকে বলে। দো-ভাষী লিংটানের দিকে তাকিয়ে বলে :

'জেনানা—মাগ্, কি রকম জেনানা আছে এ-গাঁয়ে ?'

ভুল শুনল না তো লিংটান ?

ভাষা ভুল ক'রে কি ভুল কথা দিয়ে অন্য কিছু চাইছে ? ঠিক বুঝবার জন্য সে প্রশ্ন করে : 'কি বলছেন ? মেয়ে ?'

কথায় জবাব না দিয়ে এমন অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে উঠল দোভাষী সৈনিকটি যে সকলেই বুঝল যে সে ভুল করে নি। ক্ষনেকের মধ্যেই নিজের ভ্যাবাচাকা ভাব কাটিয়ে নিয়ে লিংটান চট ক'রে বলে :

'হ্যাঁ, তা আমরা দেখছি, মেয়ে—' এই বলেই পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল লিংটান। যেতে যেতে দোকানীর বাড়ীর মেয়েদের বলে গেল : 'পালাও, পালাও, লুকোও—শয়তানরা মেয়ে খুঁজছে!' যে যার সকলেই ছোটে নিজ নিজ গৃহে নিজেদের স্ত্রী-মেয়েদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে। গৃহে ফিরে লিংটান সদর দরজা ভাল ক'রে খিল এঁটে স্ত্রীকে বলল সকলকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে চুপচাপ থাকতে। বড় চওড়া তরোয়ালটা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিয়ে দরজার পাশে লিংটান প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াল। আর লিংসাও ছুটে গিয়ে ছেলে-মেয়ে-বৌদের ডেকে এক জায়গায় জড়ো করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বহু লোকের ভারী পদধ্বনি তারই বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসে…চলমান ভারী আওয়াজে চিন্তিত লিংটান দোরটা সামান্য একটু ফাঁক ক'রে দেখতে গিয়ে দেখে কামনা-লালসায় উদ্দীপ্ত, সৈনিক-টুপীর নীচে ক্রোধে হিংস্র বীভৎস নারকীয় কতগুলি মুখ তাকে যেন ধাওয়া ক'রে গিলে খেতে ছুটে আসছে। দোর না খুললেই হয়তো ভাল ছিল। মাতালের মতন রক্তিম মুখগুলি লিংটানকে দেখে বিকট চিৎকারে ঝাপিয়ে পড়ে দরজার উপরে। মুহূর্তে পেছিয়ে এসে দরজা ঠেলে বন্ধ ক'রে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ধারালো সঙ্গীনের খোঁচা বারে বারে ঘা মেরে বসতে থাকে দরজার কাঠের উপরে। কামনা-লোলুপ সৈনিকদের দেখে বিশ্বাসী কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে চিৎকার ক'রে উঠ্ছে বারে বারে…একটু পরেই আসে তার মৃত্যু-যন্ত্রণার করুণ ক্রন্দন…তারপর চুপচাপ। মন বিষিয়ে ওঠে, কিন্তু বাঁচাতে তো যেতে পারে না লিংটান এই দুঃসময়ে।

কিন্তু এ ভাবে তো খুব বেশীক্ষণ চলবে না…শয়তানরা দোর ভেঙ্গে ঢুকে পড়বে। সেই মুহূর্তের আগেই পরিবার বাঁচাবার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

আর আগেও তো সে যুদ্ধ দেখেছে···সে জানে লড়াইয়ের সৈনিক হ'লে মানুষ আর মানুষ থাকে না। মন-মগজ হারিয়ে শুধু নিম্নাঙ্গের ক্ষুধা মিটাতে দানবের মত সেই কামনা-লেলুপ বন্য পশু ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং মেয়েদের দূরে সরাতে হবে। দোর ভাঙবার আগেই একাজ তার সমাপন করতে হবে। ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে ছেলে-মেয়েদের কোলে নিয়ে মেয়েরা মাঝের বড় ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, আর ছেলে দু'জন কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে বসে পড়েছে। বাপকে দেখে লাও-তা বলে: 'আমরা সব গেলাম—' লিংটান ঠোঁটের উপর আঙ্গুল দিয়ে চুপ থাকতে নির্দেশ ক'রে খুব আস্তে আস্তে বলে:

'আঙ্গুর-লতার পিছনের খিড়কি-দোর দিয়ে তোমরা সব বেরিয়ে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে টিলাগুলোর আড়ালে আড়ালে চলে যাবে, যেন দেখতে না পায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্ত্রী-ছেলেমেয়ের জিম্মা নিয়ে বেরিয়ে যাও···আর লিংসাও ও প্যানসিয়াও-র দায়িত্ব রইল লাওসানের ওপর।'

'কিন্তু আমি থাকব তোমার পাশে,' লিংসাও বলে।

'উহুঁ, তুমি পারবে না। আমি ছাদের সিলিং-এর কোণে উঠে খুঁটির আড়ালে পালিয়ে থাকব।' বলে লিংটান।

'আমিও ওখানে উঠে পালাতে পারব।' লিংসাও জোর দিয়ে বলে।

কথা কাটাকাটি ক'রে মূল্যবান সময় নষ্ট করা যায় না। খিড়কি-দোরের কাছে গিয়ে আঙ্গুর লতা আস্তে আস্তে সরিয়ে বেশ একটু জোর লাগিয়ে লিংটান মরচে-ধরা খিলটি উপরের দিকে ধাক্কা মেরে-দোরটি খুলে ফেলে। এত ছোট দরজা যে উলীনের মার বিরাট বপু কিছুতেই ঐ দোর দিয়ে গলানো গেল না। সর্বশেষে তাকে বের ক'রে দেবার চেষ্টা করবে বলে লিংটান বাড়ির আর সকলকে দিল ঐ দোর দিয়ে বের ক'রে। তারপর বাইরে থেকে উলীন তার মার হাত ধরে টানতে লাগল আর এদিক থেকে লিংটান ধাক্কা দিতে থাকল সেই সুবিপুল মাংস পিণ্ডকে, কিন্তু ছোট দোর দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোন পথই হয় না। সংক্ষিপ্ত সময়ের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বহুর জীবন-ইজ্জত বিপদের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হবে না বুঝে লিংটান উলীনকে বলল বাড়ির আর সকলকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে এগোতে, তার মার দিকে সে নজর রাখবে। উলীনরা এগিয়ে গেল। লিংটান তার ক্রন্দনরতা বেয়াইনকে দোর থেকে তুলে এনে আঙ্গুর-লতার ঝোপের আড়ালে ঢেকে রেখে মনে মনে প্রার্থনা জানাল যেন এই বিপদ থেকে বৃদ্ধা বাঁচে। আর দেরিও তো করা চলে না এখানে···বাইরের দরজা মর মর

শব্দ ক'রে কঁকিয়ে উঠছে, নারকীয় উল্লাসের ভীতি-উদ্রেক শব্দ কানে এসে বিঁধছে।

লিংসাওকে সঙ্গে নিয়ে ঝড়ের বেগে মাঝের ঘরে ঢুকে, এক লাফে টেবিলের উপরে উঠে লাফ দিয়ে ওপরের বরগাটা ধরে লিংটান। তার পিছনে পিছনে উঠে আসে কাঠবিড়ালির মতো লিংসাও। বরগার উপর থেকে নুয়ে প'ড়ে লিংসাওকে তুলে নেয় লিংটান সিলিং-এর উপর। বিপদ-আপদ-আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য লিংটানের পূর্বপুরুষরা এইভাবে লুকোবার গোপন জায়গা তৈরি ক'রে রেখেছিল...বছর দশেক পর পর প্রয়োজনীয় মেরামত পর-পুরুষের লোকেরা করেছে, করেছে লিংটানের বাপ-ঠাকুর্দারা। লিংটান তারই ওপর একটা মোটা বরগার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে আরও ভাল ক'রে এই লুকোবার স্থানটি ক'রে রেখেছিল। খড়কুটো ধুলো-বালির মধ্যে কোনমতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সেই গোপন গর্তে লুকিয়ে রইল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কিন্তু তবুতো বেঁচে থাকা যাবে।

ভাল ক'রে গর্তে বসবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়োল্লাসে সেই স্মরাতুর বন্য পশুরা হুড়মুড় ক'রে ঢোকে তার উঠানে। তারপরই ছুটে আসে বড় ঘবের মধ্যে... বরগার গর্তে বসে বসে ইষ্ট জপ করে দুই ভয়ার্ত জীব বারে বারে প্রার্থনা জানায় পূর্বপুরুষদের কাছে, দম-বন্ধ-করা ধুলোর চাপে যেন তারা হেঁচে না ফেলে, উপর থেকে খড়-কুটো বালি যেন নিচে ঝড়ে না পড়ে...

শূন্য ঘর দেখে মুহূর্তের মধ্যে সৈনিকরা এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে পাতি পাতি ক'রে খোঁজে তাদের কামরার ধন মেয়েদের। আটটি ঘরের কোথাও কাউকে না দেখে জিঘাংসার তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে তারা বাসন-পত্র আসবারের উপর। ভেঙ্গে চূড়ে তছনছ ক'রে দেয় রান্নাঘরের যত বাসন-কোসন টেবিল-চেয়ার-চৌকি, এমন কি ধ্বংসের হাত থেকে বাদ পড়ে না লাও-সানের বাঁশের মাচাটা পর্যন্ত। উপর থেকে ভীত দম্পতি বারে বারে ভাবে, আগুন ধরিয়ে না দেয় বাড়িতে...তা হ'লে জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে। আকুল-আশঙ্কায় লিংটান ভাবে, যদি আগুনই ধরিয়ে দেয় তো কি ভাবে লাফ দিয়ে নেমে স্ত্রীকে নামিয়ে কোন রাস্তায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আগুনের গর্জনের পরিবর্তে কেমন ভীতি-চিৎকার শোনে তারা। তবে কি শুয়োরের বাচ্চা দুটোকে ওরা জবাই করল? কিন্তু তারপরই কানে আসে দু'একটা কি কথা, ঘর্ঘর শব্দ...একটানা গোঁ গোঁ—। তারা বুঝতে পারে

কোথায় কি ঘটল। আঙ্গুর-লতার নিচে উলীনের বৃদ্ধা মাকে শয়তানরা দেখতে পেয়েছে। লিংটান বেরিয়ে যেতে নেয়; কিন্তু লিংসাও লোহার মত শক্ত হাতে তাকে টেনে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে।

'না, যেতে পারবে না। ওঁকে মেরে ফেলেছে...পরিবার রয়েছে, তাদের কথা ভাব, তাদের বাঁচাতে হবে।'

স্ত্রীর কথায় লিংটান সম্বিতে ফিরে আসে, মনে হয় স্ত্রীর যুক্তিই ঠিক।

তারপর সেই বন্য-শক্ররা চলে গেল। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ......স্বামী-স্ত্রী মূক হ'য়ে বসে থাকে, পারে না সামান্য নড়ে চড়ে বসতেও। একভাবে বহুক্ষণ পরস্পরকে জড়িয়ে বসে থাকাতে সমস্ত পা-হাত টনটন ক'রছে, ধুলোর মধ্যে দম বন্ধ হ'য়ে আসে, এই শীতের ঠাণ্ডায়ও তারা ঘেমে ওঠে...। লিংটান স্ত্রীর কানে কানে বলে: 'আমি নিচে নেমে একবার দেখি...যদি ছেলেরা ফিরে এসে না দেখে আমাদের, ভাববে, আমাদের মেরে ফেলেছে।' ছেলের কথায় লিংসাও স্বামীকে ছেড়ে দেয়। স্বামীর পিছনে পিছনে সে-ও নেমে আসে নিচে। নিজের ঘরে—কিছুক্ষণ আগেও নিজের হাতে সাজিয়ে গুছিয়েছে যে সংসার, তারই ধ্বংসস্তূপের মাঝে তারা হা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

সংসারের শ্রীকে গলা টিপে মেরেছে বিজয়ী-বিদেশীরা। বড় ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে চারিদিকের ধ্বংস তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে...চেয়ার-টেবিল-চৌকি, বাসন-পত্র, সংসারের সম্পদ-শ্রী ভেঙ্গেচুড়ে সকলের উপর ধ্বংসের কালো তুলি লম্বা লম্বা করে টেনে দিয়েছে বিদেশী সৈনিকরা। এ-ঘর ও-ঘর সমস্ত জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লিংটান বলল:

'এক চাল ছাড়া কিছুই ওরা নেয়নি। এসব তো কিছু চায়নি ওরা। যা চেয়েছিল তা না পেয়ে এ-ভাবে সব ধ্বংস করেছে।'

জামা-কাপড় ছিঁড়ে, তোষক-বালিশের তুলো বের ক'রে শয়তানরা তাদের রাগ মিটিয়েছে। ওরা আগুন ধরালো না কেন?—লিংটান ভাবে, বোধহয় ধ্বংসের অবশিষ্ট দেখে আমরা যাতে হা-হুতাশ করি তার জন্য।

ছেঁড়া জামা-কাপড়, ভাঙ্গা বাক্স-প্যাঁটরার মাঝে এক গোছা চুল দেখে লিংটান জিজ্ঞেস করে: 'এটা কার?'

লিংসাও চুলের গোছা হাতে নিয়ে দেখে বলে: 'এতো দেখছি নীলার সেই কাটা চুলের গোছা!'

খিড়কির কাছে যে নারকীয় দৃশ্যের মাঝে তাদের যেতে হবে, সেকথা ভেবে মন ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে। তবুও নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। লিংটান বলে :

'সেই দৃশ্য আমরাই তো সর্বপ্রথম দেখব...ছেলেপিলেদের যেন তা না দেখতে হয়...তাদের আসবার আগেই লাশ সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ভাঙা-রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে খিড়কি দোরের পাশে মৃত দেহের সামনে এসে তারা দাঁড়ায়। এ যদি শুধু মৃতদেহ হ'তো হয়তো মনের দাগ কোনমতে মিটিয়ে নেওয়া যেত। কামড়ে-খিমচে বিকৃত ক'রে দেওয়া উলঙ্গ বৃদ্ধার মৃত-দেহের দিকে তাকিয়ে তারা চমকিয়ে ওঠে...সুন্দরী যুবতীদের পেলে না জানি কী করত ঐ বন্য-পশুরা! লালসার কামনার আগুন ঠাণ্ডা করেছে তারা এই বিপুল দেহা বৃদ্ধার উপর দিয়ে। বাড়ির মেয়েরা যদি কেউ পড়ত এই বর্বরদের হাতে কি হ'ত আজ? লিংসাওকে পেলেও তো বর্বররা এমনি করত! বর্ণহীন আকাশে মুখ ঘুরিয়ে হতভম্ব লিংটান তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে।

'শত্রুদের আসল চেহারার নগ্ন প্রকাশ তো দেখছি চোখের উপরে...কি ভাবে বাঁচাব মেয়েদের? আমি পালিয়ে থাকতে পারব, ছেলেরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু মেয়েদের বাঁচাই কি ক'রে?' বেদনাহত ভাঙা কণ্ঠে লিংটান বলে।

কোন কথা বলতে পারে না লিংসাও...যে বীভৎস চিত্র তার চোখের সামনে, তার জীবনেও তো এটি ঘটতে পারত! কী উত্তর দেবে স্বামীর প্রশ্নের? বিকৃত উলঙ্গ শবের দিকে তাকিয়ে দেখে শিউরে উঠে স্বামীর সামনেও কেমন লজ্জায় অবনত হ'য়ে পড়ে সে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে টেনে ছিঁড়ে-ফেলা বৃদ্ধার কাপড় মাটি থেকে তুলে নিয়ে লিংসাও ঢেকে দেয় বৃদ্ধার বিকৃত উলঙ্গ দেহ। সেই বিপুলা দেহা আত্মীয়ার শবকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা ক'রে তারা ব্যর্থ হয়ে বসে পড়ে। তিন চার জনের কাজ তারা দু'জনে পারে না করতে। মৃতার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে খিড়কির দোর খুলে বাইরের দিগন্ত প্রসারী রৌদ্রভরা মাঠ-ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখে...কই, তাদের জীবনের বিপর্যয়ের ছাপ তো প্রকৃতির গায়ে কোন রেখাই টেনে রাখেনি...সূর্য যেমন ওঠে তেমনি আজও উঠেছে। ভগবান, এত নির্দয় তুমি! বিকৃত শবের অসহনীয় দৃশ্য সইতে না পেরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে লিংটান চলে এল। আহারের কথা মনে আসে

না। সমস্ত দিনমান চুপচাপ বসে থাকে...রাত্রির অন্ধকার কখন নেমে এসে গ্রাস করবে এই দিনের আলোকে। রাত্রির অন্ধকারে নিশ্চয়ই ছেলেরা এসে খবর দেবে কে কেমন কোথায় আছে, খোঁজ নেবে বাপ-মায়ের, গৃহের। ঘরের মধ্যে বসে বসে ওরা বুঝেছিল তাদেরই মত ইজ্জৎ হারানোর দুর্ভাগ্য শহরের বোমা বর্ষণের মতই নেমে এসেছে গাঁয়ের প্রতি ঘরে, লিংটানের আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শীর গৃহকোণে। কিন্তু সাহসে ভর ক'রে বেরিয়ে খোঁজ নিতে পারে না লিংটান। নিজের দুর্ভাগ্যের লিখন ঘরের কোণে বসে নিজেরই সহ্য করতে হবে যে।

দিনের যেন আর শেষ নেই ..মুহূর্তের প্রতিটি পল গুনে গুনে তারা প্রতীক্ষা করে রাত্রির আগমনের। অবশেষে এল রাত্রি .তারই সঙ্গে এল চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি ফেলে ঝোপের আড়ালে আড়ালে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দুই ছেলে। অন্ধকারে বসে তারা শুনল কাদের যেন পদধ্বনি উঠানের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে ভাঙ্গা বাসনে ধাক্কা খেয়ে ঝনঝনিয়ে উঠল। তারপর মৃদু কণ্ঠের শব্দ : 'চলে গেছে ?'

'না, আমরা আছি,' অন্ধকার ভেদ ক'রে লিংটান ফিসফিসিয়ে জবাব দেয় .. দু'হাতের স্পর্শের ভিতর দিয়ে সে জানতে চায় কুশল বারতা। আলো জ্বালাবার কথা তারা ভাবতে পারে না।

'নাতি-নাত্নীরা সব কোথায় ?' লিংসাও জানতে চায় ছেলেদের কাছে। সমস্ত দিন ধরে বারে বারে তার মনে হয়েছে এদের কথা। এই শয়তান হিংস্র নর-পশুরা হয়তো এদের মেরে কেটে খেলনার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

'সব শহরে,' ফিসফিস ক'রে লাও-তা উত্তর দেয়।

'শহরে !' লিংটান ব্যস্ত হ'য়ে প্রশ্ন করে : 'শহর। সে-তো বিপদের প্রধান ঘাটি।' তাড়াতাড়ি লাও-তা বলে :

'অনেক ঘুরে শহর-প্রান্তের জলার পাশে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। লোকের মুখে শুনলাম মেয়েদের আর শিশু-সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় শহরের মধ্যেই বলে একটা আছে। এই শত্রু-সেনারা আমাদের মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে কি অকথ্য হিংস্র পাশবিক অত্যাচার করেছে তার ভয়াবহ বিবরণ শুনে মনে আর সাহস পেলাম না এই পথ দিয়েই ওদের আবার গাঁয়ে ফিরিয়ে আনতে...খালি হাতে ঐ নর-পিশাচদের হাত থেকে কি ক'রে বাচাব মেয়েদের ? জলাশয়ের এদিকে নিরিবিলি দেখে শত্রুরা এ অঞ্চলে হানা দেয় নি। সমস্ত

দিন ঝোপে ঝাড়ে দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে জলাশয় পেরিয়ে সেই আশ্রয়স্থানে মেয়েদের ও শিশুদের নিরাপদে রেখে এসেছি। একজন বিদেশী স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে এই প্রাচীর-ঘেরা আশ্রয়স্থলটির বিরাট বাড়িটা বলে একটা মেয়েদের স্কুল। সেই বিদেশিনীকে আমি দেখলাম, বেশ ভদ্র সুশ্রী দেখতে, যদিও তার ধর্ম এবং আমাদের ধর্ম এক নয়। দোরে বারকয়েক ঘা দিতে সেই বিদেশিনী নিজে দোর একটু খুলে যখন দেখলেন আমাদের বিপদগ্রস্ত মেয়ে শিশু-সন্তানদের, তিনি তাদের আশ্রয় দিলেন।'

'তাহ'লে তোরাও থেকে গেলি না কেন?' লিংটান জানতে চায়।

'শুধু বিপদগ্রস্তা মেয়ে শিশু-সন্তানদের জন্যই ঐ আশ্রয়স্থল।' লাও-তা বলে।

'ওখানে ওরা সত্যি সত্যি নিরাপদ তো?'

'লোকের মুখে শুনলাম, শয়তানদের এই অত্যাচারের মধ্যে ওর থেকে নিরাপদ আশ্রয় আর শহরে বলে এখন আর একটাও নেই।'

লিংটান এবারে তার অন্য কাজের কথায় আসে। ছেলেদের বলে :

'ওখানে মেয়েরা যদি সত্যিই নিরাপদে থাকে, তবে রাত থাকতে আজই তোদের মাকে সেখানে রেখে আসবি।'

বিস্ময়াবিষ্ট ছেলেরা মায়ের দিকে তাকায়। কেমন লজ্জায় অবনত মস্তকে নীরবে সে বসে আছে। আজই জীবনে সর্বপ্রথম লিংসাও বলতে পারল না : 'কোন পুরুষকেই আমি ভয় করি না—'

'কিন্তু মা, মা কি—' তো তো ক'রে লাও-তা বলে!

লিংটান উলীনের বৃদ্ধা মায়ের উপরে শত্রুদের অপকীর্তির কাহিনী ধীরে ধীরে লাও-তার কাছে বলে। নিশ্বাস চেপে সে-কাহিনী শুনে হা হ'য়ে যায় লাও-তা। মাকে বলে :

'এস মা, তোমাকে সেই আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দিতে আমিই যাব। লাও-সান থাক বাবার সঙ্গে। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমরা তিনজন কোনমতে এখানকার কাজকর্ম চালিয়ে নেব, তুমি ভেব না...আর তোমরা যদি নিরাপদ থাকতে পার তো আমরা এখানকার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারব।'

আঠারো বছর বয়সে লিংসাও এ-গৃহে প্রথম পদার্পণ করেছিল। যৌবনের কত সুমধুর স্বপ্ন তারা দেখেছে...এক রাত্রির জন্যও পারেনি তারা পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে। কী ক'রে আজ যাবে একজনকে ছেড়ে আর একজন?

ছেলেরা পিছন ফিরে একটু দূরে সরে দাঁড়ায়। বিরহাকুল স্বামী-স্ত্রী নিজে-

দের পায়ে না ধরে রাখতে...ছেলেদের পিছনে এ-ভাবে বিরহ ব্যথার গোপন প্রকাশও তারা কোনদিন ভাবতে পারে নি। কিন্তু তা-ই হ'ল আজ...লিংসাও স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে :

'তোমাকে ছেড়ে আমি যাই কি ক'রে ?'

'কিন্তু যেতে যে হবেই...শত্রু-সেনার কামনার যে হিংস্র রূপ দেখলাম তোমার বয়সের মারাও যে বাদ যায় না সে-আক্রমণ থেকে। এ না হ'লে তুমি আর আমি তো এভাবে ছাড়া ছাড়ি হতাম না কোনদিন।'

অনেক যুদ্ধ লিংটান দেখেছে, শত্রুর কামনা-লোলুপ দৃষ্টি সে দেখেছে নিজের দেশের সৈন্যদের চোখে, কিন্তু কোনদিন লিংসাওর বয়সী মায়েদের উপর এরা ঝাপিয়ে পড়েছে, এ কখনও শোনেনি। অসভ্য জানোয়ার বন্য-পশুর লোলুপতা ঐ হিংস্র শত্রু-সেনাদের আছে বলেই না তারা পারে এ পাশবিক অপকর্ম করতে। আরও ক্ষণেকের জন্য স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ধীরে তাকে ছেড়ে দিয়ে লাও-তাকে ডেকে বলে :

'মাকে নিয়ে যাও, বেশ সাবধানে নিয়ে যেও, যেন কোন বিপদ আপদ না হয়।'

'হ্যাঁ বাবা, সাবধানেই যাব।' পুত্র জবাব দেয়।

লিংটানের গৃহলক্ষ্মী গেল চলে...সমস্ত রাত্রি তার জাগরণে কাটে ব'সে ব'সে, কখন লাও-তা ফিরে এসে জানাবে নিরাপদে তার মাকে সে রেখে এসেছে। বারে বারে ইচ্ছা জাগে কেন সে নিজেও গেল না সেই আশ্রয়স্থান দেখে আসতে ? কিন্তু কীইবা এগোতো তাতে ? এই দুর্দিনের বিপদের মাঝে তিনজনের থেকে দুজনাই যাওয়া তো ভাল, আর ছোট ছেলেকে একলা ফেলে সে যাবেই বা কি ক'রে ? আর চারজন তো যাওয়াও যায় না, দুজনার পদধ্বনির দ্বিগুণ শব্দ উঠবে তাতে।

লাও-সানকে আস্তে ডেকে লিংটান বলে : 'একটা জায়গা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে শুয়ে পড়।' দুর্দিনের দুঃখের মাঝেও ক্লান্তিতে কিশোর বালক শুয়ে পড়ে। নিমেষে নিজেকে সঁপে দেয় সুপ্তির কোলে।

ধ্বংসের স্তূপের মাঝে বসে প্রহর গোনে লিংটান। অবশেষে অনেক রাত্রে নিরাপদে লাও-তা ফিরে আসে, শত্রুদের হাতে সে পড়েনি।

"সেই শ্বেতাঙ্গ বিদেশিনী নিজে বেরিয়ে এসে মাকে নিয়ে গেছে সেই অট্টালিকার মধ্যে। বলেছে, যদি কারও বিপদ না হয় তো, তোমার মারও হবে না।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে থাকে লিংটান। নিরাপদ আশ্রয়ে তার স্ত্রী স্থান পেয়েছে…শ্রান্তির বোঝা তার ঘাড়ে যেন চেপে বসে, কিন্তু কেমন অনড় হয়ে যায় সে, কথা আসে না মুখে, ঘুম নামে না চোখে…। শ্রান্ত লাও-তা ধ্বংস-স্তূপের কিছু সরিয়ে নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত পুত্রদের পাশে বসে ক্লান্ত লিংটান ঘুম-না-আসা চোখে শুধু প্রহর গোনে…কত রাত্তির কোন্ প্রহর? মোরগের অতি পরিচিত কর্কশ ধ্বনি কানে আসতে মাথা তুলে দেখে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে দিগন্তের-কোলে অরুণালোকের অতি ক্ষীণ প্রকাশ একটু একটু ক'রে দেখা দিচ্ছে।

'গাঁয়ে মোরগ ডাকে এখনও?' আশ্চর্য হ'য়ে ভাবে লিংটান। তারপর বসে বসে তাকিয়ে দেখে গৃহের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে নিদ্রিত পুত্রদের মুখে-দেহে উষার প্রথম আলো এসে পড়ছে।

॥ সাত ॥

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় লিংসাও তাকিয়ে দেখে সেই শ্বেতাঙ্গ-বিদেশিনীকে। পিছনের দরজা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, ছেলে ফিরে গেছে। নতুন পরিবেশে বিদেশিনীর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখে: তাদের মত চুল তো পাট করা নয় এর, কেমন পাকানো উলের মত চুলের গোছা, চোখের মণি বিড়ালের মত শাদা। বিদেশিনী তাকে বলল:

'এস, তোমার মেয়েরা যেখানে আছে তোমাকে সেখানে পৌছে দি।'

আশ্চর্য, তাদের ভাষায় যে সে কথা বলে! কি ক'রে জানল? প্রশ্ন শুনে বিদেশিনী হেসে বলে:

'কুড়ি বছর আমি আছি তোমাদের এ-শহরে। তোমাদের ভাষা শিখেছি বলেই তো কথা কইতে পারি।'

দুই দেয়ালের মাঝে ঘাসের উপর দিয়ে লিংসাওকে নিয়ে বিদেশিনী অট্টালিকার দিকে এগোয়। বড় বড় গাছের ডাল বাহু বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাথার উপর। বাড়ির ভিতর ঢুকে এক প্রশস্ত হলের মধ্যে গিয়ে প'ড়ে লিংসাও দেখে তারই মত কত আশ্রয়প্রার্থী ছেলে মেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। সিলিং থেকে একটা আলো ঝুলছে। বিদেশিনী লিংসাওকে

হলের এক কোণে নিয়ে এসে তার মেয়ে বৌ নাতি-নাত্নীদের দেখিয়ে বলে : 'ঐ কোণায় দেখ তোমার পরিবারের সকলে আছে।'

নিদ্রিতাদের মধ্য দিয়ে সাবধানে পা ফেলে একটা উঁচু টেবিলের পাশে দেখে অর্কিড, নাতি-নাত্নী সব ঘুমিয়ে পড়েছে। লিংসাওর আগমনে নাতি-নাত্নী কেউ জাগল না। লিংসাও দেখল প্যানসিয়াও শুধু জেগে নীরবে কাঁদছে। মাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে ছোট মেয়ের মত ছুটে মাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে : 'তুমি এসেছ মা ?'

'হ্যাঁ রে, ভয় নেই, এই তো আমি,' সান্ত্বনা দিয়ে লিংসাও মেয়েকে আদর করে।

'বাবা, বাবা কোথায় ?'

'তোর বাবা আর দাদারা বাড়ীতেই আছে...তোরা এখানে ভাল আছিস তো ?' ফিসফিস ক'রে লিংসাও জিজ্ঞেস করে।

'সমস্ত দিন এত ভয়ে ভয়ে কেটেছে যে কিছু খেতে পারি নি।'

'এখন শুয়ে পড়...কাল দেখি তোর জন্যে আমি নিজেই খাবার তৈরি করব।'

'কিন্তু ওরা আমাদের খেতে দিয়েছিল, আমি একেবারে খেতে পারিনি।' লিংসাও শুয়ে পড়ে। বড় মেয়ে মাথা তুলে মাকে একবার জিজ্ঞেস করে তার শাশুড়ীর কথা। রীতি অনুযায়ী এই প্রশ্নই তার করা উচিত, কারণ স্বামীর পরিবারের প্রধান যিনি, তিনিই তো পুত্রবধূর কাছে তার নিজের মার থেকেও আপনার। লিংসাও বোঝে মেয়ে ঠিকমত প্রশ্নই করেছে। তবুও মনে মনে লিংসাও ভাবে, মেয়ে রীতি রক্ষা না ক'রে অন্য প্রশ্ন করলেই যে ভাল হ'ত। সোজা সত্য কথা সে বলতে পারে না, মিথ্যা ক'রে উত্তর দেয় : 'যে রকম বয়স হয়েছে তার, বাড়িতেই রেখে...হ্যাঁ, জামাই কোথায় ?'

'আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে উঁ গেছে নিজের দোকানের দিকে...শহর যখন শত্রুদের হাতে পড়েছে, শহরে শান্তিও শিগ্‌গির ফিরে আসবে, বিপদের আশঙ্কা আর নেই, এই-ই ওঁর ধারনা...। ব'লে গেছেন, শহরের হাল-চাল বুঝে সুযোগ মত আমাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।'

ফিসফিসিয়ে কথা বলার শব্দও পাশাপাশি অনেক আশ্রিতার তন্দ্রা ছুটিয়ে দিল, একে একে অনেকে উঠে ব'সে নবাগতাকে দেখতে লাগল। বড় মেয়ের পাশে শুয়েছিল এক অপূর্ব সুন্দরী তন্বী। সে উঠে বসতে তার দৃষ্টির দিকে

তাকিয়ে লিংসাওর কেমন খটকা লাগল। ঐ দৃষ্টি যে মেয়ের চোখে সে কি বিশ্বাসী স্ত্রী হবে? মনে মনে লিংসাও ভাবে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে:

'কথা বলে কি তোমার বাচ্চাকে জাগিয়ে দিলাম, মেয়ে?'

'না মা, আমি নিঃসন্তান।' ধীর কণ্ঠে সুন্দরী জবাব দেয়।

'তুমি কী এখানে একাই এসেছ?'

'আমারই মত আরও ছ'জন আমার সঙ্গে আছে।'

লিংসাও বুঝলো এরা বারাঙ্গনা...সতী সাধ্বী মেয়েদের এদের থেকে দূরে থাকাই বিধেয়। নিজের মেয়ে আর ঐ সুন্দরীর মাছে নিজেকে বিস্তৃত ক'রে দিয়ে লিংসাও ভাবে এভাবেই ওদের মাঝে ব্যবধান রেখে মেয়েদের নাতি-নাত্নীদের ঐসব সুন্দরীদের সম্ভাব্য অসুখ-বিসুখের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করবে।

কিন্তু লিংসাওর পাশের সুন্দরী তখনও ব'সে...ধীরে কোমল কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে:

'মা—,' লিংসাও আশ্চর্য হ'য়ে যায় এ মধুর ডাকে: 'আমাদের পরে যখন তুমি হেথায় এলে, শহরের এখনকার অবস্থা আমাদের কিছু বলতে পারবে কি?'

'আমি তো শহরের ভেতর দিয়ে আসি নি।' লিংসাও সংক্ষেপে জবাব দেয়।

'ও, তাহ'লে তুমি গ্রামাঞ্চল থেকে আসছ মা?' আরেকজন সুন্দরী প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ', লিংসাও এবারেও সংক্ষেপে জবাব দেয়।

'ও...তাই তুমি জান না, কী বীভৎস নারকীয় অবস্থা হয়েছিল এই শহরে!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি হাঁটুর ওপর কপালটি ঠেকিয়ে মুখ নিচু ক'রে বসে থাকে।

লিংসাও কিছু বলবার আগেই ঘুম ভেঙ্গে অর্কিড উঠে ব'সে শাশুড়ীকে দেখে মৃদু চেঁচিয়ে ওঠে: 'মা, তুমি এসে গেছ? আমাদের চলে আসবার পর বাড়ির কি অবস্থা হয়েছে মা...বাড়িতে কে কে রইল?' এত জোরে সে কথা বলে উঠেছে যে সে-চিৎকারে বহু ছেলে-মেয়ে ঘুম থেকে হক্‌চকিয়ে উঠে গেছে...এপাশ-ওপাশের বহু আশ্রিতা অর্কিডকে চুপ হতে বলে। পুত্রবধূর অবস্থা বুঝে না-চলার ধরন দেখে লিংসাও রেগে ততোধিক জোরে অর্কিডকে ধমকে ওঠে:

'হা ভগবান! চিৎকার ক'রে সকলের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে?...থাক্ থাক্ আর কোন কথা তোমাকে বলতে হবে না।'

আর কোন কথা না ব'লে অর্কিড শুয়ে পড়ে। সমস্ত দিনের ব্যথা-বেদনার দুর্দান্ত ঝড়ের পরে চোখ মুদে সব আশ্রিতারা ভুলে যেতে চায় সেই বেদনাময় অত্যাচারের ইতিহাস: লিংসাও পারে না ঘুমুতে...জীবনে শুধু দুটি মাত্র বিছানায় সে ঘুমিয়েছে...বিয়ের আগে বাপের বাড়ির সেই স্বল্প-পরিসর বিছানায়, আর বিয়ের পরে পরমানন্দে স্বামীর কাছে প্রশস্ত বিছানায়। অপরিচিতা যুবতীর পাশে শুয়ে আর কানের কাছে বড় মেয়ের নিশ্বাসের শব্দে তার চোখে ঘুম আসে না। দীর্ঘনিশ্বাস, নাক ডাকানো কিংবা ঘুমের মধ্যেও গোঁ গোঁ শব্দে সে জেগে থেকে প্রহর গোনে। সমস্ত দিনের দুর্ঘটনার ছবিগুলো বারে বারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।...বৃদ্ধ স্বামীই বা একা একা কি করছে এখন? গভীর মধ্য-রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে বারে বারে সে ভাবে প্রত্যুষে উঠে মুখে কালি মেখে, ছেঁড়া জামা-কাপড় পড়ে আরও বৃদ্ধা সেজে সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু ভোরে উঠে সে-সাজে সে সাজতে পারে না.. হাজার বিকৃত সাজে সাজলেও কোনমতেই কুৎসিৎ মোটা উসাওর থেকে সে-তো বৃদ্ধা সাজতে পারবে না।

প্রত্যুষে বিছানা ছেড়ে উঠে, মেয়ে-বৌকে উঠিয়ে নাতি-নাত্নীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলে। এরই মধ্যে আরও অনেক বাচ্চারা কেঁদে উঠে বসেছে, অনেক মা-দিদিমা গা মোড়ামুড়ি ছেড়ে উঠে বসতে থাকে। কিন্তু অনেকে যেমন ছিল তেমনি ঘুমিয়ে থাকে। লিংসাওর পাশের সুন্দরী যুবতীরা লাল-রেশমী লেপ গায়ে জড়িয়ে তখনও ঘুমিয়ে রয়েছে।

'এরা তো বেলা পর্যন্ত ঘুমুবেই...রাতের কারবারী এরা, জাগরণে যায় বিভাবরী, আর সমস্ত দিন পড়ে পড়ে ঘুমোনো—' লিংসাও একটু বিরক্ত হয়েই ভাবে এদের সম্বন্ধে। বড় মেয়ে আর পুত্রবধূ অর্কিডকে পাশে ডেকে ফিসফিসিয়ে এরা কি-জাতের মেয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বারণ ক'রে দেয় এদের সঙ্গে কথা কইতে। ছেলে-মেয়েরাও যেন এইসব বদ মেয়েদের কাছে না যেতে পারে। প্যানসিয়াওকে ডেকে বলে: 'তোকে যদি এই অচেনা মেয়েরা ছোঁয় কি কথা কইতে চায় তো কোন জবাব না দিয়ে সরে আসবি...অনেক ভাল মেয়ে পাবি হেথায় কথা কইবার। কিচ্ছু দরকার নেই, তুই আমার পাশে পাশে থাকবি, কোন অচেনা মেয়ের সঙ্গেই কথা কইবি না।' নিজের

পাশে সককে ধরে রেখে সেই নিদ্রিতা যুবতীদের দিকে মাঝে মাঝে সে তাকিয়ে দেখে।

বেলা অনেকটা বাড়লে বড় বড় ঝুড়ি ভ'রে ভাত, নোনা মাছ আর তরকারি নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করল একদল পরিবেশিকা। তারা নিয়ে এল থালা আর ভাত খাবার কাঠি। 'পয়সা না দিয়ে খাই কি ক'রে?' লিংসাও পরিবেশিকাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে। বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার সময় তাড়াতাড়িতে স্বামীর কাছ থেকে টাকা কড়ি আনতে সে ভুলে গেছে। আর পয়সা না দিয়ে কোন্ লজ্জায় এভাবে পরের দেওয়া ভাত তারা মুখে তুলবে?

মৃদু হেসে পরিবেশিকারা বলল: 'লজ্জার কিছু নেই মা, নির্ভাবনায় তোমরা খাও...যারা এ ভাত জোগাড় করছে, তারা পরকালে গিয়ে আত্মার তুষ্টির জন্য এ-ব্যবস্থা করছে, বিপদগ্রস্তদের প্রাণ বাঁচিয়ে খাইয়ে দাইয়ে পরকালের পুণ্য সঞ্চয় করছে...।'

'ও! এই জন্যেই বুঝি তিনি আমাদের প্রাণ বাঁচাচ্ছেন?' আশ্চর্য হ'য়ে লিংসাও বলল। তারপর লজ্জা ক্ষোভ না রেখে তারা পেট পুরে সকলেই আহার শেস করল।

যখন সকলের আহার প্রায় শেষ হ'য়ে এল, তখন সেই সাত-সুন্দরী বিছানা ছেড়ে উঠে, হাত দিয়ে সুগন্ধী চুল ঠিক ক'রে কোণের "বেসিনে" গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিল। সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা যে-ভাবে মুখ-হাত ধোয়, এরা তারও বেশী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল ক'রে ধুয়ে নিল। তারপর এক সঙ্গে এসে অন্যদের সঙ্গে না মিশে আলাদা বসে নিজেদের খাবার খেয়ে নিল। কারও দিকে একবার ফিরেও দেখল না, কিন্তু সব মা, সতী-সাধ্বী স্ত্রী কন্যারা অপাঙ্গে এদের দিকে তাকিয়ে দেখল বার বার, দেখল এদের চাল-চলন। যদি এদের কাছে কোন বাচ্চা এসে যায় তো তারা ছুটে গিয়ে নিয়ে যায় এদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

নতুন দিনের সুত্রপাত হোলো এই ভাবেই। শিশু-সন্তানদের বাদ দিয়েও এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে শ'খানেক বিপদগ্রস্তা নারী। বৃহৎ উঠানে শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে আশ্রিতারা হেঁটে হেঁটে এর-ওর খবর শোনে। সুগৃহিনী লিংসাওর উজ্জ্বল গোলাকৃতি মুখের তোজোদৃপ্ত চোখ আর কাঁচা-পাকা চুল আকর্ষণ করে সকলকে...মন খুলে এর সঙ্গে কথা বলা যায়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার উপদেশ নেওয়া যায় এ-প্রৌঢ়ার কাছে। তাই কথা বলার আগে অতি সহজেই সকলে তাকে সম্ভাষণ জানায় 'মা' ব'লে।

এক এক ক'রে বহুর কাছ থেকে যখন লিংসাও শুনল সেই বীভৎস নারকীয় অত্যাচার কাহিনী, ভীত হ'য়ে উঠল সে। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে, শান্তির প্রত্যাশায় তারা যখন শক্রর আগমনের দিন গুনেছে, সেই শক্র-সেনা যখন এল শহরের বুকে, কী সে লোলুপতা, কী সে নৃশংশতা, হিংস্রতা, বর্বরতা ! হতভম্ব হ'য়ে গেছে সব। সমগ্র জাতির মধ্যমণি এই সম্পদশালী শহরে তারা যখন প্রবেশ করল, বন্য-পশুর পাশবিকতা সঙ্গে নিয়েই শুধু তারা এল না, তার থেকেও জঘন্য এরা, কারণ বন্য-পশুরা পুরুষ-নারী ভেদাভেদ ক'রে মারে না, কিন্তু এরা পুরুষকে হত্যা করে, মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। বৃদ্ধা যুবতী বিচার করে না এরা। মহাউল্লাসে উত্তুঙ্গ কামনার শিখরে প্রথমে এরা বাড়ী থেকে লুট ক'রে নিয়ে গেছে যুবতীদের, তারপর নিয়েছে প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের।

'আমার দিদিকে—' কাঁদতে কাঁদতে একটি মেয়ে বলল লিংসাওকে : 'যখন ঐ বর্বররা এসে ধরল, তার পাঁচ মাস বয়সের মোটা-সোটা কোলের শিশুটি প্রাণপণ চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠল . চিৎকারে বিরক্ত হ'য়ে দিদির কাপড় ঐ বাচ্চার মুখে গুঁজে দিয়ে হাত-পা বেঁধে পর পর একত্রিশ জন ..দিদি আমার ঐখানেই মরে গেল .'

'তুমি নিজের চোখে দেখেছ বাছা ?' লিংসাও মৃদুকণ্ঠে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে।

'না, বাবার কাছে আমি শুনেছি। অবিবাহিত বলে বাবা আমাকে আগেই এ-গৃহের আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সগু-প্রসূতি আর বিবাহিতা নারীর অপমৃত্যু যে এ-ভাবে হ'তে পারে কে ভাবতে পেরেছিল এর আগে ? তাই দিদি তার শিশু-পুত্রকে নিয়ে বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল।'

বিজয়ী শক্র-সেনারা যখন শহরের বুকে উল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে, যুবতীদের বিশেষ ক'রে সুন্দরীদের দিন কয়েকের জন্য লুকিয়ে রাখতে হয় যে পর্যন্ত না শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে—একথা সকলেই জানে। কিন্তু এ-বর্বরতার তুলনা মেলাই ভার। এর আগেও অনেকবার এ-শহর সৈন্যদের বিজয়োল্লাসের উন্মাদ নৃত্যে কেঁপে উঠেছে.. কিন্তু এবারের, এই বিদেশী সেনাদের বিজয়ের আগে থেকেই শান্তি-শৃঙ্খলার দূত হিসেবে, দেশী সেনাদের থেকেও তারা ভাল ব'লে চিত্রিত করা হয়েছে সাধারণ দেশবাসীর কাছে, ফলে নিরাপদের সুব্যবস্থার দিকে কেউই বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোঝে নি।

সরল বিশ্বাসে তারা দিন গুনে প্রতারিত হয়েছে।…কত নির্দোষী অজানা পুরুষকে যে এরা গুলি ক'রে হত্যা করেছে তার হিসাব কে দিবে? প্রত্যক্ষ-দর্শিনীরা লিংসাওকে বলে: শত্রুকে দেখে যারা দৌড়ে পালাতে গেছে, পিছনের গুলির ঝাঁকে তাদের মুখ থুবরে পড়ে মরতে হয়েছে। এ-ভাবে এক-একদিন সহস্র লোকের মৃত্যু হয়েছে। সৈন্যদের মত যাদের তাগরা দেখেছে তাদের হত্যা করেছে….এক-একদিনে এ ভাবেই মারা গেছে সহস্রাধিক জোয়ান পুরুষ। তারপর কঠিন গতর খাটানো কাজের চাপে ফেলে দিয়েছে কত-জনকে…বৃদ্ধ, কিশোর, দুর্বল, শিক্ষিত কেউ বাদ যায়নি…কাজ অসমাপ্ত থাকলে গুলির মুখে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের। এক-একদিন হাজার হাজার লোকের প্রাণ গিয়েছে শুধু এইভাবেই।

প্রত্যক্ষ-দর্দিনীদের আত্মীয়-স্বজনের সেই হত্যা কাহিনী, নিজেদের আত্মীয়াদের উপর সেই চরম নাশবিকতার বিবরণ শুনে লিংসাও দিশেহারা হয়ে যায়। এ ছাড়া লিংসাওর এদিকে-ওদিকে কত আশ্রিতা তো পাথরের প্রতিমার মত চুপচাপ বসে আছে….কত নির্মম অত্যাচারের কাহিনী তাদের মনের গহন-গহ্বরে জমে আছে, অশ্রুজলে তার ভাষা গেছে হারিবে। নিদারুণ বীভৎসতা তাদের সুসংবদ্ধ চিন্তার খেই ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। ভাগ্যহীনাদের করুণ কাহিনীর বীভৎসতায় ক্লিষ্ট লিংসাওকে ভয়ের ভূত যেন ঘিরে ধরে, জীবনে কোনদিন এভাবে সে ভীত হয় নি। এই ভয়াবহ অমানুষ নর-পিশাচ নয়া-শাসকদের হাতে গিয়ে পড়ল গ্রাম, শহর, তাদের মাঠ-ঘাট। ভবিষ্যতের গহ্বরে তাদের আশাহীন ভাগ্য-লিপি কী যে রচনা ক'রে রেখেছে কে জানে? কু-শাসকদের তারা যে আগে দেখেনি তা নয়, তাদের আগেও কু-শাসন সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু এই নায়াশাসকরা যে মনুষ্যত্বহীন বর্বর।

দিনের অবসানে লিংসাওর জীবনে গৃহ-ছাড়া দ্বিতীয় রাত্রি নেমে এল… দুঃখে বুক ভার হ'য়ে আসে…তাইতো, সমস্ত দিন স্বামীর কথা যে একবারও মনে আসেনি, পরের করুণ-কাহিনী তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল। আজ ভোরে উঠে মনে ক্রেছিল কোন ছল ছুতোয় ঐ সুন্দরী নটীদের পাশ থেকে তার মেয়ে-নাত্নীদের সরিয়ে অন্য এক স্থানে বিছানা পাতবে, কিন্তু তাও ভুলে গিয়েছে। নিদ্রিত নাতিদের পাশে মায়েদের শুয়ে দেখে গত রাতের মত সেও শুয়ে পাশ ফিরে দেখে সেই সুন্দরীদের। যতটা পারে ব্যবধান রচনা ক'রে নিয়ে চুপচাপ সে শুয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ

থেকে পাশের শায়িতা সুন্দরীকে জিজ্ঞেস করে—স্বরে তার ভিতরের অসন্তোষ ফুটে ওঠে :

'তোমরা এখানে এলে কেন? তোমাদের মত মেয়েদের তো এরকম আশ্রয়ের দরকার হয় না।'

বিষাদের করুণ ক্ষীণ হাসি সুন্দরীর পাতলা ঠোঁটের কোণে খেলে যায়, বলে : 'আমরাও যে মেয়ে···পশুকে আমরাও তো ভয় করি মা।' সেও নিজেকে লিংসাওর কছে থেকে আরও একটু টেনে সরিয়ে নিয়ে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দিয়ে সংসারী মেয়েদের শুচিতা বাঁচাতে যেন সাহায্য করে। আর কোনো কথা লিংসাওর সঙ্গে হয় না, নিজেদের সঙ্গীদের সঙ্গে মৃদু ভাষায় কি যেন সে ফিসফিস ক'রে বলে, লিংসাও বুঝতে পারে না। এরা এসেছে অন্য এক শহর থেকে, ভাষা তাদের ভিন্ন। কিন্তু অনেক ভাষায়ই তো এরা জানে, কারণ, বহু পুরুষের মনোরঞ্জন করাই যে এদের পেশা। এমনকি বিদেশী ভাষাও এরা জানে, কারণ, বিদেশী নাবিকদের নিয়েও তো এদের কারবার। এ কথা সকলেই জানে, লিংসাও-ও শুনেছে।

লিংসাও-র মনে হয় এরা বোধহয় স্থচো শহরের মেয়ে। জিজ্ঞেস করে : 'কোথাকার লোক তোমরা? স্থচো থেকে এসেছ কী?'

'হ্যাঁ, স্থচো থেকেই এসেছি মা।' সুন্দরী জবাব দেয়।

'তবে তোমরা এ শহরে এলে কেন?' লিংসাও প্রশ্ন করে। তার মনে খটকা লাগে, সৈন্যদের কাছ থেকে পয়সা লুটতে এরা যদি এই শহরে এসে থাকে, তবে সেই নর-পশুদের কামনার আগুন থেকে সংসারী মা-মেয়েদের সতীত্ব বাঁচাবার জন্য কেন তারা বাইরে থেকে সে-কাজ করে না?

যুবতী উত্তর দেয় : 'স্থচো-র পতন পর্যন্ত আমরা ওখানেই ছিলাম। একটা বাড়িতে আমরা ছিলাম তেইশ জন বাইজী ও নটী···আমরা পালিয়েছিলাম, কিন্তু সকলেই, মা, পালাতে পারেনি। শুধু এই কয়জন কোনমতে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছি। সেই কামনা-লোলুপ নৃশংশ অত্যাচারের বিভীষিকা আমরা আজও ভুলতে পারি নি, মা। ছুটে পালিয়ে সর্বস্বান্ত কপর্দকহীন হ'য়ে আজ আময়া আশ্রয় নিয়েছি এইখানে...শুনেছিলাম এই শ্বেতাঙ্গ রমণী আশ্রয় দিচ্ছে বিপদগ্রস্তা নারীদের তাঁর এই প্রাচীর-ঘেরা স্কুল-বাড়িতে। উঃ... সে-বিভীষিকা আমরা ভুলতে পারি না...সে নর-পশুদের সকলে ঘৃণা করে, ওরা মানুষ না, নর-পিশাচ!'

লিংসাও-র দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ সে শুয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই চাপা-কান্নার শব্দ লিংসাওর কানে আসে, এত আস্তে সে-ক্রন্দন ধ্বনি যে পাশে শুয়ে আছে বলেই লিংসাও তা শুনতে পায়। তার মাতৃ হৃদয় ব্যথায় দুলে ওঠে, সমবেদনা জানিয়ে সান্ত্বনা দিতে চায়, হাজার হলেও অল্প বয়সের মেয়ে...কিন্তু মনের মাঝে খচখচ ক'রে ওঠে,—এরা যে নটী! এদের পেশার কথা সে শুনেছে কিন্তু আগে কোন দিন এদের চাক্ষুস দেখে নি—এই-ই সর্বপ্রথম দেখছে। চুপ ক'রে থেকে তাই সুন্দরীকে তার সঞ্চিত বেদনা অশ্রুজলের বন্যায় অঝোড়ে ঝড়ে দিতে দেয়। তারপর এক সময়ে মেয়েটির কান্না বন্ধ হ'য়ে যায়. বিব্রত, ক্লিষ্ট, লিংসাও-ও ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ মধ্য-রাত্রে গভীর কোলাহল, সেই পাঁচিল ঘেরা বাড়ীর দরজায় হৈ-হুল্লোড়, করাঘাত, পাঁচিলের উপর বন্দুকের গুলির শব্দে সকলের নিদ্রা টুটে যায়। অন্ধকারে জেগে উঠে ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে সকলে আগত বিপদের ক্ষণ গোনে। সেই তীব্র কোলাহল একটু কমে আসে আর সেই সঙ্গে আর একটি অবোধ্য বিদেশী ভাষা ছাপিয়ে উঠে কী যেন চিৎকার ক'রে বলে ওঠে।

অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে অসম্বৃত কাপড়-জামা ঠিক করে নেয় কিম্বা ছাড়া-কাপড় পড়ে নিয়ে যে-যার জায়গায় নিঃশব্দে বসে থাকে। ভয়ে কেঁদে-ওঠা ছেলেকে মুখ চাপা দিয়ে থামিয়ে দেয়। পরক্ষণেই সেই শ্বেতাঙ্গ নারী হাতে আলো নিয়ে প্রবেশ করে সেই হলে। উঁচুতে বাতিটা তুলে ধরে বলে :

'বড়ই খারাপ খবর. সশস্ত্র শত্রুরা পাঁচিলের দরজায় হানা দিয়েছে। সংখ্যায় তারা প্রায় একশ' জন। চিৎকার ক'রে বলছে তারা দোর ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকবে...আর এদের রুখবার আমারও তো আর ক্ষমতা নেই। আমার হাতে তো কোন অস্ত্র নেই...একমাত্র ভরসা আমার ভগবান আর আমার দেশ। ভগবানকে এরা ভয় করে না, কিছুটা এখন পর্যন্ত ভয় করে আমার দেশকে শক্তিমান জাতি হিসেবে। এই ভয়েই এখন পর্যন্ত পাঁচিল ভেঙ্গে তারা প্রবেশ করেনি, আর আমিও এদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসতে ...হ্যাঁ, একটা বন্দোবস্তে আসতে সক্ষম হয়েছি।'

শ্রোতাদের ভীত শুকনো মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শ্বেতাঙ্গিনী আবার বলতে সুরু করে। কেমন বিষাদ পাণ্ডুরতা নেমে এসেছে তার চোখে-মুখে।

'এ বন্দোবস্ত এমন যে লজ্জায় আমি মুখে আনতে পারছি না...কিন্তু কি করবো, বলতে তো আমাকে হবেই যাতে তোমরা নিজেদের বাঁচাতে পার। তারা বলেছে যে এ বাড়ির অভ্যন্তরে তারা প্রবেশ করবে না যদি ..যদি এখান থেকে কিছু মেয়েকে আমরা ওদের হাতে ছেড়ে দি...ওরা নিয়ে যাবে...পাঁচ-ছয়জন মেয়ে, এমন কি—'

কথা অসমাপ্ত রেখে শ্বেতাঙ্গিনী নীরব হ'য়ে যায়। সকল আশ্রিতা নিশ্চুপ। কে আছে এমন মেয়ে যে যাবে ঐ নর-পশুদের সামনে অন্য মেয়েদের বাঁচাতে? সকলেই মূক হ'য়ে বসে থাকে।

শ্বেতাঙ্গিনী প্রতীক্ষা করে। বাইরে আবার কোলাহল ফেটে পড়ে, দোরের উপর বজ্রাঘাত সুরু হয়। শ্বেতাঙ্গিনী বাইরে বেরিয়ে যায়, আর আশ্রিতারা নিজের মনে মনে ভাবে: 'সেই পাঁচ-ছয়জনের মধ্যে আমি হতে পারি না—আমি হব কি ক'রে?'

শ্বেতাঙ্গিনী আবার ফিরে আসে পর মুহূর্তেই। অতি দ্রুত সে আবার বলে:

'আমি তাদের তো আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না।' হাফিয়ে উঠে সে বলে: 'তারা বলেছে, যদি আমরা এক্ষুণি তাদের মেয়ে না দিই তো তারা দোর-পাঁচিল ভেঙ্গে ঢুকবে। উঃ! ভগবান, ভগবান'—দরজার দেহলির উপর দাঁড়িয়ে বুক ভাঙ্গা করুণ কণ্ঠে আবার বলে: 'বোন্, কী ক'রে আমি বলি অমুক এ বাড়ী ছেড়ে ঐ নর-পশুদের কাছে নিজেদের স'পে দিয়ে অন্যদের বাঁচাও! কিন্তু তবুও আমার অন্তঃকরণ যেন বলছে যে ভগবান এই ঘরেই সেই বাঁচানোর ব্যবস্থা ক'রে পাঠিয়েছেন. এখানেরই কেউ বাঁচাতে পারবে সতী-সাধ্বী মা-বোনদের। আমি চাইছি না—শুধু আমি বলছি আমার অন্তঃকরণের কথা—যদি কেউ এরকম থাকে—যদি বোঝে যে তারা এই আত্মোৎসর্গ করতে পারবে—হয়তো এ কাজ—' কথা সে শেষ করতে পারে না, গলায় আটকিয়ে যায়। বাতির হলদে রংএ দেখা যায় সে তার নিজের ঠোঁট দাঁত দিয়ে বারে বারে চাপছে, হাতের লণ্ঠন থর থর কাঁপছে।

লিংসাওর পার্শ্ববর্তিনী সেই সুন্দরী যুবতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জামা-কাপড় টেনে ঠিক ক'রে তার সাথীদের ডেকে বলে: 'চল্‌রে বোন...ওঠ্—চুলটা ঠিক ক'রে মুখে হাসি ফুটিয়ে চল্, আমরা আমাদের জীবনের ধরা-বাধা কাজে আবার নেমে যাই—' বিষাদময় ক্লিষ্ট স্বরে কথা বলতে বলতে মাঝ পথে মেয়েটি থেমে যায়।

একটি কথাও কারও মুখ থেকে বের হোলো না। সূচীবিদ্ধ স্তব্ধতা নিয়ে তারা শুধু তাকিয়ে দেখল সাতটি উদ্ভিন্ন যৌবনা অপূর্ব সুন্দরী অপেক্ষমান নর-পশুদের কামনার লেলিহান অগ্নি শিখায় নিজেদের দলিত মথিত নিঃশেষিত ক'রে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে হল-ঘরের মাঝ খান দিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেল।

দরজায় দণ্ডায়মানা শ্বেতাঙ্গিনীর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দরী-প্রধানা বলল : 'আমরা প্রস্তুত!'

'ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুণ...তোমাদের এই মহান আত্মোৎসর্গের জন্য স্বর্গে তাঁরই পাদপদ্মে যেন তোমাদের স্থান হয়!'

সোজা মাথাটি তুলে সুন্দরী যুবতী বলে ওঠে :

'তোমাদের শ্রীভগবান তো আমাদের বোঝে না—'

তারপর গট্‌গট্‌ ক'রে মরণের সাথীদের নিয়ে এগিয়ে চলে মৃত্যু-দোরের দিকে...পিছন দিক থেকে লণ্ঠনটি তুলে শ্বেতাঙ্গিনী তাদের চলার পথে আলো দেখায়।

ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকারে নীরবে বসে থাকে আর সকলে। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ—বেদনা-বিদ্ধ নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা...আস্তে আস্তে মায়েরা এসে শুয়ে পড়ে ছেলে-মেয়েদের পাশে। লিংসাও-ও শুয়ে পড়ে। পাশের শূন্য স্থানে হাত দিয়ে দেখে তারই চাওয়া ব্যবধান আজ এই ভাবেই এল! বেদনায় দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয় ভেঙ্গে পড়তে চায় প্রতি মুহূর্তে, চোখ ভরে ওঠে অশ্রু-জলে, বারে বারে মুছেও শেষ করা যায় না, আবার আসে ভ'রে। এ-চিত্র, এ-কথা লিংসাও জীবনে ভুলতে পারবে না...এ-সংসার-সমাজ যে-নারীদের নীচ, অপাংতেয় ক'রে দূরে ঠেলে রেখেছে, তাদের জন্য চিরদিন—মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত—লিংসাওর হৃদয় ব্যথাতুর কোমল হ'য়ে রইল।

অট্টহাস্যের বজ্রনাদে মেয়েদের লুফে নিয়ে চলে গেছে স্মরাতুর নর-পিশাচেরা। পাঁচিলের বন্ধ-দরজা আর বাইরের অন্ধকার এখনও বোধহয় কেঁপে উঠছে সেই বিকট অট্টহাস্যে। শ্বেতাঙ্গিনী আর ফিরে আসে নি আশ্রিতাদের শয়নাগারে। প্রতিদিনের সকালের মত আবার সকাল আসে, নিষ্করুণ সূর্য প্রতিদিনের মত বুনে চলে আলোর ঝালর। লিংসাও বিছানা ছেড়ে ওঠে, ভাবে বিগত রাত্রের নিদারুণ ঘটনা—সেই সুন্দরী নটীদের শেষ-কথা...ভাবে অন্য মেয়েরাও। কেউ পারে না কথা কইতে, শিশুদের খাইয়ে কোনমতে

দিন দেয় কাটিয়ে···গভীর নিশীথিনীর নিস্তব্ধতার মত এ গৃহ প্রাঙ্গণের দিনও ধীরে ধীরে গড়িয়ে গিয়ে ডুবে যায় রাত্রির অন্ধকারে···তৃতীয় রাত্রি।

আট ॥

নিজের দোকানে উলীন একলা কাজ ক'রে চলেছে। শ্বেতাঙ্গিনী আশ্রয়দাত্রীর গৃহে নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের রেখে, ঘরে ফিরে সর্বপ্রথম কাজ তার হ'য়েছে, দোকান খুলে রেখে সাধ্যানুযায়ী দোকানের লণ্ড-ভণ্ড পণ্য-দ্রব্যগুলো সাজিয়ে ঠিক করা। এমন কি নিজের খাবারের ব্যবস্থা করার আগে সে প্রথমেই খুঁজেছে কালি আর বুরুশ। না পেয়ে রান্নাঘরের চিমনি থেকে ঝুল নিয়ে জল মিশিয়ে কালি তৈরি ক'রে কাঠির মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে দোকানের সামনে শাদা দেয়ালে বড় বড় ক'রে লিখে দিল :

"পূব সাগর পারের দেশের পণ্য-দ্রব্য এখানে বিক্রয় হয়।"

সেই ছাত্রের দল তার দোকান ভেঙ্গে দেবার পর এই সর্বপ্রথম যেন মনে মনে সান্ত্বনা পায় উলীন। কোথায় সে-সব ছাত্ররা আজ? হয় পালিয়েছে, নয় তো এর মধ্যে শেষ হ'য়ে গেছে সৈন্যদের হাতে। কিন্তু সে এখনও জীবিত থেকে আবার ফিরে এসে দোকান খুলেছে। কিছুদিনের মধ্যেই যদি শহরের শান্তি ফিরে আসে, স্ত্রী-পুত্র মেয়েদের ঘরে নিয়ে এসে আবার সংসার পাতবে, আবার সুদিন ফিরে আসবে। 'নিজের দেশকে ভালবাসা ···দোকানের ভাল ভাল জিনিস-পত্র নষ্ট ক'রে এ কোন্ দেশী দেশপ্রেম, বাবা? নিজের দেশের লোকের প্রতি এ দুর্ব্যবহার, ক্ষতি, শিক্ষিত বুদ্ধিমানরা করে কী ক'রে?' ঐ ছাত্রদের থেকে তার দেশপ্রেম অনেক বেশী। সে ফিরে এসে দোকানে আবার নানা ধরণের খাবার আর পণ্য-দ্রব্য সাজিয়ে বসেছে। সে কি আর উলীনের নিজের জন্য? সেও তো এই শহরের লোকদের জন্যেই। স্বজাতির প্রতি কার দেশপ্রেম বেশী? ঐ ছাত্রদের থেকে তার স্বদেশপ্রেম অনেক বেশী, উলীন মনে করে।

জীবনে যা সে কোনদিন নিজে হাতে করে নি, পরমানন্দে এখন তাই করছে। দোকানের ভাঙ্গা-দেয়াল সরিয়ে ধুয়ে-মুছে সে দোকান পরিষ্কার করে। তার মনে হয় স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের আগেই সংসারও বোধহয়

সাজিয়ে রাখতে পারবে। গভীর রাত্রে, সন্ধ্যায়, এমনকি দিনদুপুরে নারীর বুক-ফাটা ক্রন্দন শুনে উলীন হকচকিয়ে ওঠে। বোঝে, কি ঘটে গেল সেই হতভাগিনীর উপর দিয়ে। দিনে রাত্রে কত মৃত দেহ পড়ে থাকে রাস্তার উপরে। নিজে দোকান থেকে একবারও সে পথে বের হয় না। বারে বারে ভাবে: 'এসব নিয়ে মাথাঘামানোর কাজ আমার নয়।' সৈন্যদের এইসব কর্মের জন্য তো উলীন দায়ী নয়, চারদিকে যাই ঘটুক না কেন, শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি সে, সে চায় শান্তি। মানুষের দিনকাল তো সবসময়ে একরকম যায় না, সুদিন দুর্দিন আছে। পুরোনো শাসক যায়, নতুন শাসক আসে— এ পরিবর্তনে মানুষ কী করবে, সবই তো সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের লীলা। তাঁরই দান হিসেবে নতুন শাসকদের গ্রহণ ক'রে, পরিবর্তন মেনে নিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে যাওয়াই উলীনের শ্রেয় মনে হয়। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রদের গৃহে আনবার আগে নতুন বিজয়ী শাসকদের কাছে থেকে ভদ্র-নাগরিকের সার্টিফিকেট যদি যোগাড় ক'রে নেওয়া যায় তো কোনো বিপদই আসবে না। কিন্তু কোথায় সে-রক্ষাকবচ পাওয়া যাবে, কার কাছে চাইতে হবে, সে এখনও কিছু জানে না।

একদিন তার দোকানের লেখা দেখে শত্রু-সেনাদের জনৈক বেঁটে অফিসর তিন জন সৈন্যসহ তার দোকানে প্রবেশ ক'রে কিছু খাবার কিনতে চাইল। অফিসরের কথা থেকে কোনমতে সে বুঝলো নোনা মাছ তাদের চাই। উলীন দোকান খুঁজে টিন-ভর্তি তেলে ভেজানো মাছ পেয়ে তাই বের ক'রে দিল তাদের সামনে। নোনা-মাছ না পেলেও এতেই চলবে তাদের।

'কত দাম?' আঙুল তুলে অফিসর প্রশ্ন করে উলীনকে।

আশ্চর্য হ'য়ে যায় দোকানী উলীন। সৈন্যরা কোনদিনই তো দাম দিয়ে জিনিস কেনে না! কোন কিছু জিজ্ঞেস না ক'রে জিনিস তুলেই তো তারা চিরদিন চলে গেছে—এইতো সকল দোকানীর অভিজ্ঞতা। মোটা ঘাড়টি নাচিয়ে মৃদু হেসে সে বলে ওঠে: 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দাম দিতে হবে না—এ আমার উপহার!'

এবারে অফিসরের আশ্চর্য হবার পালা। কুতকুতে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে চ্যাপ্টা মুখের শাদা ফকফকে দাঁতগুলো বের ক'রে হেসে সে জিজ্ঞেস করে: 'অ-ও! তা হ'লে তুমি আমাদের ঘৃণা কর না?'

'আমি কাউকে ঘৃণা করি না।' একটু বেশী ক'রে হেসেই উলীন জবাব দেয়।

মাথাটা সামনে নুইয়ে অফিসরটি সৈন্যদের সে-কথা বুঝিয়ে বলল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথা একটু নোয়াল। অফিসর আবার বলল: 'অন্ততঃ কিছু দাম নাও তোমার জিনিসের।'

'না, না,—ও-সব জিনিস আপনাদের দেশ থেকেই কেনা, আপনাদের হাতে একটু তুলে দিতে পেরে আজ আমি সত্যিই ধন্য—' জবাব দিয়ে উলীন মাথাটা নোয়ায়।

কাউণ্টারের পাশে ছোট টুলটির উপর এবার অফিসর বসে পড়ে। তারপর রাস্তার ধ্বংসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে:

'এ সবের জন্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আমাদের সৈন্যরা অত্যন্ত বীর, সাহসী—তবে একটু মেজাজী।'

মাথাটা মৃদু হেলিয়ে উলীন বলে: 'আমাদের দেশী সৈন্যদের আমি দেখেছি, আমি জানি সৈন্যরা কি রকম হয়···কিন্তু এখন, এখন—আমরা শান্তি চাই, একমাত্র শান্তি বজায় থাকলেই আমরা ব্যবসা করতে পারি।' তারপর দু'চারটি কথা সাজিয়ে কোনমতে অফিসারকে বলে কী ভাবে ছাত্ররা তার দোকান ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল। 'গত কয়েক বছর তোলো বড় দুর্দিন-বিশৃঙ্খলা চলেছে এই শহরের উপর দিয়ে। এখন আশা হয় এবারে আমরা শান্তিতে কেনা-বেচা করতে পারব।' উলীন তার কথার শেষে আবার শান্তির কথা যোগ দেয়।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!—যদি তোমার মত আরও ভাল লোক এদেশে থেকে থাকে—' অফিসার ব'লে ওঠে।

'হাঁ, হাঁ, আমার মতন অনেক লোক আছে এখানে···অত্যন্ত দুঃখিত যে চা দিয়ে আপনাদের আপ্যায়ন করতে পারলাম না,' উলীন তাড়াতাড়ি উঠে দোকানের তাক থেকে কিছু মিষ্টি খাবার নিয়ে এসে সৈন্যদের হাতে দিয়ে বলে: 'আমি একলা আছি, বাড়ীর আর কেউ নেই এখানে।'

'কিন্তু কেন?' অফিসর জানতে চায়।

একটু কেশে উলীন বলে: 'আমার স্ত্রী বাপের বাড়ী গেছে, কিছু দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।'

মনে মনে অফিসর বুঝলো কেন এই বাড়ীতে তার স্ত্রী নেই। কিন্তু সে-কথা উলীন না বলে অন্য কথা বলল দেখে অফিসরটি মনে মনে খুশি হয়ে উলীনকে কাগজ কলম নিয়ে আসতে বলল। ভিতর-বাড়ীতে গিয়ে

উলীন কাগজ নিয়ে এল। অফিসরটি অবোধগম্য ভাষায় কী সব লিখে নাম সই ক'রে উলীনের নাম-ধাম চীনা ভাষায় লিখে তার হাতে দিয়ে বলল :

'যদি কোন বিপদ-আপদ হয় তো এই কাগজখানা দেখিও।'

'কী ভাবে আপনাকে যে ধন্যবাদ জানাবো! আপনারা আমায় যা করতে বলবেন, আমি তাই করব।' গদগদ হ'য়ে উলীন বলে ফেলে।

'বেশ বেশ। আমাদের হেড কোয়ার্টার থেকে তোমার জন্য একটা প্রতীক চিহ্ন পাঠিয়ে দেব, দরজার উপরে লাগিয়ে রেখ। তাতেও যদি না হয় তো একজন রক্ষী পাঠিয়ে দেব, তোমার দোকানের সামনে পাহারা থাকবে।'

প্রতীক চিহ্নের কথা শুনে উলীন আনন্দিতই হয়েছিল, কিন্তু রক্ষীর কথা শুনে নে প্রমাদ গুনল। কে না জানে দশজনের খাবার এই রক্ষী-সোনারা খায়? ভাল বসবার জায়গা চাই, তার মনোস্তুষ্টির ব্যবস্থা করতেই তো সব ফতুর হ'য়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি বলে: 'যে প্রতীকচিহ্ন আপনি পাঠাবেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু আমার এই অল্প পুঁজির কারবারের জন্য রক্ষীর কোনই দরকার নেই স্যার···সেই রক্ষীর সম্মানের অর্ধেকেরও তো উপযোগী নই আমি। তবে আমার মত সাধারণ বিশ্বাসী লোকের যদি আপনার দরকার হয় তো আমাকে আপনি সব সময়েই পাবেন। আপনাদের সেবা করে আমি ধন্য হব। উলীন আমার নাম, জীবিকা ব্যবসা। বাবাও এই ব্যবসাই দেখেছেন, আর আপনারা যদি সদয় থাকেন তো আমার ছেলেও এই কারবার চালাবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমাদের কোন বিরোধিতা যারা করে না, তাদের কোন ক্ষতিই আমরা করি না।' গর্বের হাঁসি হেঁসে অফিসরটি উত্তর দেয়।

'আপনাদের দয়াকেই বা আমি কেন বিরোধিতা করব?' বিনম্র উলীন মাথা নুইয়ে জবাব দেয়।

অফিসর তার সৈন্যদের নিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এই শীতের সকালেও উলীন কপালে হাত দিয়ে দেখে সে ঘেমে উঠেছে, ভিতরের জামা ঘামে ভিজে গেছে। বোঝে, তার মনের শত্রু-ভীতি তার দেহে যে কম্পন এনেছিল তার এক বহিঃপ্রকাশ এই ঘাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আর তো এদের ভয় করতে হবে না। এদের কোনরকম বিরোধিতা না করলেই হোলো, আর তার মত লোকের পক্ষে বিরোধিতাবিহীন জীবনই তো কাম্য।

অপরাহ্ণ বেলায় একজন সৈন্য বাক্সে ভরে শত্রু-দেশের একটা পতাকা

এবং বড় প্রতীক আঁকা একখানা কাপড়ের টুকরো এনে উলীনকে দিয়ে গেল। উলীনের যুদ্ধ জেতা হ'য়ে গেছে—আনন্দে কিছু টাকা বের ক'রে সেই সৈন্যটির হাতে উপহার দিয়ে তাকে বিদায় ক'রে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি ক'রে দরজার উপরে সেগুলো লাগিয়ে দিল। দোরের উপর সেগুলো লাগাতে লাগাতে এক নারীর করুণ আর্তনাদ তার কানে এসে বেঁধে। মুহূর্তের জন্য তার হাতের কাজ থেমে যায়, তারই বাড়ীর ও-পাশের গলি থেকে আসছে সেই করুণ আর্তনাদ···উলীন বুঝতে পারে কী চলেছে সেই আর্তনাদের পিছনে।

সেই সৈন্যটিই কি···যাকে এই মাত্র সে টাকা উপহার দিল? আর্তনাদের করুণ ক্রন্দন ধীরে ধীরে বন্ধ হ'য়ে না যাওয়া পর্যন্ত উলীন দাঁড়িয়ে থাকে। এগিয়ে খোঁজও করতে পারে না সে। এইমাত্র যে সৈন্যটি প্রতীক আর পতাকা দিয়ে তাকে উপকার ক'রে গেল এই যুদ্ধের দিনে তাকে দোষই বা দেয় কি ক'রে?

ঘরে প্রবেশ ক'রে নিজের জন্য এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে বসে বসে ব্যথিত হৃদয়ে ভাবে উলীন, লড়াইয়ের দিনে মেয়েটির এ-দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তো ওর বাবা।—শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে না আসা পর্যন্ত মেয়েকে কেন সে রেখেছিল শহরের বাড়ীতে? যাক্, বুদ্ধি ক'রে সে তার পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসেছে!

কিন্তু সত্যিই কি সব কিছু নিরাপদ? গোধূলির ম্রিয়মাণ আলোয় দোকান বন্ধ করতে গিয়ে উলীন দেখে সেই প্রতীক-চিহ্নটি কে যেন নিয়ে গেছে, শত্রু-পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে, দু'এক টুকরো শুধু পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে। হা ক'রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভয়ে সে কেঁপে ওঠে। তবে ছাত্ররা এখনও এখানে আছে? কাছেপিঠে কোথাও?

'এ শত্রুর কীর্তি, শত্রুর কীর্তি···আমার কাছাকাছি কোথাও শত্রু আছে—' ভাবতে ভাবতে উলীন তাড়াতাড়ি দরজার খিল এঁটে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমুতে পারে না। বারে বারে তার মনে আসে সেই অফিসরের রক্ষী পাঠানোর কথা। ভাবে: 'দেশী শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য বোধহয় ঐ বিদেশী রক্ষী-সেনার ব্যবস্থাই মেনে নেওয়া ভাল।' •

উলীনের মা উসাও-র মৃত-দেহ সৎকারের জন্য লিংটান ছেলেদের নিয়ে

নিজে কফিন তৈরি করল। আজকাল দিন রাত্তির কফিন তৈরি করেও পেশাদার কফিন-প্রস্তুতকারক ছুতোররা দাবী মিটিয়ে উঠতে পারে না। যুদ্ধই এদের ব্যবসার মরশুম—এ কথা ছুতোররা সকলেই জানতো, অনেক আগে থেকেই তারা কফিন তৈরি ক'রে নিজেদের গৃহে, মন্দিরের অলিন্দে জমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তা আর কয়দিন! চারিদিকের মৃতের সংখ্যা যে আরও অনেক বেশী। কফিন ছাড়াই কত মৃতের কবর দেওয়া হচ্ছে। আর শত্রুরা তো সামান্য মাটি খুদে লাসগুলি একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে ওপরে কোনমতে মাটি টেনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর তার পরক্ষণেই মাটি সরিয়ে মরাগুলো টেনে তুলে পরমানন্দে ভোজ সুরু করে ক্ষুধার্ত শারমেয়র দল। সৌভাগ্যবশতঃ এখন শীতকাল, গ্রীষ্মকাল হ'লে তো পচা গন্ধে উপরের ভগবানও পাগল হয়ে যেত।

ছুতোরের খোঁজে সময় নষ্ট না ক'রে ভাঙ্গা চৌকি আর দোরের কাঠ দিয়ে লিংটান কফিন তৈরি ক'রে ফেলল। তারপর বাঁশ আর দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই বিপুলাদেহা মৃতাকে কোনমতে কফিনের মধ্যে ঢুকিয়ে পেরেক ঠুকে কফিন বন্ধ ক'রে দিল। মাঠের মাঝে গর্ত খুঁড়ে, মোষ দিয়ে টানিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা পিছন দিক থেকে ঠেলে সেই ভারী কফিনটাকে তারা কবরের গর্তে নামিয়ে দিল। তারপর বেশ উঁচু ক'রে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। যদি কোনদিন জামাই এ-গাঁয়ে ফিরে এসে তার মায়ের গোরস্থান দেখতে চায় তো তাকে তারা ঐ উঁচু ঢিবি দেখিয়ে দিতে পারবে।

ঘরে ফিরে এসে তারা ধ্বংস স্তূপ সরিয়ে বাসপোযোগী ব্যবস্থার কাজে লেগে যায়। গ্রামের প্রতিটি ঘরের তো এই অবস্থা···একমাত্র লিংটানের সেই পণ্ডিত খুড়তুতো ভাই-এর কোন ক্ষতি হয় নি। এত দীর্ণ-জীর্ণ সে-বাড়ীর অবস্থা যে শত্রুরা তার ভগ্নপ্রায় জিনিসপত্র ছোঁয়ও নি। পণ্ডিত ভাই তার স্ত্রীকে নিয়ে মাঠের কোণের বৃহৎ গোবর-গাদার মধ্যে পালিয়ে থেকে কোনমতে বেঁচেছিল। পালিয়ে যাবার আগে জ্ঞান-হারা ছেলের চারধারে জ্বালানির কাঠ সাজিয়ে রেখে তাকে ঢেকে রেখে গিয়েছিল তার মা। সৈন্যরা তাকে দেখতে পায়নি।

সেই আঘাত-প্রাপ্ত ছেলেটি বাঁচবে কিনা কে জানে। নির্বাক ছেলেটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে, নাড়ানাড়ি করলে রক্তক্ষরণে মরার মত হ'য়ে যায়। গ্রামবাসীরা দেখতে এসে যে ব্যবস্থার কথা বলে, বাপ-মা তাই করে। মনে আশা, হয়তো ছেলে তাদের বেঁচে উঠবে।

লিংটানের বাড়ীর শুধু জিনিসপত্র-দরজা গেছে, কিন্তু প্রত্যুৎমন্নবুদ্ধি

যাদের কম, তাদের মেয়েদের সতীত্ব বলি গেছে ঐ শয়তানদের কামনার খড়্গে। এই সব অত্যাচারিতাদের সংখ্যা যে কত কেউ জানবে না। কারণ, লজ্জার খাতিরে কার বৌ-মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে তা তো কেউ বলবে না। তবে শ'খানেক গৃহস্থের এ-গাঁয়ে সাতজন যুবতী মেয়ে শয়তানদের কামনার নিষ্পেষণে মারা পড়েছে, মরেছে চারজন বৌ। আর মারা গেছে সেই বৃদ্ধ যার ঘাড়ে খোঁচা মেরে সেদিন ঘা করে দিয়েছিল। সমস্ত দিনের অত্যাচারের ধ্বংসের মধ্যে তার খোঁজ কেউ ক'রে উঠতে পারে নি। সন্ধ্যায় তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে মরে কাঠ হ'য়ে গেছে বুড়ো। 'গাঁয়ের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্ঞানী বৃদ্ধ নিজেও বিদায় নিয়ে গেলেন,' লিংটান ভাবে। দূর-আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথানুভব শুধু নয়, যেন গাঁয়ের পরমাত্মীয় গেলেন চলে।

গাঁয়ের মেয়েদের বাঁচানোর সমস্যা নিয়ে গ্রাম্য-প্রধানরা একে একে এসে জড়ো হোলো। তাদের কাছে লিংটান শহরের সেই শ্বেতাঙ্গিনীর প্রাচীর-ঘেরা আশ্রয়স্থলে কি ভাবে নিজের স্ত্রী-মেয়ে-পুত্রবধূদের পাঠিয়ে তাদের বাঁচিয়েছে, সে-কথা ব'লে সকলকে বললো গ্রামের সব মেয়েদের সেখানে পাঠিয়ে দিতে। তারপর অতি সাবধানে একে একে গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে সেই প্রাচীর-ঘেরা বাড়ীর দরজায় উইলো গাছের ডাল দিয়ে মৃদু টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ানও সাবধানে দোর খুলে আশ্রয়প্রার্থীদের ভিতরে ঢুকিয়ে নিল··· আশ্রিতার সংখ্যা, অত্যাচারিতা বিপদগ্রস্তা যুবতী নারীর সংখ্যা এমনি ক'রে আরও বেড়ে গেল।

গাঁয়ে থেকে গেল শুধু পুরুষরা আর রইল দু' একজন প্রায় উত্থানশক্তি রহিত অতি-বৃদ্ধা এবং লিংটানের খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী। আহত ছেলেকে ফেলে তো সে পালাতে পারে না। তার জন্য ভাবনা নেই···শয়তানরা এলে সে দৌড়ে ঐ গোবরের গাদায় লুকোতে পারবে।

জীবন-সঙ্গিনীর জন্য লিংটানের মন আকুল হ'য়ে ওঠে। গাঁয়ের এ-দুর্দিনেও ঘরের কালো মুরগীটা ঠিক মত ডিম পেড়ে যায়। ধর্ষিতা কিংবা কোনমতে রক্ষা-প্রাপ্তা স্ত্রী-কন্যা-বধূদের নিয়ে শহরের সেই পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীতে গাঁয়ের অন্যরা যখন যাবে, তাদের কারও সঙ্গে লিংটান কিছু জিনিস পাঠাবে লিংসাও-র জন্য। কালো মুরগীর ডিমগুলো একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে, বাড়ীর পাশের ডোবা থেকে একটা মাছ ধরে নুন মাখিয়ে পদ্ম পাতায় জড়িয়ে আর ক্ষেতের বেশ

ভাল দুটি বাঁধাকপি নিয়ে শহর-যাত্রীদের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। যদি সে লিখতে পারিত, যদি লিংসাও পড়তে পারত! লিংসাওকে বলবার জন্য বারে বারে বলে দেয়:

'তাকে ব'লো যে ঘর-দোর পরিষ্কার ক'রে সংসারের কাজ কোনমতে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি···কিন্তু তাকে ছাড়া কী আর সংসার চলে, এ কী আর পুরুষের কর্ম···!' আবার বলে: 'হাঁ, তাকে ব'লো যে নিজেরাই কফিন তৈরি করে উলীনের মাকে কবর দিয়েছি···' পরক্ষণে আবার বলে: 'এ কথাটাও তাকে ব'লো যেন সে গাঁয়ে ফিরবার জন্য উতলা না হয়। শহর ধ্বংস শেষ ক'রে আজকাল এই বিদেশী শয়তানরা শুনছি, প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে নিয়মিতভাবে হানা দিতে শুরু করেছে···শহরে তো আর কিছু বাকী নেই···লিংসাওকে বুঝিয়ে ব'লো যে আমরা মোটেই ভীত হ'য়ে পড়ি নি, কারণ গাঁয়ের সব মেয়েরাই তো নিরাপদ আশ্রয়ে স্থান পেয়েছে।'

কিন্তু সত্যিই কী সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ে স্থান পেয়েছে? লিংটানের ভাগ্যের সকল দুঃখের অবসান কি হ'য়ে গেল? শয়তানী চক্রে নতুন দুঃখ যে আসছে তার ভাগ্যে···সে-দুঃখের নব-অভিজ্ঞতা নিজের চোখে না দেখলে লিংটান যে বিশ্বাস করতো না।

শহরের রাস্তায়, বাড়ীতে বিজেতাদের নির্মম অত্যাচার, ধ্বংস, ধর্ষণ কিছুটা কমেছে কিম্বা ঘটে-যাওয়া ঘটনা চাপা দেওয়া হচ্ছে, শহরের উপরের বিরাজমান শান্ত-পর্দা দেখলে হয়তো তাই মনে হবে। শত্রু-পদদলিত অঞ্চলের উপর দিয়ে বিজেতাদের নৃশংস অত্যাচার, ধর্ষিতা মেয়েদের করুণ গগনভেদী আর্তনাদ আছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দেশের নর-নারীর কানে। মানুষের ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও যেন এ-নৃশংশতার কথা কেউ শোনেনি! দুনিয়ার সর্বদেশে সমবেদনা আর প্রতিবিধানের চিৎকারে শত্রু-দেশের শাসন কর্তারা যেন একটু লজ্জা পেল। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরাধীন দেশের সেনাপতিদের তারা বলে পাঠালো শহরের বুকে খোলাখুলি এসব যেন না হয়, কারণ, সমস্ত দুনিয়ায় বড় চেঁচামেচি সুরু হয়েছে, তাদের দুর্নাম হচ্ছে···আর যা কিছু ঘটেছে সে-সব যেন চাপা দেওয়া হয়। তখন থেকে গ্রামাঞ্চলে শত্রু-সেনাদের নিয়মিত হানা সুরু হয়েছে। পিছনের এতকথা তো লিংটান জানতো না।

একদিন অপরাহ্নে রাত্রের খাবারের জন্য জল ঢেলে ঢেলে লিংটান

চাল ধুচ্ছিল, এমন সময়ে মুখ উঠিয়ে তাকিয়ে দেখে তারই মেরামত করা দরজায় চারজন শত্রু-সেনা দাঁড়িয়ে। তার দুই ছেলে কোণের অন্ধকার তাঁত-ঘরে প্রদীপের আলোয় তাঁত চালাচ্ছিল···ছোট ছেলে সুতো বেছে বেছে দাদার হাতে দিচ্ছিল আর লাও-তা তাই দিয়ে মাকু চালিয়ে কাপড় বুনছিল। সমস্ত বাড়ীতে এই তাঁতটাই শুধু বেঁচেছিল, কারণ, এই অন্ধকারে সেই শয়তানরা প্রবেশ করেনি সেদিন। পালাবার চেষ্টা ক'রে কোনো লাভ নেই, কারণ, মেরামত করা সদর দরজা ভেঙ্গে ওরা বাড়ীর মধ্যে জোর ক'রে ঢুকে পড়বে। চালের ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে লিংটান এসে দোরটা খুলে দেয়, পশ্চিমের অস্তগামী সূর্যের রোদ এসে পড়ে যুবকদের গরম চ্যাপ্টা মুখের উপরে। চিৎকার ক'রে লিংটানের মুখের উপরে কী যেন সব কিচিরমিচির কথা ছুঁড়ে দেয় তারা, কিন্তু কিছুই সে বুঝলো না। হয়তো ওরা খাবার চাইছে মনে ক'রে লিংটান পেছিয়ে এসে চালের ঝুড়ি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'খাবার চাই?' রাগ ফেটে পড়ে যুবকদের চোখে-মুখে··· আরও জোরে কি যেন চেঁচিয়ে ব'লে ঝট ক'রে প্যাণ্ট খুলে নিম্নাঙ্গের বিকৃত ভঙ্গী ক'রে দেখাতে থাকে কী তাদের চাই। লিংটান বোঝে এই কামার্ত যুবকরা চাইছে এক্ষুণি মেয়ে আর তাকেই বলছে তার বাড়ীর মেয়েদের বের ক'রে তাদের হাতে দিতে। বহু-পুরুষের ভাগ্য যে মেয়েদের সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। মনে মনে বারে বারে পূর্ব-পুরুষদের ধন্যবাদ জানিয়ে সে নিজের ভাষায় জবাব দেয়: 'আমার বাড়ীতে তো কোন মেয়ে নাই।'

কিন্তু লিংটানের কথাও তারা বোঝে না। কথা কওয়া-বোঝার পিছনে সময়ক্ষেপ না ক'রে তারা ছুটে গিয়ে প্রতি ঘরে পাতি পাতি ক'রে খোঁজে তাদের কামনা চরিতার্থ করবার যন্ত্র। না পেয়ে তারা আরও যায় ক্ষেপে। এমন সময় স্মরাতুর শয়তানদের চোখে পড়ে বাড়ীর মেয়েদের দু'চারটে জামা-কাপড়। কামনা-লোলুপ যুবকরা ক্ষেপে উঠে গগনভেদী চিৎকারে কী যেন বলে ওঠে, লিংটান বোঝে না কিছু। সে নিজের ভাষায় বলে:

'মেয়ে যদি না থাকে তো, আমি কী ভগবান যে একজনকে তৈরি ক'রে এনে দেব?'

ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁত-ঘর থেকে তাঁতের শব্দ আসে। মুহূর্তে অদ্ভুত শব্দ ক'রে কামাতুর পশুরা ছুটে গিয়ে ঢোকে তাঁত-ঘরে, পিছনে পিছনে সন্ত্রস্ত লিংটান দাঁড়ায় এসে। ঝড়ের বেগে ঘরের প্রতি কোণে কোণে

আছড়িয়ে পড়ে তাদের কামনাতুর দৃষ্টি। কিন্তু কোথায় তারা যাদের সর্ব-শরীরে, দেহদ্বারে, নিষ্পেষণ আর ঘুর্ণির আবর্তন তুলবে এই যুবকদের কালবৈশাখী-কামনার ঝড়? লাও-তা তাঁত নামিয়ে হা ক'রে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ-আসা আপদের দিকে, কিশোর লাও-সান হাঁটুর ওপর থেকে স্থতোর গোছা নামিয়ে রেখে হা ক'রে দেখে এদের।

কামনার আর্তি ফেটে পড়ার রাস্তা পায় না। হঠাৎ ছুটে গিয়ে তারা ধরে কিশোর লাও-সানকে। ছেলেটার সৌন্দর্যই হোলো তার কাল। সুন্দর কিশোর লাও-সান ভয়ে কেঁপে ওঠে···নিষ্পেষণের যন্ত্রণায় দিশেহারা হ'য়ে যায়। মেয়েদের পেলে এই কামাতুর নর-পশুরা যা করত, কিশোর বালক লাও-সানকে ফেলে তার উপর দিয়ে তারই চরিতার্থতা করতে থাকে তারা। এ দৃশ্য কল্পনায়ও আনতে পারে নি লিংটান···ভিতরের সমস্ত স্নায়ু যেন তার ফেটে পড়তে চায়, মুখ দিয়ে বমি বেরিয়ে আসতে নেয়। লাও-তারও তাই। সহ্য করতে না পেরে তার দু'জনে ঝাপিয়ে প'ড়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিশোর বালককে ঐ বর্বরদের কামনার ঝড়ের ঝাপটা থেকে টেনে আনতে। কিন্তু পারবে কেন তারা খালি হাতে ঐ সশস্ত্র নর-দানবের সঙ্গে? এক ঝটকা টানে তাঁতের দড়ি খুলে নিয়ে বাপ-ছেলেকে বেঁধে মাটির উপর ফেলে রেখে তাদের চোখের 'পরে তারা চালাতে থাকে লাও-সানের উপর তাদের অপকর্ম। পারে না বাপ-দাদা এ-দৃশ্য সহ্য করতে, চোখ বুজে অসহ্য ক্রোধ আর নিরুপায়তার বোঝা বুকে নিয়ে প'ড়ে থাকে তারা। অপকর্ম শেষ ক'রে অট্টহাস্যের বজ্রনাদে চারিদিক কাঁপিয়ে নর-পশুরা যায় বেরিয়ে। বিক্ষত দেহে মৃতের মত পড়ে থাকে কিশোর বালক···

একটি কথাও কেউ কইতে পারে না। ধীরে ধীরে অনেক চেষ্টায় বাঁধন আলগা ক'রে বাপ-ছেলে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। অবশেষে লাও-তা তার শক্ত দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে ফেলে। ভাত রাঁধার জন্য যে জল গরম হ'য়ে উঠেছিল তাড়াতাড়ি তাই নিয়ে এসে লিংটান বিক্ষুব্ধ লাও-তার সাহায্যে অত্যাচারিত কনিষ্ঠ কিশোর পুত্রকে ধুয়ে মুছে কাপড় পরিয়ে দেয়। লাও-সান মরে যায়নি, এমন কিছু মারাত্মক আঘাতও পায়নি··· কিন্তু এ-বিষদৃশ্য ঘটনায় তার মন একেবারে ভেঙ্গে গেছে, হতভম্ব হ'য়ে গেছে। নির্বাক ছেলেকে দেখে লিংটানের মনে হয় হয়তো ছেলের মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে। বারে বারে জিজ্ঞেস করে:

'বাপ্ বেঁচে আছিস তো ?'

'মরে গেলেই ভাল হতো বাবা—' করুণ স্বরে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাষায় কিশোর ছেলে উত্তর দিয়ে কাঁদে।

লিংটান সান্ত্বনা দিয়ে কি সব বলে, বালকের কানে কিছুই প্রবেশ করে না। গালের পীতাভ সোনালী রং-এর উপর কেমন নীল দাগ কেটে বসেছে, চোখের মণির তীব্রতা ডুবে গিয়ে ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বালক বলে : 'আমি এখানে থাকব না।'

'তোকে এ-গাঁ থেকে অন্য জায়গার পাঠিয়ে দেব। দেয়ালের ফাঁকে কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম, শয়তানরা খুঁজে পায়নি—তাই দিয়ে তোকে পাঠিয়ে দেব। লাও-এর আর নীলা যে কোথায় আছে যদি জানতাম—' সান্ত্বনা দেয় লিংটান।

কিন্তু ছেলের চোখে জিঘাংসার হঠাৎ ঝলকানি দেখে লিংটানের মনে ভয় হয়, যদি বেপরোয়া হ'য়ে সে ডাকাত-দলে গিয়ে নাম লেখায়! আস্তে আস্তে ছেলেকে বলে : 'যদি পাহাড়ের ওদিকে যাস তো ডাকাত-দলে মিশবি না···সাধারণ লোকদের পর্যন্ত ওরা লুঠ ক'রে সর্বস্বান্ত ক'রে দেয়। ঐ সব পাহাড়ে শুনেছি অনেক ভাল ভাল পাহাড়ী লোক আছে যারা শত্রুদের বিরুদ্ধে শুধু লড়ে, তাদের দলে যাবি।'

একটি কথাও বলল না বালক। একটা কোট এনে বাপ তার গায়ে পরিয়ে দিল। রুটির একটা টুক্‌রো চিবোবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। একটা ন্যাকড়ার ফালিতে রুটি জড়িয়ে নিয়ে বাপের দেওয়া টাকা কোমরে বেঁধে বালক উঠে দাঁড়ালো অজানা পথে যাত্রার উদ্দেশে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথে কেমন একটু সে দুলে উঠল। ভীত বাপ জিজ্ঞেস করে : 'হেঁটে যেতে পারবি তো ?'

'হাঁটতে পারব,' গভীর ঘোলাটে দৃষ্টি বাপের চোখে ফেলে বালক উত্তর দেয়।

'যেখানেই থাকিস, কোন রকম ক'রে আমাকে খবর পাঠাস।' বৃদ্ধ লিংটানের কণ্ঠে অনুরোধ ফুটে উঠে। অজানা উদ্দেশের যাত্রী কিশোর বালক যেন মুহূর্তে যুবক হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু মনে হয় কত দুর্বল, কত অসুস্থ সে।

'হাঁ, পাঠাব বাবা,' বলে চলতে গিয়ে সে আবার মাথা ঘুরে টলে ওঠে। বাপকে জড়িয়ে ধ'রে চাপা-কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে : 'বাবা! বাবা!'

থর থর ক'রে সমস্ত অবয়ব তার কেঁপে কেঁপে উঠছে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার ফেপে-ওঠা ভিতরের ক্রন্দনকে চেপে রাখতে। লিংটান বোঝে, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলে :

'বাপ্, আজ না গেলি, থেকে যা, এক রাত ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে নে···আমি দুটো চাল ফুটিয়ে নামিয়ে দিচ্ছি, তাই মুখে দিয়ে শুয়ে পড়।'

'ঘুম আমার হবে না, আমি আজই যাব বাবা।'

সোজা দাঁড়িয়ে উঠে দোরের খোলা পথ দিয়ে বালক বেরিয়ে পড়ে ···অজানা পথের নব-যাত্রী। ঘন অন্ধকার রাত্রির আকাশের এক কোণে ক্ষীণাঙ্গী চাঁদ মৃদু অস্পষ্ট আলোর রেখা টেনে দিয়েছে একটু, বিন্দু বিন্দু ফোটা এঁকে মুক্তি-পথের নিশানা দিচ্ছে যেন আকাশের নক্ষত্ররাজী। নিস্তব্ধ শীতল নিশীথিনীর বুক চিরে বালক সোজা এগিয়ে চলে, একবারও ফিরে তাকায় না পিছনের পথে···বাপ-দাদা বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে বালককে ধীরে মিশে যাচ্ছে ঘন অন্ধকারের মধ্যে।

'এর থেকে আর কি খারাপ হ'তে পারে আমাদের, বলতে পার?' লিংটান ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে। লাও-তা জবাব দেয় না, চুপ ক'রে থাকে। মাথার উপর আকাশ তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেমন থেকেছে চিরদিন শান্তির সময়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লিংটান চেঁচিয়ে ওঠে : 'হেই পাষান ঠাকুর···কিছুতেই কি তোর মন ভরবে না?'

দুঃখে বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল বুঝি! ভীত লাও-তা তাড়াতাড়ি বাপকে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে সদর দরজার খিল ভাল ক'রে এঁটে দেয়। বিমর্ষ বাপকে বলে :

'আমি ভাত চাপিয়ে দি, তুমি খেতে পারবে তো বাবা?'

'আজ রাতে আর গলা দিয়ে কিছু নামবে না।'

'আমারও মুখে ভাত রুচবে না।' লাও-তা বলে।

নিজ নিজ ঘরে গিয়ে বাপ-ব্যাটা শুয়ে পড়ে, কিন্তু লিংটান পারে না শুয়ে থাকতে। উঠে ছেলের ঘরে এসে ঢোকে।

'একলা ঘরে ঘুমুতে পারি না। চোখ বুঁজলেই সেই বীভৎস দৃশ্য চোখের উপর ফুটে উঠছে যে—'

'আমার পাশে এসে শোও বাবা।'

চুপচাপ দু'জনে শুয়ে থাকে। জামা কেউই খুলতে সাহস পায় না। কে জানে, অন্ধকার রাত্রির গহন-গহ্বরে আরও কী বিপদ লুকিয়ে আছে।

ঘুম কারও চোখে নেই। নিথর নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে তারা শুয়ে থাকে, কথা কয় না। কী বা বলবে, যা বলার তা তো দু'জনার মনের ভিতে চোখের কোণে বারে বারে নাড়া দিয়ে উঠছে···পাহাড় দেশের মুক্তির আলোর খোঁজে অত্যাচারিত কিশোর বালকের চলার পথের প্রতিটি পদধ্বনি যেন তারা শুয়ে শুয়ে শুনতে পায়।

নয়

উলীন বুঝলো নিজের দেশের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে বিদেশী বিজেতা শত্রুদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দু'দিন ঘরের বন্ধ দরজার পিছনে ভীত সঙ্কুল অবস্থায় বাস ক'রে অবশেষে সে ঠিক করল যে সে সেই চ্যাপ্টা মুখো অফিসরটির সঙ্গে দেখা ক'রে তার সাহায্য চাইবে এই বিপদ বৈতরণী পার হতে। তাকে সে বলবে যে সে সত্যি-সত্যিই বিশ্বাসঘাতক নয়, সে ব্যবসায়ী, সওদাগর, শান্তিপ্রিয় নাগরিক, ঘর-সংসার পরিবার নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে দিন যাপন করতে চায় মাত্র।

দিনাবসানে রাত্রির অন্ধকার যখন বেশ ঘনীভূত হ'য়ে আসে, উলীন অতি পুরাতন জীর্ণ কাপড়-জামা পরে অন্ধকার ভেঙ্গে অতি সাবধানে সেই অফিসরের দেওয়া ঠিকানার খোঁজ ক'রে হাজির হয়। বাড়ীটি দেখে সে আশ্চর্য হ'য়ে যায়, এ বাড়ীতে সে আগেও এসেছে। দরজায় মৃদু টোকা দিতে বেগে দরজা খুলে একজন সৈন্য এসে দাঁড়াল। ভীত উলীনের হাঁটু ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে, তবুও কোনমতে পকেট থেকে অফিসরের দেওয়া সেই কাগজটি বের ক'রে সৈন্যটির চোখের সামনে তুলে ধরে। কাগজটি একবার দেখে উলীনকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে, ইশারায় অপেক্ষা করতে ব'লে সৈন্যটি ঢুকে যায় অট্টালিকার অভ্যন্তরে।

এই বৃহৎ অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উলীন আগেও একবার এসেছিল। ধনীর বিরাট বাড়ী···যুদ্ধের ভয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। বছর দুই আগে

বিদেশী কলের খেলনা আর দু'চারটে মনোহারী জিনিস নিয়ে তাকে আসতে হয়েছিল এ-বাড়ীর মেয়েদের আহ্বানে। শিশু আর মেয়ে ভর্তি এ প্রাঙ্গণটি সেদিন হাসি-আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠেছিল বিদেশী কলের খেলনা দেখে। ধনীর গৃহের যত পর-গাছা বাস করে তারাও বাড়ীর ঝি-চাকরের সঙ্গে বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে উলীনের কলের খেলনার খেলা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। সে-হাসিতে উলীনও হেসে ফেলেছিল।···কিন্তু আজ এই শীতে আর অযত্নে সে-বাগান গেছে শুকিয়ে, বাড়ীর সে-হাসি-আনন্দ আজ মূক হ'য়ে গেছে। সৈন্যটি ফিরে এসে উলীনকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল বাড়ীর ভিতরের এক বড় ঘরে। পান-মত্ত তিন চার জন অফিসর উলীনকে দেখে ক্ষণেকের জন্য মুখ তুলে একবার তাকাল মাত্র, বিরক্তি তাদের চোখে-মুখে। তার চেনা অফিসরটির মুখে-চোখে পর্যন্ত বিরক্তির ভাব। এদের সামনে মদ্য পানের সময়ে এসে বোধহয় মোটেই সে ভাল করে নি। কিন্তু এখন তো ফিরে যাবার আর উপায় নেই। নিজের দায়েই যে সে এসেছে, তাই মনে জোর এনে সে বলে ওঠে :

'স্যার, একটা কাজের কথা নিয়ে এসেছি আমি। সোজা কথায় যদি বলি তো খুব বেশী সময় নেব না।'

'বলে যাও—' চেনা অফিসরটি বলে উঠল, কিন্তু উলীনকে একবারও বসতে বলল না। এ যেন চাকর বাকরের সঙ্গে ব্যবহার···প্রতিবাদ জমে ওঠে উলীনের জিহ্বায়। কিন্তু আত্ম-স্বার্থ-সচেতন উলীন সঙ্গে সঙ্গে বোঝে প্রতিবাদ ক'রে এখন লাভ নেই। তাড়াতাড়ি মনের কথা চেপে সে বলে : 'এই শহরেরই আমি একজন নাগরিক, আমার দোকানে আপনি অনুগ্রহ ক'রে পদার্পণ করেছিলেন একদিন, মনে আছে বোধহয়। বিদেশী পণ্যের কারবারী আমি, আর বেশী ক'রে বেচি আপনাদের মহান দেশেরই তৈরি জিনিস। আমি কিছু চাই না, চাই শুধু শান্তি···কারণ, দেশে শান্তি বজায় থাকলেই ব্যবসা চালু থাকে। দেশের শাসন কার হাতে গেল তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই বিশেষ, আমার ব্যবসা চললেই হলো। কিন্তু আমার এই ব্যবসায়ী-স্বার্থের মতের জন্য এই শহরে আমার শত্রু আছে···তারা চায় আমাকে হত্যা করতে। সেই জন্যেই আমি এসেছি আপনাদের সাহায্য চাইতে। আপনারা আমাদের নতুন শাসক—কি ভাবে আমি বাঁচতে পারব আপনারা অনুগ্রহ ক'রে ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

উলীনের কথা অফিসররা শুনল…তাদেরই একজন, যে উলীনের ভাষা বুঝতো, অন্য অফিসরদের সে তার কথা বুঝিয়ে দিল। উলীনের অবোধগম্য বিদেশী ভাষায় নিজেরা কি বলাবলি করে নিল। তারপর উলীনের চেনা অফিসারটি টেবিলের উপর টোকা মেরে শব্দ ক'রে উলীনের নজর তার দিকে আকর্ষণ ক'রে বলল :

'ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের অনেক কাজে আসতে পার, হুঁ—'

'কেন আমি আসব না, স্যার?'

'জনসাধারণের সরকার আমরা এখানে কায়েম করব…আর সেই সরকারই এখানে আমাদের হ'য়ে শাসন চালাবে। এ কাজে কি তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে?'

'কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, স্যার, আমার যে কোন ক্ষমতাই নেই—'

উলীনকে থামিয়ে দিয়ে অফিসরটি বলে ওঠে: 'তুমি লিখতে জান? পড়তে জান?'

'আমি? নিশ্চয়ই। আমার বেশ ভাল জানা আছে, এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কিভাবে চালাতে হয় তা আমি ভাল ক'রেই জানি, স্যার। আর কন্‌ফ্যুসিয়াস আমি পড়েছি যেমন আমার বাবাও পড়েছিলেন—'

'ও-সব আমাদের দরকার নেই। তুমি ইংরেজী জান?'

'আমার দুর্ভাগ্য, আমি ও-ভাষা জানি না, স্যার। নিজের ভাষা ছাড়া বিদেশী ভাষা শেখার যে প্রয়োজন আছে তা তো আগে কোনদিন বুঝি নি, কারণ—'

'তোমার ভাষা তুমি বেশ ভাল করেই জানো তো? তাড়াতাড়ি লিখতে পারো?'

'গর্ব করছি না, কিন্তু আমার ভাষা বেশ ভাল করেই লিখতে পড়তে পারি।' বেশ বিনয়ের সঙ্গে উলীন জবাব দেয়।

নিজেদের ভাষায় কি আলোচনা ক'রে উলীনের দিকে তাকিয়ে অফিসর আবার বলে: 'এই বাড়ীতে তুমি এক্ষুণি উঠে চলে আসবে। তোমার কাজের ক্ষমতা দেখে তোমার মাইনা আর পদবী পরে ঠিক করা হবে। হাঁ, তুমি কালই চলে আসবে।'

মাথার মধ্যে যেন পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে, এইভাবে উলীনের মগজটা নড়ে উঠল।

'কিন্তু আমার যে পরিবার, ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধা মা রয়েছে, স্যার।'

'তাদের এখানে নিয়ে আসবে, এখানে তারাও নিরাপদে থাকবে, তুমিও…তোমাদের জন্য এই বাড়ীর গোটাকয়েক ঘর ছেড়ে দেওয়া হবে।'

এদের আগমনের পর যে-শহরে নিরপত্তা ব'লে কারও কিছু নেই, সেখানে নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা ; যেখানে খাদ্য প্রাপ্তি অনিশ্চিত, সেখানে মাইনে পাওয়া, পরিবার নিয়ে সংসার পাতা…এবং সর্বোপরি ছোরা ও গুলির আঘাত থেকে নিশ্চিতরূপে বেঁচে বাস করা—এতো স্বপ্নাতীত। আর তাই কিনা এল আজ উলীনের ভাগ্যে! খর-রোদে পর্বতগাত্রে তৃষ্ণার্ত পথিক ঝরনা দেখে যে রকম আনন্দিত হয়, উলীনও সেইরকম আনন্দিত হ'য়ে বলে উঠল :

'আমার দু'চারটে জিনিসপত্র যা আছে তা কি আমি এক্ষুণি নিযে আসতে পারব স্যার?—যদিও সবকিছুই শেষ হ'য়ে গেছে…খুব বেশী জায়গা লাগবে না এসব জিনিসের জন্যে।'

সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে আবার কি কথা বলে। তারপর অফিসরটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে : 'তুমি এক্ষুণি আসতে পার।'

'আর কাল, স্যার, আমি আমার পরিবার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসব।' গদগদ কণ্ঠে উলীন বলে।

মৃদু হেসে অফিসর বলে : 'আচ্ছা, নিয়ে এস।' তারপর অঙ্গুলি নির্দেশে উলীনকে চুপ থেকে তার বক্তব্য শুনতে বলে :

'দেখলে তো, আমাদের প্রতিরোধ যারা করে না তাদের প্রতি আমরা কি রকম দয়ালু! আমরা চাই সকলের ভাল, চাই এদেশের শান্তি। আর আমাদের যারা এই মহৎ কার্যে সাহায্য করবে তাদের আমরা ভাল ভাবেই পারিতোষিক দেব।'

'হাঁ, স্যার—' বিড়বিড় ক'রে উলীন বলে। নিজের সৌভাগ্যের নব-দিনের সুত্রপাতে সে বিগলিত হ'য়ে যায়। অফিসরদের দিকে তিন তিনবার মাথা নুইয়ে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি সোজা বেরিয়ে সুবৃহৎ অট্টালিকার গেট পেরিয়ে সে চলে আসে। পকেট থেকে টাকা বের ক'রে গেটের সৈনিকটিকে দিয়ে নিজেই যেন আপ্যায়িত মনে করে নিজেকে।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে সমস্ত রাত্রি ধ'রে জিনিসপত্তর গোছগাছ ক'রে রিক্সার খোঁজে বাইরে বেরিয়ে দেখে তমিস্রা ভেদ ক'রে উষার প্রথম আলো পুব গগনে জেগে উঠছে। রিক্সার উপর সব জিনিসপত্র উঠিয়ে তার উপর চেপে ব'সে উলীন শত্রু-পুরীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।

পরদিন দামী কাপড়-চোপড় পরে আনন্দচিত্তে দুই শত্রু-রক্ষী পরিবেষ্টিত হ'য়ে সে চলল সেই শ্বেতাঙ্গিনীর আশ্রয়-বাটীর দিকে নিজের স্ত্রী-পুত্রদের আনতে। গোটা কয়েক গলি পেরিয়ে একটা ছেক্‌রা ঘোড়ার গাড়ী পেয়ে তাই ভাড়া ক'রে সে চলল। আজ যদি একটা মটর গাড়ী ভাড়া পাওয়া যেত! তবুও মনের আনন্দেই সে গাড়ী চড়ে এসে হাজির হোলো সেই আশ্রয়-বাটীর সদর দরজায়। গাড়ীর পিছন সীটে হেলান দিয়ে বসে কোচোয়ানকে উলীন হুকুম করল:

'নেমে দোরে শব্দ ক'রে খবর দে-যে উলীন বাবু এসেছেন তার পরিবার নিতে।' যেন চাকরকে হুকুম করছে এই ভাব ফুটে উঠল উলীনের কথায়।

'কত্তা, তা তো হবার নয়···লাগামের টান যদি ঢিলে হ'য়ে যায় তো আমার এই নবাব পুত্তুর ঘোড়াটি ন্যাজে ভর দিয়ে বাবু মশাইদের মত বিশ্রাম নিতে বসে যান। চার-চার জন লোকও তখন তাকে টেনে ওঠাতে পারে না।'

রক্ষীদের ডেকে কোন কথা কইতে উলীনের মনে সাহস হয় না। কোন পথ নেই দেখে উলীন নিজেই নিজের চাকর হ'যে দোরে করাঘাত করে। করাঘাতের শব্দে দোরের ছোট্ট ফুটো দিয়ে দরোয়ান অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি উলীন বলল:

'আমার নাম উলীন, আমি এসেছি আমার বৌ ছেলে নিতে।'

শত্রু-সৈন্যদের উপরে বিরক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলে দরোয়ান দোরটা একটু খুলে উলীনকে কোনমতে ভিতরে গলিয়ে নিয়ে শত্রু-সেনাদের মুখের উপরে দোরটা ধড়াস ক'রে বন্ধ ক'রে দিল। পিছন থেকে বন্দুকের কুঁদা দিয়ে ঘা দিতে দিতে তারা চেঁচাতে থাকে ভেতরে ঢুকবার জন্যে। গম্ভীরভাবে দরোয়ান উলীনের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে:

'এ দুটোকে সঙ্গে নিয়ে কেন এসেছ শুনি?'

'জানোতো আমি এ শহরের ব্যবসায়ী···আমাকে রক্ষার জন্য এদের পাঠান হয়েছে।'

'তোমাকে রক্ষা করতে!' বিস্ময়াবিষ্ট দরোয়ান প্রশ্ন ক'রে হেসে ফেলে।

'ওদের জন্যে আমি দায়ী থাকছি।' বেশ রাশভারী কণ্ঠে উলীন বলে।

'উঁহুঁ, উঁহুঁ, শত্রু-সেনাদের এ-বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ···দেখি, কর্ত্রী ঠাকরুনকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।'

নিমেষে দরোয়ান ভিতরে চলে যায়। দোরের বাইরে দুম্-দাম্ শব্দে আর চিৎকারের গর্জনে সন্ত্রস্ত উলীন সেই শীতেও ঘর্মাক্ত কলেবরে বারে বারে ভাবে যদি এরা সঙ্গে না আসত। দরোয়ানের কাছে সব শুনে গৃহ-কর্ত্রী দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে উলীনকে ভাল ক'রে দেখে। তার প্রস্তর-স্থির দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে উলীনের মনে হয় এ যেন কোনো মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

'তুমি বিশ্বাসঘাতক নও তো?'

ঘর্মাক্ত কলেবরে পিছনে রক্ষী-সৈন্যদের চিৎকারে সন্ত্রস্ত উলীন শ্বেতাঙ্গিনীর প্রশ্নে একটু বিরক্ত হ'য়ে জবাব দেয়:

'ভদ্রে, বিশ্বাসঘাতক বলতে আপনি কি বোঝেন? আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, উন্নতিই আমি কামনা করি,—এই মাত্র···পরিবারের ভরণ-পোষণ আমাকে করতে হবে তো? আর আমিই হলাম পরিবারের একমাত্র পুরুষ যে আয় ক'রে এদের বাঁচাবে।'

আবার সেই হিমশীতল কণ্ঠ প্রশ্ন করে: 'কিন্তু সমস্ত শহরে কি ঘটে গেছে, কিছুই তুমি দেখনি?'

আরও বিরক্তিতে উলীন জবাব দেয়: 'যা ঘটেছে তা তো ঘটেছে, ···আর এ কথা তো জানাই যে বিজয়ী দেশী সৈন্যদের থেকে বিদেশীরা বেশী কিছু করবেই।···আমার কথা হোলো, এ সব আমরা যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারি ততই মঙ্গল, ততই শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।'

'বুঝলাম, তুমি হলে একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক···তোমার পরিবার নিয়ে এ-বাড়ী ছেড়ে বাইরে যত তাড়াতাড়ি যাবে ততই আর সকলের মঙ্গল।' দরোয়ানের দিকে ফিরে শ্বেতাঙ্গিনী বলল ঐ দুই শত্রু-সেনাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে। নিতান্ত অনিচ্ছায় দরোয়ান দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দুই মূর্তিমান ধূমকেতু ভিতরে ঢুকেই কৈফিয়ৎ তলব করল এ-দেরীর জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দণ্ডায়মানা হিমশীতল মূর্তির দিকে তাকিয়ে তারা থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুষ্টু ছেলেদের ধমক দিয়ে কথা বলার ভঙ্গীতে শ্বেতাঙ্গিনী ঐ দুই শত্রু-সেনাকে কড়া ভাষায় বলল:

'যেখানে আছ চুপচাপ ভদ্রভাবে শান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক।'

ভয়ে কেঁপে উঠল উলীন। তবু ভাল, শ্বেতাঙ্গিনীর কথা ওরা বোঝেনি, নিজেদের ভাষায়ই কি যেন নিজেরা বলাবলি করছে। সে-কণ্ঠের আওয়াজে

বোঝা গেল মনে মনে রেগে গেলেও তারা এগোতে সাহস করছে না। ভেড়ার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজগজ করতে থাকে। উলীনের দিকে ফিরে এবারে গৃহ-কর্ত্রী বলল :

'এই জাতীয় সঙ্গীদের নিয়ে এর বেশী এ-বাড়ীর ভেতরে তোমাকে আসতে দিতে পারি না। এখানেই তুমি অপেক্ষা কর, তোমার স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের আমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

শ্বেতাঙ্গিনী ভিতর-বাড়ীর দিকে চলে গেল। উলীন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গৃহ-কর্ত্রীর লম্বা গাউনের শেষপ্রান্ত ঘাসের মাথা ছুঁয়ে দুলতে দুলতে চলেছে। দুই রক্ষীর মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উলীন কাঁপতে থাকে। এ বিলম্বের মূল হয়তো উলীন মনে ক'রে এরা আবার না ক্ষেপে ওঠে। এরা তো রক্ষী নয়, যেন বাঘ, যে কোন মুহূর্তে থাবার ঘায়ে প্রাণ না নিয়ে নেয়···কিন্তু উপায়ই বা কী, সরিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেও উলীনের ক্ষমতা আজ কই। দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে দরোয়ান লক্ষ্য করতে থাকে এই ত্রিমূর্তিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উলীন দেখে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তার স্ত্রী বেরিয়ে আসছে, পিছনে শাশুড়ী লিংসাও। অর্কিডও আসতে চেয়েছিল, কিন্তু গৃহ-কর্ত্রী বারণ করেছে। অত ভরা-যৌবন আর সৌন্দর্য নিয়ে কোনো মেয়েকেই এই শত্রুদের সামনে বেরোতে দিতে সে রাজী নয়।

'সব ভাল তো, মা ?' শাশুড়ীকে সম্ভাষণ জানিয়ে জামাতা প্রশ্ন করে।

'আশীর্বাদ করি বাবা, ভাল থাক—' উত্তর দিতে গিয়ে জামাইর পাশে শত্রু-সৈন্যদের দেখে আশ্চর্য হ'য়ে থেমে যায়। তারপর কথাটা টেনে আবার বলে : 'তোমার শ্বশুরের কোন সংবাদ জান কি বাছা ?'

'না, সেই যেদিন ওরা এখানে আশ্রয় পেল তারপর থেকে কোন খবরই পাই নি···এখানকার খবরও দিতে পারি নি। আপনারা এখানে কবে এলেন তাও জানি না।'

'সেই রাত্রেই আমি এখানে চলে এসেছি।' বলতে বলতে লিংসাও মনে মনে চিন্তা করে, ওর মার মৃত্যু-সংবাদ উলীন এখনও জানে না তবে। সেই জঘন্য মৃত্যু-কাহিনী না ব'লে যে টুকু বলা দরকার তাই জামাইকে বলল :

'শ্বশুরের সঙ্গে তোমার যখন দেখা হয়নি, তখন খারাপ সংবাদটা আমাকেই দিতে হয় বাবা···বড়ই দুঃসংবাদ। তোমার মা সকলকে ছেড়ে চলে গেছেন,

বয়সও তো হ'য়েছিল। শত্রুরা আমাদের বাড়ীতে হানা দিলে ছাতের বরগা চাপা পড়ে তিনি মারা গেছেন। কফিনে ক'রে মাঠের মাঝখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, তার ওপরে উঁচু ক'রে সমাধি-স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে···আমার চলে আসবার পর যারা এসেছে তাদের মুখেই শুনেছি।'

শাশুড়ীর শোকে জামার হাতা দিয়ে উলীনের স্ত্রী চোখ মোছে···স্বামীর সামনে শোকের উচ্ছ্বাস না দেখালে নয়। এ মৃত্যু-সংবাদ সে আগেই পেয়েছে, শোকের ধাক্কাও সে আগেই সামলিয়ে উঠেছে। উলীনের চোখে জল এসে যায়, হাত তুলে জামার হাতা দিয়ে চোখ মোছে।

কিন্তু এ শোকোচ্ছ্বাসে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে রক্ষীদ্বয়। বন্দুকের কুঁদা দিয়ে উলীনের পিছনে গুতো দিয়ে তাড়া করে এগোবার জন্য···শোক-ক্রন্দন আপাততঃ কিছুক্ষণ মুলতবী থাকুক; তাদের এখন ফিরতে হবে। লিংসাও-কেও বিদায়ের শেষ কথা না ব'লে উলীনকে এগিয়ে যেতে হয়। দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লিংসাও প্রশ্ন করে :

'তোমার সঙ্গে হলেও মেয়েকে এভাবে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ তো?'

ভাল সীট দুটো রক্ষীদের দিয়ে পরিবারকে গাড়ীর মধ্যে বসিয়ে চলন্ত গাড়ীতে নিজে উঠতে উঠতে উলীন কোনমতে জবাব দেয় :

'হ্যাঁ মা, আমি যখন নিরাপদ, তখন আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও নিরাপদ!'

গাড়ী চলে গেল, লিংসাও হা ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। পাশে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গিনী গৃহ-কর্ত্রী তারই দিকে তাকিয়ে। লিংসাও ফিরে তাকালে গৃহ-কর্ত্রী বলে : 'সত্যিই তোমার জন্য আমি দুঃখিত—'

বিদেশিনী ওখানে আর দাঁড়াল না, লিংসাওকে কথা কয়টি বলেই বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

পাশে দণ্ডায়মান দরোয়ানকে হতভম্ব লিংসাও জিজ্ঞেস করে :

'আমার থেকেও কতজন আরও কত বেশী অত্যাচারিত হয়েছে, কিন্তু আমার জন্য গৃহ-কর্ত্রী দুঃখিত কেন বললে?'

'কারণ বুঝলে না, মা···তোমার জামাই শত্রু-শিবিরে চলে গেছে। আজ সে তাদেরই ভাড়াটে কুকুর।'

'সেই জন্যেই বুঝি জামাইর বেশ-ভুষা আজ এত চটকদার ছিল!' লিংসাও জোরে বলে ওঠে।

'হুঁ,' জবাব দিয়ে দরোয়ান দাঁত খুঁটতে থাকে।

লিংসাও ঘরে ফিরে এসে বসল যেখানে কন্যা ও পুত্র-বধু নাতি-নাত্নীদের নিয়ে শীতে জড়ো-সড়ো হ'য়ে বসে আছে। শীতের বৃষ্টি আর দমকা হাওয়ায় সকলে আরও কাঁপতে থাকে। বাইরে তুষার জমে উঠেছে, আর সেই সঙ্গে লিংসাও-র মনও কেমন জমে ভার হ'য়ে ওঠে গৃহ-চিন্তায়। জামাইর সঙ্গে বড় মেয়ে আজ চলে গেল নিজের ঘরে, মুক্ত সে, এখানকার প্রাচীর-ঘেরা বাঁধনের কড়া শাসন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। কোন অসুবিধাই এখানে নেই, তবু লিংসাও ভাবে, বুড়োকে না দেখলে ভাত যে গলা দিয়ে তার নামতে চায় না। কী ভাবেই বা ওরা সংসার চালাচ্ছে! ঘরের কাজ কি আর পুরুষরা কিছু পারে? বাড়ীর চারিদিকে দেখগে এর মধ্যে কত নোংরা জমে উঠেছে, সংসারের কত কাজ হয়তো ওরা দেখেও না। ভাত-তরকারীও কী আর গরম গরম নামিয়ে ওরা খায়? হয়ত চাল শুদ্ধ ভাত নামিয়ে, আসেদ্ধ তরকারী দিয়ে কোন মতে খেয়ে উঠছে বুড়ো আর ছেলেরা। লিংসাওর কথা কি ওরা একবারও মনে করে?···খেতে বসে নিশ্চয়ই ভাবে শুধু তরকারী-ভাত,—মাছ-মাংস-র কথা ছেড়েই দাও—কত সুন্দর ভাবে আমি রেঁধে দিতাম···মাংস কি আর ওরা এখন কেনে? বোধ হয় না। তারা জাল ফেলে মাছ ধরে নিতে পারে। পুকুরের জল যদি ইতিমধ্যে জমে বরফ হ'য়ে গিয়ে থাকে তো উপরের বরফ ভেঙ্গে সরিয়ে জাল ফেলে মাছ তুলে নেবে। কিন্তু মাছ কেটে পেটের নাড়ী-ভুড়িগুলো ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে ধুতে পারে তো! মাছের ঝাল ঠিকমত জ্বাল দিয়ে নামাতে কি আর পারবে ওরা!

গৃহে ফিরবার একটা গোপন-তাগিদ যেন মনের চারি-ভিতে বারে বারে হানা দেয় লিংসাও-র। শুধু কি লিংসাও-র মনেই?

সকলেই যখন শুনল এই আশ্রয়স্থলের তাদের মত একজনকে তার স্বামী এসে নিয়ে গেছে ঘরে ফিরিয়ে, প্রত্যেকেই উতলা হ'য়ে ওঠে, ভাবে: 'বোধহয় দিনকালের অবস্থা ভাল হ'য়ে এসেছে, হয়তো এবারে তাকে নিতে আসবে, যদি অবশ্য অতটা বুদ্ধি স্বামীর ঘটে থাকে!' ঘরে ফিরে যাবার চাপা-আকুলতায় ছেলে-পিলের সামান্যতম বিরক্তিও কেমন অসহ্য লাগে। অন্য দিন ছেলেমেয়েদের সামান্য বিরক্তি যা চোখে পড়ত না, আজ যেন তাই সহ্য হয় না। মুহূর্তে চড়-চাপাড়ীর ঝড় তুলে অপরাহ্ণের আগেই সমস্ত বাড়ীটা ক্রন্দন-সাগরে পরিণত হ'য়ে যায়। বারে বারে লিংসাও-র মনে হয় আজ রাতেই সে একলা গাঁয়ের গৃহে ফিরে যাবে, কিন্তু পারে না।

বড় মেয়ের পৌঁছ সংবাদ এল। শত্রু-সেনার রক্ষণাধীনে তার স্বামীর উন্নতি, তার স্বামীর সম্মান, বৃহৎ অট্টালিকায় কতগুলি সাজানো ঘরে নতুন ক'রে গড়া তার সংসার, এমন প্রাচুর্য, জীবনেও যা সে কোনদিন দেখেনি, তারই ফিরিস্তি দিয়ে মেয়ে চিঠি লিখেছে। শুনে লিংসাও বলে :

'শত্রুদের আমরা যত খারাপ ব'লে মনে করেছিলাম, বোধহয় ততটা নয়। আমার জামাই-মেয়ের সঙ্গে তো তারা বেশ ভাল ব্যবহারই করছে। আর শহরেও বোধহয় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।'

মেয়ের এ-চিঠি যেমন মেয়েও নিজে লেখে নি, মায়েও তেমনি সে-চিঠি নিজে পড়তে পারে না। এ চিঠি মেয়ের জবানিতে উলীনের লেখা। ঐ আশ্রয়স্থলেরই এক কুমারী শিক্ষয়িত্রীকে দিয়ে সে চিঠিটা পড়িয়ে নিয়েছিল। লিংসাওর কেমন ধারণা যে এ শিক্ষয়িত্রীটি এখনও কুমারীই আছে, মন্দিরের সেবাদাসীদের মত নয়। চিঠিটা পড়ে মেয়েটি মন্তব্য করেছিল :

'এ চিঠি আমি বিশ্বাস করি না। এখনও প্রতিদিন রাস্তায় কত লোককে হত্যা করছে, কত মেয়ের উপরে বলাৎকার করছে ঐ পাষণ্ডেরা।'

মন্তব্য শুনে লিংসাও ভাবে, এ কুমারী মেয়ে বলাৎকারের কি বোঝে? তাই প্রশ্ন করে : 'তবে তুমিও কী সেবাদাসী, মেয়ে?'

'নিশ্চয়ই না—' চটে গিয়ে মেয়েটি জবাব দেয় : 'আমি ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারতাম···কতবার সম্বন্ধ এল! বিয়ে না ক'রে বই পড়ব, কত কিছু জানব, এই তো আমি চেয়েছিলাম।'

'তোমার মতন আমার এক ছেলের বৌ আছে। কিন্তু তার ছেলে হবে।' লিংসাও বলে।

'অ—!' এমন স্বরে মেয়েটি উত্তর দেয় যেন তার কাছে এ সংবাদ এমন কিছুই নয় এবং সত্যিও কিছুই নয় বটে। চিঠি পড়ার জন্য মেয়েটিকে আশীর্বাদ ক'রে লিংসাও উঠে আসে। অর্কিড আর প্যানসিওয়াওকে চিঠির খবর দেয়।

প্রাচীর-ঘেরা ধূসর স্কুল-বাড়ীর নিরালা ঘরে দম বন্ধ হ'য়ে আসে সকলের। অনভ্যস্ত এ-জীবন যেন আর সহ্য হয় না। সেই একঘেয়ে প্রাচীরের মধ্যবর্তী শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটা। শহরের এক পার্শ্বের এই নিস্তব্ধ বাড়ীর প্রাঙ্গণে আর কোন শব্দের মূর্ছনাও জাগে না, শুধু দুইবেলা প্রাত্যহিক প্রার্থনার ভজন গান ছাড়া। কী ভাবে দিন কাটাবে তারা?···উতলা হ'য়ে ওঠে মন। দু'একবার সেই বিদেশী ধর্মমন্দিরে নতুনের আস্বাদ পেতে গিয়ে

অর্কিড ফিরে এসেছে। বিদেশী গানেরও যেন কি রকম সুর···কান্নার মত কানে এসে মনকে আরও খারাপ ক'রে দেয়। আর প্রার্থনার বিদেশী ভাষাও সে বুঝতে পারে না। সুতরাং ওদিকেও আর পা বাড়ায় না সে। প্রতিদিনের ঐ একঘেয়ে জগা-খিচুড়ি খাদ্য আর রুচতে চায় না মুখে। কিছু মিষ্টি-মুখ করবার বাসনা মনে জাগে বার বার। গাঁয়ের পথের ফেরীওয়ালার ঘণ্টা ধ্বনি শুনে সে যেত ছুটে মিষ্টি তিলে-ভাজা কিনে খেতে। শীতের সকালের ফেরীওয়ালার সেই নৈ-টানা মুখে দিয়ে চুষে চুষে সমস্ত সকাল পরমানন্দে সে কাটিয়ে দিত···। আবদ্ধ স্থানের মধ্যে ছেলে-মেয়েরাও অস্থির হয়ে ওঠে। চিনির সাজ···তাদের খেলনা খাবার, মাটির পুতুল, কাগজের ঘুড়ি, খরগোস-মাছ, প্রজাপতি আকৃতির কতরকম কাগজী-লণ্ঠনের খেলনা তাদের ছিল··· বারে বারে সে-খেলনা, সে-সব খাবারের কথা মনে হয়, মন অস্থির হয়ে ওঠে। আজ এখানে তাদের কোন খেলনাই নেই।

বড় ননদের সুখের সংসারের খবর জেনে মনে মনে অর্কিড ভাবে :

'শহরে তো শান্তি ফিরে এসেছে। একদিন সকলের অলক্ষিতে দোকানে গিয়ে কিছু কিনেও তো আনতে পারি। অবস্থা বুঝে ননদের বাড়ীও ঘুরে আসতে পারব একবার···তারপর স্বামীকে খবর পাঠিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাব। এভাবে বন্ধ হ'য়ে কি আর থাকা যায় ?'

নিজের মনের কথা সে আর বললো না। নরম তুলতুলে মেয়ে হলেও, পরের মতে সায় দিয়ে চললেও, নিজের মনের গোপন ইচ্ছাকে রূপ দিতে এসব মেয়ে পিছু পা হয় না।

একদিন ভোরে উঠে কোলের ঘুমন্ত শিশুটিকে বিছানায় শুইয়ে রেখে, আর একটিকে খেলায় মত্ত দেখে অর্কিড লিংসাও-র কাছে গিয়ে মৃদু হাই তুলে বলে : 'কাল রাতে মোটেই ঘুম হয় নি, মা। কোলেরটা তো ঘুমিয়ে, আর ওটা খেলছে···তুমি যদি একটু নজর রাখ তো আমি একটু ঘুমিয়ে নি।'

'এমন কিছু তো করবারও নেই এখানে, বেশ ঘুমোও গে।' লিংসাও জবাব দিয়ে নিজের মনে সুতো কাটতে থাকে। হাতে কাজ না থাকলেও লিংসাও-র মত গৃহিণীরা কাজ জোগাড় ক'রে নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। অর্কিড তো আর তার মত নয়। কিছু তুলো আর একটি তকলী সে এখানেই জোগাড় ক'রে নিয়েছে।

মৃদু হেসে অর্কিড দালানের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে দেয়ালের পাশ দিয়ে গেটের দিকে এগোয়। বাইরে বেরোবার এই তো সময়। এই সময়েই তো দরোয়ান দোরে খিল এঁটে নিজের ঘরে গিয়ে খেতে বসে। কেউই কোথাও নেই। অতি সাবধানে পা ফেলে শব্দ না ক'রে আস্তে আস্তে অর্কিড গেটের খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দোরটি টেনে ভেজিয়ে দিল। জানালা দিয়ে হঠাৎ নজর পড়লেও ভেজানো দোরের খিল খোলা আছে বুঝতে পারবে না দরোয়ান। যেদিন গ্রাম ছেড়ে তাদের পালিয়ে আসতে হয়েছিল সেদিন কিছু পয়সা সে লুকিয়ে এনেছিল। বুকের কোণে সে-পয়সা বেঁধে নিয়ে আসতে সে ভোলে নি। পথে বেরিয়ে খাঁচা-ছাড়া পাখীর মুক্ত-আনন্দে প্রভাতী-বাতাস বুক ভরে সে টেনে নেয়। তারপর একটি একটি পা ফেলে সে এগোতে থাকে। শীতের সকালের জন-বিরল পথে সব কিছুই অর্কিডের ভাল লাগে···বিশৃঙ্খলা অশান্তির কোন কিছুই তার নজরে পড়ে না।

যে মুহূর্তে গেট খুলে সে বাইরে বেরিয়েছে, বাজের শ্যেন দৃষ্টির মত তাক্ ক'রে পাঁচটি শত্রু-সেনা আস্তে আস্তে তার পিছু নিল। নিরালা রাস্তায় হঠাৎ যদি কোন মেয়ে বেরিয়ে পড়ে, তারই উপর ঝাপিয়ে প'ড়ে কামনা চরিতার্থ করবার ফিকিরে ঘুরছে এই নর-পশুরা। কিন্তু নতুন হুকুমে দিন-দুপুরে রাস্তাঘাটে মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি লোটা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে দেয়ালের আড়ালে যা-কিছু ঘটে তার কথা তো চাপা থাকে, বাইরের কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এ দুর্দিনে কোনো মেয়েই তো ঘরের বাইরে একলা বের হয় না। অর্কিডকে দেখে, তার নরম তুলতুলে দেহ, গালের লাল-আভায় মোহিত কামাতুররা মনে করল, এ বোধহয় শহরের কোন বারবনিতা। দুর্দমনীয় কামনা ফেটে পড়তে চায় তাদের চ্যাপ্টা মুখের প্রতিটি রেখায়, কুতকুতে চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে, দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সজাগ নিষ্পেষণে। হোলা বিড়ালের মত পা টিপে টিপে এরা শিকারের দিকে এগোল। শহরের বড় বড় রাস্তার মোড়ে যে দেয়াল-ঘেরা সাধারণ স্নানাগার থাকে, তারই একটি পাশ কাটিয়ে অর্কিড যখন এগিয়ে চলেছে, বাজের মত হঠাৎ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজেদের মধ্যে অর্কিডকে নিয়ে কিছুক্ষণ টানা-হ্যাঁচড়া কোরে, তাকে তুলে নিয়ে ঢুকল দেয়াল-ঘেরা স্নানাগারের মধ্যে। কে লুটবে প্রথম মজা, এই নিয়ে লাগল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া।

এক জাতীয় মেয়ে আছে যারা আদরে-স্নেহে-ভালবাসায় বেঁচে থাকে,

কিন্তু নিষ্পেষণের ঝড়ঝঞ্ঝার আঘাতে মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ে। এই জাতীয় মেয়ে অর্কিড। সেই কাল্‌ছে চ্যাপ্টা মুখগুলোর স্মরাতুর গিলে-খাওয়া রূপ দেখে অর্কিড আধমরা হ'য়ে যায়। তার সকরুণ চিৎকারে দু'চারজন পথিক সাহস ক'রে দেয়ালের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে যখন দেখে প্রাচীর-গাত্রে বন্দুক খাড়া ক'রে রেখে পাঁচ-পাঁচজন সসস্ত্র সৈনিক···প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত পদে তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়। অর্কিডের আর্তনাদে বিরক্ত সৈনিকরা তাকে প্রহার করে, তারপর চিৎকার বন্ধ করবার জন্য অর্কিডের নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়ে শক্ত ক'রে ধ'রে বসে একজন। একের পর আর একটি দানবের নিষ্করুণ আক্রমণে, তাদের কামনার চরম আঘাত আর ক্ষণিক সার্থকতায়, নেকড়ের থাবার ঘায়ে মৃতপ্রায় শশকের মত, ক্ষতবিক্ষত অর্কিড পড়ে থাকে। তবুও অক্রমণাহত নারী চেষ্টা করে বাঁচবার···পারে না···শশকের মতই তার শেষ-নিশ্বাস আক্রমণের মাঝেই বেরিয়ে যায়। শেষ-সৈনিক মৃত অর্কিডের শবের উপরেই তার কামনার চরম আঘাত শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ায়। ঝঞ্ঝার অবসানে মৃত নারীকে ফেলে রেখে সৈনিকের দল চলে যায় তাদের পথে। সন্ত্রস্ত পথিক সাবধানে এগিয়ে এসে মৃত অর্কিডকে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। নগ্ন দেহ ঢাকা দিয়ে, আশ্চর্য হ'য়ে ভাবে, এ দুর্দিনে কোথা থেকে এল এই নারী, কী বা তার পরিচয়। দেখেই বোঝা যায় যে এ হতভাগিনী গ্রাম্য-নারী। সাবেক কালের মত মাথায় রূপোর চিরুনি, পরনে পুরোনো ধরণের কালো রেশমী কাপড় আর ছোট কোট · গ্রাম্যমেয়ে ছাড়া তো এসব কেউ পরে না আজকাল। শত্রু-কবলিত শহরে দুর্দিনের কথা বোধহয় জানতো না মেয়েটি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পথিক-দর্শকরা। নিজের ঘাড়ে ঝক্কি নিয়ে কবর দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে সাহস হয় না তাদের, হয়তো নারী-হত্যার দায়ে গিয়ে পড়তে হবে। এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ বলল :

'এক কাজ কর। সেই শ্বেতাঙ্গিনীর কাছে এই মৃতদেহ নিয়ে চল···তাকে নারী-হত্যার দায়ে দায়ী করতে পারবে না কেউ। কবরের ব্যবস্থাও সেই মহিলাই ক'রে দেবেন নিশ্চয়ই।'

এক রিক্সা ডেকে অর্কিডের মৃতদেহ চাপিয়ে সেই প্রাচীর-ঘেরা স্কুল-বাড়ীর দোরে এসে পথিকেরা দোরে মৃদু করাঘাত করে। মৃতদেহ টেনে নিয়ে যেতে রিক্সাওয়ালাও প্রথমে রাজী হয় নি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীর স্কুল-বাড়ীর অল্প-দূরত্ব দেখে আর ভাল ভাড়া প্রাপ্তির আশায় সে রাজী হ'য়ে যায়। খাওয়া শেষ ক'রে

একটি ছোট বেঞ্চির উপর বসে দাঁত খুঁটছিল দরোয়ান—অবসর সময়ে দাঁত-খোঁটাই তার বিলাসিতা—দোরে শব্দ শুনে উঠে দোর খুলে চেঁচিয়ে ওঠে : 'সে কী, এ-মেয়ে তো এখানেই এ-বাড়ীতেই ছিল !'

'তা হ'লে একে দোরের বাইরে যেতে দিয়েছিলে কেন?' পথিকেরা গুমরিয়ে প্রশ্ন করে।

'না, আমি তো দিই নি, কোনো সময়ই কোনো মেয়েকেই আমি তো বের হতে দেই না।' দরোয়ানের মনে পড়ে, খাওয়া শেষ ক'রে বাইরে এসে দরজার খিল খোলা দেখে সে আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিল। এরকম ভুল তো তার হয় না। হয়তো বৃদ্ধ বয়সের ভুল···ভাগ্য ভাল যে কারুর নজরে পড়ে নি।

'আমি যখন খেতে বসেছিলাম তখন সেই ফাঁকে এই মেয়েটি চুপে চুপে খিল খুলে নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়েছিল।' পথিকদের ব'লে তাড়াতাড়ি দরোয়ান ছোটে ভিতরের দিকে গৃহ-কর্ত্রীকে খবর দিতে।

প্রার্থনা শেষ ক'রে তক্ষুণি কেবল শ্বেতাঙ্গিনী বেরিয়েছে। দরোয়ানের মুখে খবর শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে সেই করুণ দৃশ্য দেখে তার উজ্জ্বল গম্ভীর মুখ থমথমে হ'য়ে যায়। পথিকদের মুখে সব শুনে বলে :

'মৃতদেহ এখানে এনে ভালই করেছেন। এখানেই এই আশ্রয়স্থলেই মেয়েটি থাকতো। দুটি সন্তান, শাশুড়ী, আর ননদ এখানেই আছে। ওর স্বামীকেও আমি খবর পাঠাচ্ছি'

মৃতদেহের একটা সুব্যবস্থা হবে দেখে পথিকরা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যায়। ভাল ভাড়া পেয়ে রিক্সাওয়ালাও চলে যায়।

বাহকদের ডেকে মন্দিরের মাঝে মৃতদেহকে নিয়ে যেতে শ্বেতাঙ্গিনী দরোয়ানকে বলল। দরোয়ান বাহকদের নিয়ে ফিরে এসে অর্কিডের মৃতদেহ সাবধানে বহন ক'রে নিয়ে মন্দিরে গেলে, গম্ভীর গৃহ-কর্ত্রী ধীরে ধীরে হলের মধ্যে প্রবেশ করল। লিংসাওকে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে অল্প কথায় সব ঘটনা বলল। প্রথমে শুনে লিংসাও মনে করে, শ্বেতাঙ্গিনী নিশ্চয়ই অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে অর্কিডকে গুলিয়ে ফেলেছে। তাই সে বলে : 'তুমি ভুল করছ মা, আমার বৌমা এখনও ঘুমিয়ে···কোলের বাচ্চাটা ঘুম থেকে উঠে কাঁদছে ব'লে তাকে আমি তো ডাকতে যাচ্ছিলাম—প্রায় আধ-বেলা তো ঘুমোল—'

শ্বেতাঙ্গিনীর মুখে কোন পরিবর্তন হয় না। লিংসাওকে সঙ্গে নিয়ে গির্জার হলে সে এল। নিচু টেবিলের উপরে অর্কিডের শায়িত মৃতদেহ দেখে

লিংসাও আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠল: 'দু'ঘণ্টা আগেও যে ও আমার বেঁচে ছিল, মোটা-কাটা হৃষ্টপুষ্ট দেহ যে—'

কি ক'রে যে এ ঘটনা হোল তার সম্ভাব্য কারণ শ্বেতাঙ্গিনীর মনে যা হয়েছে তাই লিংসাওকে বলল। কাঁদতে কাঁদতে লিংসাও বলতে থাকে:

'হতে পারে মা, তা হতে পারে। চাপা মেয়ে···মনের মধ্যে যে কি খেলত তা কাউকে ভেঙ্গে বলতো না। মৃদু হাসি আর ওর নরম দেহের আড়ালে ওর মনটা ছিল এক গুঁয়ে ··হা-হা-হা—আর আবাগী বেটির কালই হোলো আজ মনের কোণের ওই একগুঁয়েমি।···আমার গাঁয়ে একটা খবর পাঠাও মা, স্বামী-পুত্র না এলে কী যে করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না!'

'সেকথা আমি ভেবেছি। আজ রাতে হ্রদের দিককার দরজা দিয়ে তোমাদের গাঁয়ে কাউকে পাঠিয়ে দেব। এ যখন মরেই গেছে এর খবরের জন্য দিনের বেলায় কাউকে পাঠিয়ে আর একটা লোককে বিপদে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না।'

মর্মাহত গম্ভীর শ্বেতাঙ্গিনীর চোখে এক ফোঁটা অশ্রু-জলও গড়িয়ে পড়ে না, তার মনের ভিতরে সব কিছু চাপা। গির্জার একজনকে ডেকে মৃতদেহটাকে ঢেকে নজর রাখতে ব'লে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। লিংসাও-র মরা-কান্না শুনে কোনো সমবেদনাও জানায় না সে, যেন এ শিশুর ক্রন্দন। লিংসাও বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলে:

'কি যে হোলো···দু'দুটো দুধের বাচ্চা—আমার ছেলেটাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। এ দুর্দিনে ছেলের জন্য কোথায় পাব আর একটা মেয়ে···।'

শোকাতুরা শাশুড়ীর বিনিয়ে বিনিয়ে এ-ক্রন্দনের যেন আর শেষ নেই। কিন্তু দিনের শেষ আছে। রাত্রির আগমনে মাতৃহারা শিশুরা ঘুমে ঢলে পড়ে···মায়ের অভাব বুঝবার মত বয়স তো তাদের হয় নি, মায়ের স্নেহ আদর পেলেই হোলো। ঘুমন্ত নাতি-নাত্নীদের পাশে বসে স্বামী-পুত্রের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে লিংসাও। প্রথম রাত্রে পদধ্বনি শুনে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে দরোয়ান হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে। নিদ্রিতা নারী ও শিশুদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে লিংসাও দোরের দিকে এগিয়ে যায়। দোরের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে স্বামী-পুত্রকে দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে:

'কী যে ঘটল আমাদের কপালে—হা-হা-হা! ওরে লাও-তা, কী যে হ'য়ে গেল—হা-া-া—'

লিংসাও-র সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই শ্বেতাঙ্গিনী লিংটানকে সব কথা

বলেছিল। ক্রন্দন শুনে সে তাদের কাছে এগিয়ে এল। তাদের গির্জার হলের দিকে এগোবার আহ্বান জানিয়ে বলল: 'তোমরা এস আমার সঙ্গে।' নির্দেশ অনুযায়ী তারা বসলে শ্বেতাঙ্গিনী তাদের বলল যে মৃতের সৎকারের জন্য এখান থেকে কফিন সে দিয়ে দেবে এবং আপাততঃ এখানেই তার কবর দেওয়া হোক। 'ভবিষ্যতের সুদিনে যদি নিজেদের মাঠে কবর দিতে চাও তো পরে কফিন এখান থেকে তুলে নিয়ে যেও।'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে লিংটান জবাব দেয়: 'কফিন জোগাড় ক'রে শহরের বাইরে আমাদের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে কবর দেবার চেষ্টা করা তো এখন পাগলামী। বিদেশিনী হয়েও আমাদের জন্য তুমি যা করেছ মা, কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব তোমাকে! এত দয়া তোমার মা—'

'আমি নিজে কিছু করছি না। যে টুকু আমি করছি সে ভগবানেরই কাজ, তাঁরই সেবা!'

লিংটান দাঁড়াল, লিংসাওও। স্বামীকে সে বলল:

'আমি তোমার কাছে ফিরে যাব।'

'না, এখনও না। চারিদিকে কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না। নতুন বিজেতা শাষকদের অধীনে আমাদের জীবন-জীবিকার যে কী হবে?'

'তা হোক, আমি তোমার সঙ্গে যাব।' বেশ একটু জোর দিয়ে বলে লিংসাও।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনে লিংটান বোঝে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছুতেই স্ত্রীকে আর এখানে রেখে ফিরে যাওয়া যাবে না।

'যখন বিপদ ঘটবে তখন কি হবে। তখন দায়ী হবে কে শুনি?'

'আমার কপালকে দুষবো···আর কাউকেই তার জন্য দায়ী করব না। আমি যাবই।'

কিন্তু লিংটান তখনও রাজী হতে চায় না। বলে: 'প্যানসিয়াও, প্যানসিয়াওকে কী করবে? তাকে এখানে একলা রেখে যাবে?'

এ ভাবনা লিংসাও ভাবেনি আগে, তাই হতভম্ব হ'য়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্বেতাঙ্গিনী বলে:

'তোমরা যদি যাওই তবে তোমার মেয়েকে এখানে রেখে যাও। শান্তির সময়ে এ-বাড়ীতে একটা মেয়েদের স্কুল ছিল, শুনেছ নিশ্চয়ই। আজ সে-স্কুল আমরা সরিয়ে নিয়ে গেছি নদী উজিয়ে হাজার মাইল ভিতরে। সেখানে এখনও

শত্রু কবলিত হয় নি, তোমার দেশের সরকার আছে। স্কুলের সব মেয়েদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী কাল আবার জাহাজে ক'রে নদী উজিয়ে আমার দেশী লোক তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সেইখানে যাবে। আমাদের দেশী দু'জন রক্ষীসৈনিক থাকবে তাদের পাহারায়। তাদের সঙ্গে তোমার ছোট মেয়েকে পাঠিয়ে দেব। যখন তোমরা চাইবে তোমাদের মেয়েকে, তখুনি তাকে আনিয়ে দেব।'

স্ত্রী আর ছেলের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের কথা পড়ে নেয় লিংটান। বলে : 'দেশের সুদিন থাকলে মেয়েকে কী পরের হাতে দূর দেশে এ ভাবে পাঠাতে পারতাম? চিন্তাই তো করতে পারতাম না এ-কথা। কোথায় ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেব মেয়ের,—আর বিয়ে দিয়ে যুবতী মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবারই বা উপায় কোথায়, যেখানে ঘরের বৌকে বাঁচান দায়? এখন তো যুবতী মেয়েকে, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে ঘরের বৌকে রক্ষা করা বিষম দায়। তুমি মা যা বলছ, বিদেশী মেয়ে তুমি, তাই হোক—মাঝে মাঝে শুধু খবর দিও কেমন থাকে আমাদের মেয়ে।'

'লেখা-পড়া শিখবে তোমার মেয়ে···নিজে চিঠি লিখেই তোমায় সে-কথা জানাবে।' শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে বিনম্র জবাব দেয়। কেউ আর কথা বলে না। পুরোনোকাল হ'লে লিংটান মেয়েদের লেখা-পড়ার কথা শুনে হো হো ক'রে হেসে উঠত। কিন্তু আজ আর তার হাসি আসে না। যে ভাবে এক একটি পরিবার ভেঙ্গে ছত্রছান হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, লেখা-পড়া, চিঠিই শুধু পারবে তার মধ্যে তবু যোগাযোগ রাখতে।

এত কথা-আলোচনার মধ্যে লাও-তা নীরবে বসে ছিল—যেন তার কথা সকলে ভুলে গেছে। অতি ধীর ব্যথা-ভরা কণ্ঠে সে বলে :

'আমি একবার দেখতে চাই—দেখব আমার—হা-হা—'

সেই বিষাদময় নারী-হত্যার কাহিনী লাও-তাকে এখনও কেউ বলে নি, লাও-তাও জানতে চায় নাই। লিংসাও-ও চায় না যে ছেলে এ নারকীয় অপমৃত্যুর বিষদৃশ্য দেখে। তাড়াতাড়ি তাই সে বলে :

'দাঁড়ারে বাছা, আমি আগে যাই।'

'হ্যাঁ, তুমি দেখতে পার তোমার স্ত্রীকে; তাকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার ধোয়া কাপড়-জামা পরিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে···মহা-শান্তির কোলে সে ঘুমিয়ে—' অতি ধীর কণ্ঠে এ কথাগুলো বলে শ্বেতাঙ্গিনী। আলো

দেখিয়ে গির্জার হলের দিকে তাদের নিয়ে যায়। নীরবে ব্যথাহত শোকাতুরা প্রিয়জন এগিয়ে যায় তাদেরই ছেড়ে-যাওয়া আত্মীয়াকে শেষ-দেখা দেখতে। শ্বেতাঙ্গিনী অতি সাবধানে, যেন আঘাত না লাগে এমনি আলতো ক'রে, ঢাকা-দেওয়া চাদরটা অর্কিডের মুখ থেকে সরিয়ে নেয়। ঠোঁঠ দুটো বন্ধ, আঘাতের দাগগুলো মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সদ্য-স্নাতা নব-বধূ যেন ঘুমিয়ে আছে। মুখে মৃদু হাসি···স্বামীর পাশে শুয়ে যে আনন্দ তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠত তার শ্রী-মুখে, তারই রেখা যেন দেখা যায় তার ফুটিয়ে-তোলা অনড় সুস্মিত মুখে। লাও-তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার জীবন-সঙ্গিনীর জীবন-হীন দেহ। বেদনাহত হৃদয়ের জমাট স্মৃতি চেপে বসে কণ্ঠে, অশ্রু-নীরের ধীর প্রবাহে দু'গাল যায় ভেসে। কাঁদে আর সকলেও, নীরব ব্যথা বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় চোখের জলে। শুধু অপরিবর্তনীয় থাকে শ্বেতাঙ্গিনী অর্কিডের ঢাকনিটি দু'হাতে ধরে।

'ঢেকে দাও—' আকুল লাও-তা ব'লে ওঠে। চাদরটি নামিয়ে দিয়ে শ্বেতাঙ্গিনী সরে আসে। রাত্রির ঘন অন্ধকারে ব্যথাতুর লাও-তা চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তারই পাশে, একটু পিছনে, লিং টান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করে পুত্রের মনোব্যথা। কিন্তু সে-ব্যথা বিদূরণের ভাষা কই? দণ্ডায়মানা বিদেশিনীর পাশ থেকে তাকে একটু টেনে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়:

'কাঁদ, হৃদয়ের জমা-ব্যথা বেরিয়ে যাবে কেঁদে কেঁদে, কিন্তু এ-কাঁদারও শেষ আছে···সংসার-ধর্ম পালন করতেই হবে, সে-কর্ম তো আমাদের করতে হবে। পরে বাচ্চাদের জন্য নতুন মা আনতে—'

'না, না, সে হয় না, ও-কথা বলো না—' আকুল লাও-তা কেঁদে বলে।

'না, আমি বলব না, কিন্তু এ-কথা তো মনে রাখতে হবে।'

যুবক কোন উত্তর দেয় না। মৃত স্ত্রীর জন্য কাঁদুক সে, তার শোক হাল্কা ক'রে দেবার জন্যও বাপ এ কথা বলেনি। শুধু শোকের মাঝেও জীবন-নিস্পৃহ না হ'য়ে গিয়ে ছেলে যেন তার সংসার পরিবারকে মনে করে, এই কথাটাই লিংটান ছেলেকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল সান্ত্বনা দিতে দিতে।

মৃতদেহ ঢেকে দেবার পরেই লিংসাও সোজা চলে এসেছে হল ঘরে ছোট মেয়ের পাশে। নাতি-নাত্নীদের ঘুম থেকে তুলে জামা-কাপড় পরাতে পরাতে প্যানসিয়াওকে সে বলে যে তাকে এখানেই রেখে তারা গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে।

'এখানে থাকলে ভয় পাবার কিছু নেই।' লিংসাও বুঝিয়ে বলে মেয়েকে।

একটু আশ্চর্য হ'য়ে দেখে একথা শুনে ছোট মেয়ে ভীত হয় না মোটে। বরং সে বলে: 'না, মা, এখানে থাকতে আমার কোন ভয় নেই।' প্যানসিয়াও-র মনে লেখা-পড়া শিখবার যে আকুতি ছিল তারই পথ বুঝি আজ খুলে গেল।

'লিখতে শিখেই কিন্তু আমাদের চিঠি লিখে জানাবি কেমন থাকিস্, আমরা গাঁয়ে তোর পণ্ডিতখুড়োকে দিয়ে পড়িয়ে নেব।'

অর্কিডের মাতৃহারা শিশুকে কোলে নিয়ে পিছনে-পিছনে অতি সাবধানে নিদ্রিতাদের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে এগোতে এগোতে প্যানসিয়াও জবাব দেয়: 'হাঁ, মা লিখব।' লিংসাও কোলে নিয়েছে অর্কিডের বড় সন্তানটিকে।

প্যানসিয়াওকে দেখে লিংটান এগিয়ে এসে কাছে টেনে নেয় মেয়েকে। মাথায় হাত দিয়ে স্নেহশীল পিতা আশীর্বাদ করে কন্যাকে। আদেশ দেয় ভাল ভাবে থেকে গুরুজনদের কথা যেন শোনে। শ্বেতাঙ্গিনীর হাতে মেয়েকে সমর্পণ ক'রে বৃদ্ধ বলে:

'বুঝলে মা, তোমার হতে ওকে তুলে দিলাম···ছোট্ট মেয়ে আমার, শেষ-সন্তান, বড় আদরের। মেয়ে ব'লে আমার বাড়ীতে কোন অনাদরই হতো না ওর। যদি দেখ কথাবার্তা শুনছে না, আমার কাছে পাঠিয়ে দিও ওকে।'

এই সর্বপ্রথম লিংসাও দেখল শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশিনীর মুখে স্মিত হাসি। মৃদু হেসে এগিয়ে এসে প্যানসিয়াওকে সে গ্রহণ করল। বলল: 'খুব ভাল মেয়ে ও, বেশ কথাবার্তা শুনবে আমি জানি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে লিংটান দোরের দিকে এগোয়। লাও-তা মায়ের কোল থেকে বড় ছেলেকে কোলে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধ'রে ধীরে ধীরে হাঁটে। প্যানসিয়ারও-র কাছ থেকে ছোট্ট শিশুটিকে কোলে নেয় লিংটান এগোতে এগোতে লিংসাও ফিরে ফিরে পিছনে মেয়ের দিকে তাকায়, ছেড়ে-যাওয়ার ব্যথায় মন তার কেমন করে। শ্বেতাঙ্গিনীর হাতের আলোয় দেখে প্যানসিয়াও তাকিয়ে আছে বিদেশিনীর দিকে। শ্বেতাঙ্গিনীর প্রশ্ন কানে আসে: 'আমাদের সঙ্গে থেকে খুশি হবে তো?'

মায়ের চোখে ভেসে আসে মেয়ের উজ্জ্বল মুখ। শোনে মেয়ের উত্তর: 'হ্যাঁ, আমি খুব খুশি থাকব।'

তমসাবৃত রাত্রির অন্ধকার চিরে লিংটান গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলে। উঁচু নিচু পথে হোচট্ খেয়েও আলো জ্বালাতে পারে না তারা; হঠাৎ হয়তো কোথা থেকে এসে হাজির হবে শত্রু-সেনারা। শোক সন্তপ্ত হলেও এখন ঘর মুখী লিংসাও। প্রাণে সান্ত্বনা পায়। নিজের গৃহের ধ্বংস নিজেই দেখে এসেছিল লিংসাও···তবু হয়তো এর মধ্যে লিংটান ভাঙ্গাচোরা জোড়া লাগিয়ে চারদিক ঠিক ক'রে ফেলেছে। আস্তে আস্তে বিধ্বস্ত গৃহ তার মানস চোখ থেকে মুছে গিয়ে তারই স্থানে জেগে ওঠে তাদের পুরোনো সুশ্রী গৃহ···হয়তো সেই ভাবেই আবার সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। পুত্রবধূর নৃশংস অপমৃত্যুর কথা চিন্তা করতে করতে ঘর-দোরের কোন কথাই বলে না লিংটান গৃহিণীকে, কনিষ্ঠ পুত্র লাও-সানের বাড়ী ছেড়ে পাহাড় দেশে চলে যাওয়ার কথাও বলে না। হাঁটতে হাঁটতে কি ভাবে ছেলের চলে যাওয়ার কথা স্ত্রীকে বলা যায়, কতখানি না ব'লে পারা যায়, লিংটান নিজের মনে মনে আলোচনা করে। কিন্তু লিংসাও-র কাছে কি কথা চেপে রাখা যাবে? কোন কিছু চাপবার চেষ্টা করলেই কি ভাবে যেন সে টের পেয়ে যায় এবং তারপর তা আর গোপন রাখা যায় না—এক সঙ্গে সুদীর্ঘ জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে লিংটান তা জানে। এমনি ভাবে চিন্তা করতে করতে গ্রামের গৃহে তারা পৌঁছে যায়। এত তাড়াতাড়ি বোধহয় কোনদিনই শহর থেকে গাঁয়ের এই লম্বা পথ সে আগে আসে নি—তবু তো কোলে শিশু নিয়ে অন্ধকার রাত্রির আলোকহীন পথে তাদের আসতে হয়েছে।

গৃহে পৌঁছে দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে, নিজের ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালায় লিংসাও। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ঘরে যে বড় টেবিলটা ছিল, যার উপর বসানো থাকত প্রদীপটি, তার স্থানে লিংটান দেয়াল ঘেঁষে দুটো খুঁটির উপর একটা কাঠের তক্তা পেতে রেখেছে। চারদিকে ভাল ক'রে দেখে দেখে গৃহিণী লিংসাও হারানো-ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠে:

'কোথায়, জিনিস পত্রগুলো সব গেল কোথায়? ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় কোনোমতে সব গোছগাছ ক'রে রেখেছ!···চেয়ারগুলো, টেবিলটা, প্রদীপদানী···গেল কোথায় সব?' কথা বলতে বলতে তার দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় নিজের হাতে গড়া গৃহের সব জিনিস: 'বিয়ের সময় বাপের বাড়ী থেকে যে টেবিলটা দিয়েছিল সেটাই বা গেল কোথায়—সে- সব গেছে? সেই ভাঙ্গা টুলগুলো মেরামত হয়নি বোধহয়!'

আসবাবহীন শূন্য গৃহে বাপ-ছেলে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে, তাদের চোখে এসব আর এখন হারানো-ব্যথা উদ্রেক করে না, সে-সব তারা ভুলে গেছে। আর তা-ছাড়া মাটির মানুষ তারা···এ-সব ঘরের জিনিসের উপর ঝাড়-পোছ করার দৈনিক স্পর্শের ভিতর দিয়ে আপনত্ব-বোধের শিকড় সুদাহি হয়ে জমে ওঠে না পুরুষের মনে, যেমন জমে গর্বের জিনিস হ'য়ে বাসা বেঁধে থাকে মেয়েদের মনে। নাতি আর শিশুকে নিয়ে বাপ-ছেলে বোকার মত দাঁড়িয়ে দেখে। গৃহিণী লিংসাও এ-ঘরে ও-ঘরে ছুটোছুটি করে সংসারী জিনিস-পত্রের খোজে। অবশেষে ভাঙ্গা-টুটা জিনিসের জন্য ম্রিয়মাণ লিংসাও কাঁদতে আরম্ভ করে। নিদ্রিত শিশুদের শুইয়ে দিয়ে গৃহিণীর মনোব্যথা ভুলোবার চেষ্টা করে লিংটান আর লাও-তা। লিংসাও কেঁদে বলে :

'কি ক'রে সংসার করবো গো আমি এখন! আমার সাজানো সংসার ঘর-দোর যে পরের চোখ টাটাতো গো···আর আজ, আজ যে আমার সব গেছে!'

স্বামী-পুত্রের সান্ত্বনার বাণী নিরর্থক হ'য়ে যায়, লিংসাও কান্না থামাতে পারে না। এ ক্রন্দন, ভাঙ্গা-মনের এই বিলাপ-উক্তি কি শুধু সাজানো সংসারের দু'চারটে হারানো জিনিসের জন্য? আজ যে চারিদিকে ভাঙ্গন ধরেছে, মৃত্যু প্রবেশ করেছে এ সংসারে, ছেলে, বৌ, গৃহলক্ষী আজ যে গৃহ ছাড়া···আর কি সেদিন ফিরে আসবে, পরিপূর্ণ সব-পাওয়া সেই প্রিয় সাজানো সংসার কি আবার লিংসাও গড়ে তুলতে পারবে? এ যে হৃদয়ের মূল উৎস থেকে ওঠা হারানো সুরের বিলাপ···স্বামী-পুত্রের সান্ত্বনার প্রলেপে কি চট ক'রে তা থামে? লিংসাওর বিলাপোক্তিতে বিরক্ত হ'য়ে স্বামী-পুত্র উঠে দাঁড়ায়। লাও-তা নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। দু'চারটে কাঠের আসবাব, ভাঙ্গা কুঁজো কিংবা বাসনের জন্য মেয়েরাই পারে এ ভাবে কাঁদতে। এ সবের জন্য তো দায়ী যুদ্ধ। বিরক্ত হ'য়ে রাগে লিংটান বলে ওঠে :

'মরুক, মরুক সেই শয়তান ব্যাটারা যারা যুদ্ধের মধ্যে দুনিয়াকে ঠেলে দিয়ে বিপর্যয় নিয়ে আসছে, বাড়ী-ঘর-দোর ধ্বংস ক'রে, মেয়েদের নষ্ট ক'রে, চারিদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে যে শয়তানরা, তারা মরুক, মরুক! হারামজাদা ব্যাটারা, বাচ্চা বয়সের লড়াই লড়াই খেলার মধ্য দিয়েই শেষ হ'য়ে গেলি না কেন···আজ বয়সকালে সেই যুদ্ধ-খেলার বাস্তবরূপ দিতে সুরু করেছিস আমাদের মত নিরীহ ভাল লোকের ধন প্রাণ শান্তি ছিনিয়ে নিয়ে! এই শয়তানদের মা বেটীরাও মরুক···তোরা বিয়োলি কেন এই দুনিয়া-ধ্বংসী

শয়তানদের…যত আত্মীয় স্বজন আছে এই শয়তানদের, সব মরুক।' এই শাপ মন্নির প্রলাপোক্তির ভাষা হঠাৎ হারিয়ে ফেলে লিংটানও ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলে। স্বামীর ক্রন্দনে বিচলিত হ'য়ে লিংসাও নিজের কান্না থামায়, চোখের জল জামার হাতা দিয়ে মুছে স্বামীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

'কেঁদো না তুমি…আমি কেঁদে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি, আর আমি কাঁদব না। বাড়ীতে যখন এসে গেছি, আর আমরা আলাদা হ'ব না… আমাদের নসিবে যাই আসুক না, এ বাড়ী ছেড়ে আমি আর যাব না কোথাও!'

কান্না থামিয়ে চোখ মুছে লিংটান চুপ ক'রে বসে থাকে। কনিষ্ঠ পুত্র লাও-সানের কথা মনে পড়ে—হয়তো এক্ষুণি গৃহিণী তার কথা জিজ্ঞেস করবে।

তক্ষুণি লিংসাও জিজ্ঞেস করে : 'লাও-সানের ঘুম কি এখনো ভাঙ্গল না? কোথায় শুয়েছে ও! এত গভীর ঘুম…আমি রাত্রিতে ফিরে এলাম, তবু এখনো টের পেল না ছেলে!'

মনস্থির করে ফেলে লিংটান। কোন কিছু গোপন না ক'রে সব কথাই খুলে বলা উচিত স্ত্রীকে। আগামী দিনের দুর্যোগের মধ্যে একসঙ্গে যখন বাস করতে হবে, মনের ব্যথা সমভাবেই ভোগ করতে হবে দু'জনাকেই। সেই ঝিঁঝিঁঝিকামর্যী রাত্রির ঘটনা-আরত্তি আস্তে আস্তে থেমে গেল, বারে বারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবশেষে লিংটান শেষ করে…মর্মাহত পিতৃ-হৃদয় মথিত দীর্ঘ নিশ্বাস অঙ্কিত ক'রে দেখায় জননীর চোখের উপরে প্রিয় পুত্রের করুণ বিদায়-দৃশ্য…সেই পাহাড়গামী নিষ্পেষিত ব্যথাহত বালকের টলতে টলতে চলে যাওয়া…। চুপ করে লিংটান…একটি কথা না, একটি শব্দ না—দম বন্ধ ক'রে শোনে, মাতৃ-হৃদয়ের আকুলতা নিয়ে শোনে লিংসাও। আরত্তি শেষ হ'য়ে গেলে সে শুধু বলে :

'বাছা আমার বেঁচে আছে তা হলে!'

'হাঁ বেঁচে আছে—' স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দেয় লিংটান।

নিস্তব্ধ রাত্রি মথিত ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে ওঠে বাপ-মা… তারপর নিজেদের ঘরে প্রবেশ ক'রে শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে লিংটান স্ত্রীকে বলে : 'চৌকিটা শয়তানরা ভেঙ্গে ফেলার পর কাঠ জোড়া লাগিয়ে কোনমতে এটাকে এভাবে মেরামত ক'রে নিয়েছি। বেত এখনও লাগাতে পারিনি বলে শক্ত লাগছে।'

'বিছানা-পত্র আসবাব নিয়ে কি হবে এ দিনে…?' ধীর কণ্ঠে লিংসাও

বলে। লিংটান বোঝে কত গভীর আঘাত পেয়েছে লিংসাও পুত্রের নিষ্পেষণের কাহিনী শুনে···আর কোন আঘাতই বোধহয় পারবে না মাতৃ-হৃদয়ের এই অতলস্পর্শী গভীরতা ছাপিয়ে যেতে।

দুর্দিনের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার আলোড়নের অনেক উপরে নির্মল আকাশ কিন্তু অপরিবর্তনীয়ই থেকে যায়। গগনতলে নিষ্করুণ সূর্য ঠিক আগের মতই উঠে আলোর ঝালর বুনে দিনের শেষে ডুবে যায়···রাত্রির আকাশের কোণে তন্বী চাঁদ ওঠে হাসতে হাসতে ঠিক একই ভাবে···তারা-ভরা আকাশ মিটমিট ক'রে তাকিয়ে দেখে আগের মতই···ঠিক ঐ একই ভাবে জমা হয় আকাশের কোলে এলো কেশ উড়িয়ে কালো মেঘ···তারপর একইভাবে বর্ষায় রূপান্তরিত হ'য়ে ঝম ঝম ক'রে ঝরে পড়ে নীচে মাটির ওপরে, মাঠ-ঘাট বর্ষাস্নাত করিয়ে দিয়ে···অতীতের মতই নব-ঋতু আসে পুরোনোর স্থানে···আসে শীত, নব বসন্ত···এই ভাবে এগোয় মানুষের জীবনও···।

লিংটানের দিনও বসে থাকে না। অর্কিডের অপমৃত্যু, প্যানসিয়াও-র কোন্ সুদূর অজানা দেশে গমন, লিংসাও-র ভগ্ন-প্রায় গৃহে প্রত্যাবর্তন···এই ভাবেই লিংটানের দিন এগিয়ে চলেছে। এমন দিনে কে এক মুসাফির গাঁয়ের পথে লিংটানের খোঁজ ক'রে তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে যায়। পড়তে না পারলেও চিঠির ভাঁজ খুলে লাল-সুতো দেখে বুঝতে পারে চিঠির মধ্যে কি লেখা। পণ্ডিত ভাইয়ের কাছে না নিয়ে গেলে তো লেখার ভাষার মুখ ফুটবে না। লাল-সুতো দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ছুটে গিয়ে সে ঢোকে হেঁসেলে। মাটি দিয়ে উনুন সারাতে সারাতে স্বামীর হাতের লাল-সুতো দেখে আনন্দে চিৎকার ক'রে ওঠে লিংসাও। মায়ের হর্ষ চিৎকার শুনে লাও-তাও কোলের শিশুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চালের গুড়ো জলে মিশিয়ে লিংসাও ছোট নাতিকে খাওয়াবার জন্য লাও-তাকে বসিয়ে দিয়েছিল। লাল সুতো দেখে তার বিমর্ষ মুখে হাসি ফুটে ওঠে, সেও আনন্দে চিৎকার করে।

শত্রুর তিক্ত শোষণ-শাসনের মধ্যে আশাহীন ধ্বংসোন্মুখ গ্রামের ভাঙ্গা গৃহে তিনজনের মুখে হাসি ফোটে। কোন্ অজানা স্থানে, কিন্তু এ দেশেরই কোথাও, নীলার কোলে এসেছে নব শিশু, নাতি, এই বংশেরই ভবিষ্যৎ জনিতৃ। লাল সুতো বহন ক'রে এনেছে সেই সুসংবাদ। হর্ষে, আনন্দে আশাহীন ভগ্ন গৃহ নেচে ওঠে।

দশ ॥

হর্ষে আনন্দে সমস্ত দিন কাটিয়ে পরের দিন লিংটান গেল খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে ছেলের চিঠি পড়াতে। গাঁয়ের কারো কাছে চিঠি আসা তো আজকাল সহজ নয়, সুদিনেও ছিল না। সুতরাং যেমন তেমন ক'রে চিঠি পড়ে দিলেই চলে না। পণ্ডিত ভাই হাত মুখ ধুয়ে চিঠিখানা খুলে পড়তে বসে। অসুস্থ ছেলের পাশ ছেড়ে গৃহিণী চিঠি শুনতে এসে দাঁড়ায়। আশে-পাশের বাড়ী থেকে গ্রামবাসীরা দু'একজন ক'রে এসে জমতে আরম্ভ করে। মনে মনে পড়া শেষ ক'রে পণ্ডিত নিজের মনে যখন একবার পড়া চিঠি সাজিয়ে নিচ্ছিল তখন প্রায় দশ বার জন লোক এসে জুটে গেল চিঠি শুনতে।

পাশের ঘর থেকে সেই আহত ছেলের ক্ষতস্থান পচে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। অতি কষ্টে লিংটান দাঁড়িয়ে থাকে ছেলের চিঠি শোনবার জন্য, নাতি, পুত্রবধূ নীলার খবরের জন্য। গলা খাঁকারী দিয়ে পরিষ্কার ক'রে মেঝের উপরে গয়ারগুলো ফেলে চিঠি পড়তে আরম্ভ করে পণ্ডিত। সমগ্র গ্রামে সেই একমাত্র শিক্ষিত, শিক্ষার গর্ব তার চোখে-মুখে।

"শত কোটি নমস্কারান্তে বাবা, মা! আশা করি আপনারা কুশলে এবং নিরাপদে আছেন। দাদা বৌদি ও ছেলেপিলেরা আশা করি ভাল আছে। আপনারা এবং গ্রামের গুরুজনেরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।"

চোখ মুছে লিংসাও বলে ওঠে: 'বাছারে, নিরাপদে আর কেউ কি থাকবে এ গাঁয়ে?—'

ইশারায় লিংটান তাকে থামিয়ে দেয়। চিঠি পড়া এগিয়ে চলে:

"আমাদের গ্রাম ও গৃহ ছাড়িয়া কত দেশ পার হইয়া হাজার মাইল দূরে আজ আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনাদের নাতির জন্মের জন্য এই স্থানেই আমাদের থামিতে হইয়াছে। কিন্তু শত্রুর হামলার গুজব এখানেও শোনা যাইতেছে। তাই ভাবিতেছি অন্যত্র যাইব কিনা। শত্রুরা আসিলে কি অবস্থা হয়, এবং তাহারা লোক কেমন এবং যদি খারাপ না হয়, তো আমরা এখানে থাকিয়া যাইতে পারি। কারণ, এখানে রিক্সা

টানিয়া যাহা উপায় করি তাহা গ্রামের একজন স্কুল মাষ্টারের মাহিনারও দ্বিগুণ। আপনি শত্রুদের সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইবেন।"

খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী এবারে ফেটে পড়ল: 'কেমন, বলেছিলাম না, রিক্সা গাড়ী টানলেও বেশী টাকা উপায় করা যায়! তা তো না, মিনসের পেটে শুধু কালি ভর্তি···সেই জন্যেই তো মুখে ওর এত দুর্গন্ধ!'

পাণ্ডিত্যের উপর এই হঠাৎ আক্রমণে পণ্ডিত-স্বামী পিছিয়ে পড়তে রাজী নয়। 'হুঁঃ, যদি পড়তে না জানতাম তো কে এই চিঠি পড়ে শোনাত শুনি!' শ্রোতাদের মুখের উপর দিয়ে গর্বের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে আবার পড়তে সুরু করে:

"আপনাদের নাতি বৎসরের ত্রয়োদশ মাসের শেষ দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আপনাদের পুত্রবধূকে হাঁটাহাঁটির দরুণ পরিশ্রমের মধ্যে চলিতে হইয়াছিল বলিয়া সময়ের পূর্বেই তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট পুত্র হইয়াছে, তাহার জন্য কোন দুশ্চিন্তা করিবেন না। সুদিন আসিলেই আপনাদের নাতিকে দেখাইতে লইয়া যাইব।"

'কিন্তু সে-সুদিন কবে আসবে?' লিংসাও বলে ওঠে। কিন্তু পণ্ডিত পড়ে চলে।

"যদি অবস্থা আরও খারাপ হয় তো আমরা নদী উজাইয়া আরও ভিতরের দিকে চলিয়া যাইব। সেইখান হইতে আবার পত্র লিখিব। আমার চিঠির উত্তর দিবেন এই ঠিকানায়: লিউ-দোকানী,—মাছ ও মনোহারী দ্রব্যের বাজারের কোণের দোকান।"

চিঠি পড়া শেষ হ'য়ে যায়।

'আর কিছু নেই?' লিংটান জিজ্ঞেস করে।

'না, এর পরে ওর নাম লিখে শেষ করেছে।' পণ্ডিত বলে।

চিঠি শোনা শেষ হ'য়ে যাবার পর সেই পচা ঘায়ের দুর্গন্ধ যেন সকলে নতুন ক'রে বোধ করে। লিংসাও জিজ্ঞেস করে তার অবস্থা। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে মা জবাব দেয়, ক্ষত স্থানে বিজবিজে পোকা পড়েছে। যদি দেখে কেউ রোগ-যন্ত্রণা উপশমের ওষুধ বাতলাতে পারে, এই আশায় মা তাদের ডেকে নিয়ে যায় মুমূর্ষু ছেলের পাশে। নিঃসাড় ছেলে পড়ে আছে। পচা ক্ষতের দুর্গন্ধে কেউ একমুহূর্ত নাকে হাত না দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। কেউ এগিয়ে গিয়ে পাশেও দাঁড়াতে পারে না। সর্বশরীরের রং

যেন আফিং-খাওয়া মানুষের গায়ের মত হলুদে হ'য়ে গেছে। এত লোকের পদ-শব্দে ঘোলাটে চোখ দু'টি তুলে সে একবার তাকায়···সে-করুণ দৃষ্টি সহ্য করা যায় না, তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। ছেলের বাঁচবার সম্ভাবনার কোন চিহ্নই দর্শকদের চোখে খুঁজে পায় না শোকাতুরা মা···দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বুক-ভঙ্গা ক্রন্দনে ফেটে পড়ে। মায়ের মন তো সান্ত্বনা পায় না। লিংটান পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেয়। ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে মা :

'আমার কান্না তো বন্ধ হবার নয়—ছেলে কি আমার আর বাঁচবে! পেট পর্যন্ত পোকায় ভরে গেছে, এরপর হৃৎপিণ্ডে পোকা পড়লেই তো সব শেষ।'

লিংটান ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।

মায়ের এই বিলাপোক্তি মুমূর্ষু ছেলের কানে প্রবেশ করে। যেটুকু জীবনীশক্তি ছিল তার দেহে, মায়ের বিলাপের মধ্য দিয়ে নিজের অবস্থা বুঝে সেটুকুও গেল নিঃশেষ হ'য়ে। দেয়ালের দিকে মুখ রেখে সেই ঘুমুলো, সেই তার শেষ···মায়ের ডাকাডাকি, ক্রন্দনেও সে-ঘুম আর ভাঙ্গে না। শুধু জীবন্ত পোকাগুলি প্রাণহীন দেহের মধ্যে কিলবিল করছে।

এই মৃত্যু সংবাদ শুনে বিমর্ষ লিংটান শত্রু-সেনাদের অপকীর্তির কথা মনে ক'রে নিষ্ফল ক্রোধে গুমরিয়ে ওঠে। কিন্তু ছেলের মৃত্যুর জন্য মৃতের মা দায়ী করে বারে বারে লিংটানকে। নীলার যদি বিয়ে হ'ত তার ছেলের সঙ্গে, তবে কী আজ আর এই অঘটন ঘটত? নীলা থাকলে তো ওকে শহরে যেতে দিত না, আর নিজেও বৌ ফেলে কি যেতো? আজ যে নাতির কথা শুনে গেল লিং টান, সে-নাতির তো তার ঘর আলো করার কথা। লিংটানই তো এর মূলে, সেইতো চুরি ক'রে নিয়েছে নীলাকে। আজ ছেলে গেল চলে, ঘরে নেই নাতি, পরকালের পিণ্ডি দেবার রইল না কেউ···একটানা শোক-বিলাপ চলে পুত্রহারা মায়ের। এই একঘেয়ে বিলাপোক্তি শুনে শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে পণ্ডিত স্ত্রীকে একটু চুপ হ'তে বলে। স্বামীর এ-কথায় শোকাতুরা স্ত্রী যায় ক্ষেপে। উঠে স্বামীর দেহে লাথি মারে। শান্তিপ্রিয় পণ্ডিত পারে না নিজের ক্রোধ চেপে রাখতে। হঠাৎ উঠে স্ত্রীকে মৃদু পদাঘাত ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে :

'ছেলের মৃত্যুতে দুঃখ কী আমার কিছু কম হয়েছে? আমার দুঃখ আরও বেশী। একটি ছেলের বেশী তো বিয়োতে পারলে না সারা জীবনেও।

তোমার পিছনে আমার যে শক্তি ক্ষয় হয়েছে, তাতে আমি একশ ছেলের বাপ হ'তে পারতাম।'

কঠোর সত্য কাঁটার মত গিয়ে বেঁধে···ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়ে যায় বন্ধ্যা স্ত্রী। সমানে লাথির পরে লাথি মেরে ঘর থেকে বের ক'রে দেয় স্বামীকে। প্রথম সন্তান জন্মাবার পর কী যে এক জ্বর হয়েছিল তার, যার ফলে সে বন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিল। উপপত্নী নিয়ে ঘর করার কথা সে মনেই আনতে পারে নি। তবে এ-কথাও ঠিক, উপপত্নী রাখবার টাকাই বা স্বামীর কোথায় ছিল? বাইরে এসে একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে শুয়ে নিজের কপালের ধিক্কার দেয় পণ্ডিত—এমন স্ত্রী নিয়ে ঘর করা! মেয়েরা এমন হয় কি ক'রে? সাধু সন্ন্যাসীরাই আছে বেশ···হঠাৎ ঘুমে স্বপ্ন দেখে সাধুর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।···কিন্তু এ স্বপ্নও মুছে যায়। সাধুর সে নিস্পৃহ জীবন তো আজ কাল আর নেই। কত মন্দির শূন্য পড়ে আছে···পূজারী সাধুরা সব কোথায় গেছে চলে। শূন্য মন্দিরে বাসা বেঁধেছে সৈন্যের দল। স্ত্রীর মতই ভীতিপ্রদ সৈন্যের স্বপ্নে ঘুম যায় টুটে। শক্ত বেঞ্চির উপর শুয়ে শুয়ে ভাবে নিজের ভাগ্যের কথা। একটু শান্তি চায় সে, একটু নিরিবিলি স্থান। কিন্তু শান্তি কোথায় আজ? কোথাও তার চিহ্ন নেই, কারও কপালে না, তার জীবনেও না।

নিজের শূন্য গৃহে নিস্তব্ধতার বুক-ভাঙ্গা চাপে লিংসাও হাঁপিয়ে ওঠে। নাতি-নাত্নী, পুত্র পুত্রবধূদের কলকাকলী পদক্ষেপে যে শ্রীমণ্ডিত গৃহ ছিল ভরপুর, আজ সেখানে ভারী শূন্যতা যেন ঝুলে আছে। সংসারের প্রতিটি কাজে সমস্ত দিন, তাকে ব্যাপৃত থাকতে হ'ত আর আজ শুধু আছে সেই গৃহে মাত্র দু'টি ক্ষুদে শিশু। কেমন অস্বাভাবিক মনমরা মূক হ'য়ে গেছে নাতি দু'টি···শিশু-সুলভ হাসি-খেলা তাদের নেই, সেই শূন্যতার বুকে ধাক্কা মেরে হুটোপাটি করতেও যেন তারা ভুলে গেছে। হাতে হাত দিয়ে বয়োবৃদ্ধের মত চুপ ক'রে বসে থাকে বড়টি। রোগা ক্যাকাসে হলদেটে মেরে গেছে তারা···হঠাৎ কোন শব্দ শুনে কেমন হকচকিয়ে কেঁদে ওঠে।

শিশু দু'টির বাপও ম্রিয়মাণ নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। স্বাভাবিক শান্তির অবস্থায় লাও-তার মত লোকেরা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে

গাঁয়ের "সম্মানিত বৃদ্ধ"য় পরিগণিত হয়। বহু সন্তানের বাপ হ'য়ে স্নেহ ভালবাসা সম্মানে সে হয়তো জীবন কাটিয়ে দিত। কিন্তু আজের এই আঁধার দিনে স্বাভাবিক বুদ্ধিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে কেমন যেন বোকার মত হঠাৎ কথা কয়। মৃতা স্ত্রীর শূন্য স্থানে আজও পর্যন্ত অন্য কাউকে আনা যায় নি···কোন কোন সময় স্ত্রীর অভাব-বোধ চন্‌চনিয়ে ওঠে লাও-তার দেহে-মনে, কিন্তু দুর্দিনের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে নতুন স্ত্রী না এসে ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী মানেই তো নতুন জীবন নব শিশু এবং আরও বিপদ। সুতরাং ম্রিয়মাণ লাও-তা সময় গুনে গুনে দিন অতিবাহিত করে, যেমন ক'রে অতিবাহিত করে ক্ষেতের মোষটি এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে···ঠিক যে-কাজটি করতে বলা হয় সেইটিই শুধু সমাপন ক'রে।

নিজের মাঠে চাষ দিতে দিতে লিংটান ছেলের কথা মনে ক'রে নিজের মনে বলে ওঠে: 'এই শয়তানী যুদ্ধে লাও-তার জীবনটা একেবারে গেল নষ্ট হ'য়ে···' ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ক্রোধের উত্তেজনায় সাময়িক ভাবে স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে বৃদ্ধ। ভাঙ্গা, অসংস্কৃত গৃহের দিকে তাকিয়ে মনটা গুমরিয়ে ওঠে। কিন্তু ভাঙ্গা-ঘর সারাবার ভরসা পায় না। কি জানি, ঘর-সারানো দেখে হয়তো শয়তানরা আবার এ-গৃহে হামলা করবে। সমগ্র গাঁয়ের অবস্থাই আজ এইরকম···ভাঙ্গা ঘর জোড়া দেবার চেষ্টা কেউ করে না। আর শহরের ওপাশের উর্বরা ধরণী বিনা চাষে বেনা বনে পরিণত হ'য়ে চলেছে···নিজের চোখে সে দেখেনি, কিন্তু শুনেছে হাজার হাজার বছরের শান্তির কোলে লালিত শস্য-শ্যামলা উর্বরা ধরণী কি ভাবে আগাছায় ভরে উঠে চাষের অনুপোযোগী হ'য়ে গেছে। দেশী শাষকদের ছোট-খাট লড়াইও এভাবে চাষবাস বন্ধ ক'রে দেয় নি। শুধু বর্ধিত খাজনা-টেক্স জমির উপর নতুন ক'রে আরও ফসলের জন্য চাপ আনতো। নতুন শস্য মাটির বুকে ফলিয়ে এ-চাপ পূরিয়ে দিতে হয়েছে কৃষাণকে। সুতরাং জমির ফলন চলত, নিষ্ফলা মাটি এভাবে কেঁদে ফেরে নি কোনোদিন।

সমস্ত বসন্তকাল লিংসাও বিক্ষোভে গুমরিয়ে কাটাল। আর লিংটান বিদেশী শয়তান সৈন্যদের বারে বারে নিজের মনে শাপ-মন্যি গালাগাল দিল। তার ক্ষেতের বিপরীত দিকের বিদেশের লোকেরা কি তার মত এই যুদ্ধের শাণিত নখরাঘাতে ক্লিষ্ট বোধ করে না? নিজের মনে সে ভাবে:

'এই ভূঁয়ের ওপরেরই হই আর উল্টোদিকের মাটির দিকে ঝুলে-থাক

বিদেশী যেই হও, আমাদের এক জোট হ'য়ে যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এই যুদ্ধবাজ শয়তানরা যেন এ পৃথিবীতে না আসতে পারে। শিক্ষা যদি তারা গ্রহণ না করে তা হ'লে ঐ শয়তানদের তালাবন্ধ ক'রে আটকে রাখবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।'

যতই গভীরভাবে চিন্তা করে ততই স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয় লিংটান যে এইসব যুদ্ধের মূলে যে স্বল্প সংখ্যক লোক আছে তাদের কোন মতে যদি শেষ ক'রে দেওয়া যায় তো দুনিয়ার বুকে আবার শান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু সে একলা কি করবে? তার ক্ষেতের চাষ নিয়ে সে ব্যস্ত। তবুও তার মনে বারে বারে সজাগ প্রশ্ন জাগে: 'কিন্তু আমার মত কি আর কেউ এভাবে ভাবে না?'

আনন্দহীন বসন্ত বিদায় নেয় নীরবে। নিরানন্দ গাঁয়ের কোন গৃহে উৎসবের আয়োজনই হয় না, আনন্দোৎসব খানা-পিনা কোন কিছুই জমতে পারে না। আনন্দহীন গৃহের চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় লিংসাও। কোন কাজেই মন বসাতে পারে না। তার বিক্ষুব্ধ মনের অবস্থা বুঝে লিংটান এক রাত্রে জিজ্ঞেস করে:

'বড় উতলা হ'য়ে উঠেছ তুমি, না?'

ভরা কলসীর মুখের বাঁধন যেন খুলে গেল:

'এ শ্মশান-পুরীতে কি বাস করা যায়?···লাও-এর আর নীলাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি কোনমতেই। লাও-তার যা অবস্থা, ওতো আধমরা। হঠাৎ যদি আমাদের কিছু হ'য়ে পড়ে তো বাচ্চা দুটোর কি হবে? বুড়ো হ'য়ে পড়েছি তো—'

এতদিন একসঙ্গে বাস করেও স্ত্রীর গহন মনের কোন প্রশ্নই লিংটান আজও ধরতে পারেনা। আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন করে:

'তবে কি লাও-এর আর নীলাকে ঘরে ফিরে আসতে লিখব? কোলের নাতিকে সঙ্গে নিয়ে আসবে এখানে? শত্রু কবলিত এই গাঁয়ে?'

'তুমি ভুল করছ! যতদিন গাঁয়ে আমরা বাস করব গ্রাম কি আর শত্রুদের হয়? যেদিন গ্রাম গৃহ ছেড়ে চলে যাব সেইদিনই এসব সত্যি-সত্যিই শত্রুর অধিকারে যাবে। কিন্তু তা তো আমরা করছি না···আর আমাদের ছেলেরাও তা করবে না।'

কলকের টিকেয় আগুন ধরাতে ধরাতে লিংটান বলে: 'থামলে কেন,

বল।' এ দুর্দিনে তামাকের দাম চড়া, যতদিন নিজের আবাদে তামাক না উঠবে ততদিন এ অভাব থাকবে।

'আমি বলতে চাইছি কি, লাও-এর ফিরে আসুক। শত্রুর কাছে নিজেদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। সব সমর্থ যুবক ছেলেরাই যদি গাঁ ছেড়ে চলে যায়, আর গাঁয়ের পথে ঘাটে ঘরে যদি দেখা যায় বুড়োদের, শত্রুরা ধরে নেবে আমরা ভীতু।'

স্ত্রীর কথায় লিংটান বাস্তবতার সন্ধান পায়। কিছুক্ষণ হুকো টেনে বলে: 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ বটে, কিন্তু দিনকাল তো এখনও ভাল নয়। আগের থেকে ঘরের মেয়েরা কিছুটা নিরাপদ বটে···শুনেছি সৈন্যদের জন্য প্রচুর বেশ্যা নিয়ে এসেছে আর সৈন্যদের মধ্যে সবথেকে বদমাসগুলোও অন্যস্থানে চলে গেছে। কিন্তু আরও দুরবস্থা যে আসছে।'

'আরও দুরবস্থা?' লিংসাও জিজ্ঞেস করে। কিন্তু এবারে সে আর আগের মত বলতে সাহস করেনা যে সে কাউকে ভয় করে না। কিন্তু কি দুরবস্থা হ'তে পারে? নরপশুদের তাণ্ডবলীলা থেকে আর কি অধিক হবে?

'গুজব শুনছি যে চাষীদের উপরে কি এক নতুন আইন চালু করবে এই শয়তানরা। খালি হাতে এ আইন মানব না বলিই বা কি ক'রে?'

'তাই যদি হয় তো এই সময়ে ছেলেদের তোমার পাশে থাকা উচিৎ। লাও-এরকে যখন চিঠি লিখবে, তাকে লিখবে যে আমি এ কথা বলেছি।' লিংসাও বলে।

'হুঁ—' ব'লে বৃদ্ধ লিংটান গুড়ুক গুড়ুক কলকেয় টান মেরে গভীর রাত পর্যন্ত স্ত্রীর কথাগুলো ভাবে। নতুন নাতিকে দেখবার অত্যুগ্র বাসনায় কোন সাময়িক খেয়ালের বশে নির্ভাবনায় লিংসাও যে কথার বীজ ছুঁড়ে দেয় তাই মহিরুহরূপে ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে লিংটানের মনে বিরাজ করতে থাকে। সে ভাবে:

'প্লেগের মত শত্রুরা যদি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তবে মাঠ ঘাঠ গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? ভয়ে অনেকে পালায় বটে কিন্তু গাঁয়ের শক্ত সমর্থ যারা তারা পালাবে কেন? আমিই বা পালাব কেন? লিংসাওর কথা মত সব ছেলেরই গাঁয়ে বাস করার কথা সায় দিতে পারছি না বটে।···তবে ও ঠিকই বলেছে যে বড় ছেলে একা আর গাঁয়ে তিষ্ঠোতে পারছে না।

ছোট ছেলেকেও গাঁয়ে রাখা সমীচীন মনে হয় না, ও বাইরেই থাকুক। কিন্তু মেজ ছেলে লাও-এর তো আমার মতই শক্ত। ও পারবে থাকতে গাঁয়ে···ছু'জনা মিলে জমি জমা চাষ বাস করব, জমি আঁকড়ে পড়ে থাকব। কুকুরের লেজের পোকার মত শত্রুর পিছনে থেকে তাদের উত্যক্ত ক'রে তুলব যাতে পিছন সামলাতে গিয়ে সে এগোতে না পারে।'

নিজের মনের কৌতুক চিন্তায় সে নিজেই হেসে ওঠে। হাসি শুনে লিংসাও বলে ওঠে: 'কি হল তোমার? একলা বসে বসে যে হাসছ।'

'উঁহুঁ, এখন বলছি না—' লিংটান ভেবে চলে। চিন্তার সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা নব মঞ্জরীতে ভরে ওঠে।

কিন্তু লাও-এরকে গাঁয়ে ফিরে আসার জন্য চিঠি পাঠাতেও সাহস হয় না। বসন্ত যায় চলে, আসে গ্রীষ্মের প্রখর দিনগুলি। শত্রুর নব নব শাসনের নগ্ন শোষন, চালের দাম বেঁধে দেওয়া, জমির ফসল বৃদ্ধির নিত্য নতুন দাবী লিংটানদের উত্যক্ত করে দেয়। দুনিয়ার বুকে এত অত্যাচারও চলতে পারে লিংটান ভেবে পায় না। কিন্তু নিষ্কৃতির নব প্রকাশ দেখা দেয় গাঁয়ের অন্ত-সীমা নদীর বুকে।

শত্রু-সেনার বিগত দিনের অত্যাচারে যে অগুন্তি লোকের প্রাণ গেল, তাদের কবর দেবার ব্যবস্থা আর হোলো না। শত্রুরা গাঁয়ের পথেপ্রান্তরের মৃতদেহগুলি টেনে এনে খালের জলে নদীর স্রোতে দিল ভাসিয়ে। জোয়ারের ফুলে-ওঠা জলে সেই ভাসমান মৃতদেহগুলি ঠেলে ফিরে এসে জমে ওঠে নদী আর খালের তীরে। গলিত শবের দুর্গন্ধ মাংসে ক্যাকড়া-চিংড়ির মহোৎসব লাগে। গাঁয়ের মানুষ সেই মোটা মোটা ক্যাকড়া চিংড়ি ধরে এনে মহাভোজে মেতে যায়। গাঁয়ের ঘরে এসে হানা দেয় নতুন মহামারী। লিংটানের গৃহও বাদ পড়ে না। দশটি দিন ধরে গৃহের সব কয়টি লোকের জলের মত পায়খানা ও বমি হোলো। লাও-তার শিশু দুটি এ আক্রমণ থেকে বাঁচল না। নিজের উদ্গত বমির চাপ দমন ক'রে মুমূর্ষু শিশু দুটির শেষ-মুহূর্তেও শান্তির প্রলেপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আকুল মনে লিংসাও। তাদের শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথে লিংটানের প্রাণও যেন গুমরে মুচড়ে শেষ হ'য়ে যেতে চায়। বেদনাহত হৃদয়ের উত্তাল কঠিন আঘাতে লিংটান মুষড়ে পড়ে, জীবনের সব আশা যেন তার মুছে যায়।

হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় লিংসাও।

'কি রইল আমাদের, কি নিয়ে থাকব? খালি বাড়ীতে থাকব কি ক'রে—এযে প্রেতের বাড়ী হ'য়ে দাঁড়ালো—হা হা হা—'

কিন্তু মৃত পুত্রের পিতা কাঁদল না একবারও। অশরীরী প্রেতের মত নীরবে বাড়ীর এ কোণে ও কোণে ঘুরে বেড়ায় লাও-তা। বাপ মায়ের অবস্থা যখন একটু ভাল হোলো, নিজের বমি পায়খানা সেরে গেল, একদিন ধীরে বাপ মায়ের কাছে এসে বিদায় চাইল—একটু ঘুরে আসবে।

'কিন্তু যাবি কোথায়?' মা উৎকণ্ঠিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

'জানিনা, যেদিকে দু'চোখ যায় সেইদিকে যাব—' ভারী কণ্ঠে জবাব দেয় ছেলে। কিছুক্ষণ ভেবে দেখে লিংটান, কোথায় যেতে পারে লাও-তা। এমন জায়গায় যাক যাতে ভবিষ্যতে তাকে আবার দেখতে পাবে। বেদনাহত আশাহীন ছেলেকে এভাবে অনিশ্চয়তার ভবিতব্যে ছেড়ে দিলে তাকে ফিরে পাবার আশা থাকবে না। সুতরাং কিছু দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে লাও-তা ভবঘুরেতে পরিণত হবে না মনে ক'রে বৃদ্ধ পিতা বলে :

'যেতে যখন চাইছ, যাও। পাহাড়ের ওদিকেই যাও। লাও-সানও ওদিকে গেছে, তার খবর আমাদের জানিও। আমার কেমন ভয় হচ্ছে যে সে পাহাড়ী মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে না মিশে হয়তো ডাকাত দলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। তাই যদি হয় তো তাকে সুপথে নিয়ে আসবার ভার রইল তোমার ওপর।'

'বাবা তুমি কি আমাকে আদেশ করছ?' লাও-তা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, এ আমার আদেশই।' গম্ভীরকণ্ঠে বৃদ্ধ পিতা জবাব দেয়।

'তাহ'লে আমাকে তা পালন করতেই হবে।'

জামা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে শেষসম্বল জমান গোটা কয়েক টাকা জামার মধ্যে সেলাই ক'রে দেয় লিংসাও। দু'একদিনের খাবার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে অবশেষে একদিন বিদায় জানাতে হয়। নতুন স্যাণ্ডাল পায়ে, একটা পাতলা বিছানা জড়িয়ে পিঠে বেঁধে সুদূর পথের যাত্রী লাও-তা এগিয়ে যায়। বৃদ্ধ বাপ মা বিদায় পথের পানে তাকিয়ে থাকে।

লিংসাও স্বামীকে জিজ্ঞেস করে: 'চাষ বাসের কাজ সব একলা কি ক'রে তুমি করবে?'

'জানি না, কিন্তু মন-মরা লাও-তাকেও তো জমিতে আটকে রাখতে পারি না।' ধীরে বৃদ্ধ জবাব দেয়।

'একটি রাস্তাই খোলা রয়েছে আমাদের সামনে···আর ভগবানের ইচ্ছাও বোধহয় তাই···। তুমি লাও-এরকে লিখে দাও ঘরে ফিরে আসতে।'

'ভগবানের ইচ্ছেও তাই! তুমি ঠিক বলছ?···কিন্তু তুমি তো লাও তাকে ঘরে জোর ক'রে রাখতে চাইলে না।' একটু হেসে লিংটান জিজ্ঞেস করে।

'নাতিগুলো যে মরে গেল তাও কি আমি চেয়েছিলাম?'—গম্ভীর মুখে লিংসাও বলে।

বৃদ্ধের মুখের হাসি যায় মুছে। ধীরে বলে: 'তাই কি হয় গো, তাই কি হয়?' ছেলের বিদায়-পথের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে গৃহের অভ্যন্তরে যখন তারা প্রবেশ করল, দমবন্ধ-করা চাপা নীরবতায় তাদের প্রাণ হাঁফিয়ে উঠল। লিংটানের বৃদ্ধ পিতামাতা যখন মারা গিয়েছিল তখনও বাড়ীতে এ-নীরবতা নেমে আসেনি। কারণ, সেইসময় গৃহে লিংসাওর নবশিশু এসেছিল। হাঁফিয়ে উঠে লিংসাও স্বামীকে বলে: 'তুমি চিঠি লেখাবে না? আজই লেখাও না কেন? চিঠি পেয়ে পেয়ে আসতে আসতে তো ওদের সেই একমাসের ওপর লাগবে।'

'হ্যাঁ লেখাব—' লিংটান চিন্তা করে ব'লে। তারপর আরেক দিনও স্ত্রীর তাগাদার উত্তরে বলে: 'একটু ধৈর্য ধর গো, একটু ধৈর্য ধর।'

গভীর চিন্তায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় জ্ঞান-অভিজ্ঞ বৃদ্ধ লিংটান। এ শয়তানী যুদ্ধের শেষ যে কবে হবে কেউ বলতে পারে না, আর খুব শীগগিরও মিটবে বলে মনে হয় না। শত্রুরা কি আর সহজে হাতের মোওয়া ছেড়ে দেবে। এই অবস্থার মধ্যেই তো বাস করতে হবে। যুদ্ধ হয়তো ছেলের জীবনে নাতির জীবনেও চলতে থাকবে। সুতরাং দেশের মাটির সঙ্গে লেগে থেকে বেঁচে থেকে আমাদের চলতে হবে। সাতটি দিন ধরে একলা একলা ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে দিতে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে লিংটান এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল। অষ্টম দিনে স্ত্রীকে ডেকে বৃদ্ধ বলল: 'বুঝলে, আজ লাও-এরকে চিঠি লিখব ঠিক করেছি।'

সকালের খাওয়া শেষ ক'রে পণ্ডিত ভাইয়ের গৃহের দিকে পা বাড়ালো লিংটান।

চিঠি লেখাতে ব'সে লিংটান বোঝে ছেলের গৃহ প্রত্যাবর্তনের সমস্যা কত কঠিন। লিংসাও ভেবেছে শুধু ছেলের ফিরে আসার কথা, দুহাতে

তুলে বুকে নাতিকে কোলে নেবার কথা। শয়তান সৈন্যদের কথা মনে পড়াতে মনে মনে অশান্তি অনুভব করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই অশান্তির চিন্তা সরিয়ে দিয়েছে এই মনে ক'রে যে চরম অশান্তির দিন বোধ হয় শেষ হয়েছে, বদমাস সৈন্যদের বোধহয় সংযত হ'তে হয়েছে কিংবা তাদের নতুন জয়ের পথে পাঠিয়ে দিয়েছে। সময় খারাপ বটে কিন্তু শত্রু-সৈন্যের বিজয়কে যদি মেনে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে থাকে এদেশের লোক, হয়তো কোনমতে দিন কাটিয়ে বাস করা যায় এখন।

কিন্তু এভাবে হীন দাসত্বের জীবন কাটানোর কথা লিংটান পারে না ভাবতে। লাও-এরও এ ধাতের নয় যে দিনের পর দিন নীরবে সয়ে যাবে এই দাসত্বের অপমান। স্বাধীন-চেতা মানুষের পক্ষে এ অবস্থা খুব নিরাপদ নয়, একথা ভাল ভাবেই বোঝে লিংটান। তাই গভীরভাবে লিংটান বারে বারে ভাবে কি ভাষায় ছেলেকে চিঠি লেখা যায়। কলম হাতে নিয়ে পণ্ডিত ভাই বসে থাকে লিংটানের কথার জন্য। কলমের মুখের কালি শুকিয়ে গেলে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে আবার সে প্রস্তুত হয়। কালির ছাপে তার মুখ বিকৃত হ'য়ে যায়। অবশেষে লিংটান বলতে সুরু করে: 'নাও এবার লেখ ছেলেকে যে, "শান্তিতে বাস করিবার জন্য তাহাকে গাঁয়ে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছি না, কারণ, দেশে গাঁয়ে এখন আর শান্তি থাকিতে পারে না। আগে যাহা খারাপ ছিল এখন তাহা আরও বিপদপূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও যে কি হইবে কে বলিতে পারে? সহ্যের বাহিরে মনে হইলেও তাহাই আমাদের বাপ ছেলেতে মিলিয়া সহ্য করিতে হইবে।"

পণ্ডিত-ভাই লিংটানের বক্তব্য লিখে অপেক্ষা করে আরও লিখবার জন্য। লিংটান আবার সুরু করে:

'লেখ পণ্ডিত, "আমি আর তোমার মা বর্তমানে একলা বাড়ীতেই বাস করিতেছি। তোমার অন্য দু'ই ভাই পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। তোমার বৌদি ও ভাইয়ের ছেলে দুইটি আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। প্যানসিয়াও শ্বেতাঙ্গিনীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। আমরা একলা রহিয়াছি বলিয়াই তোমাকে বিপদ ঘাড়ে করিয়া এখানে আসিতে বলিতেছি, তাহা নহে। তুমি আসিলে একথা নিশ্চিতভাবে জানিয়াই আসিবে যে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের জমি চাষ বাস করিয়া যাইব। আমি মরিয়া যাইবার পর তোমাকেই আমার নাতির হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে হইবে

এই ভূ-সম্পত্তি আগলাইয়া যে-পর্যন্ত-না শত্রুরা এদেশ হইতে বিতাড়িত হইতেছে।"

কলম থামিয়ে পণ্ডিত বলে: 'এ চিঠি যদি শত্রুর হাতে পড়ে তো তারা গাঁয়ের উপর হামলা ক'রে সকলকেই শেষ ক'রে ফেলবে যে—'

লিংটান আশ্বাস দিয়ে বলে: 'সোজা রাস্তায় এ চিঠি আমি পাঠাব না পণ্ডিত। সীমানা পর্যন্ত সাবধানী পত্রবাহকের মারফৎ পাঠাব। ভয়ের কিছু নেই।'

ভিখারী কিংবা অন্ধের ছদ্মবেশে ছোট ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে, ছড়া পাঁচালা গেয়ে মুক্ত এলাকা থেকে পত্রবাহকরা শত্রুকবলিত গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে হামেশাই আনাগোনা ক'রে থাকে। এদেরই একজনের হাত দিয়ে লিংটান তার ছেলেকে চিঠি পাঠাবে।

লেখা শেষ হ'লে পণ্ডিত-ভাই একবার পড়ে শোনায় সম্পূর্ণ চিঠিটি। পাণ্ডিত্য ভাষার কচকচানির ভিতর দিয়ে মূল বক্তব্য লাও-এর বুঝতে পারবে কিনা লিংটান বিচার ক'রে দেখে। এ চিঠির কতখানি পণ্ডিত খুড়োর বিদ্যার বহর, আর কতখানি তার বাপের মূল কথা, লাও-এর বুঝবে নিশ্চয়ই। চালাক ছেলে। চিঠিটি ভাল করে একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্যে জড়িয়ে সাবধানে তুলে রেখে দিন গোনে লিংটান লিংসাও। কবে পাওয়া যাবে সেই মুক্ত এলকার পত্রবাহকের খোঁজ! গাঁয়ের চা-খানায় প্রতি রাত্রে লিংটান সাবধানী দৃষ্টি ফেলে দেখে মুক্ত এলাকার কোন পত্রবাহক আসে কিনা। রাত্রের পথযাত্রী এরা, দিনের বেলায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। চতুর্থ রাত্রিতে এক নতুন যুবকের দেখা পেয়ে লিংটান ইশারায় ডেকে জিজ্ঞেস করে:

'তুমি কি হোই, হোথায় যাবে নাকি?...মুক্ত-এলাকায় যদি যাও তো আমার একটা চিঠি নিয়ে যাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে লিংটান তাকে নিজের গৃহের নির্দেশ জানিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

রাত্রের ঘন অন্ধকারে মুক্ত এলাকার যাত্রী লিংটানের দোরে টোকা দিতেই দোর খুলে তাকে তারা ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। নবাগতর জন্য লিংসাও ভাল ক'রে রেঁধেছিল। স্বামী আর তাকে বসিয়ে খাবার সাজিয়ে দিল। খেতে বসে অজানা পথের যাত্রী নতুন দেশের কথা বলে। প্রাচীন কালের

সম্রাটরা শত্রু ঠেকাতে উত্তর প্রান্তে বিখ্যাত চীনা-প্রাচীর তৈরি করেছিল, কিন্তু আজ মুক্ত-এলাকায় প্রস্তুত হচ্ছে নতুন প্রাচীর···লক্ষ প্রাণবন্ত মানুষের হাজার হাজার মাইল ধরে লম্বা সুদৃঢ় দেয়াল। গ্রামের পর গ্রাম হাজার হাজার ক্রোশ ব্যাপী মানুষদের নিয়ে তৈরি এই প্রাচীর।···সেই মুক্ত এলাকায় আজ গড়ে উঠেছে কত স্কুল, কলকারখানা, খনি। হাজার হাজার দেশবাসী এই অঞ্চল ছেড়ে ওদিকে চলে গেছে। আজ সেখানেই গড়ে উঠেছে শত্রু-অগ্রগতি রুদ্ধ ক'রে দেবার মত দৃঢ় আনমনীয় বাহিনী। গ্রাম-গ্রানাঞ্চলে শত্রু-বুহের পিছনে এরাই এসে ঘা দেবে।

একথা শুনে আশার আলোক ঝিলিক দিয়ে ওঠে লিংটানের মনে। কিন্তু জায়গা-জমি ছেড়ে যাবার কথা স্বামী স্ত্রীর কেউ ভাবতে পারে না। লিংটান বলে :

'আনন্দের কথা শুনালে বাছা! মুক্ত ফৌজ এগিয়ে আসবে আমাদের গাঁয়ে, আমরা থাকব এ গাঁয়েই। লাও-এর ফিরে এলে সেও থাকবে আমার সঙ্গে। এ-জমি ভবিষ্যতে তখনও আমাদের থাকবে নিশ্চয়ই, কারণ, হাজার বিপদের মুখে জমি ধরে আমরাই বসে রইলাম, ছেড়ে পালাইনি একদিনের জন্যও।'

পুঁটলি থেকে চিঠিটি বের ক'রে যাত্রীর হাতে দিয়ে লিংটান চাইল লাও-এরের চেহারার ব্যাখা দিতে। স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে লিংসাও বলে উঠল: 'থাম বাপু, আমার পেটের ছা লাও-এর, তার চেহারার কথা আমিই বলতে পারব ভাল।···বুঝলে বাছা, দেখবে, লাও-এরের ডান চোখের নিচে একটা ছোট তিল আছে। খুব ছোট—নজর দিয়ে না দেখলে খুঁজে পাবে না। চোখদুটো বড় বড় আর কালো, সাধারণতঃ যা দেখা যায় না। আসলে ওর বাপের মত চোখ, তবে হা দেখবে আমার চাইতে একটু বড়। মাঝারী গড়ন, কাঁধদুটো সমকোণ রেখে নেমে গেছে, পায়ের জাংও বেশ গোল। ডান পায়ের পাতায় দেখবে কাটার দাগ···বছর বার বয়সের সময় লাঙ্গলের মুখ লেগে ওর পাটা কেটে গিয়েছিল। আমি তো তখন ভেবেছিলেম, ওর পাটা বুঝি একেবারেই গেল। নতুন কাপড় ছিঁড়ে তক্ষুণি বেঁধে দিয়েছিলাম। নতুন কাপড়ের মায়া থেকে ছেলের টানই বেশী মায়ের কাছে, কি বল! হাঁ, আর দেখবে মাথায় একটা ফোঁড়ার দাগ। দাগটা ঢাকবার জন্যই চুল টেনে দেয় বটে তবু একটি নজর দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।'

লিংটান হেসে ওঠে : 'এই ভাবে কি কেউ কাউকে খুঁজে বের করতে পারে? তুমি বাছা ওর কথা শুনো না, সব মায়েরাই একরকম···যেন তার ছেলের মত দ্বিতীয়টি আর কোথাও নেই। আমার কাছে শোন—। তুমি দেখবে বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলে আমাদের। দেখতে সুপুরুষই বটে তবে যাকে সুন্দর বলে তা নয়। আমার ছোট ছেলে যেমন সুন্দর মেয়েদের মত ···হু—, আর সুন্দর না হ'য়ে ভালই হয়েছে।'

ছোটছেলের সৌন্দর্যের উল্লেখে লিংসাওর দৃষ্টি অবনমিত হ'য়ে পড়ে, আর সেই নীরবতার মধ্যে মুক্ত এলাকার যাত্রী ধীরে উঠে দাঁড়ায় বিদায়ের জন্য।

'বলা মুস্কিল। কপাল ভাল হ'লে মাস খানেকের মধ্যেই চিঠি পেয়ে যাবে। তবে যা দিনকাল, সাধারণতঃ এভাবে কপাল বড় খোলে না।'

বিদায় জানিয়ে অজানা যাত্রী পথে বেরিয়ে পড়ে। জমান টাকার কিছু নিয়ে লিংটান দেয় তাকে, আর লিংসাও রুটির মধ্যে মাংস পুরে একটা পুঁটুলি বেঁধে দিয়ে দেয় সঙ্গে। বারে বারে তাকে বলে ভবিষ্যতে এ-অঞ্চলে এলে সে যেন এখানে রাত্রিযাপন করে। ধন্যবাদ জানিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মিশে যায় পথিক। কি তার নাম—সেও বলেনি, এরাও জিজ্ঞেস করেনি। এই দুর্দিনে নাম না জানাই ভাল। শত্রুর অত্যাচার ও প্রশ্নবানে জর্জরিত হ'য়ে সত্যি কথাই বেরিয়ে আসবে : 'তার নাম তো জানি না।' ওর থেকে বেশী কিছু আর বলতে পারবে না।

চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে দিন গোনে স্বামী-স্ত্রী। এবারে মাঠের কাজে সেই সাবেক দিনের মত লিংসাও এসে দাঁড়ায় স্বামীর সাহায্যে। ধান বুনে দিয়েছে গ্রীষ্মের সুরুতে এবং হয়েছেও প্রচুর। কিন্তু নিড়ানোর কাজ কোনোমতেই সুষ্ঠুভাবে হ'য়ে ওঠে না। ছেলেদের নিপুণ হাতের কাজ তো নেই। আগাছা জমে ওঠে ধানের চারার মাঝে মাঝে। মোষটাও পেটপুরে খেতে পায় না।—পাহাড়তলির ঘাসের বনে চরিয়ে আনবার কেউ নেই আজ। তবুও যতদূর সম্ভব স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে যতখানি পারে জমি নিড়িয়ে দেয়। সংসার চালু রাখে লিংসাও। মাঠের কাজ শেষ ক'রে যদি ফিরতে দেরি হয় তো কোনমতে ভাতে ভাত ফুটিয়ে নামিয়ে নেয় সে।

নীলা তার বাচ্চা নিয়ে ঘরে ফিরে এলে কি ভাবে দিন চলবে তাই নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আলোচনা করে। লুকোনোর জায়গা তৈরি করার কথা বলে

একদিন লিংসাও। অন্য কোথাও গিয়ে থাকার বাসনা তাদের নেই। প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য তাদের নিজেদেরই ব্যবস্থা থাকা দরকার। 'কিন্তু কি ভাবে?' লিংটান জিজ্ঞেস করে: 'চিন্তা তো ডিমের মতো…তা' দিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে ছানাটা বের করো তো দেখি!'

'সবুর, সবুর। একটু বসে তা' দিয়ে নি—' হাসতে হাসতে বলে লিংসাও। এমনি করেই ওদের দিন কাটে। তারপর একদিন লিংসাও বলে: 'হেঁসেলের উনুনের পিছনে মাটি খুঁড়ে ফেলে মাটির দেয়ালের নিচু দিয়ে উঠোনের তলা পর্যন্ত গর্ত ক'রে একটা ঘর তৈরি করলে কেমন হয়গো? কাপড়-কিনিয়ে তো এ-তল্লাটে আর নেই। তাঁত চালিয়ে কি হবে? তাঁতঘরের চৌকাঠ, থাম নিয়ে মাটির তলায় ঘরে লাগানো যাবে। গর্তের মুখে একখানা তক্তা বসিয়ে দিয়ে তার উপর কিছু খড় বিছিয়ে দিলে আর কেউ ধরতে পারবে না।'

স্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করে লিংটান। স্বামীর প্রশংসায় লজ্জিত লিংসাও বলে: 'এমন কী আর ভেবে চিন্তে বলেছি—'

'অনেক, অনেক কিছু বলেছ গো—কোন্ মেয়ে বা এত ভাল ক'রে ভাবতে পারে। মাঠের কাজের সময় তো কেউই আর ভাবে না। তোমার আর অন্যান্য বৌঝির মধ্যে কত তফাৎ! তোমার মন তো অলসের মত ব'সে থাকে না। আর, আমিও কি ছাই বুঝতে পারি তোমার মনে কি খেলছে?'

স্বামীর প্রশংসায় স্মিতহাস্যে লিংসাও উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেয় যাতে সামনের ফোকলা মুখ স্বামীর নজরে না পড়ে। অনেক বছর হোলো সামনের দাঁত পড়ে গেছে, তবুও সে এইভাবেই হাসির সময় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেয় যতক্ষণ না বুঝতে পারে যে প্রিয়র সপ্রশংস দৃষ্টি তার উপর থাকলেও তার নজর থাকে না বিশেষভাবে তার মুখাবয়বের উপর।

সে-রাত্রেই তারা গর্ত খুঁড়তে সুরু করল। গ্রীষ্মের রাত্রি। উনুনের পিছনের শক্ত মাটি খুদে খুদে গর্ত করা বড় সহজ কর্ম নয়। লিং বংশের পূর্বগামিনী অন্নপূর্ণা কত নারী পুরুষানুক্রমে উনুনের এই মাটি পিটিয়ে পিটিয়ে প্রস্তর-কঠিন ভূমিতে পরিণত ক'রে গেছে। সেই মাটি খুদে তোলা বড় সোজা কাজ নয়। ঘর্মাক্ত কলেবরে শ্রান্ত হ'য়ে যখন তারা থামল, তখন দেখল দু'জনে মিলে শুধু এক বিঘত মাত্র মাটি খুদ্‌তে পেরেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে শ্রান্ত লিংটান বলে: 'বয়স কম ওদের, ওরা আসুক, ওদের সাহায্যে খোঁড়া শেষ করা যাবে।'

'ওদের ফিরে আসার আগে অন্ততঃ লুকোনো যায় এমন গর্ত আমাদের ক'রে ফেলা দরকার।' গৃহিণী বলে।

দিনের পর দিন তারা মাটি খোঁড়ে। গর্তের গভীরতা চোখে না ঠেকলে কাজ থামায় না। পুত্র পৌত্রের গৃহাগমনের পথ চেয়ে থাকে লিংসাও। গভীর গর্তে তারা শুধু লুকিয়েই থাকতে পারবে না, দরকার হ'লে, ক্ষেতের ধানও জমা রাখতে পারবে।

একদিন লিংটান ক্ষেতে কাজ করছে, এমন সময় দেখল শয়তানের কালোছায়া এগিয়ে আসছে তার দিকে। শহরের দিক থেকে একদল শত্রু এসেছে গাঁয়ের পথে। হয়তো আজই তার শেষ। সসস্ত্র সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হ'য়ে সে নিজের মাঠে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু না, তাদের কিচির মিচির শুনে তো মনে হয় না যে তারা মারবে। একজন একটা ছোট নোট বই ও কলম বের ক'রে লিংটানকে জিজ্ঞেস ক'রে লিখতে সুরু করল তার নাম ধাম, কতদিন এই গাঁয়ে বাস, তার জমির পরিমাপ, ক্ষেতের পরিমান। ভীত লিংটান সঠিক উত্তরেরও বেশী বলে ফেলল যা সে বলতে চায়নি, কিন্তু শস্যের পরিমান সে বেশ কম করেই বলল, কারণ, জমিদারের নায়েব গোমস্তার সম্মুখীন হওয়ার পুর্ব-অভিজ্ঞতা তো তার ছিল। আর, ফসল সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তার জ্ঞানও বিশেষ নেই। তাই লিংটান যা বলল সেও তাই লিখে নিল। লেখা শেষ হ'লে নবাগত সৈন্য চেঁচিয়ে বলল:

'এই ব্যাটা চাষার পো, তোদের এইসব জমি জমা সব আমরা দখল ক'রে নিয়েছি, বুঝলি। এ সব এখন আমাদের। আমরা যে ভাবে চাষ আবাদ করতে বলব, ঠিক সেই ভাবেই করবি। সমস্ত ফসল নিয়ে আসবি আমাদের কাছে। দাম একটা পাবি বটে। এখন আর তোদের ইচ্ছেমত কেনাবেচা চলবে না। নতুন আইন কানুন আমরা চালু করেছি, তাই মেনে তোরা চলবি, বুঝলি।'

ফসলের দাম কম বেশী কেন হয় অভিজ্ঞ গ্রাম্য চাষী লিংটান জানতো। ক্রেতা বিক্রেতা, ফসল ও বছরের অবস্থা, স্থানান্তরে ফসল রপ্তানীর হিসাব —এসবের উপর নির্ভর করে ফসল কিংবা মাংসের দাম। হঠাৎ আগে

থেকেই ফসলের দাম ঠিক করা যায় না, সুচতুর কৃষক লিংটান জানতো। তাই স্পষ্ট কণ্ঠে অথচ বিনয়ী ভাষায় সে বলল :

'কর্তা, এত আগে ফসলের দাম কি ভাবে ঠিক করা যাবে? সবই তো ঐ ওঁনার ইচ্ছা—' উপরের আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় লিংটান।

বেঁটে শত্রু পুঙ্গব রাগে গম্ গম্ করতে করতে চোখ ঘুরিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল : 'সব কিছু এখন আমাদের হাতে। আমাদের হুকুম না মানলে জমি থেকে উৎখাত ক'রে দেব হারামী ব্যাটা।'

আর একটি কথাও না বলে উর্বরা ধরণীর দিকে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লিংটান। শত্রুর প্রশ্নের জবাবে সে শুধু কাটা কাটা কথায় বলে গেল তার সম্পত্তির তালিকা : 'একটা মোষ, দুটো শুয়োর, মুরগী আটটা, একটা ছোট্ট ডোবা, কিছু মাছও আছে তাতে, আর গোটাকয়েক হাঁস, আর গৃহে বাস করে সে ও তার বৃদ্ধা স্ত্রী।'

'ছেলে পিলে?'

মাথা তুলে জীবনের প্রথম মিথ্যা কথা লিংটান বলল : 'আমরা নিঃসন্তান।'

এসব কথা খাতায় টুকে নিয়ে প্রশ্নকর্তা বলল : 'মাসের পয়লা তারিখ থেকে মাছের কন্ট্রোল হবে। যদি মাছ ধরা পড়ে তা সোজা আমাদের কাছে নিয়ে আসবি। বিনা হুকুমে তোরা মাছ ধরবি না, খাবিও না, বুঝলি।'

'কিন্তু পুকুর তো আমার—' লিংটানের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। সেই শিশু বয়স থেকে নিজেদের পুকুরের মাছ ধ'রে তারা খেয়েছে। আর মাছই তো প্রধান খাদ্য।

'কিছুই তোদের না,' লোকটা ফেটে পড়ে : 'গেঁয়ো ভূত কোথাকার! হারামজাদা, জানিস না যে তোরা এখন আমদের হুকুমের নোকর। আমরা তোদের দেশ জয় করেছি?'

আবার মাথা তুলে দাঁড়াল লিংটান। ঠোঁট চেপে নিশ্চুপ থেকে নিজের জীবন বাঁচিয়ে সে আর একবার তাকালো বক্তার চোখের দিকে। চোখ থেকে প্রতিবাদ ঠিকরে বেরিয়ে এসে যেন বলছে : 'না, আমরা যে বিজিত এ কথা আমরা মানি না।' তার উন্নতশির যেন প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে : 'না'; 'না' বলছে লিংটানের সমগ্র সত্তা। কিন্তু তার কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোল না, কারণ, সে বুঝেছিল জীবিত থাকলে সমস্ত জমি সে স্বাধিকারে রাখতে

পারবে, কিন্তু মরে গেলে তার দেহের মাপে একটু গোরস্থানের মাটিও কি থাকবে তার দেহের নিচে?

বেটে শত্রু অন্যদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল: 'নে, তোর নাম লেখা হ'য়ে গেছে। তোর বৌ, শুয়োর, মুরগী, মাছ, মোষ, জমি—সব কিছুর হিসাব লিখে নিয়েছি। শান্তিতে যদি দিন কাটাতে চাস তো আমাদের হুকুম মেনে চলবি।' লিংটান চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শোনে। মাথাটি তুলে সে দাঁড়িয়ে থাকে, সমগ্র দেহ নিশ্চল স্থাণুর মত হ'য়ে গেছে। গাঁয়ের প্রতিটি গৃহস্থের হিসাব নিয়ে তাদের জমির পরিমান লিখে নিল শত্রুর লোক-গুলো। গত বছরের তুলনায় কর্মব্যস্ত কৃষকের সংখ্যা অনেক কম, গাঁয়ের যুবকরা সব চলে গেছে, অনেকে মরে গেছে। তারই মত বেশ কিছু গ্রামবাসী এখনও জমি আগলে বসে আছে। যে কোন বিপদই আসুক না কেন, মাটির মায়া মুছে ফেলে গ্রাম ছেড়ে তারা যাবে না কেউই কোনদিন।

দৃষ্টিপথে যতক্ষণ শত্রুরা রইল ততক্ষণ লিংটান ঘরে ফিরল না। ওদেরই চোখের উপরে আবার সে ক্ষেতের কাজ সুরু করল এমনভাবে যেন বিশেষ কিছু ঘটেনি আজ। কিন্তু মনের কোণে বিপদের কালোছায়া ঝুলে রইল সর্বক্ষণ। শত্রুরা যখন অন্যত্র চলে গেল, লিংটান চারদিকে তাকিয়ে দেখল। যার যার ক্ষেত থেকে চাষীরা আলের উপর দিয়ে গাঁয়ের পথে ঘরে ফিরছে দুপুরের ভাত খেতে। লাঙ্গলটি কাঁধে তুলে সেও ফিরে চলল। অর্ধভগ্ন চা-খানায় তারা একে একে এসে জমল প্রায় চল্লিশ জন। শত্রুরা কাকে কি বলল তাই তারা পরস্পরকে শুনাল। শত্রুর হাতে কম দামে চাল তুলে দিতে হবে, নিজেদের ডোবা-পুকুরের মাছও তারা ধরতে পারবে না। যদি ধরাও পরে তো তা জমা দিয়ে আসতে হবে তাদের কাছে। 'এ জাতীয় অত্যাচার আমরা কোনদিন দেখিনি—' কিন্তু আর কিছু তারা বলতে পারে না। শুধু শুধু কথা ব'লে কিম্বা রাগ ক'রে তো লাভ হবে না। অবস্থা বুঝতে হ'লে আরও কিছু জানা দরকার। লিংটান অবশেষে বলল:

'যতক্ষণ সওয়া যায় সইতে হবে—' যেন সকলের মনের কথাই সে প্রকাশ করছে: 'যখন সইতে পারব না তখন ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। তবে জমির কথাই তো সর্বাগ্রে। কি বল'গো তোমরা।'

লিংটানের এ-কথা মেনে নেয় সকলে। তারপর ফিরে যায় যে-যার ঘরে।

দুঃসময়ের এত ঝঞ্ঝাট একলাই বা কি ক'রে সওয়া যায়? তবুও মন্দের ভাল যে লাও-এর গাঁয়ে ফিরে আসছে। দুপুরের রোদে গৃহপ্রত্যাবর্তনের পথে লিংটান ভাবতে ভাবতে চলে: গাঁয়ের মোড়ল হিসেবে তাকে সকলে মান্য করে। কিন্তু আগামী দিনের ঝক্কি যদি সহ্য করা না যায় তবে কি ভাবে মোড়লী করা যাবে? কম বয়সের শক্ত সমর্থযুবক-মোড়লের প্রয়োজন এই জমানায়, যারা চিন্তা ভাবনা ক'রে পথ বাতলাতে পারবে। এ দুর্দিনের সঙ্গে তার পুরানো দিনের অভিজ্ঞতার কোন মিলই তো দেখা যায় না।

গৃহপ্রাঙ্গণের এক কোণে স্বামী স্ত্রী খাবার নিয়ে বসে। বাড়ীতে তো আর তৃতীয় প্রাণী নেই এখন। লিংসাওকে সব কথা খুলে বলে বৃদ্ধ। সব কথা শুনে লিংসাও বুড়োকে বলে ভিন গাঁয়ে গিয়ে যত নুন পাওয়া যায় কিনে আনতে। আশ্চর্য হ'য়ে লিংটান জিজ্ঞেস করে: 'কিন্তু কেন বলতো?'

'ঐ শুয়োরগুলো তো মরবে এবং আধাআধি মুরগীও। আর তাজা মাছ যখন খাওয়া নিষেধ, তখন নোনা মাছের ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

'কিন্তু ব্যাটারা যদি টের পায় তো আমাদের মেরে ফেলবে।'

মুখটি ঘুরিয়ে লিংসাও বলে: 'যদি কোন ব্যারামে গাঁয়ের পশু পাখী মারা যায়, তার জন্যও কি আমরা দায়ী নাকি? আমি গাঁয়ের সব মেয়েদের ব'লে দেব'খন এই ব্যারামের কথা, আর নুন কিনতে যাবার পথে তুমিও বলতে বলতে যেও। হাওয়ার মুখে কথা ভাসতে ভাসতে যাবে। এখনও ভেবে কোন হদিস পায়নি ওরা—একথা শুনলে দেখবে, ঠিক বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবস্থা ক'রে নেবে।'

কোন কথা না ব'লে দাঁতে দাঁত চেপে লিংটান বেরিয়ে গেল নুন কিনতে। এক জায়গায় তো সব নুন কেনা যায় না, অন্যান্য জায়গায়ও তাকে যেতে হোলো। তারপর ফিরে এসে গভীর রাত্রে চুপে চুপে শুয়োর আর হাঁসগুলো মেরে আঁচে শুকিয়ে নিয়ে নুন মাখিয়ে রাখে। মাদী শুয়োরটাকে বাচ্চা না দেওয়া পর্যন্ত মারে না। তাঁত-ঘরের এক কোণে ওটাকে বেঁধে রেখে দেয়। তারপর বিয়োলে বাচ্চাগুলোকে যাতে কেউ না দেখতে পায় তার উপর নজর রাখে। এগুলোর তো আর হিসেব নেই।

প্রতি রাত্রে মাটির নীচের গর্ত আয়তনে বাড়তে থাকে। শত্রুর মত কাউকে দেখলে লিংসাও নুনমাখা মাংসগুলো তাড়াতাড়ি গর্তে লুকিয়ে ফেলে। সেই গ্রীষ্মে লিংটান যত মাংস খেল অত মাংস সে কোনোদিন খায়নি, মাংসের ছোট ছোট সব টুকরোগুলো তো আর নুন মাখিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

তারপর রক্ত জমিয়ে পুডিং তৈরি করা। শুধু লিংটানের গৃহে নয়, সমগ্র অঞ্চল জুড়ে একই ব্যবস্থা। পর্যাপ্ত নাড়ীভুড়ী ও ফেলেদেওয়া অংশগুলো খেয়ে খেয়ে গাঁয়ের কুকুরগুলো পর্যন্ত মোটা হ'য়ে গেল। শুধু যথেষ্ট নুন পাওয়া যাচ্ছিল না কোথাও। হঠাৎ কোন্ অজানা জায়গা থেকে অচেনা হাত দিয়ে গাঁয়ের দোকানে দোকানে নুন এসে গেল। প্রয়োজন মত যে যার নুন নিয়ে গেল, কেউ একবার জিজ্ঞেসও করল না কোথা থেকে নুন এল। তবে সকলেই বুঝল ঐ মুক্ত অঞ্চলের লোকরা এই নুনের ব্যবস্থা করেছে।

সুদীর্ঘ গ্রীষ্মকাল ধরে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পুত্র পৌত্রের পথ চেয়ে কাটিয়ে দিল। তখনও গর্ত সম্পূর্ণ হয় নি। প্রতিদিন পথের দিকে হা ক'রে তাকিয়ে থাকত আর রাত্রি জেগে থেকে কান পেতে প্রতীক্ষা করত পরিচিত শব্দের। এমনি করেই তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে লিংটানকে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পডতে হ'ত শত্রু-সেনাদের কিংবা শত্রু-অফিসারের একাকী আগমনে। তারা আসত গ্রামবাসীদের কি-করা না-করার হুকুমনামা জানাতে, কিংবা ক্ষেত-ভরা শস্য দেখতে। এরই মধ্যে গোঁয়ো চাষীর ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি ফেলে নীরবে বিনা প্রতিবাদে শত্রু সেনাদের কথা শুনে সহ্য করার ক্ষমতা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে লিংটান। এদের আনাগোনার ভিতর দিয়ে লিংটান বুঝতে পারে যে যদিও এদের সকলেই খারাপ তবুও তার মধ্যে একটু উনিশ বিশ আছে। মনে মনে লিংটান ঠিক করেছে যে লাও-এরের ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সে চুপ ক'রে থাকবে।

কোন কোন দিন শত্রুরা লিংটানের গৃহেও এসে হাজির হয়। কিন্তু লিংসাওর সাবধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত না। নুন মাখানো মাংস ও চাল আগেই গর্তে লুকিয়ে ফেলত সে। গর্তে না ধরলে অন্ধকার ঘরের বাতার উপর ঢেকে রেখে দিত। না-বোঝার ভান ক'রে বোকা বোকা চাউনি মেলে সে আগন্তুকদের উপর নজর রেখে হাতের তকলী চালাত। জীর্ণ ময়লা বেশভূষা পরে আলু থালু চুলে থাকত লিংসাও। গরমে আর অযত্নে তার গায়ের হলদে রংও মলিন হ'য়ে উঠেছে। যদি শত্রুরা কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে চাইত সে মাথা ঝাঁকিয়ে, কান দেখিয়ে বুঝিয়ে দিত যে সে কালা।

'যতই কুৎসিত হব ততই আমার পক্ষে বাঁচোয়া,' মনে মনে লিংসাও ভাবে। গর্তের পরিমানও বৃদ্ধি পেয়েছে ইতিমধ্যে, পৌত্র, পুত্রবধূর লুকিয়ে থাকার স্থান হ'য়ে যাবে তাতে।

গ্রীষ্মকাল গেল কেটে, গরমও কমল। ছেলের পথ চেয়ে চেয়ে লিংটান

বারে বারে আশা করে ফসল কাটার আগেই হয়তো লাও-এর আসবে। তবুও তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কারণ, যুবকদের ধরে ধরে জোর ক'রে অন্য কাজে নিয়ে যায় শত্রু-সেনারা। ছেলেকে এভাবে হারাতে রাজী নয় সে। সুতরাং গাঁয়ের পথে সবসময় নজর রাখার ব্যবস্থা তারা করবে। রাত্রে যেটুকু সম্ভব তাই করবে লাও-এর। চারদিকে কড়া নজর রাখবে তারা।

তারপর অবশেষে একদিন সেই প্রতীক্ষমান মুহূর্ত এল। মধ্যরাত্রে দরজায় করাঘাত শুনে দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে লিংটান ছুটল দোর খুলতে। সে বুঝেছিল কার করাঘাতের শব্দ। প্রদীপ হাতে স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে : 'দাঁড়াও, আলোটা নিবিয়ে দিই আগে। ওরা যদি না হয় তো আমরা অন্ধকারে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারব। আর ওরাই যদি হয় তো কেউ ওদের দেখতে পাবে না।'

স্ত্রীর ক্ষুরধার বুদ্ধি দেখে লিংটান আবার আশ্চর্য হ'য়ে যায়। আলোটা নিবিয়ে আস্তে দুয়ার খুলে তারা তাকিয়ে দেখে। নক্ষত্রখোচিত আকাশের আধো-আঁধারে দেখে দুটি মূর্তির কালোছায়া।

'বাবা!'

লাও-এরের কণ্ঠস্বর। নীরবে তাড়াতাড়ি দুজনকে দোরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে তাদের নিয়ে আসে। জানালা-হীন রান্নাঘরের দরজা বন্ধ ক'রে প্রদীপ জ্বালিয়ে লিংসাও তাকিয়ে দেখে ওদের। সামনে দাঁড়িয়ে দুইটি পুরুষ মূর্তি···লাও-এর আর নীলা। মাথার চুল কেটে ছোট ক'রে ফেলেছে নীলা। পুরুষের সজ্জা তার দেহে। পায়ে পরেছে ছেলেদের খড়ের চটি। রংও ছেলের মত তামাটে হ'য়ে গেছে। আর মুখটাও এমন হয়েছে যে চেনা লোকও পথে ওকে দেখলে কৃষক বলে মনে করবে। কিন্তু নাতি কই? নাতির জন্য লিংসাওর মত উতলা হ'য়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করে :

'আমার নাতি কই, আমার ছোট্ট নাদাপেটা মানিক কই?'

মৃদু হেসে পিঠের ঝুড়ি নামিয়ে নীলা বের ক'রে দেয় তার ছোট্ট শিশুকে। সযত্নে সাবধানে লুকোনো শিশু। দু'হাত বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরে লিংসাও। আনন্দে থর থর কাঁপে তার মুখ। কোনদিকেই, কোনকিছুতেই আর তার নজর নেই। চোখ দিয়ে নামে আনন্দাশ্রুর ধারা। কাপড় চোপড় সরিয়ে ফেলে উলঙ্গ শিশুকে উল্টেপাল্টে দেখে বারে বারে। ঠোঁটে মৃদু তৃপ্তির হাসি।

বির বির করে বলে : 'ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম—!' গলার কাছে নিয়ে চেপে ধরে, তারপরেই কোলে দোল দিতে দিতে বলে : 'ওরে আমার মানিকরে, ওরে আমার চোখের মণিরে—'

লিংসাওকে ঘিরে সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। চোখে জল—বেদনামাখা আনন্দাশ্রু। কিন্তুটা বেদনা দুঃখ থেকেই তো আসে এই আনন্দ। দুঃখই যে জানল না, সে তো বুঝবে না এই গভীর তৃপ্তি। নীলার চোখে তৃপ্তি-অশ্রু। কত বিপদের ঝক্কি মাথায় নিয়ে বাচ্চাকে বয়ে আনবার পর প্রথম আনন্দানুভূতি তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। সে তো ফিরে আসতে চায়নি। আরও দূরে, আরও পশ্চিমে শিশু-মণিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পত্র বাহকের হাত দিয়ে শ্বশুরের চিঠি যখন তাদের হতে গিয়ে পড়ল—শ্বশুর লিখেছিলেন তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য—নীলা কত কথা কাটাকাটি করেছিল লাও-এরের সঙ্গে। কত বিপদের মধ্য দিয়ে সেই চিঠি গিয়েছিল তাদের কাছে। প্রথম পত্রবাহক শত্রুর গুলির আঘাতে মারা যায়। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে সমস্ত কাগজপত্র আরেকজনের হাতে দিয়ে যায়। শুধু লিংটানের লেখা চিঠিই তো নয়, আরও কত জরুরী চিঠি, বিশেষ ক'রে ছিল গোপন সংবাদগুলো, যা বহন করাই ছিল তার প্রধান কাজ। মুক্ত এলাকার শাষকদের এবং পাহাড় প্রদেশের মুক্ত-সেনাদের মধ্যের গোপন সংবাদ। সুতরাং ঘুরে ঘুরে লিংটানের চিঠিও তার ছেলের হাতে পৌঁচেছিল।

সেই চিঠি পড়ার পর নীলা মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল : 'আমরা যারা যুবক, আমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার, আমরা ফিরে যাব না। ছেলের জন্যই আমরা ঐ জায়গা ছেড়েছিলাম, তাহ'লে কি এখন আবার ওকে ওখানে ঐ বিপদের মাঝে নিয়ে যাব?'

উত্তরে লাও-এর বলেছিল সেদিন : 'আমরা যখন গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিলাম নীলা, বাবা মার কাছে ছিল সেদিন দাদা ও লাও-সান। আমাকে ছাড়া দু'দুটো ছেলে ছিল তাঁর পাশে। আমরা তখন আমাদের নিজেদের কথা নিজেরাই ভাবতে পারতাম। কিন্তু আজ তাঁরা একলা, বাপ মার বিপদের সময় যদি আমরা না যাই, তবে আমাদের বুড়ো বয়সে আমাদের ছেলেরা কি দেখবে আমাদের? বয়সের সময়ে যদি আমরা কর্তব্যকর্ম না করি, আমাদের ছেলেরাও তো তা করবে না, নীলা!'

স্বামীর একথায় নীলাকে অবশেষে রাজী হ'তে হয়েছিল, কিন্তু তবুও

ফিরতি-পথের প্রতিটি পদক্ষেপে তার ছিল শঙ্কা, অনিচ্ছা। কিন্তু এই প্রথম সে যেন অনুভব করল কি ভাবে সে তার স্বামীর পরিবারের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গেছে। সর্বপ্রথম যেন সে বুঝল যে শুধু একজনকে ঘিরেই একটি শিশুর জন্ম নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে মিশে আছে এই গৃহের সকলে, এই পরিবারের অতীত পুরুষেরাও। নীলার শিশু-ভগবান লিংসাওর পরম তৃষ্ণার তৃপ্তি দান করে। দু' চোখ ভরে এ আনন্দ-দৃশ্য নীলা উপভোগ করে। হাত বাড়িয়ে ছেলেকে নিজের কোলে ফিরিয়ে নিতে সে পারে না, চায়ও না।

ভীতি-হীন কুতকুতে চোখে বৃদ্ধা ঠাকুরমার আনন্দাশ্রু বিগলিত মুখ হা হ'য়ে দেখে নীলার শিশুটি। জন্মের পর থেকে এতটুকু বয়সেই নানা মানুষের কত রকম মুখ সে দেখেছে। কিন্তু এমনভাবে তো তাকে কেউ আদর জানায় নি এর আগে। গৃহ প্রবেশের আগে গাঁয়ের পথে ছেলে যাতে না কাঁদে নীলা তাই বেশ ভাল ক'রে তাকে মাই দিয়েছিল। সমস্ত পথ মায়ের পিঠের ঝুড়িতে ঘুমুতে ঘুমুতে সে এসেছে। প্রথম দর্শনের মুহূর্ত কেটে গেলে সে হাসতে সুরু করে। হাঁটুর উপর বসিয়ে লিংসাও লিংটানকে বলে প্রদীপটা ভাল ক'রে তুলে ধরতে যাতে সে নাতির মুখ-শ্রী ভাল ক'রে দেখতে পারে। হাঁটুর উপর বসে খ-খ ক'রে হেসে ঠাকুরমার জামার বোতাম ধরে টানতে টানতে কত কথা নাতি বলে! আনন্দে লিংটান গড়িয়ে পড়ে, লিংসাওর দু' চোখ দিয়ে গড়াতে থাকে অশ্রুধারা। তার সব যেন কেমন হ'য়ে যায়। হাসি ও আনন্দের মাঝে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে দু'গাল বেয়ে।

লিংটান ভয় পায়, নিশ্বাস নিতে পারছে তো! লাও-এবের হাতে প্রদীপটি দিয়ে লিংসাওর কাছে গিয়ে মৃদু চেঁচিয়ে বলে: 'শুনছো গো, মনটা শক্ত কর, নোঙর হারিয়ে ফেলোনা, তা হ'লেই আবোল তাবোল বকতে সুরু করবে। খুব বেশী দুঃখের মত খুব বেশী আনন্দও তো ভাল নয়!'

শিশুকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে লিংটান নীলাকে বলে শাশুড়ীকে একটু গরম চা ঢেলে দিতে। নীলার হাত থেকে চা খেয়ে আনন্দাশ্রু মুছে ফেলে লিংসাও সম্বিত ফিরে পায়। লিংটান আবার নাতিকে ঠাকুরমার কোলে ফিরিয়ে দেয়। আর, লিংটান-এরও নিজের হাতে নিজের দেহে নাতির দেহের স্পর্শ পেতে বাসনা জেগেছিল। নব কচি দেহের সুখ স্পর্শ···বৃদ্ধ দেখে, অনুভব করে নাতির হৃষ্টপুষ্ট পা দু'খানি, বেশ মোটাসোটা বক্ষটি আর চৌকো কাঁধটি। ছেলের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের আনন্দকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়:

'মুখটা দেখেছিস, চৌকো মুখ, হা-টাও তাই…যেমন তেমন তো নয় সকলের ঘরেই আর এমনটি হয় না !'

লিংটানের কথায় লাও-এর ও নীলা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখে। তাদের নীরব গর্ব আনন্দের দোলা বৃদ্ধের চোখ এড়িয়ে যায় না।

'দুশমন ব্যাটারা কি করতে পারে, যদি আমাদের বংশের বাতি এই রকম হয় ?' লিংটান ব'লে ওঠে।

আর সত্যিই আগামী দিনের প্রতিনিধি হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের দেখে প্রত্যেকেরই মনে বল আসে, সমস্ত গৃহে জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

লিংসাও দাঁড়িয়ে নাতিকে কোলে বসিয়ে নেয়…নাতির কচিদেহের স্পর্শ সে অনুভব করে। নীলা খাবার গরম ক'রে নেয়। লিংটান হুকো নিয়ে বসে ছেলের পাশে, সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের দিনগুলির সব কথা সে জানতে চায়। খেতে খেতে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে কথা চলে। নীলা লিংসাও-ও বসে পাশে। নাতিকে নিয়ে লিংসাও থাকে ব্যস্ত, নাতির কর্মকুশলতার প্রতিটি পরিচয়ে ঠাকুমা বসে বসে হাসে।

এত আনন্দের মাঝেও শুধু একটিবার একটু নিরানন্দের কালো মেঘ জমে উঠেছিল। নিজের ছেলেদের যেভাবে খাইয়েছে, সেইভাবে লিংসাও ভাত চিবিয়ে নরম ক'রে নাতির মুখে দিয়েছিল। তাই দেখে নীলা আপত্তি জানিয়ে অতি নম্র বিনয়ী কণ্ঠে শাশুড়ীকে বললে :

'একটা কথা মা, রাগ করোনা, কারও মুখের চিবোন ভাত বাচ্চার মুখে দেওয়া ঠিক নয়।'

গুরুজনের মুখের উপরে পুত্রবধুর এই কথা ! আর চিবোন নরম ভাত নাতির মুখে দেওয়া বারণ ! লিংসাও আশ্চর্য হ'য়ে যায় নীলার আপত্তিতে। কঠিন স্বরে বলে : 'আমার ছেলেদের তো আমি এই ভাবেই খাইয়েছি। কই, তাদের তো কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি বাপু !'

একটু সাহসে ভর ক'রে নীলা বলে : 'কিন্তু আজকাল ও-সব ভাল বলে না মা। কি ক'রে ছেলে মানুষ করতে হয় তার একটা বই কিনেছিলাম আমি উজানের শহরে। তাতে অন্যের মুখের বাচ্চাদের দিতে বারণ ক'রে লিখেছে মা।' ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে কথা শেষ করে নীলা।

'আমার মুখে বুঝি দুর্গন্ধ ?' আরও রেগে গিয়ে লিংসাও বলে।

'না মা, তা নয়। আমি নিজেও ও-ভাবে ছেলেকে খাওয়াই না।

রাগ করোনা মা, তোমার নাতির যাতে ভালো হয় তাই তো আমরা চাই সকলে।'

গম্ভীর লিংসাও কোন জবাব দিল না। পুরুষরাও কোন কথা বলল না, কারণ, এসব ব্যাপারে মেয়েদের কথার মধ্যে যোগ দেওয়া ঠিকও নয়।

লিংসাও বলে উঠলো: 'তা হ'লে তোমার ছেলে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে। আমার ছোঁয়া লেগে হয়তো খারাপ হ'য়ে যাবে।'

'রাগ করোনা মা! তোমার জন্যই আমি তোমার নাতিকে বয়ে নিয়ে এলাম!' নীলা বুঝাবার চেষ্টা করে শাশুড়ীকে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লিংটান বলে: ''আহা, মেজাজ ঠাণ্ডা কর দেখি। আজই কথা কাটাকাটি চলবে নাতিকে নিয়ে? আমাদের সকলের চোখের মণি যে ও! আমার দাতুমণি!'

নীরবে বসে রইল লিংসাও, কিন্তু বৌ-এর কথা সে ভুলতে পারল না। নানা কথাবার্তার মাঝে সে ভাবতে লাগল: 'তবে কি ছেলেদের এখন থেকে মানুষ করতে হবে বই দেখে দেখে? বই দেখে কি আমি ছেলেদের মানুষ করেছি নাকি! কই তাদের তো কারও খারাপ কিছু হয়নি।'

মুক্ত এলাকায় লাও-এর আর নীলা কি করেছে তার কাহিনী এসে পৌঁছোয় তার কানে। আস্তে আস্তে কখন সে ভুলে যায় এই কথাকাটাকাটির কথা। হৃষ্টপুষ্ট নাতি তো তার অমূল্য সম্পদ; রাগ ক'রে থাকা যায়? রাত্রির শেষে তাদের কথাবার্তা শেষ হয়। উনুনের পিছনের বিরাট গহ্বর দেখিয়ে লিংটান বলে পুত্রকে:

'শত্রুরা এলে তোরা এখানে লুকিয়ে থাকবি। তোদের কথা ওব্যাটারা জানে না, নামও রেজেষ্ট্রী করাইনি।'

'না ক'রে খুব ভাল করেছ বাবা! পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আমরা এসেছি, সেইখানেই ওদের সঙ্গে আমরা কর্মপন্থা ঠিক ক'রে এসেছি। আমার কথা যে শত্রুরা জানে না, তাতে ভালোই হয়েছে।'

ছেলের সব কথা বৃদ্ধ বাপ বুঝল না। কিন্তু আবার নতুন ক'রে শুনতেও ইচ্ছা হ'ল না এখন, ক্লান্তি নেমে এসেছে সর্ব অঙ্গে। যা শুনেছে এতক্ষণ, তাই নিয়েই মন ব্যস্ত থাকবে। বরং কাল শোনা যাবে। শুতে গেল তারা, কিন্তু লিংসাও চাইছিল সমস্ত রাত্রি ঐ ভাবে নাতিকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে··· তার কোলে নাতি ঘুমিয়ে থাকুক। কিন্তু লিংটান তা হ'তে দিল না, সে

বলে উঠল: 'ওঠ, তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও। তুমি না উঠলে আমি উঠছি না।'

তমসাচ্ছন্ন রাত্রির শেষ-প্রহরায় তারা পরস্পরকে ছেড়ে যে যার ঘরে গেল। বিছানায় শুয়ে ক্লান্ত লিংটান বহুদিন পরে এই সর্বপ্রথম যেন আশার আলো দেখল। ছেলে তাকে শুনিয়েছে আশার বাণী। শত্রু-আগমনের পরে এই যেন সর্বপ্রথম লিংটান নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেল। বহুদিন পরে আগের মতই স্ত্রীর পাশে শুয়ে নতুন ক'রে নিজের সত্ত্বা উপলব্ধি করল··· জীবনের আশার আলো সে আবার দেখছে···সব কিছু গা-ঝাড়া দিয়ে ফেলে নতুন মানুষ লিংটান এবার ঘুমোল।

শ্রান্ত-ক্লান্ত লাও-এর ও নীলা তাদের সেই পুরোনো ঘরে এসে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। গৃহ প্রত্যাগমনের পরিশ্রম তাদের অনেক বেশী হয়েছে, মুক্ত এলাকায় যাবার পরিশ্রমের থেকে অনেক বেশী সে-পরিশ্রম। সেই মুক্তি, স্বাধীনতা তারা আর পাবে না, হয়তো এ-জীবনে তাদের স্বাধীনতা আর ফিরে পাবে না। 'অন্ততঃ নিজের মনের মধ্যে তো স্বাধীন সত্ত্বা বাঁচিয়ে রাখব—' নিজের মনে মনে লাও-এর ভাবে। কিন্তু কথা বলতে তার মোটেই ইচ্ছা করে না, এমন কি নীলার সঙ্গেও না। মুক্ত এলাকা ছাড়বার পর রাতের পর রাত নীলাকে নিয়ে সে হেঁটেছে, আর দিনের বেলা লুকিয়ে কাটিয়েছে। পাহাড়ের লোকেরা তাদের সাহায্য করেছে, পরস্পরকে তারা ভাল ক'রে চিনেছে, যেমন ক'রে পাহাড়ের সেইসব ছেলে-মেয়েরা লাও-এর ও নীলাকে চিনেছে। তারাও ওদের ছেড়ে দিতে চায় নি।

বৃদ্ধ পিতা-মাতার আহ্বানের কথা ব'লে লাও-এর নীলা বিদায় নিয়ে এসেছে। এখানে গ্রামে এসে কি করা যায়, সেইসব পাহাড়বাসীদের কি ভাবে সাহায্য করা যায়, তার একটা পথও তারা ঠিক ক'রে এসেছে। আজ গ্রামে ফিরে এসে সে জেনেছে শত্রুরা শহরে কি করেছে, অসহনীয় আইন-কানুন কি ভাবে চালু করেছে। শুয়ে শুয়ে সে ভাবে: 'চোখ কান খুলে রেখে আমাকে সতর্ক হ'য়ে কাজ করতে হবে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে আমাকে তৈরি থাকতে হবে সর্বসময়। মরার ভয় করি না, তবে শুধু শুধু মরলে তো আর কাজ হবে না।'

ঘরের নীচে বিরাট গহ্বর তৈরির জন্য মনে মনে বাপ মায়ের প্রশংসা করে লাও-এর। ঘুমোনোর আগে নীলাকে বলে: 'বুঝলে নীলা, ঐ গর্তটিকে আরও ভাল ক'রে খুদে ভেতরে খুটি বড়গা বসিয়ে আরও শক্ত ক'রে একটা

দুর্গ বানিয়ে ফেলব। আমাদের লুকোন ছাড়াও যাতে আরও অনেকে থাকতে পারে, আরও অনেক মাল মসল্লা, প্রয়োজনীয় জিনিস পত্তর রাখা যায় তার ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে।'

'হাঁ, তাই করব।' নীলা বলে।

'এটাই হবে আমাদের প্রথম কাজ। তারপর যখনই শেষ হবে, পাহাড়ের বন্ধুদের খবর দেব। তারপর দেখি কি করা যায়।'

বুক ঘেঁষে শিশুকে নিয়ে নীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু লাও-এরের চোখে ঘুম আসে না। শহরের কথা বাপের মুখে যা শুনেছে, সেই লুট, ডাকাতি, অগ্নি সংযোগ, মেয়েদের উপর পাশবিক বলাৎকার···দেহের সমস্ত রক্ত চন্ চন্ ক'রে উঠে তার শিরা উপশিরা ছিঁড়ে ফেলতে চায়। রাগে সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, সে দুশমনের বিরুদ্ধে সমস্ত জান-মান কবুল করে লড়বে, তার সন্তানদের সে শিক্ষা দেবে লড়াই চালিযে যাবার। অনেকক্ষণ পরেআস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

এতদিনের সব কথা কি এক রাত্রেই শেষ হয়! পরের দিন লিংটান আরও কত কথা, কত খবর বলে ছেলেকে। ভগ্নীপতি উলীনের শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়ার খবর পেয়ে রাগে ফেটে পড়তে নেয় লাও-এর। এত রাগ বোধহয় ইতিপূর্বে তার কিছুতেই আর হয় নি। সে বাবাকে বলল :

'এই লোকগুলিই হ'ল বিশ্বাসঘাতক। শত্রুকে পেদিয়ে যখন দেশ ছাড়া ক'রে ঐ সমুদ্রজলে ঠেলে ফেলব, এই সব উলীনদেরও তখন তাদের সঙ্গে যেতে হবে। আর যদি না যায় তো আমাদের হাতেই ওদের মৃত্যু।'

'কিন্তু আমি উলীনকে ঠিক বিশ্বাসঘাতক ব'লে মনে করতে পারছি না—' একটু ভেবে লিংটান বলে : 'মুনাফা আর আত্ম-সর্বস্ব···দুনিয়ায় আর কিছু এরা ভাবতে পারে না। মাংসের গন্ধে কুকুর পাগল,—কথা আছে না, এরাও ঠিক তাই। মুনাফার গন্ধ পেলে পাগল হ'য়ে ছুটবে।'

এ ব্যাখ্যা লাও-এর মেনে নিতে পারে না। 'এদিনে যে কেবল নিজের কথাই ভাববে সেই তো বিশ্বাসঘাতক।' লাও-এরের এ কথা বৃদ্ধ বাপ চুপ ক'রে শোনে। নিঃশব্দে বৃদ্ধ চিন্তা করে, বোধহয় এ-যুগের ছেলেরাই ঠিকমত ভাবতে পারে, ঠিক পথের কথা বলতে পারে। যেমন ক'রে হোক, শুধু জমি জমা আঁকড়ে পড়ে থাকবার কথা ছাড়া তো আর কিছুই সেও নিজের থেকে ভেবে উঠতে পারে না। বেশ বিনম্র হয়েই ছেলে বলতে থাকে :

'বাবা, সর্বপ্রথম আমাদের এই গর্তটা শেষ ক'রে ফেলতে হবে। অবস্থা না বুঝে আমার মাঠে বেরোন উচিত হবে না। আমি বরং উঠোনের নীচের গর্তটায় বেশ শক্ত ক'রে ঘর তৈরি ক'রে ফেলি। দরকার হ'লে আমরা ওখানে থাকতেও পারব, এবং অন্যদের লুকিয়েও রাখতে পারব।'

'অন্যদের ?' আশ্চর্য হ'য়ে লিংটান জিজ্ঞেস করে।

'ঐ পাহাড়ের লোকদের সঙ্গে আমাদের মিত্রতা রাখতে হবে, এবং দরকার হ'লে হয়তো তাদের এখানে লুকিয়েও রাখতে হবে।'

একটি কথাও বৃদ্ধ বললো না। আর কীইবা বলবে ! তার দুই ছেলেও তো ঐ পাহাড়দেশে আছে।

খাওয়া সেরে লিংটান মাঠে গেল। যতক্ষণ না লিংসাও নাতিকে ছেড়ে আসতে পারল, ততক্ষণ সে একা কাজ করল। লাঁও-এর গর্তের মধ্যে কাজ সুরু করল। অতি পরিশ্রমে বুকের দুধের ক্ষতি না ক'রে যতক্ষণ কাজ করা যায় ততক্ষণ নীলা রইল স্বামীর সাহায্যে।

হাসতে হাসতে নীলা বলে : 'পা দুটো আমার খুব শক্ত হয়েছে···ঘুমের মধ্যেও তো হাঁটতে শিখেছি। এবারে হাতের পালা !'

এই কঠিন মাসগুলোতে নীলা যেন একজন পুরুষের মত শক্ত হ'য়ে উঠেছে। তার সেই মেয়েলী দেহের পেলবতা ঘুচে গেছে, দেহের মুখের শ্রী মুছে গিয়ে এসেছে কেমন একটু কাঠিন্য। বুকের দিকে নজর না পড়লে যুবক বলেই সে চলে যেতে পারে। ছোট্ট বুক হলেও শিশুর পুষ্টি ভালভাবেই হয়। মনে হয়, নীলা যা খায় সবই তার শিশুর পুষ্টি সাধনেই চলে যায়।

লিংসাও আনন্দে একদিন বলে ফেলল :

'অর্কিড যদি আজ দেখত ! বেশ মোটাকাটা ছিল সে। বাচ্চা হ'লে সে যা খেত, তার সবটুকুই গিয়ে জমত নিজের গতরেই। ওর বড় মাই দুটোতে দুধই থাকত না, একেবারে চর্বিতে ভরা ছিল।'

একটু চুপ থেকে দুঃখিত কণ্ঠে নীলা আবার বলে : 'আমাকে বোধহয় দিদি আজ আরও অপছন্দ করতো। বই পড়তে পড়তে বাচ্চা পালা, এ দেখলে দিদি বোধহয় রেগেই যেতো।'

বইয়ের উল্লেখে লিংসাও গম্ভীর হ'য়ে যায়। বলে : 'কিন্তু বই পড়তে পড়তে ছেলে পালন করা, আমিও ভাল মনে করি না, বাপু ! দু'টো উল্টো জিনিস করতে যাওয়ার বিপদ আছে, বিশেষ ক'রে মেয়েদের।'

নীলা হেসে ফেলল: 'বাচ্চাকে যখন আবার মাই দেব, তখন তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ না।'

এবং লিংসাও একদিন লক্ষ্য করল, পড়তে পড়তে নীলা যখন ছেলেকে মাই দিচ্ছিল। 'এত দুধ নীলার স্তনে! তাড়াতাড়ি খেয়েও শেষ করতে পারে না লিংসাওর নাতি। দুধের ধারা গড়িয়ে নামে অন্য স্তন দিয়ে। কোন কথাই আর বলতে পারে না লিংসাও বৌকে। পুত্রবধূর সর্বদোষই সে ক্ষমা করবে। তার নাতির জন্য নীলার বুকে এত দুধ!

ভোরের আলোয় শিশু-নাতির সৌন্দর্যে বিমোহিত হ'য়ে যায় লিংসাও। কি সুন্দর নাতির নরম দেহের বাস! সমস্ত সকাল কোন কাজই সে করতে পারে না। শুধু নাতিকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকে, বারে বারে তাকিয়ে দেখে, ছোট্ট দেহটি নাকের কাছে তুলে ধ'রে বুক ভরে ঘ্রাণ গ্রহণ করে আর হাসতে থাকে। কারোও কথা তার কানে প্রবেশ করে না। দুচোখে ভরে ওঠে সুতৃপ্তির মৃদু হাসি। ঘর নিকোনো, বাসন মাজা, কিংবা খাবারের ব্যবস্থা—কোন দিকেই তার নজর নেই। শুধু নাতি, শিশু-ভগবান।

ছেলেকে লিংটান বলে: 'নাতি নিয়েই ও থাক দিন ভোর। দু'চোখ ভরে ও নাতিকে দেখুক আর আদর করুক। তাতেই সব ব্যথা ও ভুলে থাকতে পারবে। নীলাকে বলে দিস্ যেন বাচ্চাকে এখন আর না নেয়।'

তাই হলো। মাঝে মাঝে তারা বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু তার নজরে এরা কেউই আর পড়ে না। কত কথা তার নাতির সঙ্গে। বারে বারে কাপড় ভিজিয়ে দেওয়ায় হেসে ওঠে লিংসাও। উঠোনের রোদে বসিয়ে নাতির ছোট্ট হাতে পায়ে ঘসে ঘসে তেল মালিশ ক'রে দেয় ঠাকুমা। একবার চিৎকার ক'রে বলে ওঠে: 'নাতির পেছনটা দেখেছ তোমরা। একবছর বয়স হয়নি সোনামণির, এক্ষুনি বসতে পারে দেখেছ! এত শক্ত!' দু'চোখে তার আনন্দাশ্রু!

হাসতে হাসতে তারা কাজে ফিরে যায়। সাতদিন লিংটান লিংসাও গর্তের যতটা খুঁড়েছিল লাও-এর ও নীলা একদিনে তার থেকে বেশী খুঁড়ে ফেলল।

ক্ষেতে কাজ করতে করতে লিংটান চিন্তা করে কি ভাবে ছেলেকে লুকিয়ে রাখা যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তো গ্রামের লোকেরা জানবেই। এদের কাছে কিছুই লুকোনো উচিত হবে না, হাজার হলেও এরাই তো তার আত্মীয় পরিজন। দুপুরে বাড়ীতে খেতে এসে লাও-এরকে লিংটান একথা বলল। লাও-এরও

রাজী হ'ল। সেই রাত্রে লিংটান ছেলেকে নিয়ে চা-খানায় সোজা এসে হাজির হ'ল। আপ্যায়নের পালা শেষ হ'লে লিংটান উপস্থিত সকলকে বলল :

'অনেক কিছু দেখে লাও-এর গ্রামে ফিরে এসেছে। তোমাদের কাছে সেইসব কথা সে বলতে চায়। এই সব দেখবার জন্য যে বিশেষ বুদ্ধি তার আছে, তা নয়। তবে তার কথা শুনলে আমাদের মনের বল বাড়বে বলে আমার ধারনা।'

টেবিলের উপর হাত চাপড়ে সম্মতি জানাল তারা। লাও-এরও দাঁড়িয়ে উঠে বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল। কোনরকম গর্বের রেশ তার কণ্ঠে ফুটে উঠল না। হাজার মাইল পশ্চিমে এক শহরে কি ভাবে সে গিয়েছিল, বাপের চিঠি পেয়ে কি ভাবে সে আবার গাঁয়ে ফিরে এল, এবং তার চলার পথের সর্বস্থানে কি ভাবে সকলেই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে স্থির-সঙ্কল্প—তারই কাহিনী সে সকলকে শোনাল। মুক্ত এলাকায় প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ, আর শত্রু কবলিত এলাকায় গোপন প্রতিরোধ...সর্বসময়েই প্রতিরোধ—এই হ'ল মূল কথা।

'দুই জাতীয় লোক শুধু এই সঙ্কল্পের বিরোধিতা করে। আত্মসর্বস্ব, নিজের স্বার্থই যারা শুধু দেখে, তারা ; আর দুর্বলচেতা, যাদের আফিং আর কোকেন দিয়ে কেনা যায়, তাদের—যাদের সাধারণ অবস্থায় গ্রামে কোন দামই নাই। কিন্তু এরাই আজ সব থেকে বিপদের, কারণ এরাই হয় গাঁয়ের মধ্যে টিকিটিকি ...শত্রুর গুপ্তচর। এরাই হয় বিশ্বাসঘাতক।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় তারা। রোদে পোড়া চেনা মুখগুলোর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের অন্তরে কেমন জোর অনুভব করে লাও-এর। বলে :

'চাচা ও ভাইসব! শত্রুর বিরুদ্ধে যারা লড়ছে, মুক্ত-এলাকার ঐ সব যোদ্ধাদের সঙ্গে আমরা যোগ দেব। কি ভাবে আমরা যোগ দিতে পারি? গোপনে কাজ ক'রে আমাদের এই পাহাড় এলাকার ঐ নয় হাজার যোদ্ধাদের সঙ্গে আমরা যোগ দিতে পারি।'

এই কথা বলে আহ্বান জানানো মানে সমস্ত গ্রামবাসীকে মৃত্যুর জন্যে তৈরি থেকে লড়াইতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো। পাহাড়ী যোদ্ধাদের সঙ্গে, গ্রামবাসীর যোগাযোগ সম্বন্ধে শত্রুর মনে সামান্য সন্দেহ জাগলে গ্রামকে গ্রামকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করবে না তারা।

তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুল তুলে একে একে সকলে সম্মতি জানায়। শুধু সেই পণ্ডিত খুড়োর কেমন একটু দোমনা ভাব দেখা যায়। কিন্তু তা' ক্ষণেকের জন্য। পরমুহূর্তে লজ্জায় সেও আঙ্গুল তুলে লাও-এরকে সমর্থন জানায়। তবে পণ্ডিত-খুড়োর এই দোমনা ভাবের জন্য কেউই দোষ দেয় না। কারণ, শিক্ষা বলে মানুষকে দুর্বল করে, আর অশিক্ষিত লোকের মত শিক্ষিতরা কখনই সাহসী হ'তে পারে না। সকলের সমর্থন দেখে লাও-এর আবার বলে :

'সেই গোপন কাজ কি? সেই গোপন কাজ হ'ল ধান গম উৎপাদন যা হবে তা লুকিয়ে রাখা। শত্রুদের যেটুক না দিলে নিজেদের জীবন রক্ষা হয় না, শুধু সেইটুকুই দিতে হবে, তার এতটুকু বেশী নয়। এই গোপন কাজ হ'ল আমাদের যে-সব ক্ষেতে তুলোর চাষ হত, এখন থেকে আর আমরা সে-সব মাঠে তুলো দেব না। সুযোগ বুঝে হঠাৎ চুপে চুপে বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দেব এই সব শত্রুদের ছোট ছোট দলকে, কিংবা যখন তারা একলা ঘুরবে তখন আক্রমন করব। বারে বারে এইভাবে গোপন হামলা করব।'

নিঃশব্দে প্রতিটি শ্রোতা লাও-এরের কথা শোনে। কিছুক্ষণ পরে একজন জিজ্ঞেস করে : 'কিন্তু আমাদের তো বন্দুক নেই।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সকলে। গুঞ্জন ওঠে : 'বন্দুকই যদি পাই, কি না করতে পারি আমরা! খালি হাতের জন্যই তো আমরা অকর্মা হ'য়ে বসে আছি। শত্রুর হাতে যখন এত অস্ত্রশস্ত্র যা আমরা জীবনেও দেখিনি, তখন পূর্বপুরুষদের মান্ধাতা আমলের পুরোনো তরোয়াল আর সরকী দিয়ে কি ওদের বিরুদ্ধে লড়া যায়?'

পুত্র-গর্বে লিংটানের মন ভরে উঠল। মনে মনে সে বলল : 'ছেলেকে গাঁয়ে ফিরে আসার আদেশ দিয়ে সত্যিই ভাল করেছি।'

বাড়ীতে ফিরে এসে লিংটান ছেলেকে বলে : 'গাঁয়ের বাইরে একেবারেই না গেলে বোধহয় আরও ভাল হ'ত।'

'না, মুক্ত এলাকায় গিয়ে মুক্ত এলাকায় মানুষদের দেখে, তাদের কথা শুনেই তো আমি বুঝেছি যে যদি তারা ও আমরা সকলে মিলে মিশে এক হ'য়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ি, তবে ব্যাটাদের সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিতে পারব। মুক্ত এলাকার লড়াইয়ের কায়দা এবং আমাদের লড়াইয়ের কায়দা ভিন্ন রকমের। তারা লড়ে সোজাসুজি, কিন্তু আমাদের লড়তে হবে গোপনে। কঠিন লড়াই আমাদের—কোথাও না গিয়ে শত্রুর মাঝে বাস ক'রে আমাদের লড়াই চালাতে হবে।'

লাও-এরের কাছ থেকে বন্দুক পাওয়ার আশা নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রতীক্ষা করে। আর উঠোনের নীচে ঘর তৈরি শেষ না ক'রে লাও-এরও কিছু করতে পারে না। এখন আর একলা নয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বস্ততা বিচার ক'রে বেছে বেছে জনকয়েককে ডেকে সে গুপ্ত-ঘরের কথা বলল। জ্ঞাতি ভাই তারা সকলে। পূর্ণবিশ্বাসে পুরাদমে তারা গুপ্ত-ঘর শেষ করার কাজে লেগে যায়। ঘর তৈরি শেষ হ'তে আর কতক্ষণ! চারজন মরদ সমানে মাটি কেটে তোলে, আর তারা কড়ি বড়ম চৌকাঠ বসিয়ে ফেলে এবং অন্যদিক দিয়ে আর একটা গোপন দরজাও তৈরি ক'রে ফেলে। লাও-এর প্রথমে যে প্ল্যান করেছিল তার থেকেও গভীর হ'ল গর্ত। মুক্ত এলাকায় হাওয়াই জাহাজের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে মাটির নীচের গহ্বর তৈরি হয়েছিল, লাও-এর তা দেখেছিল। গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে আবার যেন কোন ফলগু ধারা না এসে পড়ে। একটা ক্ষীণ জলধারা তারা পেয়েছিল গভীর মাটির নীচে, কিন্তু লাও-এর একটা গোল বাঁশের টুকরো বসিয়ে সে জলধারা বাড়ীর কুয়োর সঙ্গে মিশিয়ে দিল। কিন্তু মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কত রকম জিনিস তারা পেল। পুরোনো মাটির হাঁড়ি, একটা পাত্র···কোন অতীতে কি ছিল কে জানে, কিন্তু এখন কিসের গুড়োয় ভর্তি হ'য়ে গেছে। কোন্ অতীত কালের ছোট শিশুর টুকরো টুকরো কঙ্কাল, একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের পায়ের হাড়···তারপর আরও গভীরে মিলল একটা কাসার বাক্স, এখন একেবারে সবুজ হ'য়ে গেছে। জোর ক'রে বাক্সটি খুলে ফেললে দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে মনি মুক্তা খচিত গোটা কয়েক কাঁটা, আর এক জোড়া বেশ ভারি সোনার দুল—এ জাতীয় জিনিস তারা আগে কেউই দেখেনি।

'আমাদের পূর্বপুরুষদের কারও ছিল এ সব জিনিস,' লিংটান বলে : 'এ জিনিস আমাদের ছোঁয়ার নয়—অধিকারও বোধহয় আমাদের নেই।' বাক্সটি নিয়ে লিংটান আবার গুপ্তঘরের দেয়ালের নীচে পুতে রাখল।

গুপ্তঘরের উপরের দিকে ঘন ক'রে বিম বসিয়ে বসিয়ে মাটি ঝড়ে-পড়া বন্ধ করল লাও-এর। বড়গাগুলো রইল ইঁটের স্তম্ভের উপর। লিংটানের তাঁতঘরের ইঁট তারা এই ভাবে কাজে লাগাল। তাতেও যখন হ'ল না, গ্রামের যাদের গৃহে ইঁটের দেয়াল ছিল, ভেতরের দিকের ইঁট খুলে রাত্রে সেগুলো লিংটানের গৃহে বয়ে নিয়ে এল। দুমাসের মধ্যেই গুপ্তঘর প্রস্তুত শেষ হ'য়ে গেল। লাও-এর বলে উঠল :

'এবারে বন্দুক রাখবার জায়গা হয়ে গেল।' পরের দিন উষার আলো ফুটবার আগেই শেষ রাতের আগেই আধো-অন্ধকারে লাও-এর বেরিয়ে পড়ল পাহাড়গামী পথে। সঙ্গে কিছু খাদ্য আর কোমরে বাঁধা দুজোড়া চটি।

॥ এগার ॥

ধান কাটবার আগে সোনালী ধানে-ভরা মাঠ দেখতে এল শত্রুরা। শস্যের ফলন দেখে মুখে মুখে হিসাব কষে কত ধান কত দাম দিতে হবে তারই হুকুমনামা শুনিয়ে যায় কৃষাণদের। নির্দিষ্ট দাম এত কম যে সে-দামে আর ধান বেচা যায় না। নিঃশব্দে হুকুমনামা শুনে যায় তারা, ক্রোধের প্রকাশ হতে দেয় না এতটুকুও, যাতে শত্রুরা খুন খারাপীর সুযোগ না পায়। মুখ বুজে এসব হুকুমনামা শোনার অভিজ্ঞতা লিংটানদের হয়েছে। খুদে-পা শত্রুদের ওপর তাদের নীরব ঘৃণা আরও বেড়েছে। মাটি আর হাতেগড়া ফসল কৃষাণের কামনার ধন, তার জীবন। তাই যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তো আর রইল কি ? হুকুমনামা তারা নীরবে মুখ নীচু ক'রে শোনে, আর ভিতরে ভিতরে তাদের ক্রোধ টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে। শত্রু চলে গেলে তারা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে কি ভাবে তাদের সমস্ত শস্য লুকিয়ে রাখবে। খুব তাড়াতাড়ি ক'রে গাঁয়ের সকলের মাঠের ধান তারা একসঙ্গে কেটে ফেলে। শত্রুদের পক্ষে সব গ্রামেই তো আর একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়ীর দোর বন্ধ ক'রে এবং বাইরে যাতে আলো ঠিকরে না পড়ে তার জন্য ঘরের ছেঁচা বেড়ার ক্ষুদ্র ছেঁদা-পথে ও জানালায় কাপড় গুঁজে আলো বন্ধ ক'রে সব বাড়ীতে রাত্রে ধান মাড়াই সুরু হয়। তারপর সেই শস্য তারা লুকিয়ে রাখে। লিংটানের মত যারা বাড়ীর নীচে গর্ত খুঁড়েছিল, তারা শস্য লুকোল সেইখানে। আর কেউ কেউ যাদের আত্মীয়স্বজন আছে পাহাড়দেশে, রাত্রের অন্ধকারে তাদের ওখানে রেখে আসে। এই সব শস্যের কিছু কিছু আবার লুটও হ'ল। নিজের দেশের লোকেরাই যারা ডাকাত হয়েছে তারাই লুট করল নিজেদেরই স্বজনদের শস্য। দুঃসময়ে দুর্দিনে এই ডাকাতদের উপদ্রব সুরু হয় চিরদিনই।

উঠানে যে অল্প শস্য পড়ে ছিল দিনের বেলায় লিংটানরা তাই মাড়াই

করে। এত কম শস্য দেখে শত্রুরা আশ্চর্য হ'য়ে গেল। মাঠভরা সোনালী গাছের ফল মোটে এতটুকু! গতবছরের তুলনায় এ-বছর শস্য হয়েছে মোটে অর্ধেক! আর গাঁয়ের কৃষকরাও বলল যে কোন কোন বছর পোয়ালেরই বৃদ্ধি হয় বেশী, শস্য সে-রকম হয় না। বিধি যদি বাম হয় তো তারা কি করতে পারে?

আর শত্রুরাই বা কি করতে পারে? কৃষকরা মিথ্যে বলছে সন্দেহ ক'রে যদি তাদের হত্যা করা হয় তো পরের বছর চাষ করবে কে? যে ধান তারা পেল নির্দিষ্ট কম দামে তারা কিনে নিয়ে গেল। লিংটান দেখল যে তিন চার গুন দামে এই শত্রুরাই সেইসব ধান শহরে বিক্রি ক'রে নিজেদের পকেট ভরছে। এই লুণ্ঠনের কথা শুনে লিংটানের মন বিরক্তি আর রাগে আরও বিষিয়ে ওঠে।

মাছ সম্বন্ধেও নতুন আদেশ চালু হয়েছে। গাঁয়ের কেউ মাছ খেতে পারবে না, পুকুর ডোবার সমস্ত মাছ শত্রুদের জন্য রক্ষিত থাকবে। দিনের বেলায় লিংটানরা কেউই মাছ ধরত না। কিন্তু রাত্রে জাল ফেলে তারা মাছ ধরতো। কাঁটা ও আঁশ গুলো তারা মাটির নীচে পুতে ফেলত, আর রাতে তারা মাছ খেত। কিন্তু মাঝে মাঝে লোক-দেখানো ব্যবস্থা না করলে তো হয় না। ছোট্ট একটি মাছ ধরে গাঁয়ের একজন শহরে গিয়ে শত্রুর অফিসে জমা দিয়ে আসত। কোন কোন সময় শত্রুরা গাঁয়ে এসে পুকুর ডোবার সব মাছ ধরবার হুকুম দিত। তখনি নিজেদের জীবনের ভয়ে লিংটানরা বাধ্য হ'য়ে কিছু কিছু বড় মাছ তুলে দিত।

খুশীমত দামে গাঁয়ের হাস মুরগী, শুয়োর গরু, শত্রুরা এসে নিয়ে গেল মাংস খাওয়ার কথা গাঁয়ের লোক একেবারে ভুলে গেল। লিংটান বুদ্ধি ক'রে আগেই সব মাংস জারিয়ে রেখে দিয়েছিল। আর তার বৃদ্ধ হাড়-বের-করা মোষটাকে দেখে শত্রুরাও এখনই ওটাকে কাটবার হুকুম দিল না।

লাও-এর পাহাড়ে চলে গেলে একদিন শত্রুরা এল লিংটানের কাছে তাদের হিসেব অনুযায়ী হাঁস মুরগী আর শুয়োর নিতে। একদিন মাঠে কাজ করতে করতে বেটে শত্রুদের ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে আসতে দেখল লিংটান। মুখ তুলে তাদের দিকে সে তাকিয়ে দেখল না, সমগ্র মন দিয়ে যেন কাজে ব্যস্ত রইল। পা দেখেই সে বলে দিতে পারে আগন্তুক কে। দু'পায়ের পাতা ফাঁক ক'রে দাঁড়াবার ঢং দেখেই সে বুঝতে পারে শত্রু কিনা। ফাঁক-করা পায়ের পাতা

তার সম্মুখে দাঁড়ালে বোকা মুখ্যুর মত মুখ ক'রে ড্যাব ড্যাব চোখে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকদের দিকে, তারপরেই মাথা নামিয়ে নেয় মাটির দিকে—যেন দুনিয়ার কিছুই সে বোঝেনা। একজন চেঁচিয়ে বলল : 'হাঁস মুরগী যেগুলোর হিসেব টুকে নিয়েছিলাম, আর দুটো শুয়োর, সেগুলি কন্‌ট্রোল দামে এক্ষুনি দিয়ে দে।'

বোকার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লিংটান জিজ্ঞেস করে : 'শুয়োর? আমার তা কোন শুয়োর নেই।'

'আছে!' চেঁচিয়ে ওঠে ক্ষুদে শত্রু : 'আমার খাতায় টোকা রয়েছে দুটো শুয়োর আছে তোর।'

'সে-শুয়োরগুলো মরে গেছে।'

'তুই নিজে যদি মেরে খেয়ে থাকিস তো তোরও কপালে মৃত্যু আছে।'

'রোগে মারা গেছে। মরে গেলে ওগুলোকে নিয়ে আপনাদের কাছে যেতে সাহস হয় নি হুজুর। কি জানি, হয়তো বলবেন, আমিই মেরেছি।'

'দেখি, হাড়গুলো কোথায় ফেলেছিস।'

'কুকুর চিবিয়েছে কিছু কিছু, আর তারপর হাড় গুঁড়ো ক'রে জমিতে সার দিয়েছি আমরা।' লিংটান বলে।

তাঁত-ঘরটি ভাঙবার আগে লিংটান এগারটি শুয়োর ছানা সেই ঘরে রেখেছিল। এক জোড়া রেখে বাকীগুলো মেরে নুন দিয়ে ভাল ক'রে জারিয়ে জমিয়ে রেখেছে সাবধানী লিংটান। আর জোড়ার শুয়োর দুটোকে গাঁয়ের বাইরে ঝোপে বেঁধে রেখে এসেছে, যাতে ও দুটো একসঙ্গে থেকে আরও বাচ্চা দিতে পারে। শুয়োর জোড়াটি যদি ধরা পড়ে যায় তো কি আর করা যাবে।

লিংটানের উত্তর শুনে শত্রুরা ভীষণ চটে যায়। কিন্তু কীইবা করবে তারা? লিংটানকে যদি ধরে নিয়ে যায় তো জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে। সুতরাং বৃদ্ধ কৃষককে ভয় দেখিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি। মিথ্যা কথা যদি লিংটান বলে থাকে তার কপালে চরম দুঃখ আছে—শাসিয়ে গেল শত্রুরা। লিংটান চুপ চাপ দাঁড়িয়ে শোনে—যেন কিছুই বোঝেনি। লিংটানের ক্যাবলা চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে শত্রুরা চলে যায় আর মনে মনে বলে : 'এমন আহম্মক এই দেশের লোকগুলো! এ বলদগুলো তাদের বোঝা হ'য়ে দাঁড়াল দেখি!'

বাঁশের টোকার নীচে লিংটান তার মৃদু হাসি চাপে। একটু আনন্দও

অনুভব করে সে। তবুতো শত্রুদের একটু অসুবিধাও সে করতে পেরেছে। গ্রামের প্রায় সকলেই কিছুটা কিছুটা সামর্থ অনুযায়ী শত্রুদের সঙ্গে ছল চাতুরী করে। তবে লিংটানের মত পারদর্শী খুব কম লোকই আছে।

লিংটানের সেই কসাই আত্মীয়টি পারল না এত ক্ষতি সইতে। তার চালু ব্যবসা গেছে, দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের সে-বেদনা অহোরাত্র তার গলায় কাঁটার মত বিঁধে থাকে। বৌ চলে গেছে, ছেলে দুটো গেছে পাহাড়দেশে, একাকী সে খালি দোকান আগলে বসে থাকে। দুপুর পর্যন্ত একদিন দোকানের দরজা বন্ধ দেখে গ্রামবাসীরা লিংটানকে ডেকে এনে দোর খুলে দেখে মাংস ঝুলানোর আংটায় ফাঁস লাগিয়ে দোকানী ঝুলছে। মরবার আগে সমস্ত দোকান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেছে, তারপর পরিচ্ছন্ন নীল পোষাক পরে দোকানী গলায় দড়ি দিয়েছে।

ধীরে কসাই আত্মীয়ের শব দড়ি থেকে নামাতে নামাতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিংটান বলে: 'এর মৃত্যুর জন্যও ঐ শত্রু-ব্যাটারা দায়ী—।' পরের রাত্রিতে দোকানীর কবর দেওয়া হল। পাহাড় থেকে ছেলেরা এল খবর পেয়ে, কিন্তু স্ত্রী এল না ভয়ে।

বিদেশী বেঁটে সৈনিকদের দেখলে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে বলে: 'শয়তানগুলো!' এদের দেখতে দেখতে প্রায় চোখ-সওয়া হ'য়ে গেছে। দোরের ঘুলঘুলি দিয়ে জাগ্রত লিংসাও তকলী ঘুরোতে ঘুরোতে কিংবা কাজ করতে করতে নজর রাখত পথেপ্রান্তরের ওপরে। হঠাৎ কিছু দেখে যদি সন্দেহ জাগত ঐ শয়তানদের আসা সম্বন্ধে, ছুটে গিয়ে বলত নীলাকে লুকোতে। ছেলেকে নিয়ে মাটির উনুনের পিছনে দৌড়ে গিয়ে মই বেয়ে সে গিয়ে লুকোত মাটির নীচের ঘরে। লিংসাও তাড়াতাড়ি কাঠের দোর টেনে দিয়ে খড়কুটো মাটি ছড়িয়ে দিত তার উপরে। ঐ অন্ধকার হেঁসেলের পিছনে যে একরম কিছু একটা থাকতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। বেঁটে শয়তানরা দূরে চলে গেলে নীলা আবার বেরিয়ে এসে গৃহস্থালির কাজকর্ম করত, কিন্তু এক সময়ের জন্যও দোরের বাইরে যেত না, রাত্রি না হ'লে লিংসাও নাতিকে কোলে নিত না।

কিন্তু দুরন্ত শিশুর কলা কৌশলের কথা কতদিন আর চাপা থাকে! এখানে ওখানে শুনে পড়শী গৃহিণীরা আসে শিশুকে দেখতে। খুড়ীও আসে, সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুকে দেখে প্রশংসাও করে, কিন্তু কেন জানি মন খুলে প্রশংসা

করতে গিয়ে মনের কোনে খঁচ্‌খঁচ্‌ ক'রে কিসের জ্বালা অনুভব করে। খুড়ী যখন এল, নীলা তখন বসে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল তার দামাল ছেলেকে। নতুন মায়ের সেই ভরা-বুকের ওপরে, মায়ের সুস্মিত হাসির ও স্নেহ-আপ্লুত দৃষ্টির নীচে উলঙ্গ শিশুর নর্তন দেখল এসে খুড়ী। কেমন একটা অদ্ভুত পাক খেল তার পেটের মধ্যে। ভদ্রতার খাতিরে দু' একটা প্রশংসার কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল :

'এত সুন্দর মোটাকাটা ছেলে···কিন্তু কেন জানি বাপু ভয় হয় গো আমার। এসব ছেলে বাঁচে না বেশীদিন। আমার এক ছেলেও তো এরকম হয়েছিল—' দুঃখ মাখানো স্বরে বলতে থাকে খুড়ী।

লিংসাও সইতে পারেনা এই অমঙ্গলের কথা। ফেটে পড়ে : 'কি বলছ এই সব অমঙ্গলের কথা। তোমার ছেলে যখন হয় তখন তো আমি ছিলাম পাশে। এতটুকু ছোট্ট একটা ছেলে বিয়োলে তুমি, নীল, নড়েও না চড়েও না। ধোওয়া পাতলা ক'রে যে পরিষ্কার ক'রে নেব, সে-সাহস পর্যন্ত আমার হয় নি তখন। ঠাকুরপোর পা-জামা দিয়ে জড়িয়ে একপাশে রেখেছিলাম শিশুকে। তারপর তো তুমি নিজে পরিষ্কার করলে। সব কিছু একবারে ভুলে গেছ? তারপর, অত ছোট শিশু···বহুদিন পর্যন্ত তো বাপু আমার ভয়ে ভয়ে কেটেছে। কিছুই সইত না পেটে···বিড়ালের মত মিঁ মিঁ করত তো তিন বছর পর্যন্ত। দশ এগার বছর বয়সের পরে ওকে দেখে ভরসা হ'ল বাঁচবে বলে।'

খুড়ী এবারে রেগে বলে : 'হুঁ, আমার ছেলের কথা আমার থেকে তুই জানিস বেশী লিংগিন্নী! তুই কেন সব পোয়াতির আঁতুড়ে হাজির থাকিস, জানি না বুঝি? আমার আঁতুড়ে গিয়ে তো তুই আমার ছেলে বদলিয়ে রেখেছিলি, জানি না আমি?' তারপর হঠাৎ নীলার দিকে ফিরে বলে : 'আবাগী বেটি, তোর যদি বিয়ে হতো আমার ছেলের সঙ্গে, তবে তো এই নাতি আসত আমার ঘরে। কানা কালা ভগবান কি আমাদের প্রার্থনা শুনেছে কোন দিন?···কত সওয়া যায়! কত শাস্তি পাব! আবাগী বেটি, তুই যদি বিয়ে করতিস আমার ছেলেকে, আজ কি আমি ছেলেকে হারাতাম? আমার ঘরে আজ এই শিশু হাসত।'

তাড়াতাড়ি উঠে বুকের কাপড় টেনে দিয়ে নীলা বলে : 'আবাগী, আবাগী বলছ কেন আমাকে খুড়ী। পরম সুখে আমি আছি। তোমার ছেলে মারা গেছে, সেজন্য তো আমাদেরও কষ্ট হয়। তা, আমাদের গালমন্দ করবে কেন তুমি?'

গজ গজ করতে করতে অবশেষে খুড়ী গেল বেরিয়ে। একজনের নাতি এবং আর একজনের পুত্র এই নব শিশু···শাশুড়ী ও পুত্রবধূর মাঝে অদ্ভুত আকর্ষণের বন্ধন। লিংসাও ও নীলা ঠিক করে যে কোনোদিন ঐ বুড়ীর কোলে দেবেনা তাদের খোকাকে। ছুঁচলো-মুখো বুড়ীর কোলে শুয়ে শুয়ে যে তার ঐ বিষাক্ত দুর্গন্ধ প্রশ্বাস পড়বে নাতির মুখে দেহে, এ লিংসাও ঘটতে দেবে না কখনও।

খুড়ী নিজের গৃহে ফিরে তার মনের জ্বালার অগ্নি বর্ষণ সুরু করে পণ্ডিত স্বামীর ওপরে। বুড়ো হাবা মিনসে কেন নীলাকে নিয়ে আসেনি সেদিন তার পুত্রবধূ ক'রে? আজ তার গৃহে হাসত নাতি। ছেলে থাকত বেঁচে। ভবিষ্যতে আসত আরও কত নাতি, সমস্ত গৃহ আনন্দে মুখরিত হ'য়ে থাকত সব সময়। আজ যে শিশুর কাকলী-হীন নিরানন্দ গৃহে দম ফেলা যায় না। বুড়ো বুড়ীর মৃত্যুর পর শ্বশুরের ভিটেয় বাতি পর্যন্ত জ্বলবে না। স্ত্রীর এই হঠাৎ ক্রন্দন ও ক্রোধের অগ্নিবর্ষণে প্রথমে হক্-চকিয়ে যায় পণ্ডিত স্বামী। তারপর হঠাৎ দেওয়ালের গায়ে নিজের মাথা ঠুকতে ঠুকতে চিৎকার করতে থাকে। লিংটান তখন যাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে। পণ্ডিত ভাইয়ের মাথা-ঠোকা দেখে দৌড়ে এসে তাকে ধরে বসিয়ে শোনে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার কারণ। তারপর দিলখোলা হাসি হেসে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে বসে গাঁয়ের চা-খানায়। চালের চিতোই পিঠে মুখে তুলে দিয়ে চায়ে চমুক দিতে দিতে পণ্ডিতকে বুদ্ধি দেয় খর-বুদ্ধি কৃষক লিংটান যে ভবিষ্যতে বৌ যদি এভাবে কোন্দল করে তো তাকে ভয় দেখাবে এই বলে যে তুমি উপপত্নী গ্রহণ করবে। দরিদ্র পণ্ডিত আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে:

'কিন্তু তা তা কি আর হয়? মাসের পর মাস তো বাপু একেবারে—'

'সে কি? তোমার স্ত্রী তোমায়—'

ছুঁচলো দাড়ি নাড়তে নাড়তে বলে পণ্ডিত: 'কিছু চাই না আমি···শুধু শান্তি চাই একটু, আর কিছু না।'

'কিন্তু চাইলেই কি আর শান্তি পাওয়া যায়! ঘর-সংসারেই বল আর দেশেই বল, শান্তি আনতে হবে লড়াই ক'রে। প্রয়োজন হ'লে সময় সময় তাকত লাগাতে হয় এর জন্য; শুধু চাইলেই কি আর শান্তি আসে?···হুঁ; আর বুঝলে পণ্ডিত, এ শুধু আমাদের ঘর-সংসারের শান্তি নয়, দেশের শান্তিও তাতেই আসে।'

লিংটানের মন্তব্যে পণ্ডিত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। তারপর বলে :

'দেখ, লেখাপড়া শিখেছিলাম, পণ্ডিত বলে আমায় সকলে মান্যও করে বটে, কিন্তু মেয়েদের পাল্লা দেবার মত শক্ত মরদ হতে পারলাম কৈ? এ-দুনিয়ায় মেয়েরাই হ'ল সব থেকে কঠিন শক্ত চিজ্...সেইজন্যই ঋষি কনফুসিয়াস নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মেয়েদের যেন কোন আত্মসত্ত্বা না থাকে। বলতে কি লিংটান, আমাদের শত্রুরা যে মেয়েছেলে না হ'য়ে সব ব্যাটা ছেলে, আমার মনে হয়, তা একরকম ভালই হয়েছে। কারণ, বিজেত্রী নারীদের কাছে পুরুষদের সত্ত্বা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়।'

পণ্ডিতের কথা শুনে লিংটান হাসি চেপে রাখতে পারে না। হাসতে হাসতে বলে : 'যা বলেছ পণ্ডিত, একেবারে খাঁটি কথা। কিন্তু আমি হ'লে সেই মাগীকে মেরে ভূত ছাড়িয়ে দিতাম।'

'পারবে, সত্যিই পারবে? যদি পার ভাই—!'

'না-না,' হো হো ক'রে হাসতে হাসতে বলে লিংটান : 'তোমার স্ত্রীকে আমি মারতে যাব কেন? প্রত্যেক পুরুষের দুটি কর্তব্য আছে : যেমন সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে, আবার দরকার হ'লে স্ত্রীকে ধরে ঠেঙ্গাবে।'

লিংটান উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পণ্ডিত ভাইও। বিষাদজড়িত অবয়বে ধীর পদবিক্ষেপে সে চলে বাড়ীর পথে। তার দিকে তাকিয়ে দেখে লিংটান বোঝে যে এত কথা হাসি দিয়েও পণ্ডিতের মনের দুঃখ ঘুচাতে পারল না সে।

তারপর শরৎকাল গেল কেটে, ক্ষেতের শস্য কেটে লিংটান বছরের খাদ্য তুলল ঘরে। এক রাত্রে বাড়ীর দোরে টুক্ টুক্ শব্দ শুনে লিংটানের ঘুম গেল ভেঙ্গে। লাও-এরের কোন বিপদ হয় নি তো? এই বিশেষ ধরণের টুক টুক শব্দ তো শুধু তারই করার কথা, বাড়ী ছেড়ে যাবার পর আগে এই ব্যবস্থাই তো হয়েছিল। লিংসাওকে আর জাগায় না বৃদ্ধ। উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দোরের ঘুলঘুলি খুলে সাবধানী দৃষ্টি ফেলে দেখে কে। যদি অন্য কিছু চোখে পড়ে তো ঘুলঘুলি বন্ধ ক'রে সরে আসবে। ঘুলঘুলি খুলবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ শোনে লাও-এরের গলা : 'আমি বাবা!' দোর খুলতেই লাও-এরের সঙ্গে প্রবেশ করে আরও দু'জন যুবক। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে তাদের কথা শুনে লিংটান চেনে তার অন্য দুই ছেলেকেও। 'এ্যা, তোরা! মা বসুমতী মুখ তুলে তবে চাইলেন, দয়াময় ভগবান...!' বির বির করতে করতে বুড়ো

নিয়ে গেল তিন ছেলেকে গবাক্ষ-হীন রান্নাঘরে। প্রদীপ জ্বালিয়ে ছেলেদের দেখল ভাল ক'রে, ছোট ছেলের দিকে তাকিয়েই বুঝল যে যে-গুজব সে শুনেছে তা মিথ্যা, ডাকাত-দলে ও-ছেলে যোগ দেয় নি। এদের শক্ত সমর্থ দেহের দিকে তাকিয়ে যে-কোন বাপের হৃদয়ই আনন্দাপ্লুত হ'য়ে উঠবে। বড় ও ছোট ছেলের এত সুন্দর দৃঢ় গঠন তো আগে কোনদিন দেখেনি লিংটান। পাহাড়ে জঙ্গলে থাকার দরুণ রোদে-পোড়া রং হলেও ওদের চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভয়ের লেশ মাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই ছেলের সর্বঅবয়বে এটাই হলো সব থেকে বড় পরিবর্তন। শোকে, দুঃখে, কষ্টে যারা আগে ঘরে ব'সে থাকত ম্রিয়মাণ হ'য়ে, আপদে বিপদে মুখ তুলে যারা কথা কইতে পারত না, আজ তাদেরই চোখের দৃষ্টিতে ঠিকরে বের হচ্ছে আশার আলো। ছোট ছেলেকে বলল বুড়ো বাপ : 'তা হ'লে তোরা ভাল সাচ্চা পাহাড়ী দলের মধ্যে গিয়েছিলি ?'

'আমি মিশেছিলাম তাদের সঙ্গে যারা শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়ে।…মা কই বাবা, বড় খিদে পেয়েছে। কিছু খেয়েই আবার এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

'এক্ষুণি যাবি কি রে ?'

'অন্ধকার থাকতে থাকতে পাহাড়তলিতে ফিরে যেতে হবে।' উত্তর দেয় লাও-তা।

'এখানে যদি লুকিয়ে রাখি তোদের ?'

'তা হলেও আজই আবার ফিরতে হবে।'

এর থেকে বেশী কিছু বলতে চায় না ছেলেরা, বোঝে লিংটান।

নীচের গোপন-ঘরে ছেলেদের নিয়ে যায় বৃদ্ধ। সেখানে পিঠের বোঝা নামিয়ে রাখে তারা। হতভম্ব লিংটান তাকিয়ে দেখে প্রত্যেকে বারটা ক'রে বন্দুক বয়ে নিয়ে এসেছে। তার জীবনেও একসঙ্গে এত বন্দুক দেখে নি কোনদিন লিংটান। একটা বন্দুক তুলে নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভাল ক'রে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে : 'কোত্থেকে পেলি তোরা এই বন্দুক ?'

হাসতে হাসতে জবাব দেয় ছোট ছেলে : 'শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি।'

ছেলেদের খিদে পাওয়ার কথা হঠাৎ মনে পড়ায় লিংটান বন্দুক নামিয়ে রেখে লিংসাওকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে আনে। লাও-এর গিয়ে নীলাকে ডেকে

তোলে। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে তারা এসে জমা হয় গোপন-ঘরে। লিংসাওর তৈরি সেমুই খেতে খেতে ফিসফিসিয়ে কথা বলে তারা। লিংসাওকে লিংটান সাবধান ক'রে দিয়েছে যাতে কোনরকম পুরোনো শোক দুঃখের স্মৃতি-কথার অবতারণা সে না করে। ক্ষীণ আলোয় ভাল ক'রে দেখতে পারে না ছেলেদের মা। তবুও তো সে মা—বড়ছেলের গাঁয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে:

'আর কি বিয়ে করবি না রে, নাতির মুখ দেখবো না আমি?'

ক্ষীণ হাসি উদ্ভাসিত হয় লাও-তার ওষ্ঠে। মাথা নেড়ে সে বলে:

'ও-সব কথা ভাববার কি আর সময় আছে এখন মা?'

'ভাবতে হয়। নাতি যদি না আসে তো ভবিষ্যতে তোদের কাজ কে চালিয়ে যাবে?'

'হুঁ, ভেবে দেখব'খন পরে,' উত্তর দেয় লাও-তা।

'লাও-সানেরও তো একটা বিয়ে দিতে হয়।'

স্ত্রীর কথায় হেসে ওঠে লিংটান: 'তোমার চাওয়ার আর শেষ নাই বাপু!'

মৃদু চাপা-হাসির রোলের মধ্যে দু' ভাই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পাহাড়তলির উদ্দেশ্যে। নিরানন্দ গৃহে প্রাণের স্পন্দন জাগে। দোরের অর্গল ভাল ক'রে দিতে দিতে বহুদিন পরে বৃদ্ধ কৃষক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

সপ্তাহ গেল, মাসের পর মাস গেল, মেয়ে জামাইর কোন খবরই পায় না লিং-দম্পতি। একদিন দুপুরের খাওয়ার পর হঠাৎ দোরের কাছে কাদের আসার শব্দ শুনল লিংসাও। দোরের কাছে এরকম শব্দ শুনলেই শিশু পুত্রসহ লাও-এর ও নীলা লুকোতো গিয়ে গোপন-ঘরে। বড় মেয়ের গলা কানে যেতেই হর্ষচিত্তে লিংসাও বলে লাও-এরকে:

'দাঁড়া রে দাঁড়া, আর লুকোতে হবে না। তোর দিদি এসেছে রে!' অর্গল খোলার জন্য বৃদ্ধা এগিয়ে যায়। লাও-এর ছুটে এসে মাকে বলে:

'আমরা যে এখানে আছি এ-সম্বন্ধে দিদিকে কিছু বলবে না।'

তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে বাচ্চাকে তুলে নিয়ে নীলাকে বলে তক্ষুণি গোপন-ঘরে পালাতে। এমন তাড়াহুড়ো করে লাও-এর, যেন শত্রু এসে পড়েছে বাড়ীর কাছে। আশ্চর্য হ'য়ে দেখতে দেখতে মৃদুকণ্ঠে বলে লিংসাও স্বামীকে: 'কি ব্যাপার গো, বোন আসছে ব'লে ভাই লুকোবে?'

'হুঁ, কি যে দিনকাল পড়লো—'

'তোমরা বাড়ীর সব ঘুমোলে নাকি? ও মা, ও বাবা—' দোরের বাইরে মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে লিংটান দোর খুলে দেখে ছেলে মেয়ে সহ মেয়ে জামাই বসে আছে রিক্সায়। নাদুস নাদুস নাতি নাত্নীর গায়ে লাল রেশমী জামা। উলীন যেন আরও মোটা হয়েছে, তার নরম তেলা দেহ আরও তুলতুলে হয়েছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে লিংটান দেখে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটিও মোটা হয়েছে। এরকম হৃষ্টপুষ্ট লোকদের বহুদিন দেখেনি লিংটান। মাসের পর মাস, শত্রু আগমনের সুরু থেকে আজ পর্যন্ত, তারা শুধু দেখে এসেছে ছিন্নমূল লোকজনদের···ভীত অনশনক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ, আহত, ছুটে চলেছে প্রাণভয়ে কোন্ অজানা প্রান্তে। তার অভ্যস্ত দৃষ্টিকে স্থূলাঙ্গ জামাই মেয়ে নাড়া দিলেও সে আশ্চর্য হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য হ'য়ে গম্ভীর হ'য়ে গেল কৃষক লিংটান জামাই মেয়ের পিছনে দু'ইজন সঙ্গীনধারী শত্রুসৈন্যকে দেখে। ঐ দুই শয়তানকে কোনোমতেই সে তার গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেবে না। উন্মুক্ত দরজা আবার আধা-বন্ধ ক'রে শুধু মুখটি বের ক'রে হিমশীতল কণ্ঠে লিংটান বলে মেয়ে জামাইকে :

'নাতি নাত্নীদের নিয়ে তোমরা আসতে পার আমার বাড়ীতে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গীদের আসতে দিতে পারি না।'

দেহাভ্যন্তর থেকে হাসি গলগলিয়ে বের ক'রে দিয়ে স্থূলাঙ্গ উলীন বলে : 'না না, অত ভাবছেন কেন, অত ভয় পাচ্ছেন কেন, এঁরা হলেন, হে, হে—, অতি সজ্জন ব্যক্তি, এঁরা এসেছেন আমাকে রক্ষা করতে।'

'রক্ষা করতে? তোমাকে রক্ষা করতে আমার বাড়ীতে?' প্রশ্ন করে বিস্ময়াবিষ্ট লিংটান। ঐ সঙ্গীনধারী ক্ষুদে শয়তানদের দেখে লিংটানের যে ভয় হয়নি তা নয়, কিন্তু ভয়ের ভাব মুখে ফুটতে দেয় না।

উলীন বলে : 'কিন্তু দোরের বাইরে এঁদের রেখে যাওয়া তো ভদ্রতায় বাধবে।'

'ভদ্রতা! প্রহরী-দারোয়ানের সঙ্গে ভদ্রতা! একথা কে কবে কোথায় শুনেছে?' উচ্চ কণ্ঠে বলে লিংটান। শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে, কোনোমতেই ঐ ব্যাটাদের প্রবেশ করতে দেবে না তার প্রাঙ্গণে। উলীন বুঝল যে বুড়ো শ্বশুরকে নোয়ান যাবে না। তাই প্রহরীদের দিকে ঘুরে হাসতে হাসতে বলে : 'বুঝলেন না, বুড়ো মানুষ তো, ভয় পেয়েছে, কিছু মনে করবেন না, হে হে—'

'ভয় আমি পাইনি উলীন। তবে ওদের আমার বাড়ীতে ঢুকতে দেব না।' জোর দিয়ে বলে লিংটান।

ছেলে মেয়ে সহ মেয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে। লিংটান তার আঙ্গিনা থেকে একটা বেঞ্চ ও দুটো টুল বের ক'রে বেঞ্চটা দেয় দোরের বাইরে প্রহরীদের বসতে আর দোরের মুখে দুটো টুল পেতে একটায় নিজে বসে আর একটায় বসতে দেয় উলীনকে। শরৎকালের বিকেলে এভাবে বসতে অসুবিধা হয় না কারও, আর এতে ক'রে মুখ রক্ষাও তো হ'ল।

উলীনকে যত দেখে কিষাণ লিংটান, ততই যেন অপছন্দ হয় তার। কেমন একটা আপদের সঙ্কেত রয়েছে জামাইর সর্বঅবয়বে। হুকোয় গুড়ুক গুড়ুক টান্ দিতে দিতে মোটা তুলতুলে জামাইর দিকে তাকিয়ে বুড়ো সোজা প্রশ্ন করে:

'বড় মোটা হ'য়ে পড়েছ—'

'তা একটু হয়েছি—, ব্যবসাও মোটামুটি ভালই চলেছে।' বিনয়ী কণ্ঠে উত্তর দেয় উলীন।

'শুনছিতো, যা দিনকাল পড়েছে, তাতে কারও ব্যবসা ভাল চলছে না এখন। তা, তোমারটা এত ভাল চলছে কি ক'রে?'

শ্বশুরের প্রশ্নে ঘামে নেয়ে ওঠে উলীন। রেশমী রুমাল বের ক'রে মুখের হাতের ঘাম মুছে ফেলতে ফেলতে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আড চোখে সঙ্গীনধারীদের দিকে একবার তাকিয়ে নিম্ন কণ্ঠে বলে: 'এটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমি যা করি তা ভালর জন্যই করি।'

অত চাপা কণ্ঠে কেন কথা বলবে লিংটান? সুউচ্চ কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে: 'তুমি কি কর না-কর, তার খবর আমি রাখি না।'

মুখের ঘাম রুমাল দিয়ে আর একবার মুছে নিয়ে, খক খক ক'রে অহেতুক কেশে হাসতে হাসতে বলে উলীন: 'দিনগতিক বুঝে চলাই তো বুদ্ধিমানের কাজ···আর শহরেও শুনছি শিগ্‌গিরই গভর্ণমেণ্ট বসবে···ঐ বিদেশী সরকার নয়, আমাদের দেশের লোক দিয়েই ঐ সরকার গঠিত হবে—এই আমাদের মতন লোকরা থাকবে সেই শাসন-পরিষদে···যারা ভাবছে যে, চাই আর না-চাই, সাময়িকভাবে যখন মাথা নোয়াতে হচ্ছেই, তখন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ওদের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে থাকাই ভাল—'

'অতশত বুদ্ধির ব্যাপার কি আর বুঝি বাপু আমরা, আমরা হলাম গেঁয়ো চাষা। কান দিয়ে কোন কথা ঢুকলে মগজে সামান্য একটু নাড়া দেয় মাত্র!' হুকোয় টান দিতে দিতে উলীনের পানে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে মন্তব্য করে বৃদ্ধ কৃষক। উলীনও নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বুড়োকে, বোঝে যে বুড়ো

ঠিক ক'রে নিয়েছে যে কোন কথাই সোজা ভাবে সে বুঝবে না। সুতরাং আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিছুক্ষণ চুপ থেকে লিংটান জিজ্ঞেস করে উলীনকে :

'শুনলাম, নিজের বাড়ীতে বলে থাক না আজকাল। শহরের কোন্ অঞ্চলে এখন বাসা নিয়েছ?'

'উত্তরদ্বারী রাস্তার দশ নম্বর বাড়ীতে।'

'ও-রাস্তায় তো সব বড়লোকদের বড়বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ী। ও-পাড়ায় তুমি কি ক'রে গেলে?'

'আমার বাসস্থান ওখানেই ঠিক হয়েছে।' উত্তর দেয় উলীন।

'ঠিক হয়েছে, মানে? তা, তোমার দোকান?'

'দোকান খোলা থাকে। দু'জন লোক রেখেছি দোকান দেখবার জন্য।'

'কর্মচারী দোকান দেখে? দোকানে আজকাল কি কি বিক্রি হয়?'

'কাপড় এবং সব রকমের বিদেশী পণ্য।'

'তুমি কি কর?'

'আমার তো সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। নতুন গভর্ণমেণ্ট।' শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় উলীন।

'মাইনে পাও?'

'হ্যাঁ, ভাল মাইনেই পাই।'

'তাহলে তো তুমি সুখেই আছ!' একটু তিক্ততার রেশ ফুটে ওঠে লিংটানের স্বরে। উত্তর দেয় না উলীন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে উলীন আবার সুরু করে :

'আমি এসেছি আপনাদের সাহায্য করতে। যা দিন কাল পড়েছে তাতে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাহায্য যারা পরস্পর পেয়েছে তারাই কোনমতে বেঁচে আছে। তা, আমি তো আছি, নিজেদের লোকজনের সুযোগ সুবিধা তো আমাকে সর্বাগ্রে দেখতে হবে। আপনি যদি আমার কথানুযায়ী—'

লিংটানের মনে দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগে উলীনের তেলা তুলতুলে গালে কষে চপেটাঘাত ক'রে তার কথা ওখানেই বন্ধ ক'রে দিতে। কিন্তু মনের ক্রোধ চেপে রাখতে হয়, ছেলেমানুষী করা চলে না। গোবেচারা গেঁয়ো চাষীর ফ্যাল ফ্যাল চাউনি মেলে জিজ্ঞেস করে জামাইকে :

'হুঁ,...পরস্পরের সাহায্য'...তা কি করতে হবে আমাদের?'

'বিশেষ কিছু না। আমিই সব ব্যবস্থা ক'রে নেব'খন—'

'ব্যবস্থাটা কি ? তুমি কি কর ?' লিংটান প্রশ্ন করে।

'দেশজাত পণ্য নিয়ন্ত্রকের পদে আমি আছি। নানাধরণের জিনিসের সংগ্রহ এবং তার রপ্তানী ও বিক্রির ব্যবস্থার কাজ আমাকে দেখতে হয়—এই যেমন চাল, গম, আফিং, মাছ—'

'আফিং !' বিস্ময়াবিষ্ট লিংটান চিৎকার ক'রে ওঠে।

শ্বশুরের চিৎকারে উলীন লাল হ'য়ে ওঠে। আফিং-এর কথা সে বলতে চায়নি, হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্যের মধ্যে আফিং নিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে হয়। উত্তরাঞ্চল থেকে সংগৃহীত পণ্যের মধ্যে এটাই হলো একমাত্র পণ্য যা পুব-সাগর-পারের বিদেশীদের হাতে দেওয়া নিষেধ। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে এই দেশের লোকরা যাতে আফিং ব্যবহার করতে শেখে তার ব্যাপক প্রচার ও বিলি ব্যবস্থা করেছে বিজেতারা। পূর্ব-কালে আফিংয়ের নেশা সমগ্র জাতিকে কি ভাবে পঙ্গু ক'রে দিয়েছিল তা কারও অজানা নয়। কত কষ্টে এবং কি বিরাট চেষ্টার ফলে সেই আফিংয়ের প্রচলন বন্ধ করা হয়েছিল। আজ আবার শত্রুরা সেই আফিং ছড়াতে সুরু করেছে, এবং এরই মধ্যে অনেকেই এই শয়তানী নেশায় ডুবতে সুরু করেছে।

শ্বশুরের প্রশ্নে হকচকিয়ে উঠে উলীন কাশতে কাশতে নিম্নকণ্ঠে আমতা আমতা ক'রে বলে : 'আমার ইচ্ছায় আমি তো কিছু করতে পারি না। ওদের হুকুমে আমাকে চলতে হয়।'

ওয়াক থু ক'রে দুবার থুথু ফেলে ঘৃণার সঙ্গে বলে ওঠে বুড়ো : 'পে'ই !' বৃদ্ধ কৃষকের দুচোখ দিয়ে ঘৃণার অগ্নিশিখা ফেটে বের হয়। জামাই উলীন আরও লাল হ'য়ে ওঠে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাশতে কাশতে বারে বারে কামনা করে শ্বশুর যদি ঐ অগ্নিবর্ষি চোখের দৃষ্টি তার উপর থেকে সরিয়ে নিত ! কিন্তু লিংটানের সেই চোখের ঘৃণার অগ্নিবর্ষণ একইভাবে বিঁধতে থাকে উলীনকে।

…অন্দর গৃহে লিংসাও জিজ্ঞেস করে মেয়েকে :

'এত মাংস চাল গম তোরা পাস কি ক'রে ?'

সরল মেয়ে জবাব দেয় : 'কেন, চাল তো প্রচুর আছে, মাছ ডিম মাংস সবই তো আমরা প্রচুর পাই।'

'শয়তান শত্রুবেটাদের জন্য এখন গাঁয়ে-ঘরে কোথাও তো কিছু থাকার উপায় নেই, তাই জিজ্ঞেস করছি। চোখের উপরেই তো দেখি ঐ

হারামজাদারা যখন গ্রামে ঢোকে যা কিছু পায় সব কিছু লুটেপুটে নিয়ে যায়, কারও ঘরে একটা কিছু রাখবার উপায় নেই। হাঁস, মুরগী, শুয়োর, গরু—সব কিছু নিয়ে যায় শয়তানরা। বুড়ো রোগা ব'লে আমাদের মোষটাকে নেয়নি এখনও। কিন্তু আসতে যেতে ব্যাটারা ওটাকেও নজর দিয়ে দেখে।'

'এ যদি জানতাম তো আসবার সময় কিছু মাংস নিয়ে আসতাম তোমাদের জন্য মা। এর পরে আসবার সময় নিয়ে আসব।'

মেয়ের একথায় ধন্যবাদ জানান দূরে থাক, তিক্ত কণ্ঠেই বলে ফেলে লিংসাও : 'থাক, থাক, চারদিকে যখন সবাই খাওয়া না পেয়ে রোগা হ'য়ে যাচ্ছে, তখন আমাদেরই আত্মীয় স্বজনের কাউকে মোটা হ'তে দেখলে কেমন যেন ভাল লাগে না বাপু। আর দুর্ভিক্ষ অনশনে মোটা হয় কারা ?'

'কিন্তু আমি যা পাই তাই দিয়েই তো খাবার ব্যবস্থা করি।'

'কিন্তু কে দেয় এইসব ?' জিজ্ঞেস করে লিংসাও।

'কেন তোমার জামাই !'

লিংসাও বুঝবার চেষ্টা করে মেয়ে কি সেই সরল মেয়েই আছে, না, অন্য কিছু। প্রশ্ন করে মেয়েকে : 'এতসব জোগাড় করে কি ক'রে উলীন ?'

কেঁদে ফেলে মেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে বলে : 'তোমার জামাই মা সত্যিই ভাল মানুষ। শত্রুদের কাছে মাথা নোয়ালেও তিনি তাদের ঘৃণা করেন। মিথ্যা দুষছো কেন তাঁকে মা। আমারও মনে হয় এছাড়া ওঁর কোনো উপায়ও ছিল না। তোমার জামাই বলেন যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ উপায়ে শত্রুদের বিরোধিতা করা উচিত। ওঁর কাছে শুনেছি যে নানা ভাবে নানাকায়দায় উনি শত্রুদের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি ক'রে থাকেন। উনি বলেন,—যে-ব্যবস্থা এসে গেছে তার বিরোধিতা ক'রে লাভ কি ? শত্রুরা শাসন করছে, তার মধ্যে যে-কোন ভাবে হোক্ বেঁচে থাকতে হবে।'

'কিন্তু সেই শত্রু-শাসনে মোটা হতে হতে বাঁচা যায় না—'

হঠাৎ রাগে ব'লে ফেলে মেয়ে : 'শত্রুদের থেকে আমাদের মোটা হওয়াই ভাল। আমরা না খেয়ে পেটে কাপড় বেঁধে পড়ে থোকলে শত্রুদের কি ক্ষতি হবে শুনি ?'

'সেই জন্যেই তোরা ঐ শয়তান ব্যাটাদের উচ্ছিষ্ট খাবি !' তিক্ত কণ্ঠে বলে লিংসাও।

হৃষ্টপুষ্ট নাতিদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দিদিমা, কিন্তু কেন জানি

সে-হর্ষ-আনন্দ উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে না বৃদ্ধার মনে। বাচ্চাদের কাছে পেলে যে-বৃদ্ধা একবার নেড়েচেড়ে না দেখলে তুষ্টি পেত না, সে বসে থাকে নির্বিকার চিত্তে, মনে বাসনাও জাগে না তারই মেয়ের ছেলে-মেয়েকে কাছে টেনে নিতে, তাদের কোমল শিশুদেহের আঘ্রাণ নিতে। কেন যেন মনে হয় এরা তার আপনার নয়, শয়তান শত্রুদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে খেয়ে এরা মোটা হ'য়ে উঠেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়ে দেখে নাতি নাত্নীদের ওপর তার দৃষ্টি। কিন্তু মায়ের মনের চিন্তার কোনো খেই কি সে বুঝতে পারে? গর্বমিশ্রিত কণ্ঠে সে বলে: 'বেশ বড়সড় হয়েছে, না মা?'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে।' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়ে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বলে:

'দেশ স্বাধীন হ'লে ওরা যখন বড় হ'য়ে শুনবে বিশ্বাসঘাতকদের নামের মধ্যে ওদের বাপের নাম, তখন ওদের মনের অবস্থা কি হবে?'

মায়ের কথা শুনে মেয়ে আবার কাঁদতে থাকে: 'কেন যে তোমাদের এখানে এলাম মা, এখন দেখছি না এলেই ভাল ছিল। কত অসুবিধার মধ্যে এসেছি···আর এসেছিলাম তোমরা কি অবস্থায় আছ দেখতে, কোনরকম সাহায্য আমরা করতে পারি কিনা বুঝতে। আমাদের সম্বন্ধে তোমরা এখন যাই ভাব না কেন, আমাদের কাছে তোমরা আগের মতই আছ মা। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা তোমাদের সাহায্যে আসব, এমনকি হয়তো প্রাণেও বাঁচাব।'

লিংসাও উঠে দাঁড়ায়। 'দাদুর বাড়ী এসে শুধু মুখে বাচ্চারা বসে আছে। কি যে দেব, কিছুই নেই ঘরে, কোনমতে দিন গুজরিয়ে চলেছি আমরা দুই বুড়োবুড়ী।'

মেয়ে বোঝে মা আর কথা বাড়াতে রাজী নয়।

'এত কষ্টে তোমরা থাকছ কেন, আমরা তো আছি মা! আমাদের ওখানে—'

'না, না, আমরা এখানেই থাকব।' জোরের সঙ্গে গর্বোদ্ধত কণ্ঠে বলে লিংসাও। লিংটান দেখল দোর খুলে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এল মেয়ে। দু'একটা অতি সাধারণ কথা বলল শুধু লিংসাও। পিতৃগৃহে আবার আসবার জন্য একটিবার আহ্বানও জানাল না তারা। দোরের বাইরে বুড়োবুড়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল মেয়ে জামাইয়ের প্রত্যাগমন। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে দোর বন্ধ ক'রে তারা ফিরে এল গৃহাভ্যন্তরে। গোপন-ঘরের

ফুটো দিয়ে ডাকতেই উঠে এল লাও-এর ও নীলা। ভগ্নীপতির মুখে শত্রুস্তুতির কথা শুনে লাও-এর গেল আরও ক্ষেপে। ঠিক করল, একদিন শহরে গিয়ে সে নিজের চোখে দেখে আসবে শহরের অবস্থা, দেখে আসবে, সত্যিই কি শহরের সকলেই শত্রু-শাসন নীরবে মাথা পেতে গ্রহণ করেছে।

নীলার তৈরি ভিক্ষুকের সাজ পরে, রং দিয়ে মুখে চোখের ওপরে দগদগে ক্ষত এঁকে, কানা ভিক্ষুক সেজে একদিন লাও-এর গেল শহরে। বড় সড়ক না মারিয়ে অলিগলি দিয়ে সে ঘুরে ঘুরে দেখল। দেখল শহরের অলিতে গলিতে আফিং-এর ছড়াছড়ি। বিধ্বস্ত বাড়ী ও অনশন ক্লিষ্ট মানুষদের বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করল না লাও-এর, কারণ, যে-কোনো লড়াইয়ের প্রথম সৃষ্টি হ'ল এরাই। কিন্তু দেখতে না চাইলেই কি না-দেখে থাকা যায়? সেদিনের সুন্দর মনোহর শহরের কাকলীপূর্ণ রাস্তাগুলো আজ দমবন্ধ নীরন্ধ্র নীরবতায় ডুবে আছে। অগণিত মানুষের যে জীবনস্রোত বয়ে যেত এই শহরের পথে ঘাটে, আজ তারা মৃত, নির্জীব। সুন্দর সুখনীড় গড়ে উঠেছিল যেসব অট্টালিকায়, আজ সেসব বিধ্বস্ত, অগ্নিশিখায় পুড়ে কালো হ'য়ে হা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দোকান পাট ব্যবসা সব বন্ধ, শুধু উলীনদের মত ব্যবসায়ীদের পোয়া-বারো। শহুরে জীবনের বিস্ফোটকের মত দুর্নীতির আখড়া গজিয়ে উঠেছে এখানে ওখানে···ছোট ছোট চিত্রিত চালাঘরের মধ্যে কোন কোনটায় প্রকাশ্যে বসেছে বারবনিতার দেহ বিক্রয়ের ব্যবসা, কিন্তু সব ঘরেই বসেছে আফিং বিক্রয়ের বিপণি। এই রকম একটা পর্ণকুটিরের পাশে এসে দাঁড়াল লাও-এর। তারই পাশ দিয়ে চলেছে খঞ্জযষ্টির উপর ভর দিয়ে পদহীন পাশুটে বর্ণের ক্ষীণাঙ্গ এক ব্যক্তি। লাও-এর বুঝল এস্থানের নিয়মিত আগন্তুকদের মধ্যে এই পদহীন ব্যক্তিটি একজন। একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল: 'এখানে কি ঐ মালটি পাওয়া যায় মশাই?'

মাথা ঝাঁকে লোকটি। লাও-এর আবার প্রশ্ন করে:

'শত্রুরা ঐ মাল বিক্রি করলেও কি আমাদের কেনা উচিত হবে?'

লোকটি তাকিয়ে থাকে লাও-এর দিকে। তারপর বলে: 'আমার মত বিকলাঙ্গ লোকের তাতে কি এসে যায়? শত্রুকে তাড়িয়ে দূর ক'রে দেবার সুদিন যদি আসে, তাতে আমার কি হবে? আমার যা হারিয়েছে, আমি কি আর তা ফিরে পাব? আমার স্ত্রী, ছেলে, দোকান—আমার যা কিছু ছিল

সব তো গেছে, এমনকি আমার পা পর্যন্ত গেছে, আজ আমি বিকলাঙ্গ। জেতার কথা আমি ভাবি না, জিতলে আমি কি পাব বল?'

গম্ভীর লাও-এর ভাবে, হ্যাঁ, এই ধরনের লোকগুলোই সত্যিই মনে প্রাণে দেহে পরাজিত। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাত্রে গৃহে ফিরে এল লাও-এর। শহরে সে যা দেখে এল, বাজারের বিভিন্ন দোকানীর কাছে যা শুনে এল, সব বলল বাড়ীর আর সকলকে। খাদ্য রপ্তানির ফলে খাদ্যের আকাশ-ছোঁয়া দাম, শহরের খাদ্যাভাব, অনশন···শত্রু-শাসকরা এসব মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনার প্রয়োজন বোধ করে না, কারণ, তারা তো সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিয়েছে চারিদিকে আফিং-এর বিস্মরণ-বিপণি! শহরের আনাচে কানাচে আফিং-এর সস্তা নেশায় সব কিছু ভুলে বুঁদ হ'য়ে থাকার ব্যাপক ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে তারা।

গম্ভীর হ'য়ে ভাবে লিংটান। জীবন-বিধ্বংসী এই নেশা মানুষকে আর মানুষ রাখে না। লিংটান দেখেছে তার নিজের মাকে···আফিংএর নেশার সেই ভয়াবহ রূপ দেখেছে নিজের মায়ের উপরে। শত্রুর উড়ো জাহাজের বোমা থেকে লুকিয়েও বাঁচা সম্ভব, যে বাড়ীঘর তারা পুড়িয়ে দিল, তাও আবার তৈরি করা যায়, কিন্তু সমগ্র জাতিকে যদি আফিং-এর নেশার বিস্মরণির অতলে ডুবিয়ে দেয় শয়তানরা, তা হ'লে কিসের আশা থাকল? এত বড় শত্রুতা, এত বড় সর্বনাশ ইতিপূর্বে এরা আর করে নি।

॥ বার ॥

শত্রুর উপর অতর্কিতে আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ চালানো—এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে এবং প্রথমটি চালানো অনেক কঠিন। সমস্ত শীতকাল ধরে গোঁয়ো লিংটান বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দিন কাটিয়েছে, শত্রু-সৈন্যের ধমকে শুধু হা ক'রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে শুধু বলেছে, 'শত্রু-সৈন্যের উপর চোরা আক্রমণের কথা সে কিছু জানেও না, শোনেও নি। কিন্তু ছোট বড় যে-কোন সুযোগের পূর্ণব্যবহারের প্ল্যান বুড়োর মাথায় কেবলি ঘুরেছে। রাত্তিরে রাত্তিরে ছেলেদের সঙ্গে অন্যান্য যুবকরা এসে গোপন-ঘরে

নানা ধরনের অস্ত্র সস্ত্র রেখে যেত। বসন্তের সুরুতে এখানে ওখানে শত্রু-সৈন্যের মৃতদেহ পড়তে সুরু করল। দোর বন্ধ আশী ফুট উঁচু প্রাচীর-ঘেরা শহরেও শত্রু-প্রহরীরা রাত্রে অতর্কিত গুলিতে মরতে লাগল। লিংটানের কনিষ্ঠ পুত্র লাও-সান তারই বয়সের ছেলেদের সাথে ঐ সুউচ্চ প্রাচীর টপকিয়ে এই অতর্কিত আক্রমণ চালাত। প্রাচীন প্রাচীর গাত্রের শিকড় ও লতা বেয়ে বেয়ে ইঁটের গর্তে, খাঁজে, কিংবা শিকড়ের বাঁধে পা ফেলে ফেলে তারা দেয়াল টপকে অতি সাবধানে আড়ালে অন্ধকারে থেকে সুযোগ বুঝে গুলি ছুঁড়ত শত্রু-প্রহরীর ওপর। তারপরেই লতা-পাতা, গাছের আড়ালে থেকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করত। যখন বুঝত ও-পক্ষ নীরব তখন আস্তে আস্তে নেমে ফিরে আসত গৃহে। তারপর রাত ফুরোবার আগেই ফিরে যেত পাহাড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণে শত্রু-শাসকরা রাগে ফুসতে লাগল।

গ্রামাঞ্চলে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহে সৈন্য গেলে প্রায়ই তারা আর ফিরত না। গাঁয়ের অভ্যন্তরে তারা হাজির হ'লে তাদের চারিদিকে এসে জড়ো হত গ্রামের কৃষাণ ও বৃদ্ধা কৃষাণীরা। তাদের ভয়মিশ্রিত ফ্যাল ফ্যালে দৃষ্টি দেখে সৈন্যদের কারও মনে কোন সন্দেহই জাগত না। তারপর সুযোগ বুঝে হঠাৎ বন্দুক, ছোরা বের ক'রে ঝাপিয়ে পড়ত ঐ শয়তানদের ওপরে, একটি সৈন্যও বাঁচত না এদের জিঘাংসা থেকে। ফলে শহরের শাসক অধিকর্তারা জানতে পারত না কোন্ গাঁয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল খাদ্য সংগ্রহক সৈন্যরা। শুধু তারা দেখত যে বহু দলই আর ফিরে আসে না। শত্রুদলের সংখ্যা ও সুযোগ বিচার ক'রে গ্রামবাসীরা চালাতো এই অতর্কিত আক্রমণ, এবং যদি শত্রুদের ঘায়েল করা সম্বন্ধে সামান্য সন্দেহ হ'ত তবে টু শব্দটি পর্যন্ত কেউ করত না। সন্দেহাতীত নিশ্চয়তা বুঝলে নেতার নির্দেশে অতর্কিত তড়িৎ আক্রমণে সমূলে খতম ক'রে দিত শত্রুদের।

লিংটানের গৃহের মাটির নীচের গোপন-ঘরে জমা হ'য়ে উঠছে হরেক রকম যুদ্ধাস্ত্র···প্রস্তুতকারী বিদেশের নাম লেখা নতুন চক্চকে ঝক্‌ঝকে অস্ত্রগুলোর সঙ্গে জমা হয়েছে বহু প্রাচীন নানা ধরনের হাতিয়ার যে গুলোকে দেখলে আশ্চর্য হ'য়ে ভাবতে হয় কবে কখন এবং কেন এগুলো তৈরি হয়েছিল। এইসব প্রাচীন অস্ত্রের অনেকগুলো জোগাড় হয়েছে পাহাড়ের লোকদের কাছ থেকে. যাদের কারও কারও পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন সামরিক প্রভুদের অধীনে পেশা ছিল ডাকাতি ও লুণ্ঠন। এইসব অস্ত্র থেকে লিংটান নিজের ব্যবহারের জন্য বেছে

নিল কাঠের হাতল ওয়ালা চারনলা অদ্ভুত ধরনের একটা প্রাচীন গাদা বন্দুক··· বন্দুকটির চারটি নল মানুষের হাতের আঙ্গুলের মত ক'রে তৈরি। নলগুলোর গোড়ার দিকে আগুন দেবার সুব্যবস্থা আছে। এত সরল অস্ত্রটি যে টোটা হিসেবে হাতের কাছের যে কোন কঠিন জিনিসের টুকরো ব্যবহার করা যায়··· লোহার টুকরো, ভাঙ্গা কব্জা, পেরেক কিংবা ঐ জাতীয় কঠিন কিছু নলের মধ্যে অল্প বারুদের ওপরে রেখে একটু তুলোর সাহায্যে একই সঙ্গে চার চার বার ছোড়া যায় এবং সে-আঘাতও হয় সাংঘাতিক।

লিংগ্রামে শত্রু-সৈন্যের উপরে আক্রমণ চালানোর নেতা নির্বাচিত হ'ল লিংটান। শত্রু এলে তারই নির্দেশে সকলকে চলতে হবে। স্থির-মস্তিস্ক লিংটানেরও গ্রামবাসীর শক্তি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ছিল, কল্পনার রং মিশিয়ে অনেক কিছু সে ভেবে নিত না। শীতকালে দু'বার এবং বসন্তকালে একবার শত্রু-সৈন্যের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিল লিংটান। এমন অতর্কিতে ও সুষ্ঠুভাবে সে তড়িৎ আক্রমণ হ'ল যে একটি শত্রুও বাঁচল না। এই গ্রামবাসীর জিঘাংসা-আক্রমণের টু শব্দটিও শাসন কর্তাদের কানে পৌঁছুতে পারল না. সৈন্যদল আর ফিরে গেল না। মাসের পর মাস এই আক্রমণের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিশেষ ক'রে দূরের পাহাড়তলি গ্রামগুলোর বৈরীভাব শত্রু-শাসকদের ক্ষেপিয়ে দিল। গ্রামাঞ্চলে যদি শাসন কায়েম না হয়, তবে বারে বারে সব জায়গায় সৈন্য পাঠিয়ে এই ভাবে খাদ্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা চলে কতদিন? অবশেষে গ্রীষ্ম কালের মাঝামাঝি বিরাট সৈন্য বাহিনী চল্‌ল গ্রামের পর গ্রামের উপর দিয়ে···যেখানেই পাহাড়ী লোকদের সামান্য চিহ্ন পেল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্‌ ক'রে দিল সেই সব গ্রাম। লিংটানের গোপন-ঘরে সেই সময়ে অনেকে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু শত্রু-সৈন্যরা কিছুই টের পেল না। লিংগ্রামের বোকা কৃষকদের উপর শত্রু-সৈন্যরা কিছু হম্বিতম্বি ক'রে চলে গেল।

পাহাড়তলির গ্রামগুলোয় শত্রু-সৈন্যের আগমনের খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে লুকালো। শত্রু-সৈন্যরা ধরে নিল নিশ্চয়ই এই সব গাঁয়ে পাহাড়ের ঐ বদমায়েসদের আনাগোনা আছে। সুতরাং পাহাড়তলির গ্রাম-গুলোয় তারা আগুন ধরিয়ে দিল। সেই আগুনে গাঁয়ের অনেক লোকও পুড়ে মরল। ছেলেদের মুখে পরে লিংটান শুনেছিল যে ঐ পোড়া কালো মাটি চাষ করতে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঐসব গ্রামের হতভাগ্য কৃষাণ কৃষাণীরা। হাজার অত্যাচার হলেও মাটি যে তাদের!

এত অত্যাচারে মেজাজ ঠিক থাকতে পারে না। তাদের মুখের দিলখোলা হাসি ঠাট্টা তামাশা ঝগড়া সব বন্ধ হ'য়ে গেছে শয়তানদের অত্যাচারে। তাদের গুমড়ো মুখে ফুটে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের অভাব অনটন, শত্রু-শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে-মধ্যে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে গোটাকয়েক শত্রু সৈন্যকে খতম করতে পারলেই এই তিক্ততা মুছে ফেলা যায় না। মনের কন্দরে যে ক্রোধ জমে থাকে তাতে সজাগ দৃষ্টি রেখে সব সময়ে সকলে খোজে গাঁয়ের সীমানার মধ্যে কোথায় কখন শত্রুরা আসে। এই অহর্নিশ ক্রোধের জ্বালায় মানুষগুলোর মধ্যেও পরিবর্তন এসে যায়। লিংটান'ও অনুভব করে তার নিজের মধ্যেও এই পরিবর্তন।

শত্রু-সৈন্যরা জ্বালানীর জন্য শুধু কাঠ সংগ্রহ করতে আসে। আর কিছুই তাদের পছন্দ হ'ত না। গাঁয়ের চারিদিকে বড ছোট গাছ কেটে কেটে তারা নিয়ে যেত। তারপরে নিতে সুরু করল বাড়ীর ঘড় থেকে বড়গা খুঁটি দরজা চৌকাট পর্যন্ত। জ্বালানীর পক্ষে এগুলো আরও ভাল। বসন্ত কালের এক সকালে লাও-এর ও নীলার সেই প্রিয় উইলো গাছটির ডাল কেটে মুণ্ডিত কাণ্ডটিকে শুধু রেখে গেল সৈন্যরা। ভারাক্রান্ত মনে লাও-এর এসে দেখল সেই বৃক্ষ কাণ্ডটি। গৃহে ফিরে এসে নীলাকে বলল : 'আমাদের সেই গাছটিকে কেটে নিয়ে গেছে শয়তানরা।'

দুঃখের নিশ্বাস ফেলে নীলা : 'সেই শান্তির দিন কবে আর আসবে যখন গাছের নীচে আবার আমরা দেখা করতে পারব ?'

গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে কাঠ সংগ্রহের জন্য একদল সৈন্য এল লিংগ্রামে। সংখ্যায় তারা আট নয় জন মাত্র। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়ো লিংটান লক্ষ্য করল যে ওদের পাঁচজনের হাতে মাত্র বন্দুক, বাকী কয়েকজনের হাতে কোন রকম অস্ত্র নেই। গাঁয়ের যোদ্ধারা যে যার ঘরের দোরে স্বাভাবিক নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে লিংটানের নির্দেশের। পেছনে হাতিয়ার এগিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকে বাড়ীর অন্যরা। ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে লিংটান সঙ্কেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে খতম ক'রে দিল সৈন্যদের। লিংটানের চারনলা বন্দুকের গুলিতে যে সৈনিকটি আহত হয়েছিল, কোনোমতে হামা দিয়ে সে লিংটানের বাড়ীর দক্ষিণের বাঁশ ঝাঁড়ে গিয়ে লুকোল। লিংটানের প্রখর দৃষ্টি এড়িয়ে সে লুকোতে পারল না। কুকুরের মত লিংটান গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। আহত সৈনিক পশুর মত

হাতে পায়ে ভর ক'রে কোন মতে উঠে করুণ ইশারায় বোঝাল লিংটানকে: 'আমাকে রক্ষা কর, তোমার কাছে আমার জীবন ভিক্ষা চাইছি। আমাকে বাঁচতে দাও! ঘরে আমার স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে, এই যে তাদের ছবি—' বুকপকেট থেকে ছবি বের করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। লিংটানের সমবয়সী হবে আহত সৈনিকটি। অত ভাববার সময় নেই লিংটানের। সাপ কিংবা শিয়াল মারবার সময় কে আর ভেবে দেখে? ক্ষিপ্রগতিতে আহত সৈনিকের কোমর থেকে ছোরা ছিনিয়ে নিয়ে সমূলে বসিয়ে দিল লোকটির পেটে। দুঃখ মিশ্রিত দৃষ্টি ফেলে লোকটি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। ইতিপূর্বে তিনটি শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছে লিংটান। সমবয়সী শত্রু-সৈনিকটিকে হত্যা করবার পর বৃদ্ধ লিংটান ভাবে: 'লোকটিকে মেরে ফেললাম বটে, কিন্তু সেই শয়তানী ক্রুর ভাব তো দেখছি না এর চোখে মুখে।' লোকটির শেষ কথা কয়টি মনে পড়ল লিংটানের। রক্তের ছাপে বুক পকেট বোধহয় এখনও ভিজে যায় নি। উপুর হ'য়ে মৃতের পকেট থেকে রেশমী কাপড়ে জড়ানো কাগজ বের ক'রে লিংটান দেখে আট থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের চারটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে একটি সুন্দরী শান্ত-শ্রী গৃহিনীর ফটো। হা ক'রে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। লিংটানের মনে হয়, আর তো কোনদিন এরা মিলতে পারবে না এই গৃহকর্তার সঙ্গে। লিংটানের মনে কি সত্যিই দুঃখ হয়েছে এই বিদেশী সৈনিকের মৃত্যুতে? মন হাতড়িয়ে খুঁজে আশ্চর্য হ'য়ে দেখে লিংটান, কই, এই হত্যার জন্য তার মনে কোন হর্ষ আনন্দ কিংবা অনুশোচনা তো জমে ওঠেনি! এই শত্রু-হত্যা প্রয়োজন বলেই সে করেছে এবং সুযোগ পেলেই আরও করবে। কি পরিবর্তনই না হয়েছে লিংটানের! যে লিংটান মুরগী জবাই করা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে পর্যন্ত দেখতে পারত না, আজ নিজের হাতে সে মানুষ হত্যা পর্যন্ত করছে। স্বামীর এই কোমল মনোভাব জানতো ব'লে ঘরের পিছনে গিয়ে লিংসাও মুরগী জবাই করত, তার সামনে করত না। আশ্চর্য হ'য়ে ভাবে লিংটান তার পরিবর্তনের কথা।

ঘরে ফিরবার পথে লিংটান গ্রামবাসীদের বলে যায় বাঁশবনে শত্রুসৈন্যের মৃতদেহের কথা। তাড়াতাড়ি ক'রে তারা ঐ লাসগুলো মাটির নীচে পুঁতে ফেলে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। বাড়ীতে এসে লিংটান রেশমী কাপড়ের থলেটা ঘরে রেখে দেয়। সত্যিই লিংটান বদলে গেছে। অন্যান্য রাত্রের মতই

সে ভাতের থালা নিয়ে বসে খাবে। মাটির নীচে যে শত্রু সৈন্যটিকে পুতে ফেলা হ'ল, যার ফিরে-আসার পথ চেয়ে বাড়ীতে আশায় অপেক্ষায় বসে থাকবে তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে—কি এসে যায় তাতে লিংটানের? এর আগেও অতর্কিত আক্রমণে শত্রু-সৈন্যদের হত্যা ক'রে মাটিতে পুতে ফেলে গ্রামবাসীরা হাসতে হাসতে আলোচনা করেছে, শয়তানদের এই লাসগুলো জমির পক্ষে ভাল সার হবে, না, জমির ক্ষতি করবে, ফসল কি আরও বেশী হবে, না, শয়তানদের কুকর্মের বিষে মাটিও বন্ধ্যা হবে। সত্যিই গ্রামের লোকদের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসে গেছে। গাঁয়ের মধ্যে এইভাবে মানুষ-হত্যা—একথা আগে কি কেউ কোনদিন ভেবেছে? ভূমিষ্ঠ কন্যা সন্তান মুমূর্ষু নীল হ'লে কেউ কেউ মনের কষ্ট সত্ত্বেও মেরে ফেলেছে। কিন্তু আজ শত্রুদের ছারপোকার মত টিপে টিপে হত্যা করে গ্রামবাসীরা, এবং এই ভাবে মানুষ-হত্যার জন্য মনে কোন-রকম অনুশোচনাও অনুভব করে না। নিজের মনে লিংটান ভাবে: 'শত্রুদের তাড়িয়ে দেবার পর আমরা কি আর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারব?' কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর কোথায়? বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে লিংটান, দেখে কোদাল হাতে লিংসাও শত্রুর লাস পুতে নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরে সংসারের কাজে মনোনিবেশ করল, এতটুকু দুঃশ্চিন্তার রেশ মাত্র নেই তার মধ্যে, রান্নাও করছে, আবার দৌড়ে গিয়ে ক্রন্দনরত নাতিকে কোলে তুলে দোলা দিতে দিতে ভুলাচ্ছে। নীলার কথা মনে পড়ে···লাও এরের মতই দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ় হাতে তাক ঠিক ক'রে সে বন্দুক চালায়, আবার পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকে ছেলেকে মাই খাওয়ায়। মায়ের বুকের দুধের সঙ্গে শিশু কি আর কিছু পান করে না? ঘৃণা? কিন্তু, সব থেকে বেশী পরিবর্তন হয়েছে তার নিজের ও তিন ছেলের। কারণ, মেয়েরা এমনিতেই বেশী শক্ত, কঠিন কাজ কিংবা হত্যা করার ব্যাপারে আরও পোক্ত। রক্ত দেখে তারা হকচকিয়ে যায় না, কারণ, প্রতিমাসেই তো তাদের রক্তস্রাব হয়, শিশুর জন্মের সময়ও তো তারা প্রচুর রক্ত বের ক'রে দেয়। কিন্তু পুরুষের কাছে রক্ত হ'ল জীবনের চিহ্ন, রক্তস্রাব হ'লে সে ভয় পায়, তার সর্বশরীর গুলিয়ে ওঠে, মৃত্যুর পদশব্দ আঁচ ক'রে সে কেঁপে ওঠে। সেই পুরুষ যখন অতি সহজে নির্ভাবনায় মারণযজ্ঞে নামে, তখন তার মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তা বড় সহজ নয়।

লাও-তাই তো তার কত বড় উদাহরণ। যে লাও-তা ছিল দরদ ও সরল-তার মূর্ত মানুষ, বাপ হওয়ার পরেও যার মুখে শিশুর মতন হাসি, প্রথম মানুষ

হত্যার পর তারই কি কম পরিবর্তন হয়েছে? পাহাড় থেকে সে প্রায়ই আসত এই গ্রামের গৃহে। লাও-তার সেই সরলতামাখান মুখে আর স্বাভাবিক হাসি নেই, দৈনন্দিন চাষের কাজের মতই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে সে শত্রু-হত্যা করে, এতটুকু কুণ্ঠাবোধ নেই। শত্রু-হত্যা করতে গিয়ে পারতপক্ষে গুলি নষ্ট করত না লাও-তা, সুবিধে থাকলে সোজাসুজি হৃৎপিণ্ডে বড় ছোড়া বসিয়ে খতম ক'রে দিত। এমনি ঘটল একদিন। খেতে বসেছে লাও-তা, হঠাৎ তার নজরে পড়ল জনৈক শত্রু-সৈনিক গাঁয়ের পথে চলতে চলতে ছোট্ট নোটখাতায় কি লিখতে লিখতে চলেছে। লাও-তা চুপি চুপি বেরিয়ে তার উপরে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিল তাকে শেষ ক'রে। পরমুহূর্তে ফিরে এসে বসল তার অসমাপ্ত খাবারের থালা নিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বৃদ্ধ লিংটান, আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করল: 'হাত পা না ধুয়েই খেতে বসলি!'

'কেন, হাতে তো কিছু ধরিনি। ও বেটাকে মেরে তো পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ঐ জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে এসেছি।' অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল লাও-তা, এতটুকুও অস্বাভাবিকতা নেই তার মধ্যে। প্রাণভর্তি ঘৃণা নিয়ে অতি সহজভাবে আহার শেষ ক'রে সে বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর মৃতদেহ মাটির নীচে পুতে রেখে এল। কিন্তু লিংটানের গলা দিয়ে যেন আর ভাত নামতে চায় না। শত্রুকে হত্যা করার জন্য সে ভাবে না, কিন্তু ছেলেদের এই পরিবর্তন তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। দেশে গাঁয়ে যখন এই উপদ্রব বন্ধ হ'য়ে শান্তি ফিরে আসবে, তখন কি ছেলেদের মধ্যেও এই জিঘাংসার পরিবর্তে মানুষের শান্ত বিনয়ী ভাব ফিরে আসবে?—চিন্তাকুল বৃদ্ধ লিংটান অনেক্ষণ ধ'রে ভাবে। কিন্তু রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে সে যখন দেখে শত্রু-হত্যার পর তার ছোট ছেলের উদ্দাম আনন্দের হৈ হুল্লোড়। লাও-সান এখন আর কিশোর নেই··· স্বপ্ন-নীরবতার দোর পেরিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে উদ্দাম যৌবনের কোঠায়। তার সেই শৈথিল্যমাখা কৈশোর-সৌন্দর্য এখন ভীতিপ্রদ খরস্রোতা ও ধারাল। অন্যান্যদের থেকে সে লম্বা। জ্বলজ্বলে চোখের ওপরের ভ্রূদুটো দীর্ঘটানা, চোখের দৃষ্টি দৃঢ়তা ব্যঞ্জক···তার দিকে তাকালে, ছেলে হোক আর মেয়েই হোক,—যেই তাকাক, চট ক'রে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না, কি যেন জাদু আছে ওর চেহারায়। দীঘল নাকের নীচের ওষ্ঠদুটিতে শিশুর সরলতা মাখানো রয়েছে। কোন মেয়ের সংস্পর্শে সে তখনও ঠিক আসে নি। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত অনেক মেয়ে, মনে মনে চাইত ওকে বরণ ক'রে নিতে। কিন্তু

জীবনপ্রভাতের সূত্রপাতে শত্রু-সৈন্যদের কামনা-চরিতার্থতার যে আঘাত ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সে পেয়েছিল বালক বয়সে, তাতে ওর মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসে গেছে। যে ভালবাসার মহাসাগরে ও অবগাহন স্নান করাতে পারত তার প্রিয়াকে, আজ তাই ভিন্ন পথে গড়িয়ে গিয়ে তাকে পরিণত করেছে এক অমর্ষী যুবকে ; আর কিছু না, শুধু হত্যা আজ তাকে পরমানন্দ দেয়, নিজ হাতে খুন ক'রে সে স্ফূর্তি পায়।

নিজের আদুরে কনিষ্ঠ পুত্রের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে লিংটান। যে যুদ্ধপ্রিয় লোকদের সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে, তাদেরই একজন কিনা আজ হ'তে চলেছে তারই এক ছেলে! যুদ্ধ সংক্রান্ত সব কিছুতেই লাও-সানের পরমানন্দ —একথা গাঁয়ের সব লোক জানে এবং জানে পাহাড়ের লোকেরাও। এদেরই এক বাহিনীর দলপতি হ'ল সে। বয়সে কম হলেও সে ছিল দুর্দান্ত সাহসী। এমন সুন্দর প্ল্যান ক'রে গোপন অতর্কিত আক্রমণে সে শত্রুদের ঘায়েল ক'রে দিত যে আক্রমণের কায়দা দেখেই শত্রুরা বুঝে নিত কার নেতৃত্বে এই আক্রমণ চলেছে, যদিও সেই আক্রমণের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে তারা বড় কেউই ফিরতে পারত না। সুতরাং লাও-সানকে শত্রুরা না চিনলেও, ওর সম্বন্ধে নানা কথা ওদের কানে গেছে।

লাও-সান বাড়ীতে খুব কমই আসত। এবং যখনই আসত, বেশ জমিয়ে গল্প করত শত্রু-হত্যা কাহিনীর, কোথায় শত্রুদের ঘায়েল করেছে তারই রসাল বিবরণ দিত পরমানন্দে। এই গল্প বলার ভেতর দিয়েই ফুটে উঠত তার আত্মম্ভরিতা, এবং তার মনে কেমন এক অদ্ভুত বিশ্বাসই জমতে সুরু করেছিল যে ভগবানের আশীর্বাদ তার উপর বর্ষিত হয় বলেই সে এইসব কাজ অতি সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। ক্রমে গর্বমিশ্রিত কণ্ঠে সে বলতেই সুরু করল: 'ভগবানই আমাকে এই কাজটি করাচ্ছেন,' কিংবা, 'ভগবানই আমাকে এই পথে চালিত করছেন,' 'আমার হাতে ভগবানই শক্তি দিয়েছেন।' ছেলের এই আত্মম্ভরিতা শুনতে শুনতে হঠাৎ একদিন লিংটান ক্ষেপে বলে উঠল: 'দেখ, কথায় কথায় ভগবান ভগবান করিস না। ভগবান বুঝি আমাদের পরস্পরকে খুন করার জন্য বলেছেন! আমাদের সৃষ্টি যিনি করেন, তিনি বুঝি আমাদের পরস্পরের ওপরে লেলিয়ে দিয়ে বলেন যে, যা তোরা খুনোখুনি ক'রে মর! যত সব অর্বাচীনের মত কথা! খুনোখুনি যদি করবি তো কর, কিন্তু কথায় কথায় ভগবান ভগবান করিস না।' বাপের রাশভারী কণ্ঠেই বলে লিংটান, কিন্তু

আশ্চর্য হ'য়ে দেখে যে ছেলের মুখে-চোখে অবিনয়ীভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উপেক্ষার ভঙ্গীতে অসহিষ্ণু লাও-সান বলে ওঠে : 'ও-সব ঋষি বাক্য ফাক্য ফেলে রাখ বাবা। অতসব নীতিকথা মানতে মানতেই তো এই পঙ্গু অবস্থায় এসে হাজির হয়েছি আমরা। ঐসব সংহিতার আঘাতেই না আজ মহানিদ্রায় শায়িত আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমরাও ঘুমিয়ে আছি। হুঁ, নীতিবাক্য!… আমরা যখন নীতিবাক্য আওড়িয়ে আওড়িয়ে ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকছি, তখন অন্যরা মারণাস্ত্র তৈরি ক'রে আমাদের উপর হামলা করছে। ওসব প্রাচীন নীতিকথা টথা থাক, এযুগে আমরা ওর থেকে অনেক বেশী জানি!'

ছেলেরে বক্রোক্তি ও বিদ্রূপ সহ্য করতে পারে না রাশভারী লিংটান। ঠাস ক'রে ওর গালে এক থাপর বসিয়ে দিয়ে রাগে চেঁচিয়ে ওঠে : 'বাপের সঙ্গে কথা বলতে শিখিস নি! মুনি ঋষির নীতিকথা, শাস্ত্র নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ! হারামজাদা ছেলে, এত বড় স্পর্ধা তোর! হাজার হাজার বছর ধ'রে যাকে ভিত্তি ক'রে সব থেকে প্রচীন জাতি হিসেবে আমরা বেঁচে আছি, তাকে তুই এক কথায় উড়িয়ে দিবি! শান্তিতে মানুষ বাঁচেনা, বাঁচে যুদ্ধে? ওরে হস্তিমূর্খ, শান্তি থাকলেই মানুষ বাঁচে, যুদ্ধে মানুষ মরে! মানুষ বাঁচলেই তো জাত বাঁচল, মানুষই যদি মরে গেল, জাতি বাঁচে কিসের ওপরে?'

কিন্তু এখনকার লাও-সানকে চিনতে পারেনি লিংটান। বাপের ধমকে ক্রোধান্ধ পুত্র হাত তুলে তিক্ত কণ্ঠে ফেটে পড়ে : 'ওসব নীতিকথার দিনকাল এখন নেই। তোমাকে বলছি, এভাবে আর যদি হাত তোল তো ভাল হবে না! তোমাকেও আমি হত্যা করতে কসুর করব না!'

নিজের কানে বৃদ্ধ বাপ শুনল ছেলের হুমকি। ছেলের ক্রোধান্বিত রক্তিম মুখের দিকে হা ক'রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লিংটান ধপ ক'রে বসে পড়ল। এ ছেলেরই জনক সে! দু'হাতে মুখ ঢেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে প্রায় অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলে : 'হ্যাঁ, পারিস, পারিস তুই বাপকেও হত্যা করতে! তুই যে-কোন লোককে হত্যা করতে পারিস! এ এখন আমি বুঝতে পেরেছি!'

কিন্তু লাও-সানের সেই ক্রোধদৃপ্ত গর্বিত দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণ একই ভাবে প্রক্ষিপ্ত হতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে কাউকে কোন কথা না বলে সে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। বহুদিন সে আর ঘর-মুখো হয় নি।

চিন্তাকুল লিংটান নিদ্রাহীন রাত্রে কেবল ভাবে : 'কি যে হ'লো লোক-জনের মন-মেজাজের অবস্থা! ধ্যান-ধারণায় অহরহ যদি কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ

ঘোরে, তবে মানুষ মানুষ রইল কৈ ?' গভীর দুঃখাচ্ছন্ন মনে বাপ হয়েও কামনা জাগে : 'লাও-সান যেন যুদ্ধ-শেষ পর্যন্ত না বাঁচে। হোক ছেলে, যে হত্যা করার আনন্দেই কেবল খুন করতে চায় তার মৃত্যুই ভাল। এতে সাধারণের মঙ্গলই হবে। এই হৃদয়হীন খুনীরাই অত্যাচারী সামন্ত-শাসকে পরিণত হয়। এদেরই দয়া দাক্ষিণ্যে তাদের মত সাধারণ লোকদের কষ্টে কোনমতে জীবন ধারণ ক'রে থাকতে হয়।' একদিন লিংসাওকে সে বললে : 'বুঝলে গিন্নী, ছোট ছেলের যা পরিবর্তন হয়েছে, দেখলে তাক্ বনে যেতে হয়। যে ছোট্ট বয়সে মরা দেখলে ভয়ে কেঁদে উঠত, আজ কিনা সে কাউকে খুন করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না!'

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গৃহিনী বলে : 'আমরা সকলেই তো বদলে গেছি!'

'তুমিও বদলিয়েছ—' আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন করে লিংটান।

'বদলাইনি ? আর কি সেই পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে পারব ? কাঁখে-কোলে নাতি নিয়ে ঘুরবার সময়ও তো একবারও ভুলি না আমার কর্তব্যের কথা।'

'কিন্তু অন্য কোন ভাবে কি হতে পারে না, গিন্নী ?'

'উঁহু, তা আর হবে না।'

চিন্তামগ্ন লিংটান ধীরে বলে : 'কিন্তু তবুতো আমরা জানি সেই মঙ্গলদায়িনী স্নিগ্ধ শান্তির জীবন। ছেলেদের হয়তো সেই শান্তির দিনের কথা মনে না থাকতেও পারে, কিন্তু আমরা যারা বুড়ো, তাদের তো কর্তব্য সেই পুরোনো শান্তির বাণী এদের সামনে তুলে ধরা, এদের শেখানো যে মানুষের জীবন ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তিই সব থেকে প্রয়োজনীয়।'

'হুঁ, এসব কথা যদি কানে তোলে তবে তো! মানুষ মারা যদি এত সোজা না হ'তো! কত সহজে সব কিছু শেষ ক'রে দিতে শিখেছে এই সব ছেলেরা। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, আমরা যদি এদের বাঁধা দিই, হয়তো আমাদেরই মেরে ফেলবে। কি জানি, কেমন ভয় হয় ভাবতে, হয়তো যখন শত্রু থাকবে না, এরা পরস্পরের গলা কামড়া কামড়ি সুরু ক'রে না দেয়।'

কোন উত্তর দেয় না ভাবনা-আকুল লিংটান। জেগে শুয়ে থাকে। লিংসাও-ও ঘুমোয়নি, ঘুমিয়ে পড়লে তার নাক-ডাকা থেকেই লিংটান বুঝতে পারত। ও ঠিক করে, এই শত্রু হত্যার মধ্যেও ও, সর্বসময়ে না হোক, দিনে অন্তত একবার স্মরণ করবে সেই পুরোনো শান্তির দিনগুলি। যত ভাবে

ততই মনে হয়, এই মানুষ হত্যা সত্যিই খারাপ। অন্যরা যদি হত্যা করে তো করুক, কিন্তু লিংটান আর কোন মানুষকে হত্যা করবে না। এরই পরে লিংটান অতর্কিত আক্রমণের সময় নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিল। কারণ কাউকে সে কিছু বলল না, শুধু ছেড়ে দিল। প্রত্যক্ষ হত্যার পথ ছেড়ে দিয়ে সে নিজের মনের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে নিল অন্যভাবে। পুকুরের জলে বিষ মিশিয়ে সে মাছ নষ্ট করে রাখত যাতে শত্রুরা সে-মাছ ব্যবহার করতে না পারে। শত্রুর সামনে সে মূক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নীরবতাই লিংটানের অস্ত্র।

লিংটানের অন্য দুই ছেলের মত কিন্তু লাও-এর মানুষ-হত্যাকে ঐভাবে গ্রহণ করেনি। হত্যা যে করত না, তা নয়। প্রয়োজনে করত। ছোট ছেলে হত্যার আনন্দে নাচত, বড় ছেলে করত অতি সহজ কাজ হিসেবেই। কিন্তু লাও এর করত অনেক কিছু ভেবে চিন্তে ভবিষ্যৎ কাজের প্ল্যান ক'রে। আর তার এ-কাজের প্রধান সহায়িকা ছিল নীলা। একদিন নীলা বলল লাও-এরকে :

'বুঝলে, ভেবে দেখলাম, উলীনদের মত লোকদের ওপর রাগ ও ঘৃণা ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকলে লাভ নেই। এদের সাহায্যে শত্রুর ব্যূহ ভেদ ক'রে ঢুকবার চেষ্টা করা উচিত। আর এরা যে-লোক, ওদের ওপর আবার ঘৃণা ভালোবাসা দেখাবার কি আছে!' তাদের গোপন-ঘরে বসে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করতে করতে বলল নীলা লাও-এরকে। পাহাড়-দেশ থেকে খবর এসেছে যে দু'তিন দিনের মধ্যেই নিকটবর্তী এলাকায় শত্রু সৈন্যের আস্তানার উপর আক্রমণ করা হবে, এবং তার জন্য লাও-এররা যেন মারণাস্ত্র সব ঠিকঠাক ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। নীলার কথা শুনে লাও-এর বলে : 'খুব ভাল কথা বলেছ।'

একটা চক্‌চকে নতুন বন্দুকের নলের ভেতরটা এক চোখ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে নীলা বলে : 'ওদের সঙ্গে আবার ভাবটা নতুন ক'রে কি ভাবে সুরু করা যায়?' সেদিন এই বন্দুকটা শত্রুর উপরে অতর্কিত আক্রমণের সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। একটা কঞ্চির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে নলের মধ্যে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করল নীলা। পাশে কতগুলো খালি কার্তুজের পরিষ্কার খোল নিয়ে খেলা করছে নীলার নবশিশু। একটা কার্তুজের পিতলের অংশের উপর নতুন দাঁতের জোর পরীক্ষা করেছে শিশু। নীলা ভেবেছে এটা সে তুলে

রেখে দেবে শিশুর প্রথম ব্যবহার করা জিনিসগুলোর সঙ্গে যেখানে সে রেখে দিয়েছে শিশুর অন্যান্য টুকি টাকি জিনিসের সঙ্গে নীলার হাতের তৈরি বাঘের মাথা চিত্রিত জুতো, বুদ্ধের ধ্যান-গম্ভীর শান্ত-শ্রী মূর্তি অঙ্কিত টুপি।

কিন্তু লাও-এর ও নীলার এই গোপন-ঘরে বাসের খবরও যে উলীন পেয়েছে, একবারের জন্যও তারা তা কল্পনাও করতে পারি নি। গাঁয়ের মাঝে উলীনের লোক আছে, এবং সে-লোক হ'ল পণ্ডিত খুড়োর সেই ডাইনী-মাগী। পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে লাও-এর ও নীলা গাঁয়ে ফিরে এসে বাস করছে, একথা গাঁয়ের অনেকের মত সেও জানে।

একদিন খুড়ী একটা মাছ ধরে চলল উলীনের গৃহপানে। শাসকদের আদেশে এভাবে মাছ তো তারা খেতে পারে না, মাছ ধরা পড়লে সেনাবাসে দিয়ে দিতে হয়। পদ্ম পাতায় মাছটি জড়িয়ে সে এসে হাজির হ'ল উলীনের গৃহ-দ্বারে। দ্বাররক্ষীকে উলীনের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে বুড়ী সোজা এসে হাজির হ'ল অন্দর মহলে।

উলীন দম্পতীর সামনে বসে বুড়ী বলল গাঁয়ের একথা ওকথা। বলল লিংটানের বাড়ীর কথা :

'তোমার বাপ মা ভাইরা সব ভালই আছে। দিন কয়েক আগে দেখলাম লাও-এরকে—'

'লাও-এর। সে কী গাঁয়ে ফিরে এসেছে নাকি?' দিদি জিজ্ঞেস করে ভাইয়ের কথা।

'হ্যাঁ, নীলাও তো এসেছে। ওদের একটা ছেলে হয়েছে, বেশ মোটা-কাটা, সুন্দর।...কিন্তু ও-ছেলে তো বেশী দিন বাঁচবে না, ওর কপালে দেখলাম আশু-মৃত্যুর রেখা। আর তোমার আর দু'ভাইও ভাল আছে। মাঝে মাঝে ওরা পাহাড় থেকে গাঁয়ে আসে।'

'পাহাড় থেকে? ওরা কি পাহাড়ে থাকে নাকি?' ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে উলীন-পত্নী।

'হ্যাঁ, ওরা পাহাড়েই থাকে আজকাল।' বলে পণ্ডিত-পত্নী। আরও কিছু বলবে কিনা—সেই মাটির নীচের গোপন-ঘরের কথা, সেইখান থেকে কিভাবে তারা অতর্কিত আক্রমণ চালায় তার ইতিবৃত্ত? নাঃ, থাক আপাততঃ এই পর্যন্ত। যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয় তো বলা যাবে। একটু মৃদু হেসে

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : 'আমার ছেলে যে মারা গেছে, সে-খবর বোধহয় তোমরা জান। সে শহরে এসেছিল এখানকার হালচাল দেখতে। শত্রু-সৈন্যের গুলিতে জখম হয়ে সে কোনমতে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল। সেই জখমের ঘায়েই তো সে মারা গেল···ঐ লিংটান বুড়ো যদি ওর মাথায় শহরে আসার কথাটা না ঢুকিয়ে দিত, তাহ'লে কি আর আমায় পুত্রহারা হতে হতো—?'

'পণ্ডিত-খুড়ো কেমন আছে ?' কথা ঘুরিয়ে দিয়ে উলীন জিজ্ঞেস করে।

'আর থাকা! খাওয়া না পেলে কেউ ভাল থাকে ?' বলতে বলতে বুড়ীর মাথায় একটা মতলব খেলে যায়। উলীনের দিকে শুষ্ক চোখে হঠাৎ ফিরে বলে :

'তোমার তো জামাই দয়ার প্রাণ···আর ভাল লোক না হ'লে কি এত সুস্থ দেহে থাকতে পারে কেউ ? এই শহরের কোথাও একটা কাজের জোগাড় ক'রে দাও না ঐ বুড়োর জন্যে। তবু তো একটু খেয়ে বাঁচতে পারি।' কথা বলতে বলতে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে বুড়ী। শহরে বুড়োর চাকরি হ'লে এই রকম আরামে বেশ বাস করা যায়।

'কিন্তু আমার বাবা কি পণ্ডিত-খুড়োকে গ্রাম ছেড়ে আসতে দেবে ? আমাদের ওপরই তো রেগে আগুন হ'য়ে আছে, তারপর আমাদের দেখাদেখি যদি খুড়ো আসে এখানে—' বলে উলীন পত্নী।

একথায় বুড়ী অগ্নিমূর্তি হ'য়ে যায়। ওর বুড়ো, বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও, মোড়লী পেলনা, গাঁয়ের মোড়ল হয়েছে লিংটান। বুড়ী চেঁচিয়ে বলে :

'আমরা কি করব না-করব, তাকি লিংটানকে জিজ্ঞেস ক'রে করতে হবে নাকি ? সে কি আমাদের খেতে দেয় ?' এরপর অতিকষ্টে বুড়ী রসনা সংযত করে। লিংটানের গোপন-ঘরে যে শস্য জমা আছে, নুন মাখানো মাংস লুকোন আছে সেকথা প্রায় বলে ফেলেছিল বুড়ী। হঠাৎ তার মনে পড়ে যে এইভাবে শস্য লুকোন তো শুধু লিংটানের ঘরেই নেই, তারাও তো করেছে, লিংটানের উপদেশ অনুযায়ী গাঁয়ের অনেকেই করেছে। যদি ওর বাড়ীতে খুঁজে ওগুলো বেরিয়ে পড়ে, তখন তো কিছু বলার থাকবে না। তাই সে সেকথা চেপে যায়।

বুড়ীর কথা শুনতে শুনতে উলীন ভাবছিল অন্যকথা। বুড়ী থামলে বলল : 'দেখ, তোমরা গাঁয়েই থাক। এই বুড়ো বয়সে শহরে এসে অসুবিধায় কেন পড়বে ? মাঝে মাঝে এখানে এস। গাঁয়ের খবরও তোমার কাছে শুনব। আর তোমার দুঃসময়ে কিছু কিছু সাহায্যও আমি করতে পারব। আমার শ্বশুর ও শালাদের খবরও তোমার কাছে জানতে পারব।'

উলীনের এই সরল কথার পিছনে কি প্ল্যান আছে বুঝতে বুড়ীর এতটুকুও দেরী হয় না। তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। এবারে বুড়ী যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। উলীন কিছু টাকা এনে ওর হাতে দিয়ে বলে: এই নাও কয়েকটা টাকা। আর মাছ তুমি এখানে নিয়ে এস না। তোমরা নিজেরাই খেয়ো। যদি কেউ বাধা দেয়, আমাকে বলো, আমি সব ঠিক-ঠাক ক'রে দেব।' তারপর বিনয়ে গলে গিয়ে আবার বলে: 'তা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের জন্য যদি কিছু করতে পারি তবেই তো আমার এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হ'ল!'

সরাবের মত লাল রংএর সাটিনের জামা গায়ে ছিল উলীনের। পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীর কথা শুনে উলীন-পত্নী সত্যি সত্যি মনে গর্ব অনুভব করে। সত্যিই তো কত দরাজ দিল তার স্বামীর! খুড়ীর দিকে ঘুরে সে বলল:

'গাঁয়ে গিয়ে আমার বাবা-মাকে ওঁর কথা বলো, খুড়ী। নিজের কানেই তো তুমি সব শুনলে। ওঁর হৃদয়ের পরিচয়—'

উলীন থামিয়ে দেয় স্ত্রীকে: 'এসব ভাগ্য। ভগবান যা করান তা মঙ্গলের জন্যেই করান। সেইটুকু বুঝে বিশ্বাস রেখে আমরা যদি শুধু সেই নির্দেশে চলি—'

'সত্যিই তুমি বুদ্ধিমান, জামাই। আমিও তো সেই কথাই প্রতিদিন বলি বুড়োকে: যা ঘটে গেছে, তাকে মেনে নাও। তা না-মানা মানেই বোকামী, লোকসান।'

বুড়ী বেরিয়ে আসে। শঙ্কা বিজড়িত নিস্তব্ধ পথ বেয়ে, বিধ্বস্ত বাড়ীর মাঝে চিমসে চেহারার ক্ষুধিত লোকদের দেখতে দেখতে সে ফিরে আসে গ্রামে। ভবিষ্যতে ঐ চিমসে চেহারায় কি ওরাও পরিণত হবে? না, না, এভাবে অনশনে থেকে ওরা মরতে পারবে না। উলীনের সাহায্যে পেট পুরে খেয়ে ওরা বাঁচবে। উলীনের কথানুযায়ী লিংটানের গৃহের উপর ও সজাগ দৃষ্টি রাখবে, কান পেতে পেতে শুনবে ও-বাড়ীর সব কথা। সমস্ত গ্রামের কর্ম্মমুখরতার প্রাণকেন্দ্র তো লিংটানের গৃহ। ঐ বাড়ীর ওপর শ্যেন দৃষ্টি রাখবে সে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে সে বলবে ওর পণ্ডিত-স্বামীকে সব কথা।

রাত্রে স্ত্রীর গায়ে-পড়া ভাব দেখে একটু আশ্চর্য হয় পণ্ডিত। স্ত্রীর মুখে তার প্ল্যানের কথা শুনে ভয়ে কেঁপে ওঠে বৃদ্ধ। শুধু ভয় নয়,

বয়ঃকনিষ্ঠ হ'লেও লিংটানের ওপর তার শ্রদ্ধাও ছিল। কে বেশী শক্তিশালী, ক্ষমতাবান? শত্রু-সঙ্গিন পরিবেষ্টিত উলীন, না, লিংটান? আস্তে আস্তে স্ত্রীকে বলে: 'ওরা যদি টের পায় যে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, একমুহূর্ত কি আর ওরা আমাদের আস্ত রাখবে মনে করেছ? শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি জানতে পারলে তক্ষুণি আমাদের সব কিছু শেষ ক'রে দেবে। মেয়ে-জামাইর সঙ্গে পর্যন্ত ওরা সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে!'

'হুঁ, তোমার মতন এরকম মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ আমি দেখিনি কোথাও। আশ্চর্য! পুরুষমানুষ, না, কী।...আমি যা বলি তাই করবে।'

পাশে শুয়ে কাঁপতে কাঁপতে পণ্ডিত বলে: 'কি কাজটা বল না।'

'লিংটানরা হ'ল আমাদের দুষমন। চিরদিন আমি ওদের ঘৃণা করি—'

'কিন্তু আমি করি না,' স্ত্রীর কথার মাঝেই বলে পণ্ডিত: 'লিংটান আমার কত উপকার করেছে। কতদিন অভাবের সময় আমাদের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে, গায়ের জামা পর্যন্ত দিয়েছে। এসব কথা বেমালুম ভুলে যাব।'

'কেন ভুলব না, শুনি? দু'একসময় একটু খাবার, দু' একটা ছেঁড়া কাপড় কিংবা জামা দিয়ে তিনি দাতা সেজেছেন! আমি বুঝি বুঝিনা কিছু, এইসব ছেঁড়া-ফাটা জিনিস খয়রাত ক'রে ঢাক পিটিয়ে তিনি নাম কিনেছেন। পিছনে কোন উদ্দেশ্য না থাকলে কেউ কি আর এমনি-এমনি দেয় কিছু?' অবিরাম কথার ঝড় চলতে থাকে ডাইনি স্ত্রীর। এই কথা-কটুক্তির ঝড়ের মধ্যে তন্দ্রা নেমে আসে পণ্ডিতের চোখে। তাই দেখে স্ত্রী তাকে ধাক্কা মেরে তুলে আবার কথা শোনায়। শেষমেশ শ্রান্ত উত্যক্ত পণ্ডিত বলে ওঠে: 'নাও নাও বাপু, যা খুশি কর। মাগের বিরুদ্ধে ভাতার আর কবে কোথায় যেতে পেরেছে!—আর বিশেষ ক'রে আমার মত দুর্বল লোক?'

এমনি ক'রেই গাঁয়ের মাঝে পণ্ডিত-দম্পতি উলীনের টিকটিকি হ'য়ে বাস করে। যতটা পারত গাঁয়ের কথা লুকিয়ে রাখত পণ্ডিত তার স্ত্রীর কাছ থেকে। কিন্তু সব সময় কি আর পারত? স্ত্রীর অদ্ভুত, অনুসন্ধান-রীতির কাছে প্রায় কথাই বেরিয়ে যেত। ঘরের শান্তির জন্যে অহর্নিশ উত্যক্ত থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার জন্য তাকে বলে ফেলতে হ'তো লিংটান ও গ্রামের প্রধানদের আলোচনা-সভার সব কথা। এবং তারপরই সেই খবর নিয়ে যেত ডাইনি বুড়ী উলীনের কাছে। সব কথা শুনে উলীন অন্য কোথাও কিছু বলত না, সে শুধু নিজে সব খবর রাখত।

এসব কথা নীলারা মোটেই আঁচ করতে পারেনি। উলীনের মাধ্যমে শত্রুব্যূহ ভেদ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে মনে ক'রে নীলা একদিন মনে মনে প্ল্যান আঁটে। কিছু সব্জি বেচতে সে যাবে শহরে, এবং সম্ভব হ'লে উলীনের ওখানেই যাবে বেচতে। কাউকে কোন কথা না ব'লে একদিন লাও-এর যখন গেছে পাহাড়-দেশে, কোলের শিশু যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন পাহাড়-দেশের এক ভ্রাম্যমান গণনাট্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নীলার যৌবন ও শ্রী ঢাকবার প্রয়োজনে লাও-এর যে বুড়ীর পরচুলা এনেছিল, তাই মাথায় দিল নীলা। মুখে হাতে রং ঘসে, পট্টি মেরে ঠোঁটটা বিকৃত ক'রে দাঁতে দিল কাল মিসি। পিঠে কাপড় উঁচু ক'রে বেধে, পুরোনো ছেঁড়া জুতোয় চরণকমল ঢেকে, কুব্জা বৃদ্ধার সাজে প্রস্তুত হ'য়ে নিল নীলা। শাশুড়ী ঘুমিয়ে। খিড়কির দোর খুলে বেরিয়ে এসে বাঁশের ঝোঁপের আড়ালে লিংটান যেখানে শত্রুর দৃষ্টিপথের বাইরে গোপনে কিছু বাঁধাকপি লাগিয়েছিল, সেখানে এসে হাজির হ'ল। সামনের ক্ষেতে পিছন ফিরে বুড়ো শ্বশুর কাজ করছিল। এক ঝুড়ি কপি তুলে নিয়ে পিঠে বেধে গোরস্থানের পাশ দিয়ে ও গেল শহরের দিকে।

চেনাপথ দিয়ে কুব্জা বৃদ্ধা নীলা এসে হাজির হোলো উলীনের বর্তমান বাড়ীর গেটে। বুড়ীর ঝুড়িতে তাজা সবুজ সব্জি দেখে দ্বাররক্ষী সৈনিক আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। উলীনের নাম পর্যন্ত বলার দরকার হলো না নীলার। শহরে এত তাজা সব্জি দেখেনি দ্বাররক্ষী। সে বলল: 'বাঃ, বাঃ, ভারী সুন্দর কপি এনেছিস তো বুড়ী! বাবুর্চীকে দিয়ে ওর কাছ থেকে দাম নিয়ে যা।'

'কিন্তু তোমাদের বাবুর্চীখানা কোথায়?' ভাঙ্গা বিকৃত কণ্ঠে এমন-ভাবে বলে নীলা, যেন শুনে মনে হয়, কথাগুলো বৃদ্ধার ফোকলা মুখ দিয়ে হুস হুস ক'রে বেরিয়ে আসছে।

'আয়, আমার সঙ্গে আয়, মাগী।' দ্বাররক্ষী সৈনিক নীলাকে নিয়ে আসে বাবুর্চীখানায়। কোনদিকে তাকায় না নীলা, মুখ নীচু ক'রে সামনের সৈনিক প্রবরের সবুট ভারী পদযুগল দেখতে দেখতে এগিয়ে যায়।

বাবুর্চীখানায় এসে সৈনিক চিৎকার ক'রে ডাকে বাবুর্চীকে। বাবুর্চী এলে নীলার সব্জির ঝুড়ি দেখিয়ে বলে: 'দেখ সোনা নিয়ে এসেছে বুড়ী মাগী। পাকান হ'লে আমাকে এক সানকী ভর্তি দিবি, বুঝলি?' এই

কথা বলে মৃত্থু হাসতে হাসতে সে তার প্রহরার কাজে ফিরে যায়। নীলা দাঁড়িয়ে থাকে বাবুর্চীখানার দোরে। মোটা সোটা বেটে এক বাবুর্চী ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। শত্রু-সেনাদের সে কেউ নয়। শহরের কোনো বিধ্বস্ত হোটেলের রাধুনী ছিল সে। ঝুড়ির মুখ খুলে মৃত্থু কণ্ঠে কি যেন বিড়বিড় ক'রে উঠল, কিন্তু কি যে বলল, নীলা শুনতে পেল না। চেঁচিয়ে বলে উঠল : 'দেখ গো মেয়ে, ছুটো টাকা পাবে।'

মাথা নেড়ে নীলা বলে : 'কিন্তু সাহেব, জানেন তো আজকাল জিনিস-পত্তরের যা দাম—'

'আচ্ছা, তিন টাকা পাবে। যাকগে, আমার তো আর টাকা না। অতকথায় আমার দরকার কি ? হ্যাঁ, ওদের তো আবার খানা-পিনা আছে। আর, খানাপিনা তো ব্যাটাদের লেগেই আছে। খাবি আর হৈ হুল্লোড় করবি তোরা, আর খাবার জোগাড় করতে হবে আমায়। বাপ্ কোত্থেকে এত জোগাড় করব ? হুঁ, তুমি কিছু মাংস দিতে পারবে বুড়ী ? শুয়োরের মাংস ? মাছ লাগবে না, মাছ পাব'খন। কিন্তু খানাপিনায় চাই মাংস। শুয়োর যদি নাও পাওয়া যায়, নিদেন পক্ষে হাঁস দিতে পার ?'

ভাল ক'রে বাবুর্চীকে লক্ষ্য ক'রে দেখে নীলা। এই লোক কি দেশদ্রোহী হবে ?

'ছুটো হাঁস যদি এনে দি, কি দাম দেবে ? দশটা টাকা দিতে পারবে ?'

'আচ্ছা, নিয়ে এস তো।' বাবুর্চি সজির দাম বের ক'রে দিতে দিতে বলে।

নীলা জিজ্ঞেস করে : 'ঐ বিশেষ খানা পিনাটা কবে হবে সাহেব ?'

'পরশুদিন—' কেমন একটু তিক্তুতা বেরিয়ে পড়ে বাবুর্চী কথায় : 'এক বছর আগে ঐ দিন ব্যাটারা আমাদের এই শহর জয় করেছিল। তাই ওরা বিজয়ের বিশেষ দিনটি পালন করবে খানাপিনা হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে। ওদের যত মাথা আছে, সব কয়টা সেদিন এসে হাজির হবে।'

একটু ঝুঁকে পড়ে অতি মৃত্থু কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে নীলা বলে :

'তুমি আমাদেরই একজন !'

'তাড়াতাড়ি বাবুর্চী চারদিকে তাকিয়ে দেখে। বাবুর্চীখানা খালি, তবুও সে কোন জবাব দেয় না।

'তুমি বড় ভাল জায়গায় কাজ নিয়ে আছ সাহেব। তুমি তো ঐ ব্যাটাদের খাবারের মধ্যে যে-কোন জিনিস মিশিয়ে দিতে পার। তোমরা ক'জন আছ বাবুর্চীখানায় ?'

'তিন জন—'

'তিন জন! এতবড় খানা তিনজনে কি ক'রে পাকাবে? অন্ততঃপক্ষে দশ জন বাবুর্চী দরকার। তোমরাই সব পাকাও, না, বাইরের রেঁস্তোরা থেকেও খানা আসে?'

'বাইরের কোন কিছুকে এরা বিশ্বাস করে না। পাহারা দেখলে না? ওদের নিজেদের সবকিছুই নিজেরাই চোখে চোখে রাখে।'

'ও—'

বাবুর্চী একটা কপি হাতে তুলে নিয়ে বলে :

'তা হ'লে কাল তুমি হাঁস দুটো নিয়ে আসছ তো বুড়ী!'

'হ্যাঁ, নিয়ে আসব। এই সময়ে আসব।'

পিছনের খিড়কির দরজা দিয়ে জনবিরল রাস্তায় বুড়ীকে বের ক'রে দেয় বাবুর্চী! বাবুর্চীর মস্তিস্কে খাদ্যে বিষ-মেশানোর কথা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে নীলা। নীলার মাথায়ও যে খুব সুচিন্তিত ভাবে এই প্ল্যান ছিল, তাও নয়। নতুন চিন্তার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেল মাত্র। পথের এখানে ওখানে দু'দশজন লোকের সঙ্গে কথা ব'লে 'বৃদ্ধা' নীলা জানতে পারে কি ভয়াবহ দুর্দিনেই না বাস করছে এরা। একটা কাটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে নীলা একটা কোট নাড়াচাড়া করতে করতে জিজ্ঞেস করে দোকানীকে, কি রকম তার ব্যবসা চলেছে। প্রশ্ন শুনে দোকানীর অন্তঃকরণের নরম জায়গায় আঘাত লাগে। চোখ ভ'রে জল জমে ওঠে। বলে : 'আর ব্যবসা! অনেক কষ্টে বন্ধ দোকান আবার খুললাম। একটা ছেলে ছিল, তাকেও হারিয়েছি। আর তিনটে মেয়ে—তাদের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে তারা মরে গেলেই ভাল ছিল।'

'তোমার ছেলেকে হারিয়েছ মানে?' প্রশ্ন করে নীলা।

'বিশ্বাস করবে বুড়ী মা! কি ভাবে যে মারা পড়ল ছেলে আমার, তা যে বিশ্বাসও করা যায় না। চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোর···আমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। আর আমার ঐ একই ছেলে···অনেকগুলো মেয়ের পরে বুদ্ধের কৃপায় ঐ ছেলে পেয়েছিলাম। অত সুন্দর অত ভাল ছেলে এ তল্লাটে ছিল ··। একদিন শত্রু-সেনারা এই পথ দিয়ে মার্চ ক'রে যাচ্ছিল। চকচকে সঙ্গিনগুলো রোদে ঝলমলিয়ে উঠছিল। ছেলে আমার দোর থেকে ওদের সালাম দিয়েছিল। কি ভাবল সৈনিকরা, কি জানি, দেখলাম ওদের একজন মার্চ করতে করতে এক পাশে বেরিয়ে এসে তাক্‌ ক'রে আমার ছেলের

দিকে গুলি ছুঁড়ল। পাশেই ছিলাম দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি হাত বাগিয়ে ওকে ধরলাম। সেই আঘাতেই ছেলে তক্ষুণি শেষ হ'য়ে গেল।'

'সে কি? এ সম্ভব?' বিষাদকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নীলা।

'হুঁ, সবই সম্ভব, সবই সম্ভব, যা দিনকাল—' দীর্ঘশ্বাস ফেল বলে দোকানী।

দোকান থেকে বেরিয়ে নীলা জনবিরল রাস্তা ধ'রে এগিয়ে চলে। আধা-পোড়া একটা বাড়ীর সামনে এসে সে থামে। এরকম বাড়ী শহরের অনেক জায়গায়ই এখন দেখতে পাওয়া যায়। এসব বাড়ীর বাসিন্দারা পোড়ো বাড়ীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারেনি। তারই মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে বাস করছে। এমনি সব আধপোড়া বাড়ীর একটার দোরে নীলা বসল একটু বিশ্রাম করতে। বাড়ীর ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল নীলাকে সে তৃষ্ণার্ত কিনা। কূয়োর ঠাণ্ডা জল শুধু দিতে পারবে অতিথি অভ্যাগতকে। সে দিনকালও নেই যে অতিথিকে চা-খাবার দিয়ে স্বাগত করবে। নীলা শুধু একটু বিশ্রাম চায়, আর কিছু না। বৃদ্ধা যেন মোটেই বিব্রত না হয়। নীলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পোড়াবাড়ীর চারদিকে। বৃদ্ধা দেখে। নিম্নস্বরে বলে :

'অত নিবিষ্ট হ'য়ে দেখ না গো···যা দিনকাল···হয়তো কোথায় কে আমাদের ওপর নজর রেখেছে। তবুতো আমার কপাল ভাল বলতে হবে। কত লোকের সর্বনাশ তো দেখলাম এই পোড়া চোখে। কতজনের সর্বস্ব পুড়ে খাক হ'য়ে গেল। কতজন অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে বাড়ীতেই ম'ল।'

'কিন্তু তোমার বাড়ী পুড়ল কি ক'রে? বোমা পড়েছিল বুঝি।' নীলা জিজ্ঞেস করে।

মাথা নাড়াতে নাড়াতে বৃদ্ধা বলে : 'না, না, তা নয়। বোমার বিপদ তো পার হ'য়ে এসেছিলাম। আমার বিপদ এল আরও পড়ে। শত্রুরা শহরে ঢুকলে, তাদের সৈন্যদের পাঠাল বিভিন্ন বাড়ীতে থাকবার জন্য বিড়ি সিগারেট ফুঁকে কোথায় কখন ফেলে তার ভ্রুক্ষেপও তাঁরা করত না একটা বাড়ীতে আগুন ধরলে, সে-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তারা আস্তানা গাড়ত আরেক বাড়ীতে। আমার বাড়ীও এই ভাবেই পুড়েছে। বাড়ীর সব ঘরদোর তাদের ছেড়ে দিয়ে আমরা গাদা মেরে কোনোমতে দিন কাটাতাম কোণা-ঘুপচি বারান্দায়। আর বাড়ীতে যখন আগুন ধরে গেল, হারামী ব্যাটারা ঘর ছেড়ে শিস দিতে দিতে আরেক বাড়ীতে গিয়ে উঠল। যখ

দেখলাম ঘরে আগুন লেগেছে, দৌড়ে এসে নিবোবার চেষ্টা করবার আগেই ও-ঘরদোর পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। এভাবেই কত বাড়ী পুড়ে শেষ হ'য়ে গেছে।···বাড়ীঘর যখন পুড়ত, তখন ঐ ব্যাটাদের কি হাসি হুল্লোড়!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ী।

নীলা শোনে। একটি কথাও বলতে পারে না। নীরবে অধোবদনে কিছুক্ষণ বসে সে উঠে পড়ে। সমস্ত শরীর রাগে রি রি করতে থাকে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে দেয়ালে আঁটা এক বিরাট ছবি। দেখে, বিজেতার বেশে শত্রু দাঁড়িয়ে···মুখে হাসি···হাতে খাবার···বিতরণ করছে এদেশেরই পরাজিত বুভুক্ষু বৃদ্ধ-শিশু-ছেলেমেয়েদের···শত্রুর দয়ায় বিগলিত ধন্যবাদ চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে তাদের করুণা-চাওয়া চোখে···বড় বড় অক্ষরে নীচে লেখা রয়েছে: 'এদেশের জনসাধারণ তাদের দয়ালু পড়শী রাষ্ট্রকে স্বাগতম জানাচ্ছে···যারা তাদের খাবার, শান্তি, সুখ এবং জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছে।'

অতিকষ্টে নিজের ক্রোধের আগুনকে চেপে রাখে নীলা। একটি ছোট দোকানে ঢুকে পড়ে বৃদ্ধ দোকানীর কাছে সে চাইল অতি পুরাতন একটা ওষুধ। বৃদ্ধ দোকানী যেন শুষ্কমূল। বিষাদমাখা হাসির রেখা ঠোঁটে ফুটিয়ে স্তিমিত আঁখির নীচে আস্তে আস্তে বৃদ্ধ শুভ্রচূর্ণ ঔষধি মেপে দেয়। বলে:

'এ ওষুধ আজকাল অনেকেই চাইছে। আর দেখছি খদ্দেরদের প্রায় সকলেই মেয়ে।'

'নিজেদের জন্যই তারা কেনে কি?' বৃদ্ধকে ভুল বুঝাবার জন্য নীলা বলে।

'হুঁ, হুঁ—সে-সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। মেয়েরা নিজেদের জন্য কেনে বই কি। যে দিনকাল পড়েছে।' আর কোন কথা বলে না বৃদ্ধ দোকানী। শুধু আর একবার নীলার দিকে তাকিয়ে দেখে গুড়ো মেপে দেয়। গুড়ো বিষের পুঁরিয়াটি জীর্ণ জামার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে নীলা এবার গাঁয়ের পথ ধরে।

নিশীথ রাত্রে নীলা শ্বশুর শাশুড়ী ও লাও-এরকে বলল তার প্ল্যানের কথা। তাকে বলতেই হ'ল, কারণ, তাকে দু'দুটো হাঁস নিতে হবে শ্বশুরের কাছ থেকে। এই দুর্দিনেও লিংটান গোটাকয়েক হাঁস লুকিয়ে রেখেছিল ডিম ও ছানার জন্য। পুত্রবধুর কথা শুনে লিংটান উঠে গিয়ে দুটো হাঁস

নিয়ে এল। লিংসাও ও নীলা ও-দুটোকে মেরে পরিষ্কার ক'রে সর্বাঙ্গে ও চেরা পেটে ঐ শাদা গুড়ো মেখে বেশ ক'রে জারিয়ে রেখে দিল রাত্রির মত। গুড়ো ওষুধের ধকলে সে-মাংস বিস্বাদ হ'য়ে রইল।

পরদিন প্রত্যুষে জীর্ণ বেশধারী কুব্জা নীলা হাঁস দুটোকে নিয়ে সেই স্থূলাঙ্গী বাবুর্চীকে দিল। নগদ টাকা কয়টা নিতে নিতে আস্তে আস্তে বলল : 'বেশ একটু তেল ঢেলে মাংসটা পাকিও, আর কিছুটা মদ ঢেলে দিও। আজে বাজে জংলী জিনিস খেত হাঁস দুটো, তাতে মাংসটা বোধহয় একটু বিস্বাদ ঠেকতে পারে।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে বাবুর্চী। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ফিরে তাকায় নীলা। হঠাৎ বাবুর্চী বুঝতে পারে, এ তো বৃদ্ধা নয়, পূর্ণ যৌবনা নারী! মৃদু শব্দ বেরিয়ে আসে তার বিস্ময়াবিষ্ট মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে সে-শব্দ চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। পরমুহূর্তে খিড়কির দরজা খুলে নীলাকে বাড়ীর বাইরে বের ক'রে দেয়। নীলাও তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফেরে।

...দিন যায়। সেই খানাপিনার যে কি ফল হ'ল তার কোনো খবর নীলা পায় না। প্রাচীর বেষ্টিত শহরের সঙ্গীন-ঘেরা অট্টালিকার অভ্যন্তরে কি ঘটে না-ঘটে তার সংবাদ কি আর সহজে গ্রামে আসে? প্রতীক্ষা করে নীলা আর সেই সঙ্গে তার মাথায় প্ল্যান ঘোরে : 'যদি সেদিন সফল হ'য়ে থাকে তো আরও করা যাবে...আরও ব্যাপকতর নতুন কায়দায়... বহুদিন পরে অবশেষে সেই সংবাদ এসে পৌঁছুল এবং এল খুড়ীর মুখ দিয়ে। অত ভেবে চিন্তে খুড়ী কথাটী বলেনি। তার কর্তা গিয়েছিল শহরে। পথে দেখেছিল উলীনকে হেঁটে যেতে। কী রোগাই না হয়েছে সে ...অতি বৃদ্ধ ছাগলের মত শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। বিদেশী শাষকদের সঙ্গে এক খানাপিনায় বলে কি এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ওদের বেশ কয়েকজন লোক মারা গিয়েছে, আর উলীনও প্রায় শেষ হ'য়ে গিয়েছিল।

কথাটা বলেছিল খুড়ী লিংসাওকে। খুড়ী আসবার ভাজ পেয়েই নীলা শিশুপুত্রকে নিয়ে পালিয়েছিল গোপনঘরে। বিস্মিত হবার ভাব ফুটিয়ে লিংসাও জিজ্ঞেস করে খুড়ীকে :

'মারা গিয়েছে? ক'জন মরেছে? কারা তারা, আহা—হা—'

কত খবর রাখে খুড়ী! গদগদ কণ্ঠে বলে : 'ওঃ, সে কি সোজা ব্যাপার?'

পাঁচ পাঁচ জন মারা গেছে···আর তারা কেউকেটা লোক নয় গো! মাথা মাথা পাঁচ জন লোক তো মরেছে সেই দিনই, আর কত যে আধ-মরা পড়ে আছে, সে আর কি বলব! কত্তাকে উলীন বলেছিল যে বিশ বিশ জন বলে আধামরা হ'য়ে পড়ে আছে। উলীনেরই বলে সব থেকে কম হয়েছে, কারণ, মাংসের একটা টুকরো শুধু ও দাঁতে ঠেকিয়েছিল। তারই ফলে ওর ঐ চেহারা।' ঠোঁট দুটো এবার একটু মুছে নিয়ে মাথাটি ঝুঁকিয়ে আবার বলে: 'বাবুর্চী ব্যাটাদের বলে ওরা দোষ দিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত অপরাধী যে কে তা কি ক'রে জানা যাবে? আর তা ছাড়া সেদিনের খানা পাকানোর জন্য বাইরে থেকেও রাঁধুনী এসেছিল। ওদের পাকড়ানোর জন্য শত্রুরা ধেয়ে এল, তার আগেই রাঁধুনীরা পালিয়ে গেছে।'

'ঐ বাবুর্চীদের জন্য কোন মাংস ছিল না? ওরাও নিশ্চয়ই খেয়েছে, খেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে।' বলে লিংসাও।

'হুঁ, তুমিও ভাল! শত্রুরা মাংস রাখবে বাবুর্চীদের জন্য? হাড় পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে ওরা!'

'তা বটে, ব্যাটারা যা মাংস খায়!'

এবং সত্যিই এই সৈন্যরা মেয়েমানুষ ও মদের পরেই চায় মাংস। ছেলেদের মুখে লিংসাও শুনেছিল যে তারা নিজের চোখে একবার দেখে-ছিল যে মোটা তনতনে একটা ষাঁড় চরছিল মাঠে; তাই দেখে শত্রুরা ওটার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জীবন্ত অবস্থায়ই ষাঁড়টার অঙ্গ থেকে টুকরো টুকরো মাংস কেটে নিয়ে সেই কাঁচা মাংস পরমানন্দে খেয়েছিল। বাপের জন্মেও এরকম কথা কেউ শোনে নি। যে শুনেছে সেই আশ্চর্য হয়ে বলেছে: 'সে কি গো! এগুলো কি মানুষ?' সুতরাং হাড়শুদ্ধ মাংস খাওয়ার কথা শুনে আজ আর কেউ আশ্চর্য হয় না।

সেই রাত্রে সকলের কাছে লিংসাও যখন এই সংবাদ দিল এবং বলল যে উলীনও সেই বিষাক্ত মাংস খেয়েছিল, লাও-এর বলল: 'আরও একটু বেশী খেয়ে মরে গেলেই তো পারত।'

নিজের হাতে মাংসের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে লিংসাও, তবুও ছেলের এ-মন্তব্য ভাল লাগেনা তার। হাজার হোক জামাই তো। বলে: 'ওকথা বলে না, ওতো তোর ভগ্নীপতি।'

লাও-এর মায়ের মুখের ওপরে আর কোন কথা বলে না। কিন্তু নীলা

বলে অতি ধীর কণ্ঠে : 'মা, এদিনে যে ভাই বোনের প্রতি কর্তব্য থেকেও বেশী কর্তব্য দেশের প্রতি।'

বৃদ্ধ লিংটান লিংসাও পুত্রবধূর কথা শোনে, কিছু বলে না। কীইবা বলবে। এরাই তো মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের, সমাজের ভবিষ্যৎ তো এরাই। লিংটান লিংসাওদের কাল তো গত হয়েছে। কিন্তু তবুও লিংসাওর মায়ের মন সইতে পারে না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বৃদ্ধা কাঁদে···চাপা কান্না···মেয়ে ও জামাইর জন্য। স্বামীকে বলে : 'যুদ্ধ শেষে দেশে শান্তি এলেও সে-পুরোনো দিনের প্রীতি-সম্পর্ক কি আর ফিরে আসবে ?'

দৃঢ় প্রমিত কণ্ঠে লিংটান বলে : 'সে-দিন আর ফিরবে না, ফিরতে পারে না। আমরা যারা বুড়ো হয়েছি এ-কথা নিশ্চিত ভাবেই আমাদের বোঝা উচিত। আর দেখছ না পরিবর্তনটা। প্রাচীনের সঙ্গে এরা সব যোগসূত্র কেটে দিচ্ছে। আমাদের সঙ্গেও যে নাড়ীর টান আছে হয়তো শত্রু তাড়ানোর প্রয়োজনে দরকার হলে তাও কেটে ফেলবে। দেখছ না ছেলেদের সেই পুরোনো রীতির প্রতি ভক্তি-সম্মান বোধ আজ কোথায় গিয়েছে ?' অন্যায় বলবে কি লিংটান এই পরিবর্তনকে ? হয়তো এটাই কালোপযোগী, হয়তো আগত মুক্তির স্বাগতম বাণী উচ্চারিত হয় এই পথেই। লেখাপড়া জানে না লিংটান, কিন্তু তবুও সে বোঝে যে যদিও ছেলেরা আর আজকাল সেই প্রাচীন রীতিতে সম্মান দেখাবে না বাপ মা কিংবা বয়োবৃদ্ধদের, তবে তারা এদের ঘৃণা করে না। এরা চায় মুক্তি, মুক্তি সবকিছু থেকে, সর্ব বাঁধন থেকে, মুক্তি চায় নতুন যুগকে আহ্বান জানাতে। হ্যাঁ, ছেলেরা এগিয়ে গেছে, বৃদ্ধদের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

শত্রু হলেও মানুষ-হত্যার এই যে পরিকল্পনা নীলা করেছিল এবং সেই পরিকল্পনা যখন সফলও হ'ল, নীলার মনে কেমন যেন ভয় হ'ল, হয়তো লাও-এর অপছন্দ করছে। একদিন সে বলল স্বামীকে :

'আমাকে তুমি ঘেন্না কর না তো ?'

'ঘেন্না ? তোমাকে ঘেন্না করব কি গো ?' বিস্ময়াবিষ্ট লাও-এর বলে।

এইমাত্র স্নান সেরে এসে নীলা দাঁড়িয়েছে লাও-এর সামনে। কাপড় ছাড়বে···নগ্ন দেহ। শোবার আগে কোণের টেবিলের কাছে বসে একটু চা পান করছিল লাও-এর। বুকের ওপরে হাত দুটো রেখে নীলা বলে :

'আমার মধ্যে আর সৌন্দর্য ব'লে কিছু নেই···কেমন একটু রোগা হয়েছি, দেহটাও শক্ত হয়ে গেছে। আজ পুকুরে কাপড় কাচতে কাচতে জলে দেখলাম নিজের ছবি···কেমন পুরুষালি চেহারা হয়েছে, মেয়েলি ভাব মুছে গেছে—' কাপড়টা টেনে নিয়ে দেহে জড়াতে জড়াতে বলে নীলা।

'বয়সও তো হ'ল গো। বিয়ের কনের সে-সৌন্দর্য আর এখন নেই, একথা ঠিক।'

ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে নীলা তাকালো স্বামীর দিকে। বলল : 'সেদিন যদি আমার এই চেহারা থাকত, আমায় বিয়ে করতে ?

হাসতে হাসতে বলে লাও-এর : 'হয়তো না। কিন্তু আমারও তো পরিবর্তন হয়েছে। আমিও কি সেই বিয়ের বর আছি নাকি ? তখন যা ভাল লাগত, এখন কি আর তাই লাগে ?'

স্বামীর মুখে হাসি দেখে নীলার বুক থেকে ভার নেমে যায়। বলে :

'তুমিও আর সেরকম সুন্দর নেই। কেমন কালচে মেরে গেছে···একেবারে পোড়া রং!'

'হ্যাঁ, অনেক কালো হয়েছি।'

'চুলের রংও মরচের মতন কটা হ'য়ে গেছে।'

ছোট্ট একখানা আরশি ছিল টেবিলের উপরে। তুলে নিয়ে স্বামীর সামনে ধরে বলে নীলা : 'পুরুষের আবার সুরত কি, কি বল ?'

হাসতে হাসতে উত্তর দেয় লাও-এর : 'তোমার কাছে তা হলেই চলো : আরও কারোও চোখে ভাল লাগা না-লাগায় তো আমার কিছু যাবে আসবে না।'

কিছুক্ষণ আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নীলা বলে :

'মুখে রং পাউডার মাখব নাকি, আর কানের দুলটা ?'

'ইচ্ছে হয় নাকি ?'

'তুমি তো আমাকে আর দুল দিলেই না।'

'কিন্তু তুমি তো নিজেই দুলের বদলে বই নিয়েছিলে।'

'কি জানি, হয়তো ভুল করেছিলাম।' একটু নীরব থেকে বলে নীলা। তখনও আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে নীলা। লাও-এর বলে : 'আচ্ছা দেব গো দেব, একজোড়া দুল কিনে দেব'খন!' প্রাণখুলে হাসে লাও-এর। সেই সুমধুর আবেগের উষ্ণতা জেগে উঠেছে দু'জনেরই মাঝে।

কত শ্রান্তি ক্লান্তি ভরা দিন, কত বিপদের মধ্য দিয়ে তারা অতিবাহিত করছে, কিন্তু তারই মধ্যে পরম শান্তির মুহূর্তে অন্তহীন ভালবাসার মহাসাগরে তারা অবগাহন করছে বার বার···চিরস্থির অচঞ্চল সে-ভালবাসা। কিন্তু তবুও আজ যেন নীলা ঠিক ধরা দেয় না, কেমন একটু সরে থাকে। কেন এমন ক'রে সরে থাকছে প্রিয়া ? জিজ্ঞেস করে : 'কি ব্যাপার গো ?'

সেই চিরপুরাতন আর চিরনূতন লজ্জাবনত বধূ মুখ লুকোয় স্বামীর বাহুর মধ্যে। লাও-এর প্রিয়ার মুখ বারে বারে তুলে ধরে। স্বামীর মুখের দিকে সোজাসুজি না তাকিয়ে মিন মিন করে ক'রে বলে নীলা : 'একটা কথা বলব, ঠিক উত্তর দেবে ?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বল না, কি জানতে চাইছ।'

'আমি যা করেছি তার জন্য মনে মনে তুমি আমাকে ঘৃণা কর, না, আগের মতই তুমি আমাকে ভালবাস ? কেমন যেন ভয় করে আমার। আমার মেয়েলি ভাব কমে গেছে ব'লে কি তোমার মনে হয় ?'

'কি করেছ তুমি ? কোন্ কাজটা বলতো ? কত কাজই তো তুমি কর!'

সেই যে,—খাবারের মধ্যে বিষ মেশানো। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে যায়, ভাবি এ আমি কি করলাম—কেমন যেন ঘেন্না হয় নিজেকে।'

'অন্যায় তো কিছু করোনি। ও-ব্যাটারা তো শয়তান, দুশমন।'

'তা তো জানি। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন, হয়তো দেশে যেদিন শান্তি ফিরে আসবে, সেদিন আমার এই খাবারের সঙ্গে বিষ মিশানোর জন্য হয়তো তোমার মনের কোণের চাপাপড়া ক্ষোভ মুখ ফুটে বলবে : "খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছিল এই মেয়ে—" তখন আমার প্রতি তোমার গভীর ভালবাসা কি থাকবে প্রিয়—'

হা ক'রে তাকিয়ে থাকে লাও-এর নীলার মুখের দিকে। এটাই হলো নীলার আসল চিত্র। নীলার চরিত্রের এদিকটা তো তার নজরে পড়ে নি আগে কোনদিন। যেমন সাহসী তেমনি শক্ত, এবং তারই মধ্যে লজ্জাবনত বধূর কোমল অন্তঃকরণ। বড় ভাল লাগে লাও-এরের। কোন্ কথাটা বললে সত্যিই সুখী হবে জানতো সে। বললে :

'অসীম সাহসের কাজ করেছ তুমি নীলা। তোমার মত কোন্ মেয়ে এত সাহসিনী আছে ?'

নীলার দয়িতদেহের পানে তাকিয়ে থাকে লাও-এর। ভাষা যায় হারিয়ে,

প্রেমের শিহরণ জাগে সর্বদেহে। নিজের দেহ সংলগ্ন ক'রে নিয়ে তাকিয়ে দেখে নীলার মুখের প্রতিটি রেখা। সেই চোখ মুখ, ঈষদ বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র। হোক বিস্ফারিত, তবু ভারী সুন্দর···টানা দুই চোখ যেন দুটো পদ্মপাপড়ি— তারই কোলে সেই ঈষদ স্ফীত নাক···ভারী ভাল লাগে লাও-এরের। আস্তে আস্তে বলে :

'আর একটি শিশু যদি আসে তোমার কোলে নীলা! শুধু একটি নয়, আসুক আরও আসুক, অনেক শিশু আসুক তোমার কোলে। বারে বারে তোমার কোল ভরিয়ে দি আমি— !'

॥ তের ॥

শক্র-সেনাপতির হুকুমে উলীন কাগজ তুলি নিয়ে বসেছে। ইতিপূর্বে উলীনের তুলি দিয়ে যে লেখা বেরিয়েছে, শক্ররা বড় বড় হরফে সেগুলো বহু সংখ্যক ছেপে মন্দির ও প্রাচীর গাত্রে সেঁটে দিয়েছে।

যে-ঘরে বসে বসে শক্রর নির্দেশ লিখছে উলীন, সে-ঘর সাজান রয়েছে কত আধুনিক আসবাবপত্রে। শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে লুট ক'রে আনা হয়েছে এই সব বহুমুল্য জিনিষ। নীচে বিছানো রয়েছে নীল ও সোনালী রংএর গালিচা। তিনটি দামী পিয়ানো ঘরের এ-কোণে ও-কোণে। এগুলো বাক্সে ক'রে চালান হ'য়ে যাবে বিজেতাদের দেশে। উলীন নীরবে বসে অপেক্ষা করে নির্দেশের জন্য। দু'একটি কথা বলার পর শত্রুসেনাপতি জিজ্ঞেস করে :

'আমি যা বলেছি, ঠিক ঠিক লিখেছ?'

'হ্যাঁ, লিখেছি।' নম্রকণ্ঠে উত্তর দেয় উলীন।

'আচ্ছা, আবার লেখ—' হুকুম করে শত্রু-সেনাপতি।

উলীন লেখে। কাগজের মাথায় বড়বড় হরফে লেখে :

"মুক্তি! মুক্তির তারকা!! পূর্বএশিয়ায় মুক্তির নব ব্যবস্থা!!" তারই নীচে ছোট হরফে লেখে : "বন্ধু নাগরিকবৃন্দ! শ্বেতাঙ্গ শয়তানদের শোষণ আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। এই একশ' বছর ধরে ঐ শয়তানদের বিরুদ্ধে আমরা আপ্রাণ লড়েছি, চেষ্টা করেছি ওদের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে, কিন্তু পেরে উঠিনি!"

একটু থেমে উলীনকে জিজ্ঞেস করে: 'কি বল ঠিক কথা নয়?' লোকটা বেটে, মেজাজ তিরিক্ষি। সাধারণ জাপানীদের থেকেও এ-লোকটা আরও বেটে, এবং সেই জন্যেই বোধহয় উচ্চগ্রামে মেজাজটি বেধে রেখে নিজের ওজন বাড়িয়ে রাখবার চেষ্টা করে। পকেটে সে একটা ব্রাশ রাখে এবং একলা হলেই মেজাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে ব্রাশ ঘসে ঘসে ভ্রু বিস্ফারিত করে। তার কাজটা যদিও এই সব প্রাচীর-পত্র তৈরির ব্যবস্থা করা, তা হলেও সর্বসময়েই সে থাকে ক্যাপ্টেনের মিলিটারী পোষাকে। প্রাচীর-পত্রের শেষে তিনটি কথায় নাম লেখা থাকে: "মহান জনসংঘ।" অর্থাৎ প্রাচীর-পত্র বিজেতা শত্রুর লেখানয়, প্রাচীর-পত্র সেঁটেছে এদেশেরই জনসাধারণের নবগঠিত সরকারের পিছনের গণ সংগঠন "মহান জনসংঘ।"

বেটে শত্রু-পুঙ্গব হুকুম করে: 'লেখ—'

উলীন লেখে: "কেন পারিনি আমরা? কারণ এদেশ ছিল দুর্বল, শৌর্য-বীর্য হীন।"

জিহ্বা দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে কথাগুলো বের ক'রে দিয়ে তাকিয়ে দেখে সৈনিকপ্রবর উলীনের মুখের দিকে। উলীনের প্রস্তরস্থির মুখে কোন পরিবর্তনের রেখাই ফুটে ওঠে না। দোকানের হিসেব লেখার মত বিড়বিড় ক'রে সে আওড়াল ঐ কথাগুলো। সৈনিক প্রবর বলে চলে আর উলীন লেখে:

"কিন্তু আজ আমাদের মহা সৌভাগ্য যে আমাদের এই মহান শ্বেতাঙ্গ-খেদা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে আমাদেরই এশিয়ার এক বন্ধু-রাষ্ট্র নিপ্পন। আমাদের জন্য কি বিরাট স্বার্থত্যাগই না করেছে সেই রাষ্ট্র। প্রতিদান হিসাব তারা কিছুই চায় না, শুধু চায় যে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হোক পূর্ব-এশিয়ার নব-ব্যবস্থা! এই নব-ব্যবস্থা যে শুধু আমাদের সাময়িক মুক্তি দেবে তাই নয়, আমাদের দেবে চিরস্থায়ী স্বাধীনতা। আমাদের দেশে কোটি কোটি জনসাধারণের সত্যিকারের মুক্তি এনে দেবে এই নব-ব্যবস্থা।"

নিজের কাজে আনন্দিত শত্রু-সৈনিক সোজা দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে ওঠে: 'বানজাই! বানজাই!!'

বড় বড় চোখ মেলে উলীন বলে: 'একথাও কি লিখব স্যার?'

উলীনের ভাব লেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত সৈনিক চিৎকার ক'রে বলে: 'বল বানজাই!'

অতি ধীর কণ্ঠে উলীন বলে : 'বানজাই।' প্রাচীর-পত্রে সে-কথাটা লিখে জিজ্ঞেস করে : 'আর কিছু কি লিখতে হবে স্যার?'

উলীনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সৈনিক প্রবর বলে : 'বানজাই লিখলে কেন? ঘটে কি একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই? এটা তো জন-সাধারণের সংগঠনের প্রাচীর-পত্র! এর মধ্যে ঐ-কথা থাকবে নাকি? একেবারে মোটামাথা।'

বানজাই কথাটা কেটে দিয়ে জিজ্ঞেস করে উলীন: 'তবে শেষে কি লিখব স্যার?'

'লেখ, "মহান জনসংঘ।" '

অস্তিত্বহীন গণসংগঠনের নাম লিখে দেয় উলীন।

নিঃশব্দে গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। গাম্ভির্যের সঙ্গে চীনা ভাষায় সেই প্রাচীর-পত্র লেখার ব্যবস্থা ক'রে ক্লান্ত উলীন যায় তার অন্দর মহলে। সেই বিষাক্ত মাংস খাওয়ার পর থেকে তার শরীর ভেঙ্গে গেছে। সেই মাংস সেও একটু খেয়েছিল বলেই শত্রু-সেনাপতিরা তার ওপর সন্দেহ করে নি। ক্লান্ত উলীন একটা হেলান-দেওয়া চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে। পেয়ালায় ক'রে মাংসের শুরুয়া খেতে দিয়ে চিন্তিত স্ত্রী স্বামীকে বলে: 'এই রকম বিপদের মধ্যে প্রাণ হাতে নিয়ে বাস ক'রে লাভ কি?'

'কিন্তু কোথায় যাবে? আমার জীবন তো আজ সব জায়গাই বিপদ-পূর্ণ? কোথায় যাব বল? বাঘের গর্তে, না, সিংহের আস্তানায়?'

শ্রান্তিতে চোখ বুঁজে আসে উলীনের।

উলীনের লেখা বড় বড় হরফে প্রাচীর-পত্র লিখে লাগিয়ে দেওয়া হয় শহরের নানা স্থানে। পিছু পিছু লোক ছোটে—প্রাচীর-পত্র পড়বার জন্য নয়, যে ময়দার লেই দিয়ে সেই কাগজ সাঁটা হচ্ছিল তাই কিছু পাওয়া যায় কিনা তারই জন্য। তাই দিয়ে যেটুকু ক্ষুন্নবৃত্তি করা যায়।

লিংটনের সেই পণ্ডিত ভাই এমনি একদিনে শহরে এল। কি সব লেখা বড় বড় কাগজ দেয়ালে সাঁটা হচ্ছে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল পড়-বার জন্য। কিছুটা ঘটনাটি কি জানবার জন্যও বটে আর কিছুটা চার-দিকের অজ্ঞ জনতাকে তার বিদ্যার বহর শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার

জন্যও বটে ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল পণ্ডিত। চোখে চশমা এঁটে জোরে জোরে প্রাচীর-পত্রে লেখা পড়ে পণ্ডিত।- নিরক্ষর জনতা সম্বিৎ ক'রে চুপ হ'য়ে শুনল সেই লেখার বাণী। সেই পাঠ শুনে শ্রোতারা আরও নীরব হ'য়ে গেল। তাদের মধ্যে যে কি প্রতিক্রিয়া হলো, তার কোন পরিচয়ই ফুটে উঠল না তাদের মুখাবয়বে। নিশ্চুপ নিস্তব্ধ জনতা। দেশ দখল হবার আগে যারা হৈ হুল্লোড়ে রাস্তাঘাট মাতিয়ে রাখত, মনের ক্রোধ যারা চেপে রাখত না, বিক্ষোভে ফেটে পড়ত যখন তখন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠত এই রাস্তাঘাটেই, আজ তারা একেবারে নিশ্চুপ। পণ্ডিতের পাঠ শুনে তিক্ত নীরবতায় যে যার গন্তব্য পথে চলে গেল। পণ্ডিতের মনে হয় ঐ প্রাচীর-পত্র পাঠ না করলেই বোধহয় ভাল হোত। সে চায় এ সব কিছু ভুলে থাকতে, কিন্তু তার মনে হয় তার এই পাঠে প্রতি-হিংসার তুষ-চাপা আগুন যেন আরও বিস্তার লাভ করল।

সব কিছু ভুলে গিয়ে শান্তিতে থাকবার জন্য পণ্ডিত ইদানীং আফিং ধরেছে। সস্তা আফিং-এর এক ডেরা জানা ছিল তার। তিনটি রাস্তা পেরিয়ে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে সে এসে হাজির হ'ল একটা নোংরা আস্তানায়। ছোট্ট দরজা দিয়ে ঢুকলো ঘরের ভিতরে। দিন রাত্রি খোলা থাকে এই নেশা-স্থান। একটি হলদে রংয়ের ক্ষীণাঙ্গী টেরা মেয়ে বুড়োকে খড়-বিছানো চৌকি দেখিয়ে দিল। একটা কাঠের টুকরোয় মাথা রেখে বুড়ো গা এলিয়ে দিল সে-খড়ের বিছানায়। মেয়েটি পাইপে ক'রে আফিং এনে দিল বুড়োর হাতে। পরমধন পেয়ে বুড়ো আফিং-এর সুগন্ধ গ্রহণ করে দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে। আরামে চোখ বুঁজে আসে। আঃ, কি শান্তি! দুঃখ-হরণ স্বপ্নক্ষরণ নিঃসঙ্গ শান্তির ক্রোড়ে নিলীন হ'য়ে যায় নির্দ্বন্দ্বী নেশাখোর বুড়ো। কে কাকে শাসন করে! সে মুক্ত, সে স্বাধীন। কত সুখস্বপ্নে সে সময় কাটিয়ে দেবে এখন। এই ডেরার বাইরের জগতে কে শাসন করবে না-করবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, বিস্মরণের অতলে সে ডুবে যায়।

বুড়োকে নেশায় ধরল কি ক'রে? বৌ-ভীত বুড়োর দিন কাটত স্ত্রীর হুকুমে। উলীনের সমীপে দরকারী অদরকারী ছোট বড় নানাধরণের খবর বহন ক'রে নিয়ে তাকেই যেতে হতো ইদানীং। গাঁয়ের পথে নতুন লোক দেখেছে বুড়ী, কিংবা পাহাড়ের দিকে কারা সব অচেনা লোক গেল,

লিংটানের বাড়ীতে বোধহয় কারা যেন সব আনাগোনা করে, ছেলেরাও আসা-যাওয়া করে—এসব খবর গিয়ে দিয়ে আসতে হবে উলীনকে, তারই বিনিময়ে উলীন টাকা দেবে তাদের। এই সব ছোট খাট টুকরো খবর দিয়ে এমন কি বৃহৎকর্ম হ'তে পারে ভেবে পায় না গেঁয়ো পণ্ডিত। কেমন ভয় ভয় করে তার সর্বসময়ে। যদি তাকে শত্রু-সেনারা ধরে চূড়ান্ত শাস্তি দেয়! এদের তো কারণ খুঁজে দেখার দরকার করে না। আর অত্যাচারও তো সোজা অত্যাচার নয়! জীবন্ত অবস্থায় চোখ উপড়ে ফেলা, গুহ্যদ্বার দিয়ে পেটের ভিতরের অন্ত্র টেনে বের ক'রে নেওয়া, কান কিংবা নাক কেটে দেওয়া এবং নানারকম বীভৎস অত্যাচারের কথা সকলেই জানে। আর কবে যে কাকে ধরে তার উপর এইসব অচিন্তনীয় অত্যাচার হবে, কেউ জানে না। যে-কোন লোকের এই দুর্ভাগ্য যে-কোন দিন ঘটতে পারে। বৃদ্ধ পণ্ডিত আফিংএর নেশায় বুঁদ হ'য়ে বিড়বিড় ক'রে বলে : 'পূর্ব-এশিয়ার নব শাসন-ব্যবস্থা!' তারপরেই ঢুলতে ঢুলতে বেরিয়ে পড়ে উলীনের বাসস্থানের দিকে। উলীন তাকে দেবে দুটো টাকা। তারই একটা সযত্নে লুকিয়ে রাখবে পরের দিনের সাময়িক বিস্মৃতির সাগরে ডুব দেবার জন্য এই আফিংএর নেশা করতে। তাও তো আসল আফিং পায় না বুড়ো। আরও যদি কিছু বেশী টাকা খরচ করতে পারত, তা হ'লে দামী নেশা-স্থানে যেতে পারত। এখানে অল্প টাকায় যা দেওয়া হয় তাতে নেশা জমে না। আসল আফিং-এর ছিটে-ফোটা কিংবা নেশাখোরদের ফেলে দেওয়া ভুসো বিক্রি করে সস্তা-দামের এই সব নেশা-বিপণী। জীবন-যুদ্ধে পরাজিত আশাহীন ক্রমবর্ধমান নেশাখোরদের ভিড় ঠেলেই পণ্ডিত আনাগোনা করে। পুরোনো দিন ফিরে আসুক, বিদেশীরা বিদায় নিক, ফিরে আসুক দেশের স্বাধীনতা—মনে মনে চায় এরা সকলেই, কিন্তু আশায় থেকে দিন গোনার সাহস নেই এদের কারও। তাই কঠিন বাস্তব বর্তমান ভুলে থাকতে চাই বিস্মৃতির নেশা, চাই আফিং।

পণ্ডিতের এই পরিণতি সম্বন্ধে গ্রামে কেউই কিছু জানত না। তার শুকনো হলদেটে মেরে যাওয়া চেহারা লিংটান দেখেছে, কি বর্তমানের দুরবস্থা-অনটনের দিনে নাদুস নুদুস চেহারা আর কার আছে, সকলেই তো পাঁশুটে মেরে গেছে। তারপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা'র মতো এসেছে

বন্যা···ক্ষেতের শস্য নষ্ট হয়ে গেছে। তবু তো আগে লিংটানরা কিছু শস্য লুকিয়ে রেখেছিল সম্বৎসরের খাওয়ার জন্য। অর্ধাসন থেকে, প্রায় না খেয়ে না খেয়ে থেকে, নেহাৎ অপারগ হ'য়ে কিছু কিছু মুখে পুরে দিন কাটায় তারা।

কিন্তু পণ্ডিত-পত্নী উলীনকে যে খবর পাঠাত, উলীন যে কি করত তা দিয়ে কিছুই বুঝতে পারত না পণ্ডিত। শত্রু-সেনাবেষ্টিত প্রাসাদের বাসিন্দা উলীনকে যে-কাজ করতে বলত বিজয়ীরা, বিনা বাক্য ব্যয়ে সে তাই ক'রে যেত। বিনয়ী নম্র বলেই তাকে তারা জানত। মাইনে হিসেবে সে যা পেত তার থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি আধলাও খরচ করত না। বিজয়ী শত্রুদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তার ছেলেরাও বেড়ে উঠতে থাকে, তাদের ভাষাও এরা শেখে। প্রাসাদের বাইরে দেশী স্কুলে ছেলেদের পাঠায় না উলীন।

উলীন যে খবর নিজে সংগ্রহ করত তার একটিও বিদেশী বিজয়ীদের কানে পৌঁছত না। বিভিন্ন স্থান থেকে আট দশ জন লোকের মারফৎ যে খবর পেত বিজয়ী বিদেশীদের নব শাসন-ব্যবস্থা কি ভাবে দেশের লোক গ্রহণ করছে। শুধু শুনত তারা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ে নারকীয় বীভৎসতার তাণ্ডবলীলা সুরু করেছে দেশের নানাস্থানে। শহরের যে-অবস্থা ঠিক তাই হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। শত্রুর বিরুদ্ধে মুক্ত এলাকা থেকে যে প্রতিরোধ লড়াই সুরু হয়েছে, তার খবর সে পেত, শ্বশুরের কানে খবর পৌঁছবার আগেই উলীন সংবাদ পেয়ে যেত তার শ্যালকরা কি ভাবে বিদেশী শত্রু-শাসকদের বিরুদ্ধে আঘাত সুরু করেছে।

যদি ভবিষ্যতে শহর শত্রু-কবল থেকে মুক্ত হয়, উলীন আবার ফিরে যাবে নিজের পূর্ব অবস্থায়। নিজের কাছে নিজের কাজের জবাবদিহি করত উলীন, অন্ততঃ নিজের কাছে সে ছিল বিশ্বস্ত। যতদিন এ-অঞ্চল শত্রু-কবলিত থাকছে ততদিন পরিশ্রম সহকারে কাজ করবে এবং আশা রাখে সুদিন এলে একদিন বৃহৎ কিছু ক'রে সে দেখাতে পারবে যে সে যা করেছে, অবস্থার বিপাকে তার মতন লোকের সেই ছিল একমাত্র করনীয়। ইতিমধ্যে সঠিক যা করা সম্ভব, তাই সে করত। কিন্তু সে যেসব খবর সংগ্রহ করত এবং তার বিনিময়ে যে টাকা খরচ করত তা তো আসত শত্রুদের নিকট থেকে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের দু' একটা ছোট খাট খবরের ওপর বিস্তৃত বিবরণী-লিখে সে পাঠিয়ে দিত বিজয়ী শত্রুদের হাতে। কিন্তু লিং গ্রামের কোন খবরই ঘুণাক্ষরেও সে কাউকে জানাত না। শুধু সম্পর্ক আছে বলেই নয়, বিপদের মাঝে শ্বশুর মশাই

আশ্রয় দিয়েছিলেন তার মাকে, মার মৃত্যুর পর তাঁর কবর দিয়েছিলেন—এ দুর্দিনে মাটির নীচে শান্তিতে সমাহিত করবার ব্যবস্থাই তো অসম্ভব—তাদের যাতে বিপদ না হয় তার চেষ্টা করত উলীন।

এই বিজয়ী শত্রুদের মধ্যে একজন ভালো লোকও ছিল। তার সঙ্গে ঘটনা চক্রে উলীনের বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। সে ছিল শিল্পী, চিত্রকর—যুদ্ধ সে পছন্দ করত না। নিজের চোখে এদেশের যুবতীদের এমন কি বৃদ্ধাদের ওপরে তারই দেশের লোকদের বলাৎকার দেখে সে অত্যন্ত মর্মাহত। দিন দুপুরে প্রকাশ্য স্থানে এই অপকর্ম সৈনিকরা করে···প্রতিবাদ করবার সাহস কারও হয় না—যদি কেউ করে, তার মৃত্যু অবধারিত। আর নিজের চোখে এই প্রতিবাদ করার জন্য খুন হতেও তো সে দেখেছে। এসব দেখে দেখে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত লোকটি একদিন উলীনকে বললে :

'মন খুলে যে একটু কথা বলব কারও সঙ্গে, তারও উপায় নেই, লোকও নেই। তোমাদের দেশের লোকজন ও মেয়েদের ওপর আমার দেশের এই নর-পশু সৈনিকরা যে অত্যাচার করে, তার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত, লজ্জিত। আমাদের সম্রাট বাহাদুর যদি একটু জানতে পারতেন! কিন্তু সেকথা কি আর কারও জানাবার উপায় আছে? আর মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের কথা বলব কি, আমাদের দেশের লোকেরাই কি জানে যে তাদের ছেলে, ভাই, স্বামী, কিংবা বাবারা এই সব অপকর্ম আরেক দেশে গিয়ে করে?'

উলীন নতুন কথা শোনে। শত্রুসেনাদেরই একজনের মুখে এ কি কথা? উত্তরে দু'চারটি কথা মাত্র বলে সে, বেশী কথা শোনে। এরই মুখে সর্বপ্রথম উলীন শোনে যে যুদ্ধ আর শুধুমাত্র এই দেশেই নেই, বহু দেশেই এই যুদ্ধ চলেছে, হয়তো পৃথিবী ব্যাপীই এখন যুদ্ধ চলেছে। উলীন জিজ্ঞেস করে: 'এত খবর তুমি জানলে কি ক'রে?'

লোকটি উঠে উলীনকে তার নিজের কামরায় নিয়ে আসে। পরপর ছোট দুটি চাবি ঘুরোবার পরে দেখে একটি ছোট্ট বাক্স থেকে অতি নিম্নস্বরে কথা শোনা যাচ্ছে। এই যন্ত্রের কথা উলীন আগে শুনেছিল কিন্তু চোখে দেখেনি। যন্ত্রটি খুলে দিয়ে লোকটি উলীনকে বলল: 'শোন!'

উলীন শোনে···সেই ছোট্ট বাক্স থেকে সে সর্বপ্রথম জানতে পারে যে বহু দেশেই যুদ্ধ চলেছে···এই সহরে যেভাবে বোমা পড়েছে, সেই ভাবে পড়ছে পশ্চিম দেশের শহর গুলোর ওপরে। লোকটিকে জিজ্ঞেস করে উলীন:

'এরকম যন্ত্র কি আমায় একটা কিনে দিতে পার!'

'আচ্ছা, একটা দেব'খন।'

লোকটির সঙ্গে হৃদ্যতা জমে ওঠে উলীনের। তারই কাছে সে জানতে পারে কি ব্যাপকতর হয়েছে এই যুদ্ধ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লোকটি বলে: 'হয়তো দুনিয়া ব্যাপী এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের এই সব লোকেরা এতে আনন্দিত হ'য়ে উঠেছে···তারা ভাবে, দুর্দমনীয় শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে আমাদের দেশ, প্রত্যেকটি লোক বলে এক একজন মহাধনী হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি আর পেরে উঠছি না···আমি চাইছি দেশে ফিরে যেতে। সমুদ্রের পারে আমাদের বাড়ী···বুড়ো বাপ মা, স্ত্রী শিশু পুত্রদের নিয়ে বাস করতে পারলেই আমি সুখী···আর কিছু চাই না।'

উলীন একটা রেডিও নিয়ে এসে তার ঘরে বসাল। অবসর সময়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত উলীন চাপাস্বরে-বাঁধা রেডিও শোনে···অনেক সময় গান বাজনা আজেবাজে কথাও শোনা যায়···আবার শোনা যায় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সংবাদ··· ক্ষুধার্ত লোকের মতন তখন সে শোনে সেই সংবাদ। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি ও অবর্ণনীয় কষ্টের কথা শোনে। সংবাদ শেষ হ'য়ে গেলে ভাবতে ভাবতে সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। ভয়ে কাঁপন ধরে মনে। কি সময় পড়েছে! 'কি দুঃসময়, কি দুঃসময়, কোনোখানে ভাল কিছু নেই—' বিড়বিড় ক'রে বলে উলীন।

এমনি ক'রে একদিন উলীন যখন রেডিও শুনছিল, সংবাদের মধ্যে যখন সে ডুবে ছিল, পণ্ডিত এসে হাজির হ'ল। এই তাজ্জব জিনিষ দেখে উলীনকে সে জিজ্ঞেস করল বাক্সটি সম্বন্ধে। অত ভেবেচিন্তে না দেখে সে পণ্ডিতকে বাক্সটি দেখাল, দেখাল কি ভাবে রেডিও চালাতে হয়, কি ভাবে শব্দ আসে . ওপরের তার ও বাক্সের চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। সেই সময় সংবাদ বিতরণ বন্ধ হ'য়ে গেছে, সুরু হয়েছে হাল্কা ধরণের গান। বাক্সটি দেখে পণ্ডিতের মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। এই যন্ত্রটি যদি সে কোনমতে একবার পায় তো এই খবর বিতরণ ক'রেই সে বেশ দু'পয়সা কামাতে পারবে। নেশাখোর পণ্ডিত ভাবে, সে তখন আসল নেশায় বুঁদ হ'য়ে থাকতে পারবে। বারে বারে সে উলীনের কাছ থেকে রেডিওর খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে জেনে নিল। তবু তার উঠবার নাম নেই। অবশেষে উলীনকে ঘর ছেড়ে ক াজেবেরিয়ে যেতে হ'ল। সেই ফাঁকে বৃদ্ধ পণ্ডিত ছোট রেডিও বাক্সটি তুলে

তারগুলো গুটিয়ে নিজের আলখাল্লা পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পণ্ডিতের এবাড়ীতে হরদম আনাগোনার জন্য দ্বাররক্ষীরাও তাকে ছেড়ে দিল। পণ্ডিত বুঝেছিল যে উলীনের কাছে আসার পথ চিরতরে বন্ধ হ'য়ে গেল। আর আসবার প্রয়োজনই বা কি, সে এখন প্রচুর পয়সা কামাতে পারবে।

কিন্তু এই বাক্সটি কোথায় রাখা যায়? শহর ছাড়া তো এই যন্ত্র চলবে না। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই নেশাঘরের ক্ষীণাঙ্গী তরুণীর কথা। ও মাগী তো কেবল টাকাই চায়। এখন যে টাকা ও পাবে তা থেকে কিছুটা ওকে দিলেই হবে। কি কায়দায় এই বাক্স থেকে কথা বের করা যায় তা ওকে শেখাবে না। কেবল সাবধানে লুকিয়ে রাখার জন্য মেয়েটিকে কিছু টাকা দেবে।

নেশাঘরে এসে বসতেই মেয়েটি এগিয়ে এল নেশা নিয়ে। পণ্ডিত বলল: 'কি গো, আর কিছু বেশী আয় করতে চাও নাকি।'

'কি উপায়ে? আমায় রাখবে নাকি?'

'না, না—এক বৌ-মাগীর ঠেলাতেই অস্থির!' তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় পণ্ডিত।

'তা হ'লে?'

'আগে একটু নেশায় দম দিয়ে নি—একটু, বেশী না। খিদেটা মরে অথচ ঘুমিয়ে না পড়ি। তারপর একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে তোমায় বলব। কেউ যেন আবার শুনতে না পায়।'

সেই মাত্রায়ই নেশা করল পণ্ডিত। নেশা কাটিয়ে যখন সে জেগে উঠল, মেয়েটি তাকে নিয়ে এল তার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে···দীন দরিদ্র আসবাবহীন কোঠা ···এককোণে একটা পায়াহীন ভাঙ্গা টেবিল, দুটো বেঞ্চি, শোবার জন্য দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের মাচা। ক্ষুদ্র জানালায় ঝোলান রয়েছে পাখীর খাঁচা··· একটা ছোট্ট হলুদে পাখী রয়েছে তাতে। পণ্ডিত ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে সাদর সম্ভাষণ জানায় পাখীটি। সে ভাবল, বোধহয় তার আলখাল্লার নীচের বাক্স থেকে শব্দটা আসছে। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে অনুভব ক'রে সে নিশ্চিন্ত হল। পূর্ণ সম্বিতে ফিরে এলে পণ্ডিত দেখল ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি তাকে ধরে মৃদু ঝাঁকতে ঝাঁকতে বলছে: 'জাগো, জাগো—মাঝরাত্তির তো হ'ল!'

সজাগ দৃষ্টি মেলে পণ্ডিত জিজ্ঞেস করে কোথায় সে এসেছে। নেশাঘরের পিছনে উঠান পেরিয়ে মেয়েটির ঘর। নিরাপদ বুঝে পণ্ডিত এবার বাক্সটি বের

ক'রে তার প্ল্যানের কথা বলল মেয়েটিকে। মাচার নীচে বাক্সটি বসিয়ে দেয়ালের বিজলীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে ঘরের দেয়ালের লোহার শিকের সঙ্গে একটা তার জড়িয়ে দিল। তারপর বাক্সের চাবি ঘুরিয়ে তড়িৎ-পূর্ণ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল সংবাদের। কিছুক্ষণ পরে আওয়াজ এল:

'মুক্ত এলাকা থেকে আজকের খবর···' তারপর একে একে সেই আওয়াজ শুনিয়ে যায় কোথায় কোন শহরে গাঁয়ে শত্রুরা বোমা ফেলেছে, দেশের লোক কি ভাবে সেই সময় পালিয়ে থাকে, কি ভাবে জনসাধারণ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছে তারই বিবরণ দেয় বাক্সের সেই কণ্ঠস্বর। তারপর বলে: 'কিন্তু আমরা আজ আর শুধু একলা নই···আজ এই একই শত্রু পশ্চিম দেশেও আক্রমণ করেছে···আমাদের মতন সেই সব দেশের লোকও লুকিয়ে থাকে, আমাদের মতই তারা সংগ্রাম করছে···আমরা পরাজিত হই না, আমরা মাথা নোয়াই না···'

একটা অদ্ভুত শব্দ ওঠে ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটির কণ্ঠে, কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়ে পণ্ডিত জিজ্ঞেস করে: 'কি হ'ল, কি হ'ল গো?'

'ওরা এখনও প্রতিরোধ করে? আমরা এখনও লড়ছি? আমি তো ভেবেছিলাম যে আমরা হেরে গিয়েছি, মাথা নুইয়ে শয়তান বেটাদের শাসন মেনে নিয়েছি।'

মাথা ঝোঁকে পণ্ডিত উত্তর দেয়: 'এই বাক্সের খবর সব সত্যি।'

'মানুষ তো এই কথাই শুনতে চায়···আর এ-খবর দিয়ে আমরা কিছু টাকাও আয় করতে পারব। এঘরে বাক্সটা তুমি নিরাপদেই রাখতে পারবে। আমি কাউকে না আনলে এখানে কেউ যেন না আসে!'

স্ত্রীর কাছে এখন ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলে পণ্ডিত। উলীন বলে তাকে এখন রাত্রে যেতে বলেছে, দিনে নয়। আর বেশী টাকা স্ত্রীর হাতে দাওয়াতে তার মনে সন্দেহও হ'ল না। কিন্তু এই গ্রামে ফিরেও যাওয়া পণ্ডিত আস্তে আস্তে বন্ধ ক'রে দিল। টাকা যখন তার হাতে এল, তখন সে ছুটল আসল আফিং-এর দোকানে। সেই কালো তেল কুচকচে এঁটেল জিনিষটির নেশায় ডুবে গিয়ে অসফল আকাঙ্খিত জীবনের স্বপ্নরাজ্যে ঘু'রে বেড়ায় সে এখন। ঘরে ফেরা বন্ধ হ'য়ে যায়, দিনের পর দিন সে থাকে নেশায় ডুবে। তারপর ফেরার কথা মনে হ'তে মনে আসে স্ত্রী-ভীতি। নিজের মনেই সমাধান আসে: 'কি জন্য

বাড়ী ফিরব? ঐ দজ্জাল মাগীর কথা কেন শুনব? আমার মত আমি একলাই পরমানন্দে থাকতে পারি।' আশ্চর্য, একথা আগে ওর মনে হয় নি কেন? তখন থেকে পণ্ডিত শহরেই থেকে গেল, গ্রামমুখী আর হ'ল না। দিনভোর সে থাকে নেশা আর স্বপ্নে ডুবে, রাত্রে সেই বাক্সের খবর শুনে তাই বিতরণ করে। তার পরিচয় কেউ জানে না, সেই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটিও নয়। সে শুধু তাকে জানে আফিংখোর ব'লে। আর, নিশাচর পণ্ডিতের সাথে কোন চেনামুখেরও দেখা হয় না…রাত্রে আর কে আসবে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শহরে? আজ পণ্ডিত সত্যিই মুক্ত, স্বাধীন।

শত্রুকবলিত শহরে পণ্ডিতের এই সংবাদ বিতরণ কিন্তু প্রেরণার উৎস হ'য়ে দাঁড়াল। প্রতিরোধ সংগ্রামের সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল উৎসুক শহরবাসীর কানে…শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ ক'রে দিয়েছে মুক্ত এলাকার জনসাধারণ, এ-খবর প্রত্যয় আনে তাদের মনে। 'আমরা প্রতিরোধ করছি, শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি।' ফিস ফিস ক'রে একজন বলে আর একজনকে। শৃঙ্খল-জর্জরিত নিরানন্দ জীবনের মাঝে আশার চিরাগ জ্বলে ওঠে, সকলের মনে সাহস মাথা উচিয়ে ওঠে।

চোদ্দ

লিংগ্রামে পণ্ডিতের দিনের পর দিন অনুপস্থিতি সকলকে চিন্তিত ক'রে দিল। কোথায় সে, কেউ জানে না। পণ্ডিত-পত্নী সোজাসুজি এসে দোষী করল লিংটানকে। প্রতিদিন তার বাড়ীতে এসে পণ্ডিত-পত্নীর ক্রন্দন ও শাপান্তে অস্থির হ'য়ে উঠল লিংটান। লিংটানের মনে হয় পণ্ডিত ঘর ছেড়েছে দজ্জাল বৌর যন্ত্রণায়, কিন্তু সে-কথা মুখের ওপরে বলে কি ক'রে? মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবে, কি ক'রে ভাইয়ের খোঁজ করা যায়। লেখাপড়া জানা লোকেরা বলে প্রায়ই নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাচ্ছে…আর শহরে তো কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করা যাবে না।

পণ্ডিত-পত্নীর মনেও ভয় হয়। উলীনের কাছে গতায়াতের মধ্যে বিদেশী শত্রুদের হাতে পড়ে নাকাল হচ্ছে না তো স্বামী? এ-গ্রামের কেউই জানে না যে তারা উলীনের গুপ্তচরের কাজ করে, এবং লিংটানকে কি সে-কথা বলা

যায়? বারে বারে সে লিংটানকে অনুরোধ করে, ছেলেদের কাউকে শহরে পাঠিয়ে পণ্ডিতের খোঁজ করতে।

ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে লিংটান। লাও-এর বলে: 'আমি নিজেই যাব একবার জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। অনেকদিন তাকে দেখি না। একবার তাকে যাচাই ক'রে আসি, আর অমনি বুঝেও আসি তার সাহায্যে কিছু করা যায় কিনা।'

বাপ মা কেউই রাজী হয় না। ছেলেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে লিংসাও। কিন্তু লাও-এর নীলা আজকাল যা ঠিক করে, বিচার বিবেচনা করেই ঠিক করে। বাপ মার কথায় তারা সিদ্ধান্ত বদলায় না।

একদিন সোজাসুজি লাও-এর এসে হাজির হ'ল উলীনের আবাসে। উলীনের শ্যালক বলে পরিচয় দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করতে তার বিশেষ অসুবিধাই হয় না। উলীনের আবাস-স্থলে নিয়ে যাবার আগে তাকে প্রতীক্ষা করতে হয় একটি বসবার ঘরে। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সুদৃশ্য দামী আসবাব মণ্ডিত ঘর খানি। গালিচা বিছানো মেঝের ওপরে সাটিন মোড়া চেয়ার। বিস্ময় কাটবার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় ভগ্নীপতি উলীন। গন্ধ তেল মাথায়, নক্সা আঁকা সাটিনের জামা গায়ে, মোটা আঙ্গুলগুলোয় সোনার আংটি। লাও-এরের কঠিন মুখে একটু বিদ্রূপের ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে। বলে: 'তাহ'লে জামাইবাবু আছ ভালই দেখছি!'

'মোটামুটি ভালই।' উত্তর দিয়ে উলীন বিশ্লেষণ করে শ্যালকের মন। বেশ বিনয়ী কণ্ঠে খোঁজখবর নেয় শ্বশুর শাশুড়ী ও বাড়ীর অন্যান্যদের। তারপর প্রতীক্ষা করে লাও-এরের এই হঠাৎ আগমনের কারণ জানবার জন্য।

লাও-এর তোলে পণ্ডিত-খুড়োর কথা, তার গ্রাম থেকে অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার সংবাদ। খুড়ীর যা কান্না! কি যে করা যায় বুঝতে পারছে না তারা। উলীনের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। আস্তে উঠে হঠাৎ দরজাটা খুলে দেখে কেউ আড়ি পেতে তাদের কথা শুনছে কিনা। কাউকে না দেখে দরজাটা বন্ধ ক'রে ফিরে এসে ফিস ফিস ক'রে লাও-এরকে বলে পণ্ডিত দম্পতির গুপ্তচর বৃত্তির কথা। বলে, গ্রামের খবর দিতে এসে রেডিও দেখে তার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে সে কিভাবে সেই যন্ত্র চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। মৃদু হাসতে হাসতে বলে উলীন:

'এই শহরেও তো আমার লোক আছে…তাদের কাছেই জানতে পেরেছি শহরের কোথায় বসে পণ্ডিত সেই যন্ত্র দিয়ে কি করছে।'

মনে মনে লাও-এর উলীনের বুদ্ধির তারিফ করে। শত্রুর পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র হয়েও সে ঠিক তাদের নয়। নিজের গুপ্তচর সে চারদিকে অতি গোপনে ছড়িয়ে রেখেছে। উলীনকে বলে: 'ভেবেছিলাম তুমি আমাদের বিরুদ্ধে…এমনকি আমি তোমার মৃত্যুকামনাও করেছিলাম।'

স্মিত মুখে উলীন বলে: 'আমি কারও বিরুদ্ধে নই ভাই।'

'তুমি কি আমাদের পক্ষে?' সোজাসুজি প্রশ্ন করে লাও-এর।

'দিন কালের অবস্থা বুঝে।'

তারপর বলে পণ্ডিতের কথা: 'এখন তো পণ্ডিত আফিং-এর নেশায় বুঁদ হ'য়ে আছে। বেশ রাত্তির ক'রে "উইলো চা-খানা"-র ভিতরের ঘরে গিয়ে হাজির হয়ো।' এরপর উলীন স্ত্রীকে ডেকে দেয় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তৃতীয় সন্তান কন্যারত্ন প্রসব করেছে উলীন-পত্নী। সকলেই এত হৃষ্টপুষ্ট যে লাও-এর ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না এদের নিজের আত্মীয় স্বজন ব'লে। ভাগ্নে-ভাগ্নীরা এল। তাদের মুখে দেশী ও শত্রুর ভাষার মিশ্রিত কথা শুনে হা ক'রে তাকিয়ে থাকে লাও-এর। অদ্ভুত বিজাতীয় লাগে সবকিছু। ক্ষুণ্ণমনে সে বেরিয়ে পড়ে।

"উইলো চা-খানা"-য় সোজাসুজি গেল না লাও-এর। এসব কথা বাবাকে জানানো দরকার বলে মনে হ'ল তার। নিরিবিলি পথ দিয়ে লাও-এর ফিরে গেল গ্রামে। উলীনের কাছে শোনা সব কথা বিষদভাবে সব বলল বাবাকে। গুপ্তচর বৃত্তি করে পণ্ডিত দম্পতি, এ গাঁয়ের সব কথা তারা বলে উলীনের কাছে। লিংটান গম্ভীর হ'য়ে যায়, অনেকক্ষণ একটি কথাও বের হয় না তার মুখ দিয়ে। কোন্ কোন্ খবর জানে উলীন, বিপদের আশঙ্কা কতটা আছে? প্রশ্ন করে ছেলেকে। লাও-এর বলে:

'লোকটার মধ্যে বিশ্বস্ততা কতটা আছে জানি না। মনে হয় সে শুধু নিজের কাছেই বিশ্বস্ত। যদি তাই হয় তাহ'লে আমাদের খুব বিপদের আশঙ্কা নেই। কারণ, যেদিন শত্রুরা এদেশ ছেড়ে পালাবে, তখন সে বলবে যে ইচ্ছে ক'রেই সে নিজেকে বাঁচিয়েছে।'

'মাটির নীচের গোপন-ঘরের কথা কি উলীন জানে?' জিজ্ঞেস করে লিংটান।

'জানি না। আর তাকে জিজ্ঞেসই বা করি কি ক'রে?'

'যদি জেনে থাকে তো আমাদের জীবন নিরাপত্তা সব তার হাতের মুঠোয়।' পণ্ডিত দম্পতির ওপর ভীষণ রাগ হয় লিংটানের। ইচ্ছা হয় বৌঠানের গলা টিপে ধরে সত্যকথা তার পেট থেকে বের ক'রে নেয়। কিন্তু তা ক'রে লাভ কি? পণ্ডিত ভাই কি করেছে কি বলেছে, তাই কি আর স্ত্রীকে বলেছে? কিছু না ব'লে চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভ্রাতৃবধূর কথা লিংটান চিন্তার রাজ্য থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু তার প্রতি কেমন এক অদ্ভুত ঘৃণা বাসা বাধে তার মনে। আগেও তাকে তার মোটেই ভাল লাগত না, কিন্তু আজকের এই ঘৃণা যেন অসহ্য। ছেলেকে বলে:

'চল্, কাল আমরা দু'জনে গিয়ে ধরি পণ্ডিতকে।'

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে লিংটান লাও-এরকে নিয়ে চলল শহরে। লিংসাওকে বলে গেল শহরে তারা যাচ্ছে জরুরী প্রয়োজনে। শহরে এসে প্রতি রাস্তায় দেখে অদ্ভুত পরিবর্তন। বহুদিন পরে লিংটান এসেছে শহরে। সে-শহর আর নেই। শত্রু-দেশের পণ্য সাজিয়ে বসেছে দোকানী…হরেক রকম দাওয়াই সাজানো আছে—সর্বরোগহরা "হিতৈষী বটিকা", "বিশ্ববিদ্যালয কাজল", আর সেই সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে বারবনিতার দল। লিংটানের মনে হয়, বোধহয় শত্রুদের এই বারবনিতা ও ওষুধই শুধু দেবার আছে এসব দেশে। তাছাড়া আছে অলি গলি সর্বস্থানে আফিংএর নেশাঘর ও বেশ্যালয়। নতুন নতুন দোকানও বসেছে বিদেশী পণ্য সাজিয়ে। রাস্তায় চোখে পড়ে শত্রু-সেনাদের বৌ ছেলে মেয়েদের। আশ্চর্য হ'য়ে ভাবে লিংটান, ঐ নরপিশাচ বন্য স্মরাতুর শত্রুসেনাদেরও তবে বৌ ছেলেমেয়ে আছে? এই বিদেশিনী ঘরণীদের দেখে লিংটানের দুঃশ্চিন্তা হয়। শত্রু-সেনাদের দেখলে মনের স্বাভাবিক ঘৃণা জেগে থাকে, কিন্তু এদেশে এসে সংসার বসিয়েছে যেসব শত্রুদেশের মেয়ে বৌ, তাদের দেখলে সে-ঘৃণাভাব থাকবে কি?

আজকের শহরের চা-খানায় সাবেক দিনের চা-দেওয়ার কাজে নিযুক্ত লোকেরা নেই। তার স্থানে এসেছে চটুল চাউনি যুবতীরা। একটা চা-খানায় চেয়ার টেনে বসল বাপ বেটা। কি চাই জিজ্ঞেস করতে এল এক যুবতী পরিবেশিকা। মেয়েটির চোখে চটুল চাউনি দেখেই লিংটান তার

সঙ্গে কথা বলল না। কিন্তু লাও-এর বলল যে এরকম মেয়ে আজকাল সব চা-খানায়ই। তখন ছেলের মুখ দিয়ে লিংটান শুধু চায়ের অর্ডার দিল।

বিদ্রূপ মেশানো চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে যুবতী দু'কাপ চা এনে দিয়ে দাম চাইল। চায়ের আকাশ-ছোঁয়া দাম শুনে লিংটান আঁৎকে উঠল, চা আর তার গলা দিয়ে নামতে চায় না। 'আগে জানলে বাপু চা খেতামই না। এখন আফ্‌সোস।'

'হুঁ, এই রকম দাম শুনেই বুড়োর পিলে চমকালো! আর এই জিনিসের দাম যদি শোনে—' ভ্রুভঙ্গী ক'রে যুবতী তার কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটা রূপোর কেটো বের করে। তার মধ্যে শাদা রংয়ের কি একটা গুঁড়ো রয়েছে। 'বুঝলে মিনসে, এর এক আউন্সের দাম তিনশ ডলার...আর এক ডলারেই তো বাপু অন্যভাবে মজা লুটতে পার।' চটুল চাউনি হেনে মেয়েটি বলে। না-বোঝার ভান দেখায় সেয়ানা লিংটান। সুবিধা হবে না দেখে রূপোর বাক্সটি আবার কাপড়ের ভাঁজে রেখে অন্য খদ্দেরের খোঁজে চলে যায়।

ফিস ফিস ক'রে লাও-এর বলে : 'এই শাদা গুঁড়ো নেশাটা হলো আফিংএর থেকেও মারাত্মক।'

লিংটান জানে কি এই নেশা। কিন্তু না-জানার ভানই সে দেখাল। আজকাল তো শহরে অল্পবয়সের ছেলেদেরও এই নেশায় পেয়ে বসেছে। আর যে একবার এই নেশা করেছে, তার পক্ষে তা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। নীরবে বসে বসে চা পান করে লিংটান। চা তার মুখে বিস্বাদ ঠেকে। তারই দেশের মেয়ে পরিবেশন করেছে এই চা...যে-মেয়েকে চিরদিনের জন্যই নষ্ট ক'রে দিয়েছে শত্রু-শয়তানরা।

পুরোনো দিনের সেই সাজানো চা-খানা আর নেই। দেয়ালে যে ছবি ছিল সেসব নিয়ে গেছে বিজয়ী সৈন্যরা, সুদৃশ্য দরজা জানালাও ভেঙ্গে গেছে, ছাদের কারুকার্যও ধোঁয়ায় ও অযত্নে নষ্ট হ'য়ে গেছে। ছোট ছোট অতি সাধারণ টেবিল ও বেঞ্চ দিয়ে সেই এককালের মনোহারী সাজানো ঘর আজ ভর্তি হ'য়ে আছে। আগের দিনে লিংটানরা এই সব চা-খানার চৌহদ্দিও মারাতে সাহস পেত না, এসব স্থানে সাধারণ লোকেরা প্রবেশ করত না। কিন্তু এই যুদ্ধে আজ সকলেই দরিদ্র অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটা টেবিলে বসে বসে বাপ ছেলে লক্ষ্য করে অন্যান্য

চা-পিয়াসীদের সাথে তাদের কোন তফাত নেই আজ। চারিদিকে নজর দিয়ে দেখতে দেখতে চা-পান শেষ ক'রে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে তারা। আট দশ জন লোকের সঙ্গে তারাও এসে হাজির হয় পিছনের একটা জানালাহীন ছোট্ট ঘর। এককালে এটা ছিল রান্নাঘর। কোণের দিকে রয়েছে ইঁটের ভাঙ্গা উনুন। ঘরে আসবাবের মধ্যে রয়েছে গোটাকয়েক নড়বড়ে বেঞ্চি ও একটু দূরত্ব রেখে একখানা চেয়ার।

অন্যান্য আগত লোকদের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রেখে পুত্র-সহ লিংটান দাঁড়াল। কারণ, এখুনি পণ্ডিত ভাইয়ের সামনে নিজেদের প্রকাশ করা সমীচীন মনে করে না তারা।

কিছুক্ষণ পরে ঐ ছোট ঘরেরই একটা সঙ্কীর্ণ দরজা খুলে গেল। ভিতরের দেয়াল-গিরির ক্ষীণ আলোয় আশ্চর্য হ'য়ে লিংটান দেখল পণ্ডিত ভাই···সাটিনের জামা গায়ে···নাকের ওপরে পুরু চশমা। লোকটা শুকিয়ে হলুদেটে মেরে গেছে, জামাটা গায়ে ঝুল ঝুল করছে। ছেলের দিকে ঝুঁকে বলে : 'এতক্ষণে বুঝলাম তোর কাকার এত সাহস হ'ল কোত্থেকে!' লাও-এর মাথা নাড়ে।

পণ্ডিত তাদের দেখতে পায় নি। বিদ্যাদিগ্‌গজ জ্ঞানী ব্যক্তির মতন হেলতে দুলতে দুলতে সে এসে বসল চেয়ারে। শ্রোতারা যেন সকলেই তার ছাত্র। চেয়ারে বসে ছোট্ট ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে স্মিত মুখে যেন শ্রোতদের নীরব সম্ভাষণ গ্রহণ করলো সে। তারপর আস্তে আস্তে বলল :

'আজ খারাপ ভাল দু'রকম খবরই আছে। শত্রুদের বিমান হানা পুরোদমেই চলেছে···লোকজনের ঘরবাড়ী সব পুড়ছে। শত্রুরা চায় যে আমরা নিরাশ হ'য়ে পড়ি। আমাদের মহান প্রিয় নেতা নির্দেশ দিয়েছেন : মুষড়িয়ে পড়বার কোন কারণই নেই, শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও, প্রতিরোধ কর।···দেশের জনসাধারণের সঙ্গেই তিনি থাকেন, একই দুঃখ কষ্ট তিনি ভোগ করেন।'

একটা ছোট্ট গুঞ্জন ওঠে শ্রোতাদের মধ্যে। একজন প্রশ্ন করে :

'কি উপায়ে আমরা রুখব, তার কি কোন নির্দেশ দিয়েছেন নেতা? শত্রুদের অবস্থা কি? তারা কি আরও শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে?'

'এসব খবর এখনও পাইনি। তবে নিশ্চয়ই পাব শিগগিরি।' এই

ব'লে পণ্ডিত চোখ দু'টো ঘুরিয়ে নিয়ে আর একটু জোর-ফিসফিসানো স্বরে বলে : 'অন্য খবরের মধ্যে হ'ল যে আমাদের মিত্র রাষ্ট্ররা এখন পর্যন্ত সোজাসুজি বন্ধু হিসেবে আমাদের সাহায্যে এগোচ্ছে না। আহতদের জন্য তারা খাদ্য এবং ওষুধ পাঠাচ্ছে বটে কিন্তু তারা শত্রুদের দিচ্ছে তেল ও জ্বালানী যা দিয়ে শত্রুরা বিমান চালিয়ে আমাদের ওপরে ধ্বংস-বৃষ্টি চালাচ্ছে। পশ্চিমে ইঙ্গদের দেশে বড় বড় শহর পশ্চিমি শত্রুর বিমান হানায় ধ্বংস হচ্ছে। রাত্রির পর রাত্রি ইঙ্গরা মাটির নীচে পালিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচছে বটে, কিন্তু তাদের বাড়ীঘর, বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকা সব ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। মৃতের সংখ্যাও প্রতিদিন বাড়ছে।'

এত খবর বুড়ো পায় কি ক'রে, আশ্চর্য হ'য়ে যায় শ্রোতারা। তবুও সকলেই সেইসব খবরে বিশ্বাস করে। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে পণ্ডিত ব'লে চলে :

'এতক্ষণ খারাপ খবর বলি নি। এবার শোন। এই শহরে শিগ্-গিরই একটা তাবেদার সরকার গঠিত হবে। আমাদের দেশের নামে কিন্তু শত্রুর হুকুমে একজন শাসনকর্তা শাসন চালাবেন। আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই বলে তিনি শাসনকর্তা হ'তে রাজী হয়েছেন! তিনি হলেন "বরুণ রাজার তিনিটি ফোঁটা" নামে যে লোকটি, তিনি।...ঐ লোকটা আমাদের রক্ষা করবে কি ক'রে? তার সে-শক্তি কোথায়? তার তো বলে সব সময় দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে তার অনুশোচনায় অশ্রুজলের সাগরে ঐ পশ্চিমের পাহাড়ের সব পাথর ফেলে দিলেও সে-সাগর ভরবে না।'

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। মাথা নেড়ে পণ্ডিত বলে : 'সত্যি বড়ই দুঃসময়...আগামী রাত্রে এই সময় আরও খবর তোমাদের দিতে পারব।'

এই ব'লে বুড়ো পণ্ডিত তার ঝোলা জামার ভিতর থেকে একটা পাত্র বের ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে চেয়ারের ওপরে রেখে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। শ্রোতারা বোঝে তাদের এ-স্থান ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে। ওরা গেলে অন্যান্য শ্রোতারা আসবে এখানে। যে যা পারল, তাই বের ক'রে পণ্ডিতের ঐ পাত্রে দিয়ে বেরিয়ে গেল। লিংটান ও লাও-এরও কিছু পয়সা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাড়ী ফেরার পথে মনে মনে হাসল লিংটান। পণ্ডিত তো বেশ

কায়দার রাস্তা ধরেছে। গল্প-কথকের মত পাত্রটি রেখে আগামী দিনের নূতন খবরের কথা বলে সে। ইতিপূর্বে পণ্ডিত ভাইকে এত সুখী সে কোনোদিন দেখেনি। লিংটান ঠিক করে যে পণ্ডিতের কথা কাউকে সে বলবে না। এই রকম একটা অকর্মা লোককে দিয়ে ভগবান এই কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, আশ্চর্য!—লিংটান ভাবে।

পণ্ডিতের কথা ছেড়ে দিয়ে লিংটান এবার ভাবে পণ্ডিতের মুখে যে-খবর শুনে এল তার সম্বন্ধে। এ-শহরের সর্বজন পরিচিত ধনী প্রবরটিকে দিয়ে তাবেদার শাসন-ব্যবস্থা চালু করবে শত্রুরা। এই সুদর্শন দুর্বল বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে ক্রোধ জমে ওঠে লিংটানের মনে। মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। সত্যি সত্যি কি লোকটা দেশদ্রোহীর কাজ করছে, না, মাথার মধ্যে কোন প্ল্যান এঁটে এই শাসনকর্তার কাজ হাতে নিচ্ছে? কিন্তু কে জানে কার মনে কি আছে?

বিস্তীর্ণ সুফলা মাটি তো এখনও সেইভাবেই আছে···গাঁয়ের কত কৃষক মরেছে, কত বাড়ীঘর শত্রু-অনাচারে বিনষ্ট হয়েছে, গাঁয়ের কৃষাণের পোড়াবাড়ীগুলো হা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে···এই পথ দিয়েই গাঁয়ের কৃষাণরা যেত শহরের বাজারে তরিকরকারী সব কতকিছু বিক্রি করতে··· গাধার পিঠে চাপিয়ে বস্তা বস্তা চাল যেত এই পথ দিয়েই শহরের চাল-পট্টীতে···শহর থেকে কতরকম মনোহারী পণ্য নিয়ে আসত গাঁয়ের পথে ফেরিওয়ালা, গাড়ী হাঁকিয়ে কতজন যেত এই পথেই···আর আজ? জনশূন্য পথ ধূ ধূ করছে। কচিৎ কখনও দু'একজন কৃষককে কিছু খাদ্য নিয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু সেই সুফলা মাটি ঠিকই আছে তার বিরাট বিস্তৃতি নিয়ে। এই মাটি ছেড়ে যদি কেউ চলে না যায়, মাটির সঙ্গে যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে, নাড়ীর বন্ধন যদি ছিন্ন না করে, এই কর্ষণসমৃদ্ধা বসুমতীই তো বাঁচিয়ে রাখবে সকলকে। পথের ধূসর ধুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চিন্তামগ্ন লিংটান ছেলেকে বলে:

'আমরা জমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। মাটির সঙ্গে যাদের নাড়ীর বন্ধন নাই, ঐসব বড়লোক শয়তানরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু আমরা মাটির বিরুদ্ধে যেতে পারি না। মা'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা?'

লাও-এর বাবার চিন্তার সূত্র ধরতে পারে না, কিন্তু বোঝে কি যেন

গভীর ভাবে ভাবছে বাবা। তাই বলে : 'হুঁ, জমি আমরা ছাড়ব না, মাটির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু করা অসম্ভব।'

পরদিন পণ্ডিত-পত্নী এল। গম্ভীর বিষাদগ্রস্ত বদনে লিটান বলল :

'বৌঠান, যে অমঙ্গলের আশঙ্কা তুমি করেছিলে, তাই হয়েছে। ভাই আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে। তুমি বিধবা—'

চিৎকার ক'রে কেঁদে পণ্ডিত-পত্নী লুটিয়ে পড়ে : 'কি ক'রে মারা গেল, তার লাশ কোথায়?'

'ও-কথা জানতে চেয়োনা, বৌঠান। আর কিছু বলতে পারব না। লাশ ফিরিয়ে পাবারও কোন পথ নেই।'

চুপ ক'রে যায় সদ্যবিধবা পণ্ডিত-পত্নী। আজই সর্বপ্রথম ভয় ও দুঃখে সে মুষড়িয়ে পড়ল। বাড়ীতে ফিরে এসে শোকাতুরা নারী প্রথম উপলব্ধি করল আগামী দিনের নিঃসঙ্গ জীবনের বাস্তব রূপ। পুরুষ-হীন গৃহে একাকিনী বাস করা কত বিপদের! ভয় হয়, যদি লিংটান জানতে পারে যে সে গাঁয়ের মধ্যে বাস ক'রে খবরাখবর দেওয়ার জন্য গুপ্তচরের কাজ করে! লিংটানের মুঠোর মধ্যে তো ওর জীবন আজ। দুর্দিনের নিঃসঙ্গ জীবনের মাঝেই পণ্ডিত-পত্নীর সে-বিষদাঁত ভেঙ্গে গেল, গর্বোদ্ধত মাথা নুইয়ে গেল। লিংটানের কাছে এসে নম্রস্বরে বলল :

'আমার তো আর কেউ নেই, তুমি ছাড়া। আর কোথায়ই বা যাব—'

'তোমার চিন্তা নেই বৌঠান। আমরা যদি খেতে পাই তো দুমু'ঠো ভাত তুমিও পাবে।'

পণ্ডিতের সম্বন্ধে বাপ-ছেলে কেউই আর কাউকে কিছু বলল না। এমনকি লিংসাওকে পর্যন্ত লিংটান কিছু বলল না। মুখরা হিংগুটে ভ্রাতৃবধূর ভার লিংটান নিজের ঘাড়েই তুলে নিল এই ভেবে যে নির্ভাবনায় অকর্মা পণ্ডিত শহরে বসে তবু তো কিছু করতে পারবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সে-কাজ-টুকুরও অনেক দাম আছে।

কিন্তু অর্ধাঙ্গিনী নীলাকে সব কিছু বলে লাও-এর। কোন কিছুই সে তার কাছে চেপে রাখে না। দু'জনে মিলেই তো এক। বুড়ো পণ্ডিতের কথা শুনে মন খুলে হাসে নীলা। কিন্তু তাবেদার শাসনকর্তার কথা শুনে নীলা গম্ভীর হ'য়ে যায়। বলে : 'এই তাবেদাররাই সব থেকে ক্ষতি

করে, এরাই আমাদের সত্যিকারের দুষমন। এরা নিজেদের সত্তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে। বিদেশী শত্রুরা হ'ল রোগ বিশেষ, কিন্তু তাবেদাররা হ'ল আমাদের নিজেদের দুর্বলতা। এই দুর্বল স্থানগুলো জিয়ানো থাকলে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে কি ক'রে?'

'কিন্তু দেশের আমরা যারা শক্তি ধরি, আমাদের আরও শক্তি বাড়াতে হবে।' চিন্তামগ্ন লাও-এর মন্তব্য করে।

নীলা মুখ তুলে তাকায় স্বামীর দিকে। 'ঠিক কথাই বলেছ তুমি।' শত্রুর বিরুদ্ধে, দুষমনের বিরুদ্ধে এরা দু'জন আরও দৃঢ়সংকল্প হয়।

॥ পনের ॥

শত্রুর বিরুদ্ধে এইভাবে বছরের পর বছর রুখে থাকা কি সম্ভব? কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের লোকেরাও। সেই আশা-জাগানো খবরে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাবার সংকল্প আরও দৃঢ়তর হয়। অতর্কিত আক্রমণে যে শত্রু খতম করা যায়, তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যক শত্রু ইদানীং চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। খুব বড় রকম কোন আক্রমণ করা হয়তো সম্ভব হয় না এই শত্রু-অধ্যুষিত অঞ্চলে, তবুও এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধের অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত ক'রে রাখে, আশা জাগায় লোকের মনে, প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে মরে শহীদ হওয়া মহাসম্মানের ব'লে মনে করে সকলে।

এরই মধ্যে নীলার দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। লাও-এর শহর ও পাহাড়, দেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার বিপদপূর্ণ কাজ ক'রে চলেছে। নিজের হাতে জীবন নিয়ে তাকে আনাগোনা করতে হয়। প্রতি রাত্রে লাও-এর ও নীলা পরস্পরকে বিদায় জানায়, মনের কোণে আশঙ্কা থাকে হয়তো আর তাদের দেখা হবে না, কিন্তু সে-আশঙ্কার কথা মুখে প্রকাশ করতে পারে না। 'সাবধানে চলাফেরা ক'রো' নীলা বলত প্রতি রাত্রে বিদায়ের মুহূর্তে। লাও-এরও প্রতিবারই বলে যেত : 'হ্যাঁ করব গো—,' কিন্তু মনের গহনে তারা জানতো যে সেই সাবধানে চলাফেরা হ'য়ে

উঠত না লাও-এরের, কারণ, একটু বিপদের ঝক্কি না নিলে তো কাজই করা যাবে না।

লাও-এরের কাজ পড়েছিল শহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলোয় যে গেরিলারা সংগঠিত হয়েছিল, যারা দিনের বেলায় গেঁয়োভূত বোকা কৃষক হয়ে মাঠে ক্ষেতে চাষের কাজ করত, তাদের সঙ্গে পাহাড় দেশের যোগাযোগ স্থাপন ক'রে সুনির্দিষ্ট প্ল্যান অনুযায়ী একই সঙ্গে আক্রমণ চালানোর ব্যবস্থা করার। কাজটি খুব সহজ নয়। সে বয়ে নিয়ে আসত খবর, এবং তারই ওপর সকলে নির্ভর করত। শত্রুর ভিতর দিয়ে তার যাতায়াত ছিল বিভিন্নরূপে। কোন সময়ে সে চলত শত্রু-দেশের পণ্য ফেরি করতে করতে, কোন সময়ে সে যেত ভিখিরীর সাজে, কোন সময়ে সে যেত প্রায় পঙ্গু বৃদ্ধের রূপে। এবং এসমস্ত সাজই অতি সুনিপুণভাবে তৈরী ক'রে দিত নীলা। পাহাড়দেশে গেলে দেখা হ'ত তার দু'ভাইয়ের সঙ্গে। তাদের সে গ্রামের খবর দিত। সে শুধু সংবাদদাতাই ছিল না, তাদের মধ্যে ধৈর্য জাগিয়েও রাখত তার এইসব খবর। মাঝে লিংটানের সঙ্গে তার ও ছেলেদের মনোমালিন্য হয়। লিংটান বলেছিল যে মানুষ-হত্যার মধ্যে,—হোক সে শত্রু—সে আর নেই। লাও-সান জিজ্ঞাসা করে: 'যার যা খুশি তাই করবে নাকি? নিজের নিজের নিয়ম এক একজন তৈরী ক'রে নেবে? শত্রুরা এসে আমাদের সব খুন করবে, আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব! বুড়োর ভীমরতি হয়েছে···ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় বাবা—!'

লাও-সান এখন দিন রাত্তির সৈন্যের পোষাক পড়ে থাকে। তার মন, চেতনা সব সময়েই যুদ্ধ এবং মৃত্যু নিয়েই ঘিরে থাকে। লেখাপড়া সে জানে না···আর কি প্রয়োজনই বা বইয়ের···সুদৃঢ় দক্ষিণ হস্তের মধ্যে যতক্ষণ তরোয়াল কিংবা বন্দুক থাকছে ততক্ষণ আর কিসের প্রয়োজন? পাহাড় দেশে অবস্থিত এক ষষ্ঠী-দেবীর মন্দিরে লাও-সান আস্তানা গেড়েছে। দু'শ' পঞ্চাশ জন তেজী যুবক তার নেতৃত্বে এই মন্দির-দুর্গ থেকে বেরিয়ে খাদ্য সংগ্রহকারী শত্রু-সেনাদের ছোট ছোট দলের উপর প'ড়ে খতম ক'রে দেয়। খবর যোগাড়ের জন্য চারদিকে চর রয়েছে। এ-অঞ্চলে শত্রু-সেনা এলে এক ঘণ্টার মধ্যে লাও-সান সে-খবর পেয়ে যায়।

কিশোর বালকের নম্রতা কমনীয়তা আর নেই লাও-সানের চেহারায়। আরও লম্বা হয়েছে সে। গায়ের রং হয়েছে কাঁচা সোনার। পূর্ণ যৌবনের

জোয়ার উঠেছে তার পেশী সঞ্চালিত সুদৃঢ় দেহে। চোখের চঞ্চল চাউনিতে বাঘের হিংস্রতা। ও যে বিশ বিশটা বিয়ে করেনি এখনও, তার মূলে রয়েছে ভিন্ন কারণ। অনেক মেয়েকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে লাও-সান ও তার সঙ্গীরা। অনেক সময় বহু স্থলে ওরা আপ্যায়িত হয়েছে : সেখানে লাও-সানের চোখ-ধাঁধানো চেহারা দেখে তার প্রতি বিমোহিতাদের ইঙ্গিত ইশারা যে বর্ষিত হয় নি, তাও নয়। শিথিল চরিত্রের মেয়েদের বাদ দিয়েও নিষ্কলঙ্ক যুবতীরাও নিজেদের অজ্ঞাতে লাও-সানের স্বর্ণকান্তির দিকে অপাঙ্গে মোহিত দৃষ্টি ফেলেছে। কিন্তু উনিশ বছরের যুবক হলেও লাও-সানের যুবোচিত পরিবর্তন যেন প্রতীক্ষ-মান। কিশোর বয়সে পাশবিকতার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার ফলে বয়োধর্মের পূর্ণ বর্ধন হয় নি তার মনে। তবু তো সে মানুষ, দেহের প্রয়োজনের উপলব্ধি তাকে নাড়া দেয় বৈকি। যদিও এখানে ওখানে মেয়েদের সঙ্গে যে একেবারে তার রাত্রিবাস হয়নি তাও নয়, তবুও মেয়েদের প্রতি তার যেন কেমন একটা বিতৃষ্ণা। কোন মেয়েকেই তার মনে ধরে না। প্রিয়া বলে, স্ত্রী হিসেবে, গ্রহণ করবার মত কাউকে সে খুঁজে পায় না। শুধুমাত্র রাত্রিবাসের সঙ্গিনী ক'রে সে চায় না কোন মেয়েকে। আরও কিছু, অন্য কিছু সে চায় তার জীবন-সঙ্গিনীর কাছে। তার মনের ভিতে যে এই বাসনা পাকাপোক্ত ভাবে বাসা বেঁধেছে তা নয়, অতি ক্ষীণ দোলা উঠেছে মাত্র।

কিন্তু কোথায় সে মেয়ে, কোথায় লাও-সানের সেই কল্পনার প্রতিমা?

নারী-সঙ্গ-কামনা যেদিন তীব্র হ'য়ে উঠত, লাও-সান উঠত ক্ষেপে। তার সঙ্গী সাথীরাও বিব্রত হ'য়ে পড়ত তাদের দলপতির জন্য। সেদিন যদি ভাগ্য-ক্রমে শত্রু-সেনার আনাগোনার খবরাখবর পাওয়া যেত, নিজ হাতে হত্যা ক'রে লাও-সানের উত্তেজনা প্রশমিত হতো, সে আবার স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে আসত। কিন্তু এ সুযোগ তো আর যখন তখন আসত না। তখন লাও-সান-এর মেজাজের সামনে টিকে থাকাই দায় হ'য়ে উঠত।

এমনি একসময়ে, একাদশ মাসের শেষের দিকে সংবাদ বহনকারী, লাও-এর এল পাহাড় দেশে। মেজাজী ছোটভাইয়ের সহকর্মী একজন চুপে চুপে তাকে ষষ্ঠী-দেবীর মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে ডেকে নিয়ে এল। ষষ্ঠী-ঠাকুরাণী পুজো পেয়ে থাকেন কেবল পুজারিণীদের কাছ থেকে। কিন্তু এই দুর্দিনে মেয়েরা তো মন্দিরে আসতে পারে না, তাই পুজো পান না আজকাল দেবী। প্রতিমার সুউচ্চ বেদীমূলে দাঁড়িয়ে লাও-সানের সহকর্মী যুবক বললে :

'একটা কথা বলার জন্যই দাদা আপনাকে এই নিরালায় ডেকে নিয়ে এলাম। কথাটা নিজের জন্য নয়…আপনার ভাইয়ের সম্বন্ধে…তার যা মেজাজ হয়েছে—'

'লাও-সানের মেজাজ বুঝি খুবই খারাপ ?' প্রশ্ন করে লাও-এর।

'মাঝে মাঝে খুবই খারাপ হয়…তবে আমরা কিছু মনে করি না। মনে হয় ওর বিশেষ প্রয়োজন একটা বিয়ের! সহকর্মী বন্ধুরাও আমাকে বলেছে, দাদা, আপনার সঙ্গে এবিষয় কথা বলতে। আপনি বাবাকে বলে ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা দেখুন। বিয়ে হলেই ও স্বাভাবিক মেজাজে ফিরবে। বেশ ভাল একজন মেয়ে দেখে—'

কষ্ট ক'রে হাসি চাপে লাও-এর। জিজ্ঞেস করে: 'কি রকম মেয়ে ওর পছন্দ ?'

গম্ভীর মুখে যুবক বলে: 'বড়ই কঠিন প্রশ্ন দাদা। তবে বেশ শক্ত সমর্থ মেয়ে চাই, লাও-সানের মেজাজ মানিয়ে চলতে পারে এমন মেজাজের মেয়ে খুঁজতে হবে। কিন্তু আবার মাটির মানুষ হলেও চলবে না। দরকারে যুক্তির জাল বিস্তার ক'রে লাও-সানের দুর্দমনীয় খেয়াল-খুশি সংহত করতে হবে সে-মেয়েকে—'

'বাপস্! কঠিন ব্যাপার দেখছি।' মন্তব্য করে লাও-এর! নীলার কথা চকিতে ভেসে ওঠে তার মনে।

মাথা ঝাঁকিয়ে যুবক বলে: 'সত্যিই কঠিন কাজ দাদা।' একটু নীরব থেকে আবার বলে: 'একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, মাঝে মাঝে ওকে দেখেছি এই মন্দিরে এসে দেবীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তাতেই আমাদের মনে হয়েছে ওর এখন একটা বিয়ের প্রয়োজন।'

'আচ্ছা, বাবাকে বলব'খন,' লাও-এর বলে: 'তুমি যা বললে সবই বলব তাঁকে।'

যুবকটি মন্দির-কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। একলা দাঁড়িয়ে রইল লাও-এর প্রতিমার সামনে। ষষ্ঠী-পূজো লাও-এর করেনি, করেনি তার বাবাও। এ-দেবীর পূজো করে মেয়েরা। আর যেহেতু লিংসাওর ওপরে ষষ্ঠী দেবীর কৃপার অভাব ছিল না—পুত্রবতী মা সে—তাই ষষ্ঠী দেবীর মন্দিরে বছরে একদিন

ব্যতীত ঘনঘন সে যায় নি। তাই লাও-এরদেরও ছোটবয়সে মার সঙ্গে এই মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ হয় নি। বরং লিংসাও প্রায়ই যেত লক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে, ধনে ধান্যে সংসার ভ'রে ওঠার প্রার্থনা জানাতে।

প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে লাও-এর দেবীর সর্বঅবয়ব। কোঁকড়ান ড্রাগনের ওপরে ছোট শ্রীচরণ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী। শিল্পীর তুলির টানে অপরূপ সৌষ্ঠব ও লালিমায় মূর্ত মাটির প্রতিমা। মনে হয় যেন দেবীর স্মিত ঠোঁটের নীচে রক্ত মাংসের নারীর পেলব স্পর্শ রয়েছে। শিল্পী তো মানুষ···সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে শিল্পীমন ভেবেছে দেবীকে নিয়ে···প্রিয়ার ছোঁয়া ফুটিয়ে দিয়েছে শিল্পী দেবীর স্মিত হাসিতে, মুখে, সর্বদেহের অঙ্গসৌষ্ঠবে, ···পুরুষের চোখে দেবী হ'য়ে উঠেছেন রমণী। মৃৎ-শিল্পী দেবীর প্রতিমা গড়েছে ঠিকই, কিন্তু শিল্প-চাতুর্যের ছোঁয়ায় কামিনী ফুটে উঠেছে দেবীর মৃদু হাসি-মাখা নরম ঠোঁট দু'খানিতে, সব-জানা চোখের কোণে। দেহাবরণ যেন ঠিক ঢেকে রাখতে পারছে না দেবীর পীনোন্নত বক্ষ, বসনাবৃত জঘন আবৃত হয়েও যেন অনাবৃত। প্রতিমার দিকে যতই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে লাও-এর ততই তার চোখে দেবী না এসে, ভেসে উঠে রমণী-মূর্তি।

এমন সময় এসে হাজির হ'ল লাও-সান। লাও-এরকে বলল: 'কতক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি। এইমাত্র শুনলাম যে তুমি এই দেবীর ঘরে রয়েছে। তা করছ কি এখানে—'

প্রতিমার দিকে দৃষ্টি রেখে লাও-এর বলে: 'এত কাছে থেকে দেবীর প্রতিমা তো আগে দেখিনি কোন দিন। তাই একটু দেখেছি।'

'মাটি আর রং-এর তৈরী নারী মূর্তি—' কর্কশ কণ্ঠে ব'লে রুক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লাও-সান দেবীর দিকে।

ভাইকে আলোচনার মধ্যে আর একটু টেনে আনবার জন্য লাও-এর বলে: 'হুঁ, আরও একটু জিনিষ আছে এর মধ্যে। বোধ হয় শিল্পী যাকে ভালবাসত তার রূপ ফুটে উঠেছে এই প্রতিমার মধ্যে।'

ছোট ভাই এগিয়ে এসে দাঁড়ায় প্রতিমার সামনে: 'উহুঁ, কোনো মেয়ের চেহারা এত সুন্দর হয় না।'

'তা' হ'লে তুই সব মেয়েদেরই দেখেছিস্ নাকি?' দুষ্টুমি-ভরা হাসি লাও-এরের ঠোঁটের কোণে।

'না, এরকম চেহারার কাউকে তো দেখি নি এ পর্যন্ত।'

'যদি খুঁজে পাওয়া যায়, বিয়ে করবি?' হাসতে হাসতে লাও-এর বলে: 'দেখ্, যদি রাজী থাকিস তো খোঁজ করি। বাবা মাকে বলি—'

'না, না, বিয়ে আমি করব না। যুদ্ধে গেলে বৌ আগলাবে কে?'

'কেন, বাড়ীতে থাকবে।'

'হুঁ, আর রাতদিন কেবল প্যান প্যান করবে এখানে যেও না ওখানে যেও না ব'লে।'

'আরে না, না, দেবী কখনও প্যান প্যান করে?'

'আমার ঠাট্টা ভাল লাগে না, দাদা।'

'ঠাট্টা না, ঠাট্টা না, দেখিস,'—থেমে যায় লাও-এর। যা বলার, যা জানবার তা তো হয়েছে। লাও-এর ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে, লড়াই সম্বন্ধে কথা তোলে।...

পরদিন রাত্রে গ্রামে ফিরে লাও-এর লিংটানকে বলল ছোট ভাইয়ের বিয়ের কথা। পাশে দাঁড়িয়েছিল লিংসাও ও নীলা। সব শুনে লিংসাও বলে: 'কয়াঁ-য়িন দেবীর মত মেয়ে পাবে কোথায়? অত সুন্দর কি আর মানুষের ঘরে হয়? আর মেয়েই বা কোথায় আজকাল? এদিকে যে দু-চারজন মেয়ে আছে, তাদের তো সব নষ্ট ক'রে গেছে শত্রু-শয়তানরা। তাদের কারও সঙ্গে ছেলের বিয়ে আমি দেব না।'

'হুঁ, তা বটে। আর লাও-সানও বিয়ে করবে না।' বলে লিংটান।

'তা হ'লে মুক্ত এলাকায় খোঁজ করতে হয়!' নীলা বলে। কিন্তু কি ভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে?

এদিকে বছরের ওপর হয়ে গেল ছোট মেয়ে প্যানসিয়াওর কোন খবরই তারা পায় নি। মুক্ত এলাকার কথায় লিংসাওর মনে পড়ে প্যানসিয়াওকে। উতলা লিংসাও মেয়েকে দেখেনি কতদিন, তার বিয়েরও কোন ব্যবস্থা হ'ল না এখনও। হঠাৎ স্বামীকে জিজ্ঞেস করে: 'কোথায় কোন্ পাহাড়ের গুহায় মেয়েকে কতদিন রাখবে এভাবে? শুধু লেখাপড়া শিখলেই হবে? বিয়ে দেবে না? আর বিয়েই যদি না হয় তো মেয়ে-জীবনের স্বার্থকতা কি?'

'তবু ভাল, শত্রুর হাতে তো পড়ে নি। বড় বৌর কথা একেবারে ভুলে গেলে গিন্নী?'

লিংসাও চুপ ক'রে যায়। কিন্তু মেয়েকে দেখতে ইচ্ছা করে। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, আদরের মেয়ে। বিয়ের বয়সও তো হ'য়ে গেল। বিয়েটা যদি

হ'য়ে যেত মেয়েটার। ছেলেমেয়েদের সময় মত বিয়ে না দিতে পারলে কি মায়ের শান্তি আছে? অবিবাহিতা মেয়ে ঘরে রেখে শান্তিতেও তো মরতে পারবে না। মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে লিংসাও বলে:

'আচ্ছা, প্যানসিয়াওকে লেখ না কেন, ওর ছোড়দার জন্য কোন কনে পায় কিনা ওখানে। ওদের স্কুলে তো কত মেয়ে আছে।'

কিন্তু চিঠি পাঠাবে কোথায়? সে-স্কুলের কি ঠিকানা জানে তারা? লিংসাও স্বামীকে কতদিন বলেছে শহরে গিয়ে শ্বেতাঙ্গিনীর কাছ থেকে মেয়ের খবর ও ঠিকানা জেনে আসতে। কিন্তু বুড়োর কি আর তাড়াহুড়ো আছে কিছুতে? এখন আবার সে বলে:

'কতদিন তো তোমাকে বলেছি, শহরে গিয়ে মেয়েটার খোঁজ নিয়ে আসতে। আমার মেয়ে কোথায় থাকে, তা আমি জানতে পারব না?'

মেয়ে অন্ততঃ নিরাপদে আছে, আর এখানে কতরকম ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে দিনাতিপাত হয় লিংটানের, তাই সময় ক'রে সে শহরে যেতে পারে নি। আজ স্ত্রীর কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বলে:

'অত রেগে যেয়ো না গিন্নী, কাল দেখি সময় ক'রে একবার যাব'খন শহরে।'

তাই গেল লিংটান। নানা ঘোরা-পথে হ্রদের পাশ দিয়ে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত গৃহের দোরে এসে হাজির হ'ল। বন্ধ দরজায় বারে বারে আঘাত দিয়ে শব্দ করেও ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। নিস্তব্ধ বাড়ীর দোরে বহুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে একটা পাথর তুলে সে বারে বারে দরজার ওপর ঠুকতে সুরু করল। তারপর অতি ধীরে দরজাটি একটু ফাঁক হয়ে যায়। দারোয়ান মুখটি বের ক'রে জিজ্ঞেস করে:

'কি চাও এখানে, শুনি?'

লিংটানকে সাবধানী দারোয়ান চিনতে পারে।

'আমি একবার সেই শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করব।' কথা বলতে বলতে দারোয়ানকে তুষ্ট করবার জন্য গেঁজে থেকে পয়সা বের করতে কোমরে হাত দেয় লিংটান। দারোয়ান দেখে বলে: 'পয়সা দিয়ে কি আর সেখানে যাওয়া যায় মোড়ল! কেন, শোন কি কিছু?'

'কি?'

'তিনি তো দেহরক্ষা করেছেন।'

এ-কথা শুনবার জন্যে লিংটান মোটেই প্রস্তুত ছিল না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সে দারোয়ানের মুখের দিকে, গেটটা আরও একটু খুলে দারোয়ান বাইরে এসে দোরের পাশের সান-বাঁধান বেঞ্চির উপর বসে। তারপর টুপী খুলে মাথাটা একটু চুলকিয়ে বলে: 'হ্যাঁ, তিনি স্ব-ইচ্ছায় দেহরক্ষা করেছেন। আমিই প্রথম দেখি তাকে সেই অবস্থায়। ভোরে উপাসনা-কক্ষের দরজা জানালা খুলতে গিয়ে দেখি বেদী-মূলে তিনি দেহরক্ষা ক'রে পড়ে আছেন। উঃ, সে কি রক্তক্ষরণ! নিজে হাতে কব্জির শিরা কেটে দিয়েছেন। মেঝের ওপরের সে-রক্ত কি আর মুছে তোলা যায়! মেঝের ওপরের সে-দাগ যেন এখনও চোখে ভাসছে।'

'কিন্তু কেন···তিনি তো বেশ নিরাপদেই এখানে ছিলেন—তা ছাড়া খাবারও ছিল, তবে—' তো তো ক'রে হতভম্ব লিংটান প্রশ্ন করে।

কোটের হাতা দিয়ে চোখ মুছে দারোয়ান বলে: 'একখানা চিঠি লিখে গিয়েছেন তিনি···সাগর পারে তার বাবা-মার কাছে। সে-চিঠি তো আর আমি পড়তে পারিনি, তাদের ভাষায় লেখা। তাতে তিনি লিখেছিলেন শুনলাম: "আমি সফলকাম হতে পারলাম না—" '

'সেকি? কিসে তিনি সফলকাম হ'তে পারলেন না?'

'কে জানে, কি তার অর্থ। কিন্তু ঐ কথাটাই তিনি লিখেছিলেন তার চিঠিখানিতে।'

বেদনা অনুভব করে লিংটান শ্বেতাঙ্গিনীর জন্য···কেমন একটু করুণা মেশানো থাকে সেই বেদনা-বোধে। দুশ্চিন্তাও হয়, মেয়ের খোঁজ এখন পাওয়া যাবে কি ক'রে? মেয়ের সম্বন্ধে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে। দারোয়ান উত্তর দেয়:

'বুড়ি ঠাকুরাণীকে ডেকে দিচ্ছি—তিনি তো এখন কর্ত্রী—তিনি নিশ্চয়ই জানেন।'

দোর পেরিয়ে ভিতরে এসে অপেক্ষা করে লিংটান। চশমা পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী বৃদ্ধা এলে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে লিংটান জিজ্ঞেস করে তার মেয়ের কথা। বৃদ্ধা বলে:

'সেই স্কুল তো মুক্ত এলাকায় পাহাড়ের কোলে যেসব গুহা আছে সেখানে। তোমার মেয়ের জন্য চিন্তা করো না, ওখানে সকলেই ভাল আছে। ঐ স্কুল দেখেন আর একজন শ্বেতাঙ্গিনী।'

'আমার মেয়ের কাছে একটা চিঠি লিখতে চাই। অনুগ্রহ ক'রে ঠিকানাটা লিখে দেবেন—' লিংটান বলে।

এক টুকরো সাদা কাগজে বৃদ্ধা ঠিকানা লিখে দেয়। পুরুষ-পণ্ডিতদের মতই অতি স্বচ্ছন্দ গতিতে কাগজের ওপর লেখে বৃদ্ধা, দেখে মনে মনে তারিফ করে লিংটান। লেখা-কাগজখানা লিংটানের হাতে দিয়ে বৃদ্ধা চলে যায়।

লিংটান গ্রামে ফিরে আসে। শ্বেতাঙ্গিনীর বিষয় সে বলে বাড়ীর সকলকে। সত্যিকার স্বজন-হারানোর বেদনা অনুভব করে লিংসাও। খুব বেশী লেখাপড়া শেখা মেয়েদের উচিত নয়, মনে হয় লিংসাওর ; বেশী লেখাপড়া শিখলে বিদেশ বিভুঁইয়ে এই ভাবে দেবদাসী হয়েই মরতে হয়। নিজের দেশের মাটিটুকু পর্যন্ত তার কপালে জোটে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে স্বামীকে : 'প্যানসিয়াওকে চিঠি দাও···ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাও সব ক'রে ফেল।'

নীলাকে ডেকে চিঠি লিখতে বলল প্যানসিয়াওর কাছে, তাদের স্কুলে ভাই-য়ের জন্য সুন্দরী কনের খোঁজ করতে। নীলা যেন লিখে দেয়, যে চলনসই সাধারণ মেয়ে হ'লে চলবে না। আর বই-পড়ার ভেতর দিয়ে নীলা তো জানেই কিরকম মেয়ে পছন্দ হবে তার দেবরের। ভাবী পুত্রবধূর সৌন্দর্যের কথা বাপ-মা এর থেকে খোলাখুলি আর কি বলবে! এটুকু বলতেই লিংটানের মুখ লাল হ'য়ে যায়। গৃহকর্তার রাশভারী সম্মান রক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে উঠে যায়। লাও-এর আর নীলা বুড়োবুড়ীর পেছনে সপ্রেম চাপা হাসি হাসে···হাসির মধ্যেও এদের ভালবাসা!

যত জ্ঞান ছিল নীলার, যা কিছু সে পড়েছে, সব মিলিয়ে সে চিঠি লিখল বর্ণনা দিয়ে কি রকম কনে তাদের চাই। দেবর লাও-সানের চরিত্র বিচার ক'রে, তার মনমতো বধূ হ'তে পারে কোন্ মেয়ে, লিখলে নীলা : 'শুধু সুন্দর মুখ দেখেই কিন্তু ভুলিস না, ছেমরী—। বোকা মুখ্যু যেন না হয়, দেখবি। তোর ছোড়দাটি যা, হয়তো ভবিষ্যতে রাগের মাথায় বোকা বৌকে মেরেই বসবে। তোর ছোড়দাটি এখন আর স্বপ্নে বিভোর হয়েই থাকেন না। চোখে ভাসে তার সুন্দরী তন্বী কয়াঁ-ইন দেবী— বোকা-বুঝ বুঝবার মত ছেলে নন তিনি! একথা মনে রাখবি।'

• চিঠিটি শেষ ক'রে স্বামীকে প'ড়ে শোনায় নীলা। ঠাট্টা ক'রে হাসতে হাসতে লাও-এর বলে : 'যা লিখেছ না, আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে এখন কয়াঁ-ইন দেবীকে নিয়েই পড়ি।'

বার দুই চোখ টিপে লাল জিভটি বের ক'রে মাথাটি মৃদু ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্বামীর ওপরে হুয়ে পড়ে নীলা। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে :

'আমার মতন মেয়ে পাবে কোথায় গো মশাই শুনি—!'

স্পর্শ-মধুর আনন্দ-উদ্বেলিত লাও-এর হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

॥ ষোল ॥

নিজের গুহা-ঘরে পিছন ফিরে বসে প্যানসিয়াও নীলা-বৌদির চিঠি পড়ে। অতি সহজ ভাবেই সে চিঠি পড়ে যায়, কিন্তু আজ এই চিঠি পড়ায় যেন কত আনন্দ, কত গর্ব! দু'হাজার মাইল দূর থেকে নীলা-বৌদি তাকে চিঠি লিখেছে। চিঠি এসেছে আকাশ পথে, জলে, তারপর মাটির ওপর দিয়ে। কত জনের হাত বহন ক'রে এনেছে এই চিঠি খানি, কত ছোঁয়া লেগে আছে এর অঙ্গে। যুদ্ধের ধ্বংসের মধ্য দিয়েও চিঠির হরকরা আশ্চর্য উপায়ে কর্তব্য কর্ম ক'রে গেছে, চিঠি পৌঁছে দিয়ে গেছে। তুহিনশীতল শীত নেমেছে এ অঞ্চলে। কনকনে হিমেল গুহা-ঘরে গনগনা আগুন জ্বালানো আছে বলে জল জমে যায়নি। ধোঁয়া বের ক'রে দেবার জন্য ছাদে ফুটো আছে। দরজা খোলা থাকলে বাতাসের চাপে পড়ে ধোঁয়া বের হতে পারে না, নিচে নেমে এসে সমস্ত ঘরগুলো ধোঁয়ায় ভরে দেয়। কিন্তু এসবের দিকে প্যান-সিয়াওর নজর নেই, সে ডুবে আছে চিঠিতে। পড়া শেষ হলে ভাঁজে ভাঁজে ভাঁজ ক'রে সে চিঠিটা তুলে রাখে। পাতলা কাগজ এরই মধ্যে মরমরে হয়ে গেছে। আজকাল সব কাগজই প্রায় এই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুর্দিনে কাগজ ফেলে দেবার কথা কেউ ভাবতে পারে না। আর চিঠির মধ্যে এক বিরাট কাজের কথা আছে, মহা দায়িত্ব দিয়েছে নীলা-বৌদি প্যানসিয়াওকে। ছোড়দার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে বলেছে বৌদি। আর বিশেষ ক'রে ছোড়দার উপযোগী মেয়ে? গাঁয়ের ঘরে প্যানসিয়াও যখন তাঁত চালাত তখন তার অফুরন্ত চিন্তার সময় ছিল। আর তখন চিন্তার মসলাই বা কি ছিল বাড়ী ঘর ভাই বৌদি ছাড়া? তাই পরিবারের এক একটি লোকের হাবভাব চরিত্র বিশ্লেষণ

হয়ে হয়ে বিশিষ্টরূপে মূর্ত হয়ে আছে তার মনোজগতে। ভাইদের কথাই তার মনে হতো বেশী ক'রে, কারণ, সে ছিল মেয়ে। ভাইদের সামনে সব কিছু খোলা, আর মেয়ে হওয়ার দরুণ তার চারধারে কেবল বন্ধনের বেড়াজাল। তবু আজ সে মুক্ত···যুদ্ধের আঘাতে তারও বন্ধন ভেঙে গেছে। তাদের পরিবারের সে-ই একমাত্র মেয়ে যে মুক্ত এলাকায় বাস করছে, যেখানে শত্রুদের উড়োজাহাজের হামলাও হতে পরে না। কে আছে এমন তার সঙ্গিনীদের মধ্যে যে এই আজাদী ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইবে?

চিঠিখানি বুকে রেখে সে ঘুরে বেড়ায়। একই ঘরে তারা থাকে বার জন। এদের মধ্যে কে হতে পারে তার ভ্রাতৃবধূ? বেশ সুন্দরী, আবার সাদাসিধে মেয়েও আছে। এরা কেউ কেউ বেশ গোছগাছ ফিটফাট, আবার কেউ কেউ আছে স্বভাব বিন্যস্ত ভাবের মেয়ে। কিন্তু কাউকেই বৌদির মতন ক'রে পছন্দ হয় না। এ ছাড়া আরও অনেক মেয়েও আছে এখানে। কিন্তু তাদের কতটুকু সে জানে? এই বারজন মেয়ের সঙ্গেই তার বাস, তাদের সঙ্গেই জমে উঠেছে তার হৃদ্যতা। এদের থেকেই যখন পছন্দ করা গেল না, তখন কি সামান্য মুখ-চেনা মেয়েদের থেকে পছন্দ হবে! বড় কঠিন কাজ দিয়েছে তাকে নীলা-বৌদি! দেবী চাই বাবা বলেছেন, দেবী চাই। এখানে দেবী কোথায়?

ঘণ্টা বেজে ওঠে। যে যেখানে ছিল সকলেই হৈ হৈ করতে করতে ছুটে গেল গুহা-ঘর পেরিয়ে অন্য আরেক গুহা-হলে। শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। প্যানসিয়াও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে একশ' বারজন ছাত্রীর প্রতিটি মুখ। দেবী-মুখ খুঁজে পায় না একটাও। বৌদ্ধ আচার্যদের মত তারা বসেছে মাদুর-বিছানো মেঝের ওপরে।

ছোড়দার কথা মনে হয় প্যানসিয়াওর। লম্বাটে সুপুরুষ কিন্তু দুর্দান্ত দাদাটি। কোন নরম তন্বীর কাজ নয় তাকে নিয়ে ঘর করা। প্যান-সিয়াওর মতন বিনয়ী মেয়েও অচল সেখানে। নিজের কথা ভাবে সে। ঐ পদের স্বামীকে নিয়ে পরম সুখে সে-ও হয়তো ঘর করতে পারবে না। ভাইয়ের কথা মনে হয়···সে কি ঘৃণা করে তার ছোড়দাকে? ভালবাসা-প্রীতি কি নেই তার মনে? না, তা নয়, দুটোই আছে। বোধহয় তার মনেও এই দুটোই থাকবে যে দাদাকে বরণ ক'রে নেবে। সব মেয়েরই

তাই থাকে, ঘৃণা ও ভালবাসা। কিন্তু এ দু'য়ের সংঘাত সে-মেয়ের মনে বাসা বেঁধে থাকবে না যাতে ঘৃণার উদ্রেকে ভালবাসা মরে যায় কিংবা উপচীয়মান ভালবাসার তোড়ে নিজের সত্ত্বার রক্ষণায় ঘৃণার বর্ম আঁটা থাকে।

নিজের মত ক'রে ভেবে প্যানসিয়াওর মনে হয় যে ছোডদার জন্য পাত্রী হবে এমন মেয়ে যে তার ভাইয়ের থেকেও হবে শক্তিধারিণী কিংবা একেবারে উল্টো, সত্ত্বাহীনা।

কিন্তু সে-মেয়ে কোথায়?

ঠিক এই সময় এই পাহাড়-প্রদেশে আসছে এমন একজন মেয়ে যার কথা প্যানসিয়াও মনেও ভাবেনি। হাজার হাজার মাইল দূরের কোন্ এক বিদেশ থেকে সে-মেয়ে আসছে এখানে। এটাই তার দেশ, কিন্তু বলতে গেলে দেশের কিছুই তার মনে নেই। বহুবছর আগে মার হঠাৎ মৃত্যুর পর তার শোকাতুর বাবা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রীর স্মৃতি বিজড়িত শহর ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই খুকী মেয়ে বাপের চোখে চোখে স্নেহে-আদরে বড় হয়ে যৌবনে পা দিয়েছে। সে-মেয়ের বয়স আজ উনিশও পার হয় নি। এমন দিনে মেয়ে কথা কাটাকাটি করল বাপের সঙ্গে। দেশের এই দুর্দিনের খবর শুনে মেয়ে চাইল না বিদেশের এই শান্তির নীড়ে দিন কাটিয়ে দিতে। সে চাইল দেশে ফিরতে। কিন্তু বাপ চাইলেন না যে মেয়ে এই বয়সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার ইতি টানে।

বাপ কিন্তু দেশে আর ফিরবেন না ব'লেই মন স্থির করেছিলেন। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর পরমাসুন্দরী জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যুশয্যায় সেই অসহনীয় যাতনা ও ব্যথা ভোগ করার দৃশ্য তিনি ভুলতে পারেন না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মুসলমান ঘরের মেয়ে। কোন্ সাবেক কালের আরবী রক্তসংমিশ্রণ এনে দিয়েছিল তাঁর চোখে বিদ্যুৎ-এর ঝলকানি, উন্নত নাসিকা, ও ভ্রাজিষ্ণু ভ্রূভঙ্গি। মেয়েদের সাধারণ উচ্চতা থেকেও তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী তন্বী। স্বামী তাঁকে ভালবেসেছিলেন তাঁর সর্বস্বত্তা দিয়ে, কিন্তু পারেননি তিনি ধরে রাখতে তাঁর প্রিয়াকে। স্বামীকে ছেড়ে তিনি চলে গেলেন সন্তান ভূমিষ্ঠের এক ঘণ্টার মধ্যেই, রেখে গেলেন শুধু তাঁর শেষ অবদান একটি হৃষ্টপুষ্ট চিৎকার-ক'রে-কাঁদা ছোট্ট মেয়ে। মেয়ের নাম রাখলেন মায়লী। তারপর বিদেশে একটা চাকরি নিয়ে

তিনি চলে গেলেন। এ-কাজের জন্য আগেও বারে বারে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তার জন্মভূমি ও দেশ ছেড়ে যেতে রাজী হন নি। আর এখন! সে-শহর আর তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে না কোনোদিন। শহরের বাইরের এক গ্রামে পিতৃপুরুষদের গোরস্থানে স্ত্রীর জীবনহীন দেহ সমাধিস্থ হ'য়ে আছে। দেশে আর তিনি ফিরবেন না, তাঁর মৃত্যুর পর, তার দেহাবশেষ স্ত্রীর সমাধির পাশে গোর দেওয়া থাকবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এই জন্যে যে চিরনিদ্রায় যেন তিনি পান তাঁর পরমপ্রিয়াকে।

মায়লী বাবাকে বললে: 'বাবা, আমি দেশে ফিরব। আমাদের দেশের ওপর যখন আক্রমণ হয়েছে, তখন আমি এখানে, বিদেশের এই শহরে—নিরাপদে থাকতে মন চাইছে না, বাবা!'

শিশুবয়স থেকে বিদেশে থাকায় নিজের মাতৃভাষা মেয়ে বলত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক'রে। কিন্তু এখন ইচ্ছে ক'রে স্থির সংকল্প নিয়ে কথা বলে মাতৃভাষায়। বিদেশী সজ্জা থাকত তার অঙ্গে, সে-সব ছেড়েছুড়ে এখন সে ব্যবহার করে চীনা আধুনিকাদের লম্বা পোষাক। স্নেহাপ্লুত দৃষ্টিতে বাপ লক্ষ্য করেন মেয়ের এই পরিবর্তন। কিছু বলেন না।

একদিন প্রাতরাশের টেবিলে বাপ যখন রৌপাধারের জলে আঙ্গুল ধুচ্ছিলেন ঘরে ছিল না চাকর বাকর, স্নেহের চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেন মেয়েকে:

'কিন্তু তুই দেশে ফিরে গিয়ে কী করবি বেটি, শুনি! সেখানে তো চাই ইঞ্জীনিয়ার, যুদ্ধবিদ্—সব পুরুষ মানুষ। লেখাপড়া শেষ করেনি এমন মেয়ে দিয়ে ওখানে কি হবে রে!'

চোখ তুলে তাকায় মেয়ে বাপের দিকে। মায়ের মতনই যেন তীক্ষ্ণ চাউনি সে-চোখে, কিন্তু সে-চাউনিতে প্রলেপ পড়েছে বিদেশী অঞ্জনের। মায়ের সে-চোখ পুরোপুরি নেই মেয়ের। মায়লী বলে: 'কাজ আমি ঠিক জুগিয়ে নেব বাবা।' স্থির-সংকল্প মায়লীর কণ্ঠে। ঝিলিক দিয়ে ওঠে মেয়ের সেই কালো চোখ। মায়েরই মেয়ে! বৃদ্ধ বাপ শুধু বসে বসে দেখেন। নীরব স্থির। মেয়ের চোদ্দ বছর বয়স পেরোবার পর থেকে মেয়ের সঙ্গে বাপ আর কথা কাটাকাটি করেন না। বোঝেন, নিরর্থক, বৃথা পণ্ডশ্রম হবে তা। তখন থেকে মেয়ে চলেছে তার নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাপ বলেন: 'তাহ'লে তুই যাবিই—? এই বিদেশ বিভুঁইয়ে

আমি একলা পড়ে থাকব ! একটা কথা আমার রাখিস্ তুই। বিপদের ঝক্কি যেসব জায়গায়, সেসব জায়গায় তুই যাস্ না, মা।'

বাপ চেয়েছিলেন মেয়ে যদি দেশে ফিরে যায়ই, সে যেন কোন শিক্ষায়তনের কাজে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ তাই পাওয়া গেল মায়লীর জন্যে। দেশের অভ্যন্তরে পশ্চিমের সুউচ্চ গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত নতুন এক স্কুলে মায়লীর কাজ জুটে গেল। শিক্ষয়িত্রীর কাজ।

এবং তারপরে সে এসে গেল এক শীতের সকালে প্যানসিয়াওদের স্কুলে। মেয়ে-অন্তপ্রাণ বৃদ্ধ বাপ বিদেশের ঐ শহরেই বসে মেয়ের নিরাপদে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। বন্দরে জাহাজ পৌঁছতেই, মায়লীর কর্মস্থলে যাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে, জাহাজ ঘাটেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল একজন প্লেন-চালক। পশ্চিমের সুউচ্চ গিরিশ্রেণীর পাদদেশে মায়লীকে নামিয়ে দিয়ে পাইলট তার নিজের গোপন ঠিকানা লেখা কাগজ মায়লীর হাতে দিয়ে জানাল যে যদি দরকার হয়, ঐ ঠিকানায় তাকে জানালে সে এসে নিরাপদে মায়লীকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবে। সেই আদেশেই তার ওপর আছে।

ঝাঁঝের সঙ্গে মায়লী প্রশ্ন করে : 'আমি ফিরে যাব কে বলেছে ?'

'তা জানি না, তবে আমার উপর এইরকম আদেশই আছে। আমাকে জানালে আমি অন্য জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব। যান আর না যান, অন্ততঃ আমার ঠিকানা আপনি রেখে দিন। আদেশ মত আমার কর্তব্য তো করা হ'ল ! তাড়াতাড়ি কোনমতে পাইলট তার কথা শেষ করে। মায়লী তার ব্যাগ খুলে পাইলটকে টাকা দিল যা সে আশাও করে নি।

গুহা-স্কুলে যে-ঘর দেওয়া হ'ল মায়লীকে থাকবার জন্য, সে-ঘর মায়লীর খুব পছন্দ হ'ল। দক্ষিণে জানালা। জানালা খুলে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হয়, ন্যাড়ামাথা পাহাড়ের ঢেউগুলো যেন প্রকৃতির গুরুগম্ভীর সঙ্গীতের মৌন বজ্রনির্ঘোষ। হিমেল সকালে জানালা খুলে দু'হাত বাড়িয়ে সে যেন বলে : 'আমার ! সব আমার ! হে নগরাজ, তোমার কাছে আমি এসেছি !'

স্কুলের যে বৃদ্ধ পিয়ন তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল এই কক্ষে, সে জানিয়ে গিয়েছিল যে শিগগিরি ক্লাশ সুরু হবে এবং নবাগতা যেন স্কুলের বিদেশিনী অধ্যক্ষার সঙ্গে দেখা করেন। মায়লীর সে-কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে

অনুভবও করে যে তার খিদে পেয়েছে। পিয়নের নির্দেশানুসারে সে এসে হাজির হয় অফিস-কক্ষে। সোজাসুজি দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে। দেখে, টেবিলের পাশে বসে আছেন এক বিদেশিনী। মায়লী প্রশ্ন করে :

'মিস ক্রীম—?'

প্রশ্নের ধরণ শুনে মিস ক্রীমের মনে হয়েছিল কোন বিদেশিনী বোধ হয় এসেছে। মুখ তুলে তাকিয়ে নবাগতাকে দেখে কেন যেন তার মনে হয় এ মেয়েকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে তার। মায়লীরও কেমন পছন্দ হয় না বিদেশিনীকে।

অধ্যক্ষা মায়লীকে সঙ্গে ক'রে আসেন খাবার ঘরে। প্যানসিয়াও মুখ তুলে নবাগতাকে দেখে তাকে মনে মনে ভালবেসে ফেললে। বিদেশিনী অধ্যক্ষার সঙ্গে কথা বলতে তার সাহস হয় না, আর তাঁর সঙ্গে কেমন কথা ব'লে চলেছে যেন কোন্ শিশু বয়স থেকে নবাগতার পরিচয় বিদেশিনীর সঙ্গে। খাওয়া বন্ধ রেখে প্যানসিয়াও মুখ তুলে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মেয়েদের মধ্যে কানাকানি সুরু হয়। 'নতুন দিদিমনি, নতুন দিদিমনি'। অধ্যক্ষার কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীরা সব উঠে দাঁড়ায়। তাই রীতি। প্যানসিয়াও-ও দাঁড়াল, কিন্তু সে-দাঁড়ানো নবাগতা শিক্ষয়িত্রীকে দেখে। নবাগতার সব কিছুই যেন বিদেশী···তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তারা তাঁর দৈর্ঘ্য, তাঁর চলাফেরা, তাঁর পোষাক। তাঁর মাথার কালো চুল, গায়ের রং সবই প্যানসিয়াওদের মত। তাঁর সৌন্দর্যে প্যানসিয়াও বিমোহিত।···

সত্যিই অদ্ভুত ঠেকে মায়লীর কাছে। অদ্ভুত জীবন।···

প্রত্যুষে ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মায়লী···অদ্ভুত অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত বন্য আকর্ষণ!···পাহাড়ের পর পাহাড়, যেন পাহাড়ের ঊর্মিমালা—আদিগন্ত বিস্তৃত। মনুষ্য পদবাচ্য যা কিছু সব সংগ্রহীত হয়ে রয়েছে উপত্যকার ঐ কোণের ছোট্ট গাঁয়ের মধ্যে···এতদূর থেকে মনে হয় হাতের তেলোয় সে-গাঁখানা তুলে নেওয়া যায়।

বাইরের এই বিরাট বিশালত্ব—, আর নিজের গণ্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্র কর্মক্ষেত্র, ছককরা রুটিন-জীবন,—আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হয়। হাঁফিয়ে ওঠে মায়লী। মাকড়সার জালের মত এই বন্ধনকে দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়বার

জন্য মন তার আকুলি বিকুলি করে। দেশের এই দুর্দিনের মাঝে এ কোন্ কর্ম তার জন্য নির্দিষ্ট হ'ল! বিক্ষুব্ধ মনে পায়চারী করতে করতে এক সকালে সে ক্লাশে এসে দেখে একটি মেয়ে উবু হ'য়ে বসে কি যেন পড়ছে। তার পাশে এসে মায়লী জিজ্ঞেস করে: 'কী বই পড়ছ, মেয়ে?' পড়ছিল প্যানসিয়াও। কিন্তু মায়লী এখনও সব মেয়েকে চিনে উঠতে পারেনি। প্যানসিয়াও উত্তর দেবার আগেই বইয়ের নামপত্র উল্‌টিয়ে দেখে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিদ্রূপ মেশানো ভাষা: 'পল রেভেরার ঘোড়দৌড়! আশ্চর্য!...মুখস্থ করছ?'

প্যানসিয়াও মাথা নাড়ে: 'বড় কঠিন—'

বইখানা হাতে নিয়ে মায়লী ছুঁড়ে ফেলে দেয়: 'আশ্চর্য! অদ্ভুত! "পল রেভেরার ঘোড়দৌড়" মুখস্থ করবে আমাদের মেয়েরা যখন আমাদের দেশের বীর গেরিলারা অমিত শক্তিতে লড়ে চলেছে—!'

মায়লীর অন্তরের এই ক্রোধ ফেটে পড়ছিল ইংরেজী ভাষায়। প্যানসিয়াও তাই বোঝে নি। সে নিচু হয়ে বইখানা তুলতে গেল। মায়লী তাকে নিষেধ ক'রে দু'পায়ে সে-বইখানি মারিয়ে দিয়ে, তারপর একটু পরেই সেখানা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্যানসিয়াও ভয়ে কাঁপে। সে বুঝতে পারে না নবাগতা শিক্ষয়িত্রী কেন হঠাৎ রেগে গেলেন।

কোনরকম জানানী না দিয়েই মায়লী প্রবেশ করল অধ্যক্ষা মিস ক্রীমের কক্ষে। সকালে ধর্মপুস্তক বাইবেল পাঠ করছিলেন মিস ক্রীম। সেদিকে মায়লী দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। খোলা বাইবেলের ওপর তার জুতোর দাগ সম্বলিত "পল রেভেরার ঘোড়দৌড়" বইখানা রেখে চোখে মুখে হাজার প্রশ্ন তুলে জিজ্ঞেস করে: 'হুঁ, দেখেছেন এখানা একজন মেয়ে মন দিয়ে পড়ে পড়ে মুখস্ত করছে!'

মিস ক্রীম হা ক'রে তাকিয়ে থাকে মায়লীর দিকে। এক মাস হ'ল এ মেয়ে এখানে এসেছে, আর কমপক্ষে দশবার তার সঙ্গে ঝগড়া হ'ল!

চোখের ওপর চশমাটা ঠিক মত লাগিয়ে মাথা নুইয়ে বইখানার দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন কি বলতে চাইছে নবাগতা শিক্ষয়িত্রী। বইখানা ভাল ক'রে দেখে তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, এটাই তো আজ ওদের ইংরেজীর পাঠ। গত পনেরদিন হ'ল এটা ওরা পড়ছে, আজই শেষ হবে।'

'এরকম বাজে জিনিষ ওদের পড়ান হয় কেন? আজ, এই দিনে আমাদের

দেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য এইরকম বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম যখন আগে কোনদিন হয়নি, সেই সময়ে আমাদের দেশের মেয়েরা বসে বসে মুখস্ত করবে "পল রেভেরার ঘোড়দৌড়" ?'

ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েন মিস ফ্রীম। সময় সময় তার কেমন সন্দেহ হয়, এ-মেয়ের মাথায় ছিট আছে কিনা। একটু জোরের সঙ্গে মিস ফ্রীম বলেন :

'পাঠ্য-তালিকায় এটা আছে।'

হো হো ক'রে হেসে ওঠে মায়লী। মনে মনে সে ঠিক করে যে সে যুক্তি দিয়ে কথা বলবে। বলে : 'মিস ফ্রীম, আমাদের দেশের স্কুলে ঐ মার্কিনী পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ কেন করছেন ? আমাদের অবস্থাটা একটু বিচার ক'রে দেখুন, মিস ফ্রীম। দেশের দু'হাজর মাইল অভ্যন্তরে শত্রুর আক্রমণের পাল্লার বাইরে পাহাড়ের গুহায় স্কুল বসেছে আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য। অল্প কয়েকজন মাত্র মেয়ে তো এখানে শিক্ষা নিচ্ছে। জানি না, আমাদের কী হবে আপনাদের এই শিক্ষায়! যাই হোক, যে-শিক্ষা দিচ্ছেন, সে-শিক্ষা নিশ্চয়ই আমরা চাই নি, মিস ফ্রীম !'

পুস্তিকাখানা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ডেস্কের পাশে-কাগজের ঝুড়িতে মায়লী ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

হতভম্ব মিস ফ্রীম চুপচাপ ব'সে থেকে তার ক্রোধ চাপবার চেষ্টা করেন। বাইবেলের দিকে তাকিয়ে দয়ালু ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করেন যাতে মেজাজ হারিয়ে না ফেলেন। এইজন্য তিনি টেবিলের ওপর একখানা বাইবেল সব সময়ে রাখেন। যখন তিনি বোঝেন যে তাঁর মেজাজ তিনি আয়ত্বের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তিনি বলেন :

'এই স্কুলের অধ্যক্ষা আমি। ছাত্রীরা কী পড়বে না-পড়বে, সেটা ঠিক করি আমি !'

মায়লীর মনে হয় ঐ ভাবে কথা ব'লে সে বোকামী ক'রে ফেলেছে। মিস ফ্রীমের উল্টো দিকের চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রবল উত্তেজনায় সে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মায়লীর অপূর্ব সুন্দর মুখে ঐ রকম উত্তেজনার চিহ্ন দেখে মিস ফ্রীম আরও মুষড়িয়ে যান, আরও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। মায়লী বলে :

'মিস ফ্রীম, আপনাকে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হ'ল যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে, আমাদের মহত্ব যা, তা ছিনিয়ে নেবেন না! স্বাধীনতার

সংগ্রাম আপনারাও একদিন লড়েছেন—আমাদের সংগ্রাম আমরা লড়ছি। আমাদের নিজেদের গান, আমাদের নিজেদের কবিতা পড়ান আমাদের মেয়েদের। সব সময় কেন আমরা ঐসব স্তব ভজন গাইব, মিস ফ্রীম? আমাদের নিজেদের গান গাইব আমরা, নিজেদের জনগণের গান গাইব, নতুন গান—' জানালা দিয়ে পাহাড়ের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে সুদৃঢ় বাহু দু'খানা সেদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে ব'লে চলে: 'মিস ফ্রীম, এসবের জন্যে তো আমি দেশে আসি নি—। আর এই গান, কি গান সব!—"হে আমার অন্তর্যামী প্রভু—", "তুষারাবৃত গ্রীনল্যাণ্ডের পাহাড় থেকে"—' হো হো ক'রে হেসে ওঠে মায়লী: 'মিস ফ্রীম, আমি কি বলতে চাই, নিশ্চয়ই বুঝেছেন!' মায়লীর সুন্দর মুখ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন মিস ফ্রীম। অদ্ভুত উত্তেজনা ছিল সে-মুখে এবং মিস ফ্রীম ঐ উত্তেজনাকে মনে মনে ভীষণ ভয় পান। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলেন: 'এ জায়গায় আমরা আশ্রয় নিয়েছি। ঈশ্বর আমাদের এই আশ্রয়স্থল দিয়েছেন।'

'আশ্রয়! আশ্রয় তো পাইনি আমরা। আমরা আছি লড়াইয়ের মধ্যে।' মায়লী চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে। মায়লীও উঠে দাঁড়ায়।

আর কোন কথা তারা বলে না। দুইজনের নীরব অস্তিত্বের মধ্যে কঠিন ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। মায়লী ফিরে দরজা পেরিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মিস ফ্রীম নিচু হ'য়ে ছেঁড়া বইখানা তুলে নেন। এই সঙ্কটের দিনে বই পাওয়া মুস্কিল। এই বইখানা জুড়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে।

কিন্তু মায়লী ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। ধরণী কাঁপিয়ে সে ক্লাশে ফিরে আসে, আপন মনে বিড় বিড় করে বলে: 'এখানে আমার থাকা হবে না, এখান থেকে আমাকে যেতেই হবে।'

হঠাৎ তার নজরে পড়ে সেই মেয়েকে যার বই নিয়ে এত কাণ্ড হ'ল। সে নীরবে ব'সে ব'সে ভয়ে কাঁপছে। তার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে মায়লী: 'কী হয়েছে তোমার?'

'আপনাকে আমি রাগিয়ে দিয়েছি—' তার চোখ জলে ভ'রে উঠেছে: 'আমার ওপরে আপনার রাগ আমি সইতে পারি না!'—প্রজ্জলিত শিখার মত মায়লীর প্রতি তার হৃদয়ের প্রীতি অশ্রুসিক্ত দু'চোখের ধারা হয়ে যেন গড়িয়ে পড়ে। তার কম্পিত হস্ত দিয়ে সে আলতো ক'রে মায়লীর সাড়ীর আঁচলটা ধরে।

'ছোট্ট মেয়ে তুমি, তোমাকে বাড়ী থেকে এতদূরে কেন পাঠালেন তোমার বাবা মা ?'

'আমি ছোট্ট নাকি ! ষোল বছর বয়স আমার ! বাড়ীতে যখন ছিলাম, আমি তাঁত চালাতাম। তিন বছর তাঁত চালিয়েছি। তারপর শত্রুরা হামলা করল আমাদের গাঁয়ে। বাবা আমাকে তখন এই স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন।'

মায়লীকে প্যানসিয়াও তাদের শহরের উপকণ্ঠের বাড়ীর কথা বলে। বলে তার আত্মীয় স্বজনের কথা। শহরের বুকে শত্রুর জাঁকিয়ে বসার কথা। তার ভগ্নীপতি উলীন যে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে সে-কথাও সে বলে মায়লীকে। এমনি সময়ে অন্যান্য মেয়েরা ক্লাশে প্রবেশ করে। মায়লী বলে: 'ঐ শহরের কথা পরে আমি শুনব তোমার কাছ থেকে। ঐ শহরে আমার মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ ঘুমোবার আগে আমার ঘরে এস তুমি, কেমন !'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায় প্যানসিয়াও। সন্ধ্যার ঐ মুহূর্তের জন্য সমস্তদিন প্রতীক্ষায় সে বিভোর হ'য়ে থাকে।

মায়লীর মনেও প্যানসিয়াওর ঐ কথাগুলো সমস্তদিন ধ'রে নাড়া দিল। মিস ক্রীমের ঝগড়ার কথা আর তার মনে রইল না। মিস ক্রীমের সঙ্গে পরমুহূর্তে দেখা হ'লে সে পরম হৃদ্যতার সঙ্গেই কথা বলল। মিস ক্রীমের মনে হয়, ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন, মায়লীর হৃদয় তিনি পরিবর্তন ক'রে দিয়েছেন। সমস্তদিন শান্তিতে অতিবাহিত হওয়ার জন্য মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সে-রাত্রে নীরবে প্রার্থনা করেন: 'হে ভগবান হে যিশু, এ-মেয়ের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে !' হৃদয়ে তাঁর বাণী শুনলেই মিস ক্রীম ব্যবস্থা ক'রে ফেলবেন।

সন্ধ্যার অপেক্ষা ক'রে থাকে মায়লী প্যানসিয়াওর জন্য। প্যানসিয়াও আসে। উচ্ছসিত হাসিতে সে তাকে ঘরের মধ্যে অভ্যর্থনা ক'রে নেয়। তাকে বসিয়ে মায়লী মিষ্টি খেতে দেয়। খেতে খেতে ছোট্ট লাল টুকটুকে জিভ দেখা যায় প্যানসিয়াওর। মায়লী হেসে বলে: 'বিড়ালের বাচ্চার জিভের মত তোমার জিভটা লাল—'

প্যানসিয়াও হাসে। তারপর আস্তে আস্তে বলে: 'ভারী সুন্দর কিন্তু আপনি দেখতে—কয়াঁ-ইন দেবীর মত।'

চোখ বড় বড় ক'রে বলে ওঠে মায়লা : 'আমি? বাবা শুনলে হেসে উঠতেন। আমাকে তো তুমি চেন না। আমার যা মেজাজ—!'

সুন্দর মুখের দিকে বিমোহিত হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে প্যানসিয়াও বলে : 'আমার বৌদি যদি হতেন আপনি—! আমার ছোড়দা—'

এমন অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা মায়লী স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। আশ্চর্য হ'য়ে সে প্রশ্ন করে : 'কী বললে?—'

'আমার ছোড়দা—। পাহাড়ী যোদ্ধাদের একটি দলের নেতা সে। তার জন্য কনে খুঁজতে লিখেছে নীলা-বৌদি। কিন্তু সে-মেয়ে পাব কোথায়?'

এতগুলো কথা এভাবে বলে ফেলে কেমন ভীত হয়ে পড়ে প্যানসিয়াও। নীলার চিঠিটা তার সঙ্গেই ছিল। কম্পিত হস্তে চিঠিখানা বের ক'রে সে মায়লীর সামনে খুলে ধরে।

কৌতূহল নিয়ে মায়লী চিঠিখানা পড়ে। প্যানসিয়াও দাঁড়িয়ে উঠে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মায়লীর মুখের দিকে। কৌতূহলী হাসি নিয়ে সে পড়তে সুরু করেছিল। সে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়...তারপর গাম্ভীর্যের ছায়া মায়লীর টুকটুকে সুন্দর মুখখানা ঢেকে ফেলল। চিঠি-খানা শেষ ক'রে ভাঁজ ক'রে প্যানসিয়াওকে ফিরিয়ে দিতে দিতে সে আপন মনে ভাবে : 'চোখে না-দেখলে এমন অদ্ভুত চিঠির কথা কে বিশ্বাস করতে পারে!' প্যানসিয়াওর দিকে ফিরে বলে : 'চিঠিখানা বেশ লিখেছেন। বেশ পরিষ্কার সহজ ভাষায় গুছিয়ে লেখা। তোমার দাদাও বুঝি এরকম লিখতে পারেন?'

'ছোড়দা? ওর ওসব লেখা-পড়ার বালাই নেই!'

'হুঁ, লেখা-পড়া না-জানা লোককে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—'

'ছোড়দা কিন্তু খুব চালাক ছেলে। লেখাপড়া শিখে কিছু লাভ নেই বুঝেই ও লেখাপড়া শিখলে না। আমাদের গাঁয়ে কিন্তু বুড়ো পণ্ডিত-খুড়ো ছাড়া কেউই লিখতে পড়তে জানে না।' মায়লীর মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে তারপর বলে : 'তা, আপনি যদি ছোড়দাকে পড়াতে শেখান, তাহলে ও ঠিক শিখে নেবে। ভারী চালাক ছোড়দা—'

মৃদু হেসে মায়লী বলে : 'কিন্তু যাকে দেখলামই না, তাকে বিয়ে করব কী ক'রে?'

'বিয়ের আগে আবার বরকে কেউ দেখে নাকি ?'

'আচ্ছা তোমার ভাইয়ের সম্বন্ধে বল—' প্যানসিয়াওর ভাইয়ের সম্বন্ধে সে মোটেই ভাবছে না। হেসে উড়িয়ে দেবার মত মেয়েটার প্রস্তাব কিন্তু তবুও এটাই তো মায়লীর দেশ, মায়লীর দুনিয়া।

প্যানসিয়াও তার ভাইয়ের কথা বলে। কিছুই বাদ দেয় না। ভাইয়ের সেই রুক্ষ মেজাজ, নিষ্ঠুরতা, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অসীম সাহসিকতাপূর্ণ তড়িৎ আক্রমণ —যা জানে, যা শুনেছে প্যানসিয়াও, সব কিছু সে বলে মায়লীকে।

গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঔৎসুক্য নিয়ে শোনে মায়লী। বহুক্ষণ ধরে, প্রায় অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত, তারা কথা বলে। তাদের দু'জনের চোখের ওপরে ভেসে ওঠে অমিতবল এক যুবক—লেখাপড়া জানে না কিন্তু বিক্রমশালী।

মায়লী ধীরে উঠে দাঁড়ায়। প্যানসিয়াওর গাল ছুঁয়ে আদর ক'রে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলে শুতে যেতে। 'মিস ফ্রীম যদি তোমাকে দেখেন এখানে তাহ'লে মজা পাইয়ে দেবেন—'

প্যানসিয়াও চলে গেলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব কিছুই নতুন মনে হয় মায়লীর। এই কক্ষের সব কিছুই সে বিদেশী কায়দায় সাজিয়ে নিয়েছিল। বিদেশের অভ্যস্ত জীবনের জিনিষপত্র দিয়ে তার কক্ষ সাজান। এখানে কাউচ কুশান, ওখানে ফটো। কিন্তু এখন আর এঘর, এ-জীবন-ব্যবস্থা তার আপনার মনে হয় না।…শত্রু অধ্যুষিত দেশের এক পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত যেন তার এই কক্ষ। একজন যুবক গেরিলা অধিনায়ক যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে।… কিছুতেই মায়লী সেই যুবককে তার চোখের সামনে থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। মায়লীর দুঃখ হয় যে এই রকম সাহসী ও শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও ঐ ছেলের কোন ভবিষ্যৎ নেই। 'আচ্ছা, লেখাপড়া যদি শেখে তাহ'লে কী শত্রুর বিরুদ্ধে আরও বেশী সাহসী হবে না ও ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মায়লী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'ও-ছেলের কথা এত ভাবছি কেন আমি ? এ রকম রোমান্টিক হওয়া তো ঠিক নয়।'

জানালার পাশে গিয়ে জানালা খুলে সে দাঁড়িয়ে দেখে।

আকাশের কোলে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্না প্লাবিত হয়েছে নিচের ন্যাড়া পাহাড়ের শৃঙ্গগুলো। ওগুলোকে ধূসর দেখায়, মনে হয় হিংস্র। একটি গাছও দেখা যায় না, গাছের ছায়াগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আরও কৃষ্ণকালো হয়ে উঠেছে। এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু

ভীতিহীন মন চাই এদৃশ্য দেখতে। ভয় পেলে তাকিয়ে দেখা যায় না। মায়লী ভয় পায় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ ধরে। নিজের মনে বলে : 'বোকা হব না আমি—।' তারপর আস্তে আস্তে নীরবে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি।

সতর

মায়লী ইচ্ছে ক'রেই দূরে রইল—প্যানসিয়াওর মুখোমুখি যাতে না হ'তে হয় তাকে। হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলে, একটু হেসে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নিত সে।

কিন্তু তবুও ওর ভেতরে কিসের শক্তি যেন সর্বসময়ে নাড়া দেয়। পাহাড় যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে···দিবারাত্র দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে পাহাড়ের নিঃশব্দ বন্য আহ্বানে···তারা যেন অষ্টপ্রহর কানে কানে বলে : ঐ ছক-ধরা জীবন তোর জন্য নয়, তুই চলে আয়। গভীর ভাবে ভাবে মায়লী : স্কুলের শিক্ষকতার পেছনে জীবন কাটিয়ে দেবে কি সে? মনে যে-সঙ্গীতের রণন ওঠে না, মুখের ভাষায় যে-গান ফুটে উঠতে চায় না—সেই ব্রহ্মসঙ্গীত, সেই উপাসনা গীতির সুরে প্রতিদিন সুর মেলাবে কেন মায়লী।

কিন্তু কি করবে মায়লী, কোন্ পথ উন্মুক্ত তার সামনে? একা একা একটি মেয়ে কি করতে পারে? যার সহায়তায় সে এখানে এই খৃষ্টান স্কুলে এসেছিল, মায়লী কি লিখবে তার কাছে তাকে এখান থেকে অন্য কোন স্থানে নিয়ে যেতে? কিন্তু কোথায় যাবে সে? মামাদের বাড়ীতে যাবে কি? শত্রু-দখলে শহর যাবার পর মামারা সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদেরই বা খোঁজ পাওয়া যাবে কি ক'রে? একলাই বা ও কি করবে? কারও সঙ্গে কি ও যাবে? কোনো সৈন্য-বাহিনীতে যদি ও প্রবেশ করে! উত্তর-পশ্চিমের মুক্ত এলাকায় তো এই জাতীয় মিলিত বাহিনী গড়ে উঠেছে। ছেলে এবং মেয়েরা একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। কিন্তু বহুর সঙ্গে এভাবে মিশে গিয়ে লড়াই করা ওর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনে সায় দেয় না। আত্ম-গর্বে, স্বাতন্ত্র্য-বোধে স্ফীত মেয়ে মায়লী পারবে না এভাবে বহুর মধ্যে ডুবে যেতে···। ও চায় ক্ষমতা, মিনমিনে শান্ত জীবন ওর নয়। ওরই মতন

বিদেশে শিক্ষিতা ক্ষমতাভিলাষিনী মেয়ের ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরূঢ় হওয়ার উদাহরণ তো ও জানে। ও কি ঐ পথেই যাবে?…

চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে মায়লীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্ত্রী চিন্তিত মিস্ ফ্রীম ভাবেন :

'দিন দিন যেন ব্যাঘ্রী হ'য়ে উঠছেন শ্রীমতী। এ-মেয়েকে দিয়ে স্কুল চলে! হে ঈশ্বর, এ-মেয়ের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে, এখান থেকে একে সরিয়ে নাও। কি ভাবে যে একে সরাই… !'

গভীর রাত্রে নিজের কক্ষে বসে মায়লী রেডিও খুলে শোনে। রাত দুটো থেকে তিনটের রেডিওতে সংবাদ বিতরণ হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিজয়ী বীর দেশপ্রেমিকদের সংবাদ আসে, আসে ক্ষয় ক্ষতিরও। খাঁচায় বন্দী বিহঙ্গের মত দিন কাটিয়ে মায়লী প্রতীক্ষায় থাকে রাত্রের এই বিশেষ সময়টুকুর জন্য। রেডিওর খবরের পরেই মায়লী পর্বতশ্রেণীর দিকের জানালা খুলে দিয়ে বুক ভরে মুক্ত হাওয়া গ্রহণ করে, যত শীতই পড়ুক না কেন, গভীর রাত্রে উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে পাহাড়ের আহ্বান সে না শুনে পারে না। নিজে নিজেই ঠিক করে এ-বন্ধন কেটে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

সেই আকাঙ্খিত মুক্তি এল, মিশনারী স্কুলের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল মায়লী।

মিস ফ্রীমই মায়লীকে বন্ধন-মুক্ত করে দিলেন।

অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীর কাছে একদিন মিস ফ্রীম বললেন :

'সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি মহান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি আমাকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য কিভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে এ-মেয়েকে আমি এই স্কুল থেকে সরিয়ে দিতে পারি। এ-মেয়েকে দিয়ে স্কুল হয়? একে দিয়ে স্কুল চলে না। একদিন এক ক্লাশে ও পড়াচ্ছিল আমেরিকার ইতিহাস।…নিজের কানে শুনলাম, সে মেয়েদের ডেকে বলছে : "এখানে এই পাহাড়ের কোলে বসে বসে অন্য দেশের অন্য জাতির কীর্তি কাহিনী পড়ে কি হবে, যখন আমার নিজের দেশের বুকের ওপর রণতাণ্ডব চলেছে? আমি যদি যাই, তোমরা কে কে যাবে আমার সঙ্গে, কে কে রাজী আছ?"…কি কাণ্ড!' মিস ফ্রীম বলেন :

'এই মেয়ে করবে শিক্ষিকার কাজ? এতগুলো কচি মেয়ের ভার রয়েছে আমাদের ওপরে, আর তাদের বলছে কিনা 'ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে? নিজের কানে শুনলাম!—হে ঈশ্বর আমার মনে শক্তি দাও—দরজা খুলে ক্লাশে ঢুকে বললাম: মিস উই, মিস উই, এসব কি শেখাচ্ছ···উঁহু, এসব উচিত নয়···তোমর শিক্ষকতার চুক্তি-বিরোধী কাজ করছ মিস উই, তোমার চুক্তি ভেঙ্গে ফেলছ!'

মিস ক্রীমের বর্ণনা শুনে অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা শিউরে উঠল। এরা সকলেই মিস ক্রীমের ভূতপুর্ব ছাত্রী।

কি ভাবে এই কঠিন সমস্যা সমাধানের পথ ক'রে দিয়ে মিস ক্রীমকে রক্ষা করেছেন মহান ঈশ্বর, সে-কথার সঙ্গে সঙ্গে মিস ক্রীমের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার বর্ণনা শুনে মায়লী হাসতে হাসতে বলল: 'ঈশ্বর তো মিস ক্রীমকে দিয়ে আমার বন্ধন মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। মিস ক্রীম কি তা জানেন?'

স্কুলের দারোয়ানকে দিয়ে মায়লী ডেকে পাঠাল এক পাহাড়ী সংবাদ বাহককে। তাকে দিয়ে সে টেলিগ্রাম পাঠাল নিকটবর্তী শহরের সেই এরোপ্লেন-চালকের কাছে, যে তাকে আগে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল এই স্কুলে। চালক এলে তারই সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল অজানা পথে। প্যানসিয়াওর সঙ্গে দেখাও করল না।

পাহাড়তলির এক গ্রামে চা-খানার সামনে ডুলি থেকে নামল মায়লী। ছোট্ট প্লেন নিয়ে এসেছে চালক। চালকের নীল জামা-প্যান্ট পুরোনো হ'য়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। টুপীটি হাতে নিয়ে স্মিত মুখে দাঁড়াল এসে সে মায়লীর সামনে। মায়লীর ফিরে আসাতে সে খুব আশ্চর্য হয় নি। শিক্ষা-নিকেতনের বন্ধনীর মধ্যে যে এ-মেয়ে আটকে থাকবে না, চালক বুঝেছিল সেই দিনই যেদিন সে এসেছিল একে পৌঁছে দিতে। চা-খানায় ঢুকে পেটপুরে খেয়ে নিয়েআধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে এল মায়লী। প্লেনে ব'সে দেহ ঝুঁকিয়ে বসে একবার শেস-দেখা দেখে নিল পাহাড়ের দিকে। বলল চালককে: 'সমুদ্রের দিকে চল—'

মনের বল্গা খুলে দিয়ে মায়লী উড়ে চলল উড়ন্ত প্লেনের সঙ্গে।··· প্যানসিয়াওর কথা মনে হয়, তার বৃদ্ধ বাপ, তাদের গাঁয়ের বাড়ীর কথা মনে পড়ে···সরল প্যানসিয়াওর প্রস্তাব শুনে যে কোন লোক হেসে উঠত, শুনে মৃদু হেসেছিল মায়লী নিজেও, কিন্তু আজ বল্গাহীন মনে সব কথা

ভেসে উঠছে। একটা অজ্ঞ মূর্খকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ভাবতে হাসিও পায় মায়লীর মত মেয়েদের। তবুও প্যানসিয়াওর সেইকথা এখন মায়লীর মনের চিন্তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। মুক্ত ও এখন, মুক্ত মায়লী সব কিছু থেকে···আকাশের মেঘ-উড়িয়ে-নেওয়া হাওয়ার মত মুক্ত ও। কেউ জানে না কোথায় ও, নিজের খুশিতে চলার আনন্দে ও স্বপ্নাবিষ্ট। সঙ্গের পুরুষ চালকটি মায়লীর কাছে যেন অবচেতন কিছু, চলমান যন্ত্রের অংশ বিশেষ—যেন চিত্রার্পিত—আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন্ সুদূর স্বপ্নে ডুবে আছে মেয়েটি···

কিন্তু স্বপ্নে ডুবে ছিল না মায়লী। মনের মধ্যে তার নানা কথা উঠছে··· প্যানসিয়াওর মত ওর ভাইটিও কি সুন্দর? প্যানসিয়াও তো তাই বলেছিল। বলেছিল, ওর ভাই আমার থেকেও দিঘল, তার দীর্ঘ টানা চোখ দুটোর নিকষ কালো মনি দুটে বলে স্বচ্ছ শুভ্রতার ওপর এমন জল জল করে যে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না ঐ চোখ থেকে, মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়তে হয়। বারে বারে ভাইয়ের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কিন্তু প্যানসিয়াও স্বাভাবিক মেয়েলী ছলা-কলার সাহায্য নিতে পিছপাও হয় নি। মায়লী ভাবে, একবার নিজ চোখে দেখে এলে কেমন হয় প্যানসিয়াওর সেই সুন্দর ভাইকে! কিন্তু মায়লীর মত মেয়েরা সমান-সমান ভেবে পুরুষদের স্থান দিতে রাজী নয়, বিশেষ ক'রে অচেনা অদেখা ছেলেকে। বিদ্রূপের বানে সে ভাসিয়ে দিত সকলককে, এমন কি তার বাবাকেও সে পরোয়া করত না—এমনি ছিল মায়লী। তবুও কিশোরী বয়সের স্বপ্নে যে ছেলে উঠত তার মনের পটে ভেসে, তাকে সে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিতে পারত না। লেখাপড়ার কদর সে বড় বেশী দিতও না। লেখাপড়া না জেনেই প্যানসিয়াওর সুদর্শন ভাই যদি এত শক্তিধর হ'য়ে থাকে, লেখাপড়া জানলে না জানি সে কত বড় হ'ত! শক্তির ধারক মহাপুরুষ ড্রাগন-রূপে এসে দাঁড়ায় সেই অচেনা যুবকটি মায়লীর বল্গা-ছাড়া মনের পটে···মায়লীর থেকেও সে কত বড় শক্তিমান···শিক্ষার জন্য সেই শক্তিমান পুরুষটি যেন মায়লীর ওপর পরম নির্ভরশীল।···থাকুক থাকুক সে উদ্দাম হয়েই থাকুক, দরকার নেই বল্গার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ার! তবুও নির্দিষ্ট গতি-ধারায় মায়লী নেবে তাকে চালিয়ে···উদ্দাম দুরন্ত শক্তিমান পুরুষকে প্রভাবিত ক'রে চালিয়ে নেওয়া —সত্যি কল্পনা করতেও ভাল লাগে মায়লীর। কিন্তু এই জাতীয় পুরুষকে

তো শহরে কিংবা প্রাসাদে, সরকারী অফিসের চৌহদ্দির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেসব জায়গায় মায়লী দেখেছে রমণীয় মেয়েলী ধাঁচের "সখী সখী" ভাব ছেলেদের। পুরুষসিংহ খুঁজে পাওয়া যায় না ঐসব স্থানে।

আকাশের বুকে সমস্ত দিন ধরে ভাসতে ভাসতে মায়লী এই ভাবেই ভেবে চলল। ঠিক করল যে একবার সে যাবে প্যানসিয়াওর সেই সুদর্শন দুরন্ত ভাইকে দেখতে। তাকে দেখে একবার মিলিয়ে নেবে তার কল্পনার অদেখা সেই উদ্দাম যুবককে।

এবং ইচ্ছা করলে এই দেখার চেষ্টা করাও মায়লীর পক্ষে খুব মুস্কিলও নয়। প্যানসিয়াও তাকে তার জামাইবাবু উলীন-এর কথা বলেছে: সে শত্রুদের সহকর্মী হ'য়ে শহরে বাস করছে। এদিকে শহরে যে সাক্ষীগোপাল দেশী শাসন-কর্তাকে বসিয়েছে শত্রুরা, সে হ'ল আবার মায়লীর বাবার বন্ধু। একই সঙ্গে তাঁরা পড়েছেন, একই সঙ্গে তাঁরা ঐ শহরে বড় হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিদেশে নির্বাসন-বাসের সময়ও তিনি মায়লীর বাবার বাড়ীতে গেছেন। মায়লী দেখেছে তাঁকে। দেশের তৎকালীন গভর্নমেণ্ট তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসন দিয়েছিল কী এক সরকারী কাজের বিরোধিতার জন্য। এ লোকটির বিরোধিতার মূলে শক্তি ছিল না, ছিল দুর্বলতা। অর্থবান ব্যক্তি, পারিবারিক-ক্ষমতাও ছিল পিছনে, বিদেশ-বিভুঁয়ে আবছা সম্মানের মোহে কালাতিপাত ক'রে এসে ভদ্রলোক আজ শত্রুর হাতের পুতুল হ'য়ে বসেছেন এদেশেরই শহরে। এই জাতীয় লোকগুলোই মূর্তিমান আত্ম-বিক্ষোভের ধ্বজা তুলে দুর্বল ষড়যন্ত্র ফাঁদে বিদেশের শহরে। এই লোকগুলোই অতি সহজে বিজেতা বিদেশীদের হাতের পুতুল ব'নে যায় এবং এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। মায়লীর মায়ের জন্মস্থান ছিল এই শহরেই। শহরের অনতিদূরে ছিল তাঁর গোরস্থান। সমুদ্র পারের কোনো জায়গা থেকে মায়লী যদি লেখে তার এই পিতৃবন্ধু শাসনকর্তাকে যে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ক'রে দিলে মায়লী চায় একবার মায়ের জন্ম ও সমাধিস্থান দেখতে, তা হ'লে অতি সহজেই সে শহরে যেতে পারে। বৃদ্ধ বাবা শুনলে রাগ করবেন বটে···তবুও সে যাবে। শহরে পৌঁছে উলীনের খোঁজ ক'রে তারই সাহায্যে প্যানসিয়াওদের গ্রামের কাছে তার মায়ের গোরস্থান দেখতে যাবে। তারই অদূরে লিংটানের বাড়ী। কাউকে কিছু না বলে সমস্ত প্ল্যানটি মনে মনে ছকে ঠিক ক'রে রাখল মায়লী। ভাইয়ের যে-বর্ণনা

প্যানসিয়াও দিয়েছে, তা যদি না হয়, তবে একটা প্রমোদ-ভ্রমণ, একটা কিছু এ্যাডভেঞ্চার ব'লে মনে করা যাবে। আর যদি সেই বর্ণনা অনুযায়ী সব মিলে যায়, তবে কে বলতে পারে তার শেষ-পরিণতি কোথায় ?

তারা উড়ে এসে হাজির হ'ল সীমান্তের এক ছোট্ট শহরে রাত্রিবাসের জন্য। যেমন নোংরা সরাইখানা তেমনি ছাড়পোকায় ভর্তি বিছানা। পরদিন ভোরবেলা উঠে আবার প্লেনে যাত্রা···সন্ধ্যার পূর্বে সমুদ্রোপকূলের বন্দরে এসে তারা হাজির হ'ল।

তার পিতৃবন্ধু সাক্ষিগোপাল দেশী শাসনকর্তাকে সে টেলিগ্রাম ক'রে জানাল তার আগমনবার্তা এবং মায়ের সমাধিস্থান দেখার বাসনা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাগতম জানিয়ে উত্তর এল···সবরকম সুব্যবস্থা শাসনকর্তা মায়লীর জন্য ক'রে দেবে যাতে সে দেখতে যেতে পারে তার মায়ের গোরস্থান। মায়লীর জন্য স্টেশনে শাসনকর্তার নিজের মটর গাড়ী অপেক্ষা করবে, ট্রেনের কামরার বিশেষ ব্যবস্থা করবার জন্য শাসনকর্তা আদেশ দিয়েছেন। মায়লীর নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজে নিচ্ছেন। এসব লিখে শাসনকর্তার মোহর মেরে দিয়ে সই ক'রে দিয়েছেন তিনি। সেই দুর্বল চিত্ত লোকটার চেহারা মনে ভেসে ওঠায় মনে মনে হাসল মায়লী।

দুদিন অপেক্ষা করল মায়লী এই বন্দর-শহরে। নতুন জামাকাপড় কিছু কেনাকাটা ক'রে সে একদিন ট্রেনে চেপে রওনা হ'ল তার মায়ের বাল্যকাল কেটেছে যে শহরে তারই উদ্দেশ্যে।···

পাশাপাশি বসে একটু ঘনিষ্ঠ হ'য়ে সরে এসে শাসনকর্তা বললনে : 'বড়ই নিঃসঙ্গ আমি—' মায়লীর হস্ত স্পর্শ করবেন না তো তার এই পিতৃবন্ধু ! আর কতটা ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসবেন তিনি !—আশ্চর্য হ'য়ে ভাবে মায়লী, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে তার দিকে। শাসনকর্তা বোঝেন যে মায়লীকে তিনি স্পর্শ করতে পারেন না। টেবিলের ওপর কাপ নামিয়ে রেখে তিনি সরে বসেন।

শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় মায়লী : 'হ্যাঁ, আপনি সত্যিই নিঃসঙ্গ, একাকী। সকলের কাছ থেকে তো আপনি নিজেকে আলাদা ক'রে ফেলেছেন।'

ইংরেজী ভাষাই তারা কথা কইছিল।

'তা হলে আমাকে ভুল বোঝনি! আমি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক নই। আমি অত্যন্ত বাস্তবপন্থী। আমাদের দেশের আধাআধি এই পূর্বসাগরপারের লোকরা দখল ক'রে নিয়েছে। বাস্তববাদী হ'লে আমাদের এখন উচিত হবে ওদের সঙ্গে কাজ করা। আর, তা ছাড়া আমি যা করছি তা হ'লো সম্পূর্ণ চৈনিক। আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ। সেখানে দেখবে যে আমরা চিরদিনই বিজেতাদের কাছে মাথা নুইয়েছি···কিন্তু শেষে আমরাই টিকে থেকেছি, বিজেতারা সব সময়ই শেষ হ'য়ে গেছে। এই তো আমাদের দেশের ইতিহাস।'

'কিন্তু সেদিন তো আমরা শক্তিমান ছিলাম!'

উত্তর দেন না শাসনকর্তা। কে একজন যেন ঘরে প্রবেশ করেছে। খিটখিটে মেজাজে তিনি প্রায় ফেটে পড়ছিলেন, কারণ তিনি হুকুম দিয়েছিলেন যে অতিথির সঙ্গে যখন তিনি আলাপ করবেন, তখন কেউ যেন তাকে ডেকে বিরক্ত না করে। মুখ ঘুরিয়ে উলীনেকে দেখে বিরক্তি চেপে তিনি বললেন:

'অ, উলীন—' মায়লীর দিকে ফিরে তিনি বললেন: 'এ হ'লো আমার সেক্রেটারী, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, এবং আমাকে ঠিক ও বোঝে।'

ও! তা হ'লে প্যানসিয়াওর ভগ্নীপতি একেবারে শাসনকর্তার একান্ত সচিবের পদে উন্নীত হয়েছেন! তা হ'লে তো মায়লীর কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে খুব বেগ পেতে হবে না!

সুন্দরী মেয়ের মুখ তাকিয়েও দেখল না উলীন! মাথা নুইয়ে বিনয় প্রদর্শন ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল: 'স্যার, আপনাদের বিরক্ত করতে হ'ল বলে খুবই দুঃখিত হয়েছি। কিন্তু বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে। একটা দুঃসংবাদ এসেছে।'

শাসনকর্তা সোজা দাঁড়িয়ে উঠে উলীনকে সঙ্গে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। মায়লী বসে বসে উলীনের কথা ভাবে।

দুঃশ্চিন্তার কালো ছাপ মুখে মেখে শাসনকর্তা ফিরে এলেন। বললেন: 'সত্যিই দুঃসংবাদ। ভীতিজনক সংবাদ···পাহাড়গুলিতে যে সৈন্যবাহিনী ছিল, তাদের ওপর একদল দুঃসাহসী গুণ্ডা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সব খতম ক'রে দিয়েছে, একজনও বেঁচে নেই।'

'অ—' কিন্তু এজন্য কি আপনাকে দোষ দেবে ওরা?' মায়লী জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ। আমার দেশের লোকদের কাছ থেকে এই রকম বর্বরতা চলতে দিতে তো আমি পারি না। ওরা জানে একথা, তবুও এর জের তো বুঝতে পারি আমি।'

উলীন এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। তার দিকে ফিরে শাসনকর্তা বলেন :

'আমার অতিথিকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস, উলীন।···আচ্ছা—! কাল আবার দেখা হবে। তোমার আনন্দের ব্যবস্থা কাল করব।'

'না, না, আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমার ব্যবস্থা আমিই ক'রে নেব।'

বিনয়ে অবনত অপেক্ষমান উলীনের সঙ্গে বেরিয়ে আসে মায়লী।

উলীনকে একলা পেয়ে মায়লী জিজ্ঞেস করে : 'কাল কি শহরে একটু যাওয়া যাবে?'

'যেতে পারেন রক্ষী নিয়ে।'

'শহরের বাইরে যাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, রক্ষী নিয়ে যেতে পারেন।'

একটু চুপ থেকে মায়লী আবার জিজ্ঞেস করে : 'রক্ষী মানে কি, বিদেশী সৈন্য? সৈন্যের সঙ্গে যেতে হবে?'

নিথর প্রস্তরের মত দাঁড়িয়ে থাকে উলীন। মায়লী বলে :

'কিন্তু এই শহরে, আমার নিজের জন্মভূমিতে, আমার মায়ের জন্মস্থানে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে শত্রু-সৈনিক পরিবেষ্টিত হ'য়ে! আপতি তো বোঝেন—' মায়লী বুঝাবার চেষ্টা করে উলীনকে। কিন্তু সে-মুখে কোন পরিবর্তনের রেখাই নেই। 'আমি মায়ের গোরস্থান দেখতে যেতে চাই··· আমার মায়ের আমিই একমাত্র সন্তান।' শেষ কথা যোগ দিল মায়লী ইচ্ছে করেই, যাতে পরার্থ প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে উলীন।

মাথা ঝাঁকিয়ে উলীন বলে : 'বুঝেছি। দেখি, আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি কিনা। যদি পারি তো রক্ষী-সৈনিকেরা একটু দূরে দূরে থাকলেই হবে।'

মায়লীর সব কথাই সত্যি। তার মায়ের কবর রয়েছে তাদের ধর্মীও গোরস্থানে। কিন্তু কোন্ জায়গায় যে সেটা, মায়লী ঠিক জানে না। তবুও তার মনে হয় যে সেই গ্রামের নামটা যদি সে শোনে তবে হয়তো ঠিক ধরতে পারবে।

'আপনাকে ধন্যবাদ জানাব যে কি ভাষায়—'

'ধন্যবাদের দরকার নেই—' মাথা নুইয়ে উত্তর দেয় উলীন।

মৃদু হেসে মায়লী বলে : 'আচ্ছা, আপনাকে ধন্যবাদ দেবার পথ আমি বের ক'রে নিচ্ছি!' মায়লীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল সে একথা। তারপর সে ঢুকল তার সাজানো ঘরে।

পরদিন মায়ের সমাধি দেখবার জন্য মায়লী প্রস্তুত হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাসনকর্তা বুঝতে পারে মায়লীর মনের ইচ্ছা। কিন্তু সে-গাঁয়ের নাম তো মনে নেই মায়লীর। উলীনের ডাক পড়ে। উলীন এসে সব শুনে বলে :

'আমার স্ত্রীকে ডাকি। সে ঐ অঞ্চলেরই মেয়ে, তার বাবা মাও ঐ দিকেই গ্রামে থাকেন। ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলোর নাম সে বলতে পারবে।'

উলীন-পত্নী এল। চেহারার মিল দেখে মায়লী তাকে দেখে প্যানসিগাওর বোন ব'লে চিনতে পারে। প্যানসিগাও আরও সুন্দর কিন্তু দিদির চেহারাটা একটু বোকা বোকা। মায়লীর ইচ্ছার কথা শুনে একটু ভেসে সে বলে :

'আমাদের লিং গাঁয়ের পশ্চিমেই হবে সেই গোরস্থান।' ঐ অঞ্চলে তো ওটাই একমাত্র মুসলমানদের গোরস্থান। স্বামীর দিকে ফিরে বলে : 'তা হলে তোমাদের সঙ্গে আমিও ছেলে মেয়ে নিয়ে যাব। তোমরা গোরস্থান দেখতে যেও, আমি সেই সময় বাবা মার সঙ্গে দেখা ক'রে আসব।'

॥ আঠার ॥

ধান মাড়ানোর উঠোনে বসে লিংটান জোয়ালটা ঠিক করছিল। নিদ্রা-হীনতার ক্লান্তি নেমেছে তার সর্বদেহে, কারণ গত দুদিন সমূহ বিপদ ও শঙ্কার মধ্যে তাঁদের কাটাতে হয়েছে। সপ্তাহ খানেক আগে লাও-তা এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে পাহাড়তলির গাঁয়ের শত্রু-সৈন্য-নিবাসের ওপর অক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস ক'রে দেবে মুক্তি ফৌজ। এর আগেও দু' দুবার এই রকম অক্রমণ চালিয়েছিল মুক্তি ফৌজ। আক্রমণের পর শত্রুরা তাদের সৈন্যাবাসকে আরও দৃঢ় করেছে। এবারের আক্রমণ তাই আরও তীব্র হয়েছিল। লিংটানের সন্দেহ হয়েছিল পাহাড়ী-যোদ্ধারা এবারে সত্যি সত্যিই শত্রুর সঙ্গে এঁটে

উঠতে পারবে কিনা। কিন্তু সেই আক্রমণ সফলতার সঙ্গে চালিয়ে শত্রু-সৈন্যাবাস ভূমিস্যাৎ ক'রে দিয়েছে মুক্তফৌজ। আজ লিংটানের গোপন-ঘরে দুই ছেলে ঘুমিয়ে আছে। তৃতীয় পুত্র লাও-সানের কনুইতে আঘাত লেগেছে ব'লে বুকের সঙ্গে হাতটা বাঁধা।

শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধ কৃষকের মত জোয়াল সারাতে থাকলেও ক্লান্ত লিংটান কিন্তু কড়া নজর রাখছিল চারদিকে। মাটির নীচের বাতাসহীন গোপন-ঘরে বড় দুই ছেলে ঘুমোলেও, ছোট ছেলে লাও-সান সে-ঘরে শোয়নি। সে বাইরে উঠোনে শুয়ে আছে। হঠাৎ যদি কেউ আসে, খবর পেয়ে হেঁশেলের ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে হলেও আগন্তুকের নজরে সে পড়বে। তাকে বলেই বা কী লাভ? বৃদ্ধ বাপের কথা কি শোনে?

কাজ করতে করতে বৃদ্ধ ভাবে: 'যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে এই রগ-চটা ছেলে সংসারের কী কাজে লাগবে?'

দূরে রাস্তার ওপরে হঠাৎ নজর পড়াতে লিংটান দেখল উলীন ও তার মেয়ে আসছে নাতি নাত্নীদের নিয়ে। ঘোড়ারগাড়ী থেকে নেমে তারা পায়ে হেঁটে আসছে। আজকাল আর শত্রু-রক্ষী-সৈন্যদের ও অত ভয় করে না। গাড়ীর পাশে তাদের অপেক্ষা করতে বলে উলীন শ্বশুর বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসে। অনেকটা কাছাকাছি এলে লিংটান দেখে কে একজন তন্বী আসছে তাদের সঙ্গে···বেশ লম্বা, কেমন বিদেশী ভাব চোখে মুখে যা কোনদিন লিংটান ইতিপূর্বে দেখেনি কোন মেয়ের অবয়বে। শত্রু দেশের মেয়ে কি? লিংটান খুব খুশি হয় না এদের দেখে। ওদের স্বাগতম জানাতেও তার ইচ্ছা হয় না। হাতের কাজ বন্ধ না ক'রে ওখানেই বসে বসে মেয়ে জামাইকে সম্বোধন ক'রে বলে: 'তোমরা এলে তবে?'

'হ্যাঁ—, আশা করি আপনারা সব ভালই আছেন।' উলীন হৃষ্টমনে উত্তর দেয়।

'হ্যাঁ—,এই দুর্দিনে কায়ক্লেশে কোনমতে যেরকম থাকা সম্ভব আর কি—' উলীনের প্রতি খুব একটা গায়-মাখা ভাব দেখাতে সে রাজী নয়।

মেয়ে বলে: 'তোমাদের নাতি নাত্নী নিয়ে এলাম দেখাতে।' মায়লীকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বলে: 'ইনি আমাদের পরিচিতা, এখানে এসেছেন মুসলমান গোরস্থানে মায়ের সমাধি দেখতে।'

শত্রুদেশের মেয়ে নয় তবে। এদেশেরই দুহিতা। স্বাগতম জানিয়ে

লিংটান বলে : 'এস মা লক্ষ্মী। তোমার চোখ মুখে বিদেশী ভাব দেখে তোমাকে শত্রুদেশের মেয়ে ব'লে ভুল করেছিলাম।'

বিনয়ে অবনত হ'য়ে মায়লী বলে : 'আমি এসে বোধহয় আপনাদের অসুবিধা করলাম।'

'না না—,অসুবিধা কেন হবে—' মুখে বল্ল বটে লিংটান, কিন্তু সত্যি সত্যি মনে মনে সে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ল। ছেলেরা রয়েছ দাওয়াতে আর এই বিশেষ মুহূর্তেই কিনা উলীন এল! গোপন সংবাদ কিছু না পেলে আজই বা কেন সে আসবে? এদের এখানে দাঁড়া করিয়ে রেখে কি ভাবে চট্ ক'রে ভিতরে গিয়ে ছেলেদের সাবধান ক'রে দিয়ে আসবে, তড়িৎগতিতে মনে মনে ভাবে লিংটান। শুধু মেয়ে জামাই হ'লে হয়তো তা করা যেত, কিন্তু অতিথি মেয়ে যে এদের সঙ্গে। স্বাগতম জানিয়ে ঘরে বসাবার প্রোটোকল রীতি না মানলে যে ছি ছি করবে।

মুহূর্তের জন্য হলেও এই চিন্তার তড়িৎগতি যখন তার মনের চারিদিকে নাড়া দিচ্ছে, তখন ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে বৃদ্ধ তাকিয়ে দেখল ঘুম-চোখে লাও-সান দোর পেরিয়ে ইজারের দড়ি খুলে বাইরে যাচ্ছিল, তাই দেখে লিংটান চেঁচিয়ে উঠল :

'দাঁড়া দাঁড়া হতভাগা! দেখছিস না সামনে লোকজন রয়েছে, একজন অচেনা মেয়ে রয়েছে!'

অচেনা মেয়ের উপস্থিতির কথা কানে যাওয়ায় লজ্জার রাগ ঝলক দিয়ে আছড়ে পড়ে লাও-সানের মুখে। বিমূঢ় দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে লিংটান। এদের দু'জনের অবস্থা দেখে মায়লী হো হো ক'রে হেসে ওঠে। হয়তো অন্য মেয়ের পক্ষে এভাবে হেসে-ওঠা সম্ভব নয়, কিন্তু মায়লী পরোয়া করে না কিছুই। লাও-সানের প্রথম দৃষ্টি যখন পড়ল ঐ অচেনা মেয়ের ওপরে, দেখল মেয়ের কৃষ্ণকালো কেশ, শুক্তি-শুভ্র দাঁতের সারি, হাসির দমকে নড়ছে রক্তিমাভা গণ্ড ও ওষ্ঠ···একখানা খোলা তরবারী যেন বিমোহিত লাও-সানের হৃৎপিণ্ড উপড়ে দিয়ে গেল। লজ্জা পেয়েছে লাও-সান। মাথা নীচু ক'রে, চোখ মুখ বুঁজে ইজারের দড়ি টানতে টানতে এক দৌড়ে বাড়ীর ভেতরে পালিয়ে গেল।

'লাও-সান না?' ভাইকে দেখে উলীন-পত্নী চেঁচিয়ে ওঠে।

জীবনে লিংটান যা করার দুঃস্বপ্নও কোনদিন দেখেনি, আজ এই মুহূর্তে সে তাই করল। উলীনের সামনে জানু পেতে বসে মাথা নুইয়ে সে চাইল

পুত্রের এবং বাড়ীর আর সকলের জীবন-ভিক্ষা। উলীন বুঝল। শ্বশুরের হাত ধরে তাড়াতাড়ি তুলে, স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল: 'আমি কিছু দেখিনি।'

লিংটান বুঝল যে উলীন তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। জামাইর সামনে দাঁড়িয়ে সে নম্র কণ্ঠে বলল: 'আর ভুল বুঝে বিচার করব না। সব বিচার ঐ উপরের ভগবানই করুন!'

এদের গৃহাভ্যন্তরে স্বাগতম জানাবার প্রতিবন্ধক আর রইল না। হৃষ্টমনে গৃহকর্তা তাদের সকলকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে বসতে বলল। লিংসাওকে বলল এদের জন্যে চা তৈরী করতে।

একে একে বাড়ীর সকলেই অতিথি ও জামাই-মেয়ের সামনে এল। এল না শুধু দু'ভাই তাদের গোপন-ঘর ছেড়ে। মায়লী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এদের …প্যানসিয়াওর বর্ণনানুযায়ী সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। নীলা এল, নতুন আর একটি শিশু-ভগবানের আগমন বার্তা তার সর্বাঙ্গে। নবাগতাকে দেখে তার অত লজ্জা নেই। মায়লীর ভাল লাগে নীলাকে।

বাইরের অর্গল ভাল ক'রে এঁটে বন্ধ ক'রে দিয়ে লিংটান এল আগন্তুকদের সামনে। পাশে দণ্ডায়মান লাও-এরকে বলল লাও-তা ও লাওসানকে ডাকতে। বড় ভাই এল বেরিয়ে…মায়লী দেখল, সরল শান্ত একটি লোক। কিন্তু ছোট আসে না। ঘরের মধ্যে বসে বসে নিজের মনে গুমরোয় সে…এ কী সে করেছে, ঘুমের ঘোরে অসভ্যের মত সুন্দরী তন্বীর সামনে ইজারের দড়ি খুলে… কি আহাম্মক সে! সাধারণ গ্রাম্য চাষা হলেও হয়তো কেউ কিছু মনে করত না, কিন্তু লাও-সান যে দলপতি! তারপর সেই মেয়েটি! হো হো ক'রে হেসে উঠল লাও-সানকে দেখে! লজ্জাবনত ভাইয়ের গুমরোন ভাব দেখে লাও-এর ফিরে এল। হাসতে হাসতে বলল বাপকে: 'ও আর বাইরে বের হবে না।'

'বাপ, ভাই, বোন, জামাই, অতিথি অভ্যাগত সব একজায়গায় একসঙ্গে হওয়া কত সৌভাগ্যের কথা আজকালকার দিনে!—বিদেশী শয়তানদের হামলার পর থেকে তো এসব চুকে বুকে গেছে, আর আজ সেই সৌভাগ্যের দিনে হতভাগা কিনা ঘর থেকে বের হবে না!' গজরাতে গজরাতে লিংসাও গিয়ে ঘরে ঢোকে। তারপর ছোটর কান ধরে বাইরে নিয়ে আসে। মাকে ভয় করত, মান্ত লাও-সান। দোরের কাছে এসে মায়ের হাত থেকে কান ছাড়িয়ে নিয়ে বলে: 'আঃ, কান ছাড় না, আমি কি ছোট্ট ছেলে নাকি!'

'তা ছাড়া কী !' হাসতে হাসতে লিংসাও বলে।

উঠোনে এসে মায়লীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে লাও-সান ভাবে : 'এত সুন্দর মেয়ে তো আগে স্বপ্নেও দেখি নি !'

লাও-সানের দিকে মোহাবিষ্ট মায়লী তাকিয়ে ভাবে : 'হাঁা, প্যান-সিয়াও যে-রকমটি বলেছিল, হুবহু সেই রকম।' ক্ষণেকের আবিষ্ট ভাব মুহূর্ত্তে কাটিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি উলীনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে : 'আমাদের যেতে হবে এখন—।' উলীন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। পরস্পরের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় সকলে। স্ত্রীর দিকে ফিরে বলে উলীন : 'তুমি তৈরী হ'য়ে থেকো, গোরস্থান থেকে ফিরে এসেই রওনা হব।'

উলীন-পত্নী উঠে দাঁড়ায়। উঠে দাঁড়ায় মায়লীও। শিং-মু কিছুক্ষণের জন্য সকলের কাছ থেকে বিদায় চায়। উত্তরীয় খানা সযত্নে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসে। অতিথির সম্মানের জন্য সকলে উঠে দাঁড়ায়। বাড়ীর দোর পর্যন্ত গৃহকর্তা ও কর্ত্রী মায়লীর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

উলীন ও মায়লী চলে যাবার পর দাওয়া থেকে লিংটান ফিরে এসে বসে উঠোনের বেঞ্চির ওপর। ছোট ছেলের ওপর নজর পড়ায় দেখে কি যেন সে বলতে চায়। লিংটানের কেমন সন্দেহ হয়, লাও-সান আবার এই মেয়েকে বিদেশীর গুপ্তচর মনে না ক'রে থাকে। তারপর উলীনের প্রতি তার ব্যবহারও পুত্র ও পরিবারের প্রতি দুর্বলতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে বোধ হয়। মনে মনে একটু শঙ্কিত হয় বৃদ্ধ। কোন্ অঘটনের নায়ক হিসেবে ছেলে অবতীর্ণ হবে কে জানে। বেঞ্চি থেকে উঠে ঘরের মধ্যে এলে লাও-সান বলে যে সে চায় এই মেয়েকে।

লিংটান হা ক'রে তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। প্রথমে ঠিক ধরতে পারে নি কি বলতে চায় ছেলে। তারপর বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে বলে : 'হতভাগা, বলিস কি ? মাথাখারাপ হয়েছে।'

স্বামীর চিৎকারে লিংসাও ঘরে এসে দাঁড়ায়। স্বভাবতঃ ভাবে সে ছেলের পক্ষ নিয়েই দাঁড়াবে, একথা লিংটান জানে। মেয়ে হ'লে তবু লিংসাও স্বামীর পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতো,—অভিজ্ঞতা থেকে লিংটান তাই দেখেছে। স্ত্রীর প্রশ্নে লিংটান বলে : 'আর কি ! সূর্য্য চন্দ্র গিলবার বায়না ধরেছেন ছেলে। তুই কি মনে করেছিস হতভাগা ! যেন এই সসাগরা পৃথিবীর মালিক তুই ! যা খুশি যা বাসনা তুই করবি, তাই তোর চাই।'

'উঃ, কী বকাবকি করছ! তোমাদের এই চিৎকার ও কথার চল থেকে কিছু বৌঝবার উপায় আছে? এর থেকে হাঁসের প্যাক প্যাক শুনেও বোধহয় কিছু বোঝা যায়। কী হয়েছে, কী চিৎকার করছ?' লিংসাও মাঝে প'ড়ে বলে ওঠে।

বড় ছেলে ও মেয়ে এসে দাঁড়ায় লিংটানে সামনে।

'আর কী হয়েছে! তোমার ঐ সুপুত্র ছোট ছেলে! এতদিন তিনি বিয়ে করবেন না ব'লে বেড়িয়েছেন। আর আজ ঐ মেয়েকে দেখে বায়না ধরেছেন যে তার ঐ মেয়েকেই চাই!'

'ঐ মেয়ে, ঐ মেয়ে আবার কে?' আশ্চর্য হ'য়ে লিংসাও জিজ্ঞেস করে। বিয়ের কথাবার্তা এমনিতেই লিংসাওর কাছে প্রিয়, তাতে আবার নিজের ছেলের।

'কেন, ঐ যে উলীনের সঙ্গে যে মেয়ে এসেছে—সেই মেয়ে।' লিংটান গজ্ গজ্ করতে করতে বলে।

অভাবনীয় চিন্তা···সকলেই চুপ ক'রে থাকে। রাগে ফুলতে ফুলতে লাওসান একের পর প্রত্যেকের মুখের উপর দিয়ে তার মনমাতানো ভ্রূর নীচের ক্রোধে-চুবোনো চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ উর্ধে তুলে চেঁচিয়ে ওঠে:

'আমার কেউ নেই। মা, বাবা, ভাই, বোন—আমার কেউ নেই। আমি সকলের থেকে দূরে। আমি শপথ করছি, কোনদিন যদি আর ঘরমুখো হয়েছি!—' দোরের দিকে এগিয়ে যায় লাও-সান। মা দৌড়ে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে:

'কোথায় চলেছিস তুই। কী করবি?' ধাক্কা দিয়ে মাকে সরিয়ে লাও-সান এগিয়ে যায়। 'যতদিন পর্যন্ত আমি যা চাই তা না দেবে আমি বাড়ী ফিরব না।' প্রকাশ্য দিবালোকে সমূহ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ক্ষিপ্ত যুবক গ্রাম্যপথ দিয়ে ঝড়ের বেগে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলে। দোরের পাশে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে লিংটান লিংসাওকে বলে: 'কি রত্নই যে তুমি বিইয়েছিলে, গিন্নী—'

'হুঁ, এতো তোমারই দাওয়া—'

'আমারও না, তোমারও না, এটা হ'ল এই কালের। এই দুঃসময় কেটে গেলে এদের নিয়ে যে আমরা কী করব—'

দুশ্চিন্তায়, দুঃখে মন ভারাক্রান্ত ক'রে বসে থাকে লিংটান। গৃহকর্তা হিসেবে ছেলের বিয়ে দেওয়া কর্তব্য তো তারই। কিন্তু ছেলের এই বাসনা পূরণ হবে কি উপায়ে? এই সমস্যা সমাধানের কোন পথই তো পায় না লিংটান। চাষী সে, পুরুষানুক্রমে জীবিকা তাদের চাষবাস, তাদের ঘরের ছেলের ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে চাওয়া তো আসমানের চাঁদ ধরার মত।

কিন্তু লিংসাওর মনোরাজ্যে অসম্ভব কিছু মনে হয় না ছেলের এই বায়নায়। তার ছেলে এমন কিছু ফেলনা নয়! হেঁশেলে মেয়েকে ডেকে নিয়ে মায় মেয়ে আলোচনা করে।

'তোর কি মনে হয়?···এ বিয়ে হ'লে তো ভালই হয়, না! তুই গিয়ে খোঁজ নিবি মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কিনা। বিয়ে যদি না হ'য়ে থাকে, তো চেষ্টা করবি ওকে ভাই-বৌ করার। আর আমার ছেলের মত অত মনে-ধরা স্বামী ও পাবে কোথায়!'

'কিন্তু খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে যে—'

'হুঁ, লেখাপড়া! ছেলে বিয়োতে কোন্ লেখাপড়া জানার দরকার হয়, শুনি!'

শহরবাসী মেয়ে মায়ের এই কথায় লজ্জিত হয়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে: 'আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে কথা ব'লে দেখব, মা।'

মেয়েদের দিকে একটু ঝুঁকে লিংসাও গম্ভীরকণ্ঠে বলে:

'দেখ, তুই যদি এই বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারিস, আমি তোদের মনেপ্রাণে ক্ষমা করব, আবার তোদের আপনার ক'রে নেব।'

'চেষ্টা করব মা আমি—' কিন্তু মেয়ের মনে সন্দেহ রয়েছে এই বিয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে লাও-সান সোজা পথে ছুটছিল। কিন্তু তা ছলনামাত্র। সে বুঝেছিল যে তার পেছনে রয়েছে বাবা মা দাদা দিদির শঙ্কিত দৃষ্টি। তাদের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে বাঁক ঘুরে সে চলল গোরস্থানের দিকে। গোরস্থানের পাশে এসে সে নতুন-ওঠা ছনের বনের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগোল। বাঘের নিঃশব্দ সঞ্চরণের মত তার ধীর পদক্ষেপ। দু'হাতে ছন সরিয়ে নজর ফেলেই দেখল নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে তন্বী সুন্দরী তার স্বর্গীয়া মায়ের সমাধির পাশে।

মনে মনে ভাবে লাও-সান: 'বেশ লম্বা মেয়েটি, ঠিক যেমনটি আমি চাই—!' ঈগল পাখীর সৌন্দর্য মেয়েটির মুখে, ঈষৎ পীত-স্ফটিক বর্ণ তার মসৃণ দেহে, লম্বা হাত দুটো দিয়ে ওড়নাটা ধরা—বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যুবক। গভীর মর্মস্থল থেকে তার চাওয়া, প্রস্তর-কঠিন স্থির-সংকল্প দাবী তার। বড়দা লাও-তার মতন সরল বিনয়াবনত সে নয়, এমন কি মেজদা লাও-এরের মতনও নয়। আদিম পুরুষের নাচন-কুঁদন ওর রক্তে প্রবহমান। মায়লীকে দেখে ওর হৃদয়ের পুরুষ-সিংহ মনের চারিভিতে যে দাবীর হাঁক দিল, তার রণন উঠল ওর মনের প্রতিটি কন্দরে। মনে মনে কত ভাবেই না চাইল সে এই মেয়েটিকে। লেখা পড়া জানা মেয়ে···হোক্ না, হোক্ না ওর থেকে ভিন্ন ধাতের, তাতে কি! নিজের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সজাগ লাও-সান নিজেকে অগৌরবের স্থানে রেখে ছোট ভাবতে পারে না কোনমতেই। মনে হয় মেয়েটি ওর নিজের, ওর স্বত্তার সঙ্গে যেন বিজড়িত ঐ কন্যা।

অচঞ্চল লাও-সান সুন্দরী তন্বীর রূপে বিমোহিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি টেরও পায় না। হর্ষাপ্লুত লাও-সান নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার কামনার পরম ধনকে।

অবশেষে মায়ের সমাধি দেখে মায়লী ফিরে চলল উলীনের সঙ্গে লিংটানের গৃহে। যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, পিছন থেকে দৃষ্টি দিয়ে লেহন করল লাওসান। তারপর লাওসান চলল পাহাড়দেশে।

এত কিছু যে ঘটে গেল, এর কিছুই জানল না নীলা ও লাও-এর। মায়লী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নীলা চোখ ইশারায় স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেল গোপন-ঘরে। বিজয়ের চিহ্ন আঁকা রয়েছে নীলার স্মিত মুখে।

'দেখলে কিছু—' জিজ্ঞেস করে নীলা লাও-এরকে।

'কী দেখব গো?—'

'কেন, ঐতো সেই মেয়ে!'

'কোন্ মেয়ে?'

'উঃ, কী নির্বুদ্ধি গো তোমরা। ঘটে কী একবারে কিছুতেই ঢুকবে না! ভগবান যে কি দিয়ে পুরুষদের গড়েছিলেন! কেন, তোমার ভাইয়ের কল্পনার দেবী উনি! এবার ঢুকেছে মাথায়!'

লাও-এর সত্যিই ভাবতে পারেনি। বিস্ময়ে ওর চিবুক ঝুলে পড়ে। বলে : 'ও-মেয়ে কী ক'রে হবে? উঁচু ঘরের মেয়ে যে! আর, তা ছাড়া ঐ ভাবে আসা,—শত্রুদের সঙ্গে তার কিছু সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে।' সন্দেহ ফুটে ওঠে লাও-এরের কথায়।

শিকারী কুকুরের মত নারীর মন ছুটে চলে। নীলা বলে : 'উঁহু, উঁহু, ও-মেয়ে শত্রুদের হ'তে পারে না। আমার তো সে-সন্দেহ কিছুতেই মনে আসে না।...জীবনের সাথীকে যদি পাশে পায়, কোনো মেয়ে কখনও ভেবে দেখে না কে দেশ শাসন করছে—'

'কিন্তু ওর পাশে তো ওর সাথী নেই। অনেক দূরে। আর লাও-সান কি ওকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রে নেবে যদি ঐ মেয়ের শত্রুদের সঙ্গে সত্যি সত্যিই কোন সম্পর্ক থেকে থাকে?'

'হুঁ! মেয়ে দেখলে তোমরা আবার খুঁজে দেখ কিনা অত সব। তা ছাড়া, নিজেদের এত ক্ষমতাবান মনে কর তোমরা পুরুষরা, যে বৌদের সম্বন্ধে অত তলিয়ে দেখবার প্রয়োজনই দেখ না। আর ফুরসতই বা কোথায়, শুনি!'

হো হো ক'রে হেসে ফেলে লাও-এর : 'পুরুষ আর নারীর সেই চিরন্তন কথা কাটাকাটি শুরু হ'ল দেখছি!'

নীলা হাসে না। বলে : 'কিন্তু এখানে হ'ল—'

'এখানে ওখানের প্রশ্ন নয় নীলা সুন্দরী,—দেবী প্রতিমার মত দেখতে হলেই সব কিছু হয়ে যায় না!'

ওরা গোপন-ঘর থেকে মই বেয়ে ওপরে উঠে আসে। নীলার দ্বিতীয় শিশু-দেবতা আবির্ভূত হতে পারেন যে কোন দিন। সাবধানী দৃষ্টি রেখে লাও-এর সাহায্য করে নীলাকে মই বেয়ে উপরে উঠতে। উপরে উঠে এসে তারা শোনে যে যে-বিষয়ে আশঙ্কা করছিল তারা, ইতিমধ্যে মা দিদি ওরা সব সে-বিষয়ে স্থির সংকল্পে এসে গিয়েছে। সব শুনে নীলা প্রশ্ন করে : 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু কি উপায়ে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে করা যায়?' এ-প্রশ্নের কোন জবাব কেউ দিতে পারে না।

মায়লী ফিরে এল শাসনকর্তার প্রাসাদে। উপরের উত্তরীয় খুলে বেশ সুন্দর ক'রে পাট ক'রে তুলে রেখে, হাত মুখ ধুয়ে, চুল আঁচরিয়ে আয়নার পাশে বসল। বহুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব।

সে-মায়লী যেন আর নেই, অদ্ভুত পেলবতা এসেছে তার দেহে, মনে। মায়ের স্মৃতি, তাঁর সমাধি দর্শন, পুরোনো দিনের কত কথা মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়। সব কিছু স্পষ্ট মনে পড়ে না, তবুও মনে হয়, যেন তার মনের কন্দরে বাসা বেঁধে আছে। মা চলে গেছেন সেই কবে, মায়লীর জন্মের পরেই। আজ সকালে সমাধিস্থানে দাঁড়িয়ে বারে বারে মনে হয়েছে মায়লীর মায়ের সেই সুন্দর স্নেহমাখা মুখখানা···যেন তাঁর আদরের মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবার সঙ্গে বিদেশে যেতে তিনি রাজী হননি, তাঁর সে-ব্যক্তিত্ব মাথা নোয়ায়নি কখনও, সানন্দে দেশের মাটিতে তিনি থেকে গেলেন। বাবার কাছে মায়ের কত কথা সে শুনেছে সেই শিশুবয়স থেকে। কী গভীর ভালবাসাই না ছিল তাঁদের মধ্যে। সত্যকারের গভীর ভালবাসা থেকে এই দুনিয়ায় আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নেই, একথা তার মনে গেঁথে বসে আছে।

কোমলতায় নুয়ে-পড়া মনের এই অবস্থায় মনের পটে ভেসে ওঠে একটি যুবকের ছবি। অদ্ভুত সুন্দর···সাহসী, শক্তিমান—এই তিনের মূর্ত প্রতিমূর্তি ঐ যুবক। একের মধ্যে এই তিনের স্ফুরণ আগে কোনদিন দেখেনি মায়লী। আর কি চাই এর থেকে? কিন্তু কি উপায়ে ঐ বাড়ীর একজন সে হ'য়ে যেতে পারে? এবং মিশে যেতে পারবে কি? কৃষক লিংটানের গৃহ মায়লীর কাছে অনেক অপরিচিত, অনেক বেশী বিদেশী, বিদেশীর বাড়ী থেকেও বিদেশী মনে হয়। ইতিপূর্বে তার জীবনে সে এইরকম গৃহে কোনদিন প্রবেশ করেনি।

'উঁ হুঁ, ও-ছেলেকে ঐ বাড়ী ছাড়তে হ'বে। আমাকে নিয়ে থাকবে সে··· আমিও ছেড়ে আসব সব। দু'জনে মিলে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করব।'

কিন্তু সে-দুনিয়ার গড়নের কাজ সুরু হবে কোথায়? অস্থির চিত্তে ঘুরে বেড়ায় মায়লী, যেন পাখা লাগান পরী। আগের দিনে এ বিয়ে সম্ভব হতো না কোন মতেই। একঘরে হ'য়ে থাকতে হ'ত। অনড় সমাজের কঠিন নিগড়ে ধাক্কা খেয়ে সব কিছু ভেঙ্গে চুরে শেষ হ'য়ে যেত। কিন্তু সে-সাবেকী সমাজ ভাঙ্গনের মুখে, সামাজিক নিয়ম ধুলায় লুণ্ঠিত। একালের ছেলে মেয়ে নিজেদের খুশি অনুযায়ী যা ইচ্ছে করে, পুরোনো ঐতিহ্য গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না।

'আমরা তো মুক্ত এলাকায় চলে যেতে পারি, যেখানে খুশি···ও-ছেলের শক্তি কেন যোগ হবে না আমার সঙ্গে। আমার জ্ঞান অভিজ্ঞান পাবে ও, ওর অভিজ্ঞতা নেব আমি।···উঃ ঐসব নরম পেলব পণ্ডিত পুরুষগুলোকে দেখলে আমার কেমন যেন বিরক্তি এসে যায়! আর, এ-ছেলের হাত দু'খানা

কি ! লড়াইয়ের ক্ষত চিহ্ন ওর মুখে দেখে, শক্তিধর বিজয়ী বীর ও-ছেলে—' যে কয়টি মুহূর্ত সে দেখেছে তাকে, তাই সে বারে বারে মনের আয়নায় দেখে। তার মুখের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি চাউনি, গর্বোদ্ধত পদবিক্ষেপে হেঁটে যাওয়া নায়লীর মনের পটে ভেসে ওঠে। ও-ছেলের যা কিছু পছন্দ হয় না, তা হ'লো ওর গেঁয়ো পরিবার। ভাবতে ভাবতে চিন্তামগ্ন মায়লী নীচে যায় খাবার টেবিলে খেতে। তাকে গম্ভীর দেখে শাসনকর্তা বলে : 'তোমার রাগ হয়েছে, না? রাগ করো না, আজ সকাল থেকে বড়ই দুশ্চিন্তায় রয়েছি, কী যে করি—' তারপর ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলে : 'গতকাল এদের সৈন্যবাহিনীকে খতম ক'রে দিয়েছে যারা, তাদের নেতাকে ধরে আনবার হুকুম এসেছে। কি ক'রে যে কী করি!'

'কী করে করবেন?' যুবকের সাহসী মুখ ভেসে ওঠে মায়লীর মনে : 'তা আপনি পারবেন না, আপনাদের ক্ষমতার বাইরে।'

ঘটনাস্রোত আপন গতিতে গড়িয়ে চলে। ঐ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে কী ক'রে সম্ভব হ'তে পারে, লিংটান লাও-এরবা কেউই ভেবে কোন কিনারা পায় না। বুড়ো বুড়ী দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়, লাও-এর ও নীলা ভেবে চিন্তে কোন পথই পায় না। স্ত্রীর কাছে উর্লান এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে মাথা ঝেঁকে বলে: 'শ্যালক বাবু বুঝি আজকাল মাতাল হ'য়ে হবীব স্বপ্ন দেখছেন। তাকে একটু প্রকৃতিস্থ হতে ব'লো।'

কিন্তু মায়লী অত কিছু না ভেবে চিন্তে যেন বিধিনির্দেশ একাকী এসে হাজির হ'লো লিং টানের গৃহে।

দুদিন সে নিজের দুর্দমনীয় ইচ্ছাকে চেপে রেখেছিল, কিন্তু মনে মনে বুঝেছিল যে এই আকর্ষণকে চেপে রাখতে পারবে না সে। গেলই বা একবার মায়লী ঐ গাঁয়ে। এই আকর্ষণ কি ভালবাসা? ভালবাসা ব'লে মেনে নিতে রাজী নয় সে। প্যানসিয়াওকে সে যে চেনে একথাই শুধু বলে আসবে নীলাকে।

দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ণে ভীতিহীন মায়লী প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে ধ্বংস কিংবা বিপদাশঙ্কা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। একটি ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে সে গারোয়ানকে নির্দেশ দিল কোথায় যেতে হবে। এইসব গাড়ীও আর আজকাল শহরে বড় বেশী দেখা যায় না, কারণ, বুড়ো ঘোড়াগুলোকে পর্যন্ত শত্রু-সৈন্যরা খেয়ে বসে আছে।

আসন্নপ্রসবা নীলা উঠোনে ব'সে হাঁসফাঁস করছিল। এবারে যেন তার পেটটা আরো বেশী বড় হয়েছে। আশ্চর্য হ'য়ে সেকথাই ভাবছিল সে। দুবছরের শিশুটি তার পায়ের কাছে বসে খেলছিল। এমন সময় খুট খুট শব্দ হ'ল বাইরের দরজায়। কান পেতে সে আবার শুনল। শত্রু-শয়তানদের শব্দ নয়, কারণ, ও-ব্যাটারা তো দরজায় সঙ্গীন কিংবা বন্দুকের বাঁট দিয়ে ধাক্কা মারে। দোর খুলবে কি নীলা? শাশুড়ীও আজ শ্বশুরের সঙ্গে ক্ষেতে গেছেন, লাও-এরও বেরিয়ে গেছে পাহাড়-দেশে। ছোট দেবর তো রাগ ক'রে বেরিয়ে গেছে ঐ দিন দুপুরে। লাও-এর গেছে ভাইয়ের খোঁজে। বাড়ীতে একলা রয়েছে নীলা। দোরে শব্দ শুনে তাই সে গলা কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'কে—?'

'আমি—!' দরজার ওধার থেকে জবাব দিল মায়লী। 'আমি' বললেই যেন এখানকার সকলে ওকে চিনবে!

নীলা কিন্তু ঠিক চিনতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেয়। 'ও! —তুমি! ভাবতেই পারিনি যে তুমি আবার আসবে।'

'কী ক'রে ভাববেন?'

ভিতরে প্রবেশ করলে নীলা দরজার খিল আবার বন্ধ ক'রে দিল। মায়লী বসল। অতি সচ্ছন্দ ভাব তার, যেন কোন রকম চিন্তা ভাবনা নেই। কিন্তু ওর মনের গভীরে যে ঝঞ্ঝা উঠেছে তার আলোড়ন ওপরে ওঠে না। উঠতে দেয় না, চেপে রাখে মায়লী। নীলাও কিছু বুঝতে পারে না। মায়লী নীলার ছোট ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। নীলা চা ঢালে। চা খেতে খেতে মায়লী বলে:

'আগে যেদিন এসেছিলাম সেদিন মন ভার ছিল। ভাল ক'রে কথা বলতে পারিনি। মার সমাধি দেখতে এসেছিলাম সেদিন। তাই আজ এলাম আপনাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করতে। আপনার ননদ প্যানসিয়াওকে আমি চিনি, তাকে আমি পড়িয়েছি।'

হা ক'রে তাকিয়ে থাকে নীলা, বিশ্বাস হয় না। বসে বসে শোনে সে মায়লীর সব কথা।

উঠোনের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মায়লী বলে: 'প্যানসিয়াও আপনাদের কথা আমাকে এতবার বলেছে যে যখন আমি প্রথম আপনাদের দেখলাম, আমার মনে হচ্ছিল যেন আপনারা সকলেই আমার চেনা। প্যানসিয়াও আবার আমার বড় ন্যাওটা ছিল।'

'আমাদের সকলের কথা বলেছিল?' জিজ্ঞেস করে নীলা। হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় খেলে যায়। অতি সন্তর্পনে সে এগোয়।

'হ্যাঁ, সকলের কথাই আমাকে বলেছিল। আপনাদের নাম পর্যন্ত জানি।'

নীলা তার ছেলেকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে সাপটে নিয়ে তার চোখের কোণের কি একটা ধুলোর কণা দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞেস করে: 'আমার লেখা কোন চিঠি দেখিয়েছিল?' প্রশ্ন ক'রে মায়লীর দিকে সে সোজাসুজি তাকায়। মায়লী চোখ না নামিয়ে সোজা উত্তর দেয়:

'হ্যাঁ, আমি সে-চিঠি দেখেছি।'

একটু নীরব থেকে লীলা বলে: 'তোমায় প্রথম দেখেই ছোঁড়া প্রেমে পড়েছে।'

'কোন কোন ছেলের তাই হয় বটে—' হাসতে চেষ্টা করে মায়লী. কিন্তু আশ্চর্য হ'য়ে বোঝে যে তার ঠোঁট শক্ত হ'য়ে উঠেছে।

'ও-ছেলে কিন্তু সকলের মত নয়—' ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলে: 'ভগবান যা করেন, ভালই করেন। আমার মনে যা আছে তা সোজাসুজি বলেই ফেলি, কি বল?···কি বলব আমার দেওরকে?'

দু'জনেই যেন একসাথে ভেসে উঠেছে ঢেউয়ের চূড়ায়। দু'জনের চোখের দিকে দু'জনে তাকিয়ে থাকে। ভারী সুন্দর চোখ মায়লীর···কৃষ্ণকালো মণি কিন্তু নীলার স্ফটিক-স্বচ্ছ চোখ সাহসে ভরা। আস্তে নীলা বলে: 'তুমি কিন্তু বেশ লম্বা।'

মৃদু হেসে উত্তর দেয় মায়লী: হাঁ 'আমি একটু লম্বা—'

'আমার দেওরটি কিন্তু লম্বা মেয়ে পছন্দ করে।' হাত বাড়িয়ে মায়লীর হাত ধরে অতি নম্র কণ্ঠে বলে: 'কি বলব আমি ওকে?'

সেই মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে চোখ ঘুরিয়ে নেয় মায়লী। নিজের জামার অভ্যন্তরে হাত প্রবেশ করিয়ে সে একটা উজ্জ্বল রেশমী পতাকা বের করে—স্বাধীনতার প্রতীক মুক্ত মানুষের পতাকা —শুভ্র সূর্য ও তারকা খচিত রক্তবর্ণ নিশান। এই মহান পতাকা যদি শত্রুরা দেখে কারও হাতে, তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু তবুও এই পতাকাকে পরম সমাদরে কেউ কেউ লুকিয়ে রাখে।

বিস্ময়াবিষ্ট নীলা ফিস ফিস ক'রে ব'লে ওঠে: 'ও! মুক্তির নিশান! ঐ নিশানের মতই তোমার সাহস—!'

নীলার হাতে পতাকা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মায়লী। বলে: 'আমি যাচ্ছি মুক্ত অঞ্চলে। কুনমিং-এ।'

॥ উনিশ ॥

মায়লী চলে গেলে নীলা চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইল। পায়ের কাছের ছোট্ট শিশুকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে দেহের অভ্যন্তরে নতুন শিশুর নড়াচড়া সে অনুভব করে। দু'জনের জন্যেই সে আনন্দিত, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ তন্বী মায়লীর প্রতি কেমন একটু ঈর্ষার খোঁচা যেন থাকে তার মনের কোণে। মুক্ত মেয়ে মায়লী। ওরই দেওয়া ভাঁজ-করা পতাকা নীলার কোলে। ওর মনে হয় আজ যদি স্বামীকে নিয়ে ও থাকতে পারত মুক্ত অঞ্চলে, আরও কত বড় কাজ তারা করতে পারত! কিন্তু স্বামী ফিরে এল আবার এই বন্ধনের মধ্যে, শত্রু-কবলিত গাঁয়ের ঘরে। আজ সংসারের কাজ কর্ম ছাড়া আর কীই বা করতে পারে সে। বই পড়াও তার আর হয়ে ওঠে না। বই কেনার টাকাও নেই, আর আজকাল বই যা বের হয় তা কেবল বিজেতাদের লেখা মিথ্যায় ভরা। আগে ছাপার বইয়ের যে সম্মান ছিল লোকের কাছে, আজ আর তা নেই। মিথ্যা ভর্তি ঐসব বই কাগজ পেলে তারা পুড়িয়ে ফেলে। নীলার মনে হয় ওর সমস্ত কাজকর্ম এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শুধু নতুন শিশুর মা হওয়া। কেমন দুঃখ হয় ওর মনে, কোলের পতাকাটা যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয় ওর দেহে মনে।

দুপুরে লাও-এর খেতে ব'সে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে কোন কিছুর গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন। দিনকাল যা পড়েছে তাতে আলুনী ও অল্প তেলে রান্না ক'রে রেখেছে নীলা। খেতে খেতে লাও-এর ঠিক করে যে খাওয়ার পরে সে অপেক্ষা করবে নীলার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

সকলের কাছে হৃষ্টমনে নীলা মায়লীর আসার খবর বলে। নানাভাবে প্রশ্ন ক'রে সকলেই আরও অনেক কিছু জানবার চেষ্টা করে তার এই আসা সম্বন্ধে। মায়লীর দেওয়া মুক্তির পতাকা তারা আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু এভাবে ওখানে রাখতেও সাহস হয় না। লাও-এরকে লিংটান বলে:

'নীচের ঘরে লুকিয়ে রেখে দে। ব্যাটারা যদি এটা পায়, আমাদের সব শেষ ক'রে দেবে।'

লাও-এর নীচের গোপন-ঘরে পতাকাটা লুকিয়ে রেখে ফিরে আসে। লিংসাও কিন্তু মায়লীর এই আসাকে ঠিক পছন্দ করতে পারে না। বলে:

'কী বলতে চায় ও-মেয়ে? আমার ছেলে দৌড়বে ওর পেছনে পেছনে?' রাগ প্রকাশ পায় লিংসাওর কণ্ঠস্বরে: 'এ আবার কী রকম ছেলে-বৌ?'

'উঁহুঁ, উহুঁ, ও তোমার পুত্রবধূ হবে না—' মুখ থেকে সানকিটা নামিয়ে নিয়ে, মুখের ভাত চিবোতে চিবোতে লিংটান বলে।

'মানে? ছেলেকে বিয়ে করবে, অথচ বৌ হবে না? কী পাগলের মত বকছ?'

'দেখে নিও গিন্নী—। লাও-সান বিয়ে করলে দেখে নিও।' খেতে খেতে চিন্তামগ্ন লিংটান বলে।

'তা হ'লে এ-মেয়ে মেয়েই নয়। ওকে দিয়ে যে নাতি পাব, তা মনে হয় না। অতবড় পা, অত ঘুর ঘুর ক'রে বেড়ান, স্কুলে পড়ান—ও-মেয়ের মেয়েলীত্ব মরে গেছে।'

'তোমার ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার মত ক্ষমতা আছে ঐ মেয়ের। এবং দেখবে তোমার ছেলেও ও-মেয়ে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।'

'হুঁঃ, ছেলেরা আবার কবে বোঝে ওদের কখন কি চাই!' বিরক্তি ফুটে ওঠে লিংসাওর কণ্ঠে: 'ও-মেয়ে আমাদের বাড়ীতে না আসলেই ভাল ছিল। নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মা ওকে এখানে পাঠিয়েছিল। ও-ও এল এমন সময়ে যখন ছেলের এখানে থাকার কথা নয়। কি জানি বাপু, কী যে আছে কপালে!'

'যাকগে, ছাড়ান দাও গিন্নী।...তুমি রেগে উঠছ কেন জান? তুমি চাও তোমার ছেলে বৌরা সব তোমার কথার পিঠে থাকবে। কিন্তু কী জান, এখন আর সে-দিনকাল নেই। এখন মুক্ত এলাকায় লড়বে একদল লোক, আর এখানে, এই সব ক্ষেত জমি গাঁয়ে থেকে লড়বে আমাদের মত আরেক দল।...তোমার ছোট ছেলে ঐ মুক্ত এলাকার লড়িয়ে। যেখানে খুশি যায় ও, শত্রুর বিরুদ্ধে সেখান থেকেই লড়ুক ও।'

অল্প কয়েকটি কথায় গম্ভীর ভাবে লিংটান বলল। রাশভারী লিংটান

যখন এইভাবে কথা বলে, তখন বাড়ীর কেউই আর কোন কথা বলার সাহস পায় না। বাড়ীর অভিভাবক, সংসারের মূল কাণ্ড যে লিংটান সেকথা প্রকাশ না হলেও, সকলেই যেন তা উপলব্ধি করে। লাও-এরের দিকে ফিরে বলে :

'লাও-সানকে বলিস যে ওর যা খুশি ও তা করতে পারে। তবে যেখানেই যাক আমাদের খবর না দিয়ে যেন না যায়।'

খাওয়া শেষ ক'রে নীলার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল লাও-এর। ইচ্ছে হচ্ছিল নীলাকে নিরিবিলিতে পাওয়ার। কিন্তু এই ভরা দুপুরে তার আর সে-আশা নেই। নীলাকে শুনিয়ে বলে :

'কালকের আগে আর যাব না পাহাড় দেশে। আজ বাবার সঙ্গে থেকে গমের চাষটা শেষ ক'রে ফেলব।'

স্মিত ঠোঁটে মৃদু মাথা নাড়ে নীলা। লাও-এর বেরিয়ে যায়। লিংসাও তকলি নিয়ে বসল সুতো কাটতে। যে অল্প তুলো জোগাড় করা যায় তাই দিয়ে সে সুতো কাটে। আগামী শীতের কাপড়ের ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে। নতুন জামা তৈরী করতে হবে লিংসাওর নাতির জন্য। আজ আর সে বাড়ী থেকে বেরুলো না। নীলার গর্ভে শিশু নড়াচড়া করছে। বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে সুতো ধরে তকলি ঘুরোতে ঘুরোতে শাশুড়ী পুত্রবধূকে নিজের সন্তান হওয়ার অভিজ্ঞতার গল্প বলে। চুপ ক'রে বসে বসে নীলা তাই শোনে।

সেদিন রাত্রে শোবার আগে নীলা চিন্তামগ্ন লাও-এরের জন্য এক কাপ গরম জল ঢেলে দিল। চা আর আজকাল বড় পাওয়া যায় না। গরম জলই এখন খেতে হয়। প্রিয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে লাও-এর জিজ্ঞেস করলো :
'কি গো, মুখ গোমড়া করে আছ কেন, কি হ'ল?'

জল ঢেলে দিতে দিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নীলা : 'কিচ্ছু না।'

নীলার মনিবন্ধ ধরে নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে লাও-এর বলে :
'কিছু না মানে! কিছু লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে। তোমার সব কিছু আমার জানা, কিছুই আমার থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না।'

লাও-এরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে নীলা বলে : 'ও-ভাবে আমার দিকে নজর দিয়ে দেখ কেন—'

'উঁ হুঁ, নজর দিয়ে দেখতে হয় না সোনা, তোমার দিকে না তাকিয়েও

আমি সব বুঝতে পারি। তোমার একটু পরিবর্তন হলেই আমার অন্তরে কিসের যেন দোলা অনুভব করি।'

'থাক থাক, কথার ঠাকুর আমার!' নিজেকে লাও-এরের হাত ছেড়ে দিতে দিতে, নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে একটু চেপে ধরে হাত দু'টো দিয়ে চোখের জল ঢাকতে ঢাকতে বলে নীলা। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর থেকে আজকাল নীলার চোখে যখন তখন অশ্রু জমে ওঠে। বলে :

'আমার কেবল মনে হয়, সাধারণ কৃষাণীর থেকে তো আমি বেশী কিছু করতে পারি না। আজ যদি মুক্ত অঞ্চলে থাকতুম, কত কিছু করতে পারতাম! তুমি আমি মিলে আরও কত কিছু বড় কাজ করতে পারতাম—'

'ঐ মেয়েটিকে দেখার পর থেকে বুঝি তোমার মনে এই চিন্তা আরও বেশী ক'রে হচ্ছে?···আমার মনে হয় আমরা অত্যন্ত সাহসের কাজ করছি। মুক্ত অঞ্চলে তো কত সহজেই যাওয়া যায়। ওখানে নিরাপদও বটে। বন্দুক নিয়ে শত্রু-শিবিরের ওপর হামলা করাও বোধ হয় সহজ, জীবনের ঝক্কি নিয়ে কাজ করাও সোজা—আর শত্রুকে ঘৃণা করলে এই বিপদের ঝক্কি নেবে সকলেই!—তারপর তো রয়েছে যশ, প্রশংসা···লাও-সানের মত যারা, অতি সহজেই তারা যশ পেতে পারে। কিন্তু আমাদের কাজের প্রশংসা যশ কোথায়? আমরা থেকে যাচ্ছি পিছনে—সেখানে থেকেই আমরা লড়ি। আমাদের লড়াইয়ের কায়দা ভিন্ন প্রকারের। প্রশংসা, যশ, সম্মান আমাদের জন্য নেই।' একটু চুপ থেকে আবার বলে : 'হয়তো ভবিষ্যতে একদিন আমাদেও মহাসম্মান জানান হবে।···সুদূর ভবিষ্যতের সেদিন কবে আসবে কে জানে? কিন্তু সে-সম্মান আমরা পাই আর না পাই, আমাদের কাজের প্রশংসা প্রকাশ করা হোক আর না হোক, আমরা তো আছি মাটি নিয়ে। মাটি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আর কিছু ভাবি না আমরা।'

'কিন্তু সে-মাটির মালিক তো শত্রু-শয়তানরা।' বিষাদক্লিষ্ট স্বরে বলে নীলা।

'উঁহুঁ, লাঙ্গল যার মাটি তার, চাষ যে করে মাটি হ'ল তার। শয়তানরা যদি আমাদের মাটি থেকে উৎখাত ক'রে দিয়ে ওদের দেশের লোকদের এখানে নিয়ে আসে, তখনই সত্যি সত্যি আমরা জমিহারা হব।···কিন্তু তখনও আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।' নীলা চুপ ক'রে শোনে। লাও-এর

বলে চলে : 'তোমার কথাই ধর। এক একটি শিশু সন্তানকে যখন তুমি এনে দাও, তুমি এনে দাও সমস্ত ভবিষ্যৎকে, এনে দাও ভবিষ্যৎ বংশধরদের যারা এই মাটি ধরে থাকবে। আমরা পুরুষরা শুধু চাষ করতে পারি, খাদ্য জোগাড় করতে পারি, কিন্তু আমরা তো পৃথিবীতে নতুন জীবন আনতে পারি না, আমাদের স্থান পূরণের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা আমাদের নেই, সে আছে তোমাদের। তোমরা এই ভাবেই সমস্ত জাতিকে, সমস্ত দেশকে বাঁচিয়ে রাখ।'

নীরব নীলা বসে বসে বসে শুধু শোনে স্বামীর কথা। লাও-এর বলে : 'তোমার শিশুসন্তান দিয়ে নীলা তুমি সমস্ত মাটিকে, জীবন্ত সব কিছুকে ভরিয়ে রাখ, সব কিছুকে আগলে রাখ।' শ্রান্ত লাও-এর চুপ করে। তার মনের সব কথা গুছিয়ে প্রকাশ করেছে সুষ্ঠুভাবে—যেন যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া এবং বিজয়ী হয়েছেও সে। নীলা মনে মনে বোঝে যে স্বামী তার ঠিক কথাই বলেছে।

এর মধ্যে লাও-তার দিকে যেন কারও বিশেষ নজর নেই। সাধারণতঃ সে থাকে পাহাড় অঞ্চলে এবং সে বেছে নিয়েছিল একটা সরল কাজ। শত্রু ধরার জন্য সে এখানে সেখানে ফাঁদ পাতত। নতুন নতুন কায়দায় সে ফাঁদ পাতে, কারণ শত্রুও এখন অতি সাবধানে চলাফেরা করে। এই ফাঁদ পাতার কাজে লাও-তা এখন অত্যন্ত সাহসী হ'য়ে উঠেছে। এমন কি শহরের প্রায় প্রান্ত সীমায় এসে সে ফাঁদ পাতে।

ইদানীং সাবধানী লাও-তা যেন কেমন বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছে। বিপদের কোন আশঙ্কাই যেন সে করতে চায় না। ওর যেন কেমন ধারণা হয়েছে যে ওর দিকে বাপ মা ভাইরা তেমন আর নজর দেয় না। ওকে যেন সকলে একটু একটু ক'রে ভুলে যাচ্ছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা লাও-সান সকলের চোখের সামনে। আর ও যেন অনেক দূরে হটে গিয়েছে। ঠিক ঈর্ষা নয়, তবু মনে হয় ও যেন সকলের মধ্যে থেকেও অনেকখানি দূরে সরে গেছে।

লাও-এরের কাছে সেই সুবেশা তন্বীর কথা যখন শুনল ছোট ভাই লাও-সান্, তখন মুক্ত অঞ্চলে যাওয়ার জন্য এত হৈ চৈ করল যে তা বড় বেশী কানে ঠেকল তাদের। লাও-তার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না ছোট ভাইয়ের এই হৈ হৈ ভাব, বিশেষ ক'রে এই অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ের পিছনে এই ভাবে দৌড়োন।

ঐ তন্বীর কাছ থেকে মুক্ত অঞ্চলের পতাকা পাওয়ার কথা তারা শুনেছিল। লিংটান সে-পতাকা লাও-এরকে বহন ক'রে নিয়ে আসতে দেয়নি। কি জানি যদি রাস্তায় হঠাৎ শয়তানরা লাও-এরের দেহ তল্লাসী করে। একথা শোনা মাত্র লাও-সানের মনে হয়েছিল যে সে তাকে ভালবাসে।

কিন্তু লাও-তার আজকাল স্ত্রীর অভাব মনে জেগে ওঠে বারে বারে, সন্তান কামনাও মনকে আলোড়িত করে। আবার কি বিয়ে করা যায়? গ্রামাঞ্চলে মেয়ে কোথায়? অসুস্থা, বৃদ্ধা কিংবা শত্রুদের দ্বারা নষ্ট করা মেয়ে ছাড়া তো গ্রামে মেয়ে পাওযা মুস্কিল।

একদিন সেই সৌভাগ্যই এল লাও-তার। স্বপ্নেও সে ভাবেনি এমনিভাবে মনের মত মেয়ে পাওয়া যাবে। আর ওর মনের যে অবস্থা তাতে যে কোন সুস্থ পরিচ্ছন্ন মেয়ে এলেই ও তাকে বরণ ক'রে নেবে।

শত্রু ধরার জন্য ও একদিন নতুন রাস্তার ওপরে গভীর গর্ত খুঁড়ে এক ফাঁদ পাতল। এ অঞ্চলে আগে সে কোনদিন ফাঁদ পাতে নি। দু' চারদিনের মধ্যেই বলে ট্যাক্স আদায় করতে শত্রুদের দু'এক জন লোক আসবে। রাস্তার ওপর গর্ত করে তার উপর পাতলা আবরণ রেখে দিল এমনভাবে যে বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। গাঁয়ের লোকদের সে সাবধান করে দিল যাতে তারা ঐ পথ ব্যবহার না করে।

পরদিন প্রত্যুষে কান্না শুনে সে ফাঁদের ওপরে আবরণ সরিয়ে দেখল একটি মেয়ে কাঁদছে।

তার হাত ও দেহ ধরে লাও-তা গর্ত থেকে তুলে আনল। দেখল, তন্বী না হলেও একেবারে গত যৌবনা মেয়ে নয় সে, লাবণ্য আছে, চোখদুটো গত রাত্রের কান্নায় লাল হয়ে আছে।

'সমস্ত রাত্তির ধরে ভয়ে কেবল কেঁদেছি—' লাও-তার সাহায্যে গর্ত থেকে উঠতে উঠতে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে মেয়েটি।

'এপথে, যে তুমি হাঁটবে তা কি ক'রে জানব?'

উপরে উঠে বিস্রস্ত বসন ঠিক করতে করতে প্রশ্ন করে মেয়েটি :

'এ আমি কোথায় এসেছি বলতে পার? এ অঞ্চলে আমি নবাগতা। আমার স্বামী শত্রুদের হাতে মারা গেছে, আমি যাচ্ছি শশুর শাশুড়ীর কাছে, যদি তারা মাথা গুঁজবার ঠাই দেন—'

যে-গ্রামের নাম বলল মেয়েটি, সে-নামের গ্রাম কোনদিন শোনে নি লাও-তা।

সে কথা শুনে মেয়েটি কেঁদে আকুল। এখন সে কোথায় যাবে? নিঃসম্বল নিঃসঙ্গ, পথেঘাটে যদি শত্রুর হাতে পড়ে, ইজ্জৎ জীবন কিছুই বাঁচবে না। কেঁদে ফেলে মেয়েটি।

লাও-তা হা ক'রে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। করুণায় বিগলিত হয় তার মন। মেয়েটি বিধবা, শয়তান ব্যাটারা এর স্বামীকে হত্যা করেছে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে: 'তুমি কিছু খেয়েছ? তারপর তার আস্তানা থেকে কিছু খাবার এনে অভুক্ত মেয়েটিকে খেতে দিয়ে লাও-তা একটু দূরে বসে বসে মেয়েটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে: 'এ যোগাযোগ কেন? ওরই পাতা ফাঁদে কেন এমনভাবে পড়বে মেয়েটি? একি বিধি-নির্দিষ্ট কিছু?'

মেয়েটির খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে লাও-তা বলে: 'কোথায় এখন যাবে? ...আমাদের বাড়ী এখন থেকে খুব দূরে নয়। একদিনের পথ হবে। যদি যেতে চাও তো আমার সঙ্গে আসতে পার। মা আমার খুব ভাল লোক। তুমি আসতে পার।' মেয়েটির মন বুঝবার জন্য লাও-তা কথাটা বলল।

মেয়েটির যেতে অনিচ্ছা হওয়ার কোন কারণই নেই। কোথায় কোন্ বিপদের মাঝে একাকী গিয়ে সে পড়বে? রাজী হ'য়ে সে লাও-তার পিছনে পিছনে হাঁটে। হাতে মোটা নীল কাপড়ের একটি পুঁটুলি। অনেকটা রাস্তায় তাদের প্রায় কোন কথাই হয় না। কিন্তু এভাবে হঠাৎ একজন মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে ওঠা কি ঠিক হবে? মা কী ভাবে নেবে? একটা সাফ ব্যবস্থা ক'রে গৃহে প্রবেশ করা উচিত মনে হয় লাও-তার। সমস্ত জড়তা দু'হাতে সরিয়ে ফেলে লাও-তা মেয়েটির দিকে ফিরে বলে:

'দেখ, আমি বিপত্নীক, দুটো সন্তান ছিল আমার, মারা গেছে।...তোমার স্বামীও নেই।...পরস্পরকে যদি আমরা গ্রহণ করি, আমাদের ভাঙা সত্ত্বা কী জোড়া লেগে এক হতে পারে না?'

মাথা গুঁজবার সামান্য ঠাঁই এর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিঃসম্বল মেয়ের কাছে এ প্রস্তাব তো হাতে চাঁদ পাওয়া। সে বলে: 'তুমি যদি আমাকে গ্রহণ কর—!'

নিশ্চিন্ত লাও-তা মাথা ঝাঁকিয়ে এগোয়। লিং গ্রামের পথ দিয়ে তারা এসে হাজির হয় লিংটানের গৃহে।

•

সেইদিন নীলার প্রসব বেদনা উঠেছে। সমস্ত দিন ধরে ব্যথা,

কিছুতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। সব রকম ব্যবস্থা ক'রে অতিব্যস্ত হ'য়ে লিংসাও ঘুরছে, নীলার হাল দেখে লাও-এরের অবস্থা প্রায় পাগলের মত। ব্যথায় মুষড়ে পড়েছে নীলা। এবারের সন্তান যেন বড় বেশী বড়।

লিংসাও একবার তাকিয়ে দেখল যে লাও-তা এক অচেনা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে এল। কিন্তু নজর দেবার সময় এখন নেই তার। নীলার অবস্থার কথা তখনও লাও-তা জানত না। লাও-তা বলল :

'মা তোমার নতুন পুত্রবধূকে এনেছি—'

'আর বৌ! বৌদের নিয়ে আমার জীবনাতিষ্ঠ। আর পারি না বাপু। মেজ বৌর বাচ্চা হচ্ছে না, কষ্টতে মেয়েটা মরে যাচ্ছে। বাড়ীতে কি আর শান্তি আছে!···ছেলেই বল, আর ছেলের ছেলেই বল, কেবল অশান্তি আর অশান্তি, ঝামেলার আর শেষ নেই—' নিজের মনে বক্ বক্ করতে করতে চলে যায় লিংসাও।

গাঁয়ে ঢুকে এ-বাড়ীর অবস্থা দেখে নবাগতা মেয়েটির বেশ ভালই লাগল। নিজের ভাগ্য এদের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত সে ক'রে ফেলল। নীল পুঁটুলিটা দাওয়ায় রেখে অতি বিনয়ী কণ্ঠে বলল :

'প্রসবের ব্যাপারে আমি কিছু সাহায্যে আসতে পারি। অনেক প্রসবই আমি করিয়েছি।···প্রয়োজন না হ'লে এভাবে ভগবান আমাকে এখানে নিয়ে আসবেনই বা কেন! পথ ভুল ক'রে ঘুরতে ঘুরতে আপনার ছেলের পাতা ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলাম। সে-ই আমাকে গর্ত থেকে তুলে—'

অত কথা শুনে তলিয়ে বুঝবার সময় নেই এখন লিংসাওর। তাড়াতাড়ি সে বলে : 'আচ্ছা, এস তো তুমি আমার সঙ্গে—' নীলার বিছানার পাশে সে তাকে নিয়ে আসে।

নীলার দিকে মৃদু হেসে তলপেটে হাত রেখে সে সাহায্য করতে লাগল নীলাকে। নবাগতার স্মিত মুখ দেখেই হোক কিংবা তার হাতের মৃদু চাপের জন্যই হোক নীলার একটু আরাম বোধ হয়। তারপরেই নীলার প্রসব বেদনা আরও তীব্র হয়, এবং নীলার দু'ঘণ্টার কষ্টচেষ্টা ও নবাগতার সাবধানী হাতের আকর্ষণে অনিচ্ছুক শিশু তার মাতৃ-গর্ভের আবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হ'ল। লিংসাও এগিয়ে এসে নাতিকে ধরল। নীলার দিকে তাকিয়ে নবাগতা মেয়েটি বলে : 'আরেকটি শিশু আছে যে— জমজ ছেলে—।' আবার চেষ্টা ক'রে নীলা দ্বিতীয় ছেলে প্রসব করল।

দুই নাতিকে নেয়ে লিংসাও আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যায়। নতুন শিশুরা প্রাণখুলে চিৎকার করে।

নবাগতা মেয়েকে ভাল লাগে লিংসাওর। এই অসময়ে এর আগমন যেন মনে হয় ভগবানের আশীর্বাদ। বলে : 'তোমাকে কী বলে যে আশীর্বাদ করব জানি না। তুমি একটু বিশ্রাম ক'রে খেয়ে নাও।'

হেঁশেলে ঢুকে লিংসাওর মনে হয়, এই মেয়েকেই না লাও-তা বৌ করে এনেছে বলল! বয়স একটু বেশী—, একে পুত্রবধূ বলে বরণ ক'রে নিতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু একে এখন পরিত্যাগই বা করা যায় কি করে? স্বামীর সঙ্গে একবার আলোচনা করা দরকার মনে করে লিংসাও।

ইতিমধ্যে লাও-তা তার বাবাকে সব কথা বলেছে। বুড়ো আসে হেঁশেলে গৃহিণীর পাশে। উনুনে জ্বালানী দিতে দিতে লিংসাও বলে : 'এ মেয়েকে আমি বৌ বলে বরণ করতে পারতাম না। কিন্তু যা দিনকাল—'

'কিন্তু ছেলেকে তুমি এখন না করবে কি করে?' জিজ্ঞেস করে লিংটান। লিংসাও বুঝল যে লিংটানের খুব অমত নেই এ-বিয়েতে। কিন্তু তবুও একবার খোঁজ নিতে হয় এ মেয়ে আবার বন্ধ্যা না হ'য়ে থাকে। বন্ধ্যা মেয়েকে কোনমতেই পুত্রবধূ করবে না লিংসাও।

খেতে বসেছে যখন মেয়েটি, তখন বেশ নম্রস্বরে প্রশ্ন ক'রে জানল লিংসাও মেয়ের আগের জীবনের ইতিহাস। শত্রুদের হাওয়াই জাহাজ থেকে বোমা পড়ে তার ছেলেরা মারা গেছে। স্বামী ছিল মুচি। সে-ও সেদিন মারা গেছে। বয়স তার ছত্রিশ। বয়স একটু বেশী মেয়েটির। তা হোক।

মেয়েটির জীবনের করুণ ইতিবৃত্ত শুনে লিংসাওর প্রাণ গেলে যায়। লাও-তার কথাই মেনে নেয় লিংসাও। ভগবান যা পাঠিয়েছেন তাই মাথায় তুলে নেয় সে, পুত্রবধূ ক'রে নেয় নবাগতা মেয়েটিকে।

॥ কুড়ি ॥

লিংটানের গৃহ আবার ভরে উঠল এই ভাবেই। শত্রু-শাসনের দুর্যোগ সত্ত্বেও তার জীবন কেটে যাচ্ছে কোনমতে। এদের অত্যাচারের এতটুকু কমতি নেই। ট্যাক্সের পাহাড় বসেছে ঘাড়ে আর শয়তানদের লোভের যেন

আর শেষ নেই। আফিং-এর ছড়াছড়ি চারদিকে। শুধু শত্রুদের নিজেদের মধ্যে আফিং-এর প্রচলন নিষিদ্ধ। খাদ্য ও ব্যবহার্য সব পণ্য আজ শত্রুর হাতে। রেশম, সিমেন্ট, চালের কারবার, মাছের আড়ৎ, কলকারখানা সব-কিছু তাদের কুক্ষিগত। শয়তানরা সবকিছু লুটে নিয়ে পাচার ক'রে দিচ্ছে নিজেদের দেশে। এদেশের যতসব ভাল ভাল জিনিস, এমন কি নতুন পুরোনো লোহা, তালা, পেরেকে, ছুড়ি, কোদাল, খন্তা, চাষের লাঙ্গলের ফলা—লুকিয়ে না রাখলে কিছুই বাদ পড়ছে না ওদের লুণ্ঠন থেকে। অনেকদিন লিংটান ভেবেছে, ভেবেছে অত্যন্ত তিক্তভাবে:

'শয়তান ব্যাটারা, সব কিছু তোরা লুটেপুটে নিতে পারিস, কিন্তু পারবি না আমাদের মাটি নিতে, মাটি চালান দিতে পারবি না তোদের বন্ধ্যা দেশে। ব্যাটারা যুদ্ধ ঘোষণা না করেও যুদ্ধ করলি আমাদের বিরুদ্ধে। এখন চাইছিস শান্তি। শান্তি চাইলেই, শয়তানরা, শান্তি পাবি মনে করেছিস?'

আর মাটিও যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সে-ফলনও আজ আর নেই। শয়তানদের হামলার আগে গ্রামের মোড়ল মুক্ত স্বাধীন লিংটান—গর্ব ও সম্মানের সঙ্গে বাস করতো গ্রামে। আর আজ? ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে বেটে বেটে শয়তানরা আস্ফালন ক'রে যায়, নীরবে মাথা নুইয়ে তাই শুনে যেতে হয় লিংটানদের। রাগে দিশেহারা হ'য়ে গেলেও চুপটি ক'রে সহ্য করতে হয়। মাটি ছেড়ে তো তারা যেতে পারবে না। মাঝে মাঝে এই উৎপাত অসহ্য ঠেকে লিংটানের কাছে। কিন্তু এই উৎপাতের শেষ কোথায়? এক এক দিন সে একেবারে মুষড়ে পড়ে। শুধু কী সহ্যই ক'রে যেতে হবে শয়তানদের এই অত্যাচার-উৎপাত? মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে এদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারার সম্ভাবনার ক্ষীণ আলোও যদি দেখা যেত—! শুধু কী সহ্য থেকে জয়ী হওয়া যায়? লিংটানের মনে গভীর সমস্যা নাড়া দিতে থাকে অষ্টপ্রহর। এসব দুশ্চিন্তার দিনে লিংটান গম্ভীর হ'য়ে পড়ত, লিংসাওর মুখ-ঝাঁকানি কিংবা নাতিদের হুটোপাটি হাসিও তাকে চাঙ্গা করতে পারত না। এসব সমস্যার সমাধান লিংসাওই বা কী দেবে? গম্ভীর লিংটানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটাই যেন মুখ কালো ক'রে নির্জীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এসব দিনকে লিংসাও মনে মনে ভয় করত।

সেই মুখ-গোমড়া-করা দিনই এল এবং এল লিংটানের ষষ্টিতম জন্মদিবসে। সাবেক দিনে মোড়লের জন্মদিনে গাঁয়ের লোকেরা আসত শুভ কামনা

জানাতে। খাওয়া-দাওয়া উৎসব হতো। মানুষের জীবনে এই ষাট বৎসর পূরণের জন্ম-দিবস মহা আনন্দের, বিশেষ ক'রে সে যদি পুত্রসন্তান বেষ্টিত এবং সৎ লোক হয়। আজ যদি দেশের সুদিন থাকত, ছেলেরা থাকত বাপের চারিধারে, স্বজন বন্ধু পরিবেষ্টিত লিংটানের ভরা সংসার আজ আনন্দে নাচত। মোড়লকে গাঁয়ের বন্ধুরা কত উপহার দিত আজ, লিংটান হৃষ্টমনে তাদের শুভকামনার মধ্যে সেসব গ্রহণ করত, আবার দিতও কত কিছু তার আত্মীয় বন্ধুদের।

কিন্তু সেই শুভদিন পালন করা তো আজকাল আর সম্ভব নয়। তৃতীয় পুত্র লাও-সান চলে গেছে মুক্ত অঞ্চলে, কর্মব্যস্ত জ্যেষ্ঠপুত্র লাও-তা কেবল পাহাড় থেকে আসা-যাওয়া করে। জন্মদিনের উৎসব তো দূরের কথা, এক টুকরো মাংস পর্যন্ত নেই ঘরে। বেঁচে থাকার তাগিদে অতি সন্তর্পনে হিসেব ক'রে খাদ্য খরচ করতে হয়। সমস্ত গ্রীষ্মের টানাটানির দিন তো সামনে পড়ে রয়েছে। এমনি ভাবে কতদিন চলবে? আর যেন পেরে ওঠে না লিংটান। নিজেকে আজ সত্যিই পরিশ্রান্ত ও বৃদ্ধ মনে হয়। বড় বেশী ভার ঠেকে যেন আজ নিজের কাছে নিজেকেই।

একদিন ধানের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়: 'শস্য দেখে, নিজের মাটি দেখে আর সে-আনন্দ তো অনুভব করি না এখন। মাটি যদি নিজেকে উজার ক'রে শস্য দেয়, তাতে তো আনন্দ আসে না, আসে বিপদ। সে-উজার-করা শস্য তো যায় শয়তানদের পেটে। যদি শস্য কম হয়, মনে হয়, মা বসুমতী রাগ করেছেন, কিছু অন্যায় ক'রে ফেলেছি বোধহয়।—ঐ শয়তান পশুগুলো যতদিন পুণ্যভূমি আঁচড়াতে থাকবে, ততদিন আর মানুষের শান্তি নেই, আনন্দ নেই।' আজ সর্বপ্রথম লিংটানের মনে সন্দেহ জাগে: 'জমি আঁকড়িয়ে পড়ে থেকে কী সত্যিই ভাল করেছি? এইভাবে বছরের পর বছর চাষবাস ক'রে শস্য উৎপাদন ক'রে শয়তানদের খাইয়ে রাখছি তো আমরাই।' অত্যন্ত তিক্ত সত্য মনে হয় লিংটানের। একদিন বিক্ষুব্ধ বৃদ্ধ বললো লাও-এরকে:

'একটু আশার বাণীও যদি শোনা যেতো কোথাও! একটু সমর্থন, মানুষের ক্ষুদ্র হাতের মতনও যদি সেটুকু ক্ষুদ্র সাহায্য হতো! দুনিয়ায় আজ সকলেই কেবল নিজের নিজের কথাই ভাবছে।'

লিংটান শুনেছে যে অনেক দেশ যারা মুখে বন্ধু বলে, তারা শত্রুদের কাছে যুদ্ধের মারণাস্ত্র সব বিক্রি করছে। মানুষের সদাচার, সাধুতা আজ

কোথায় চলেছে? নিজেরা যুদ্ধ না করলেও মুনাফার লোভে যদি মারণাস্ত্র সব তারা যুদ্ধবাজদের কাছে বিক্রি করে, যুদ্ধবাজ শয়তানরা তাই দিয়ে যখন সরল মানুষদের ঐইভাবে হত্যা করে, তখন ঐ মুনাফাখোর যুদ্ধাস্ত্র বিক্রেতাদের যুদ্ধবাজ শয়তানদের থেকে ভাল বলবে কিসে? পাঁচ বছর হলো লিংটানদের ওপর ঐ শয়তানদের হামলা চলেছে, আর এই সব বন্ধুদেশ-গুলোর কারবার তারা দেখছে। ওদের সাহায্যের আশায় বসে থাকা বৃথা। লিংটান একদিন লাও-এরকে বললে : 'এই দুনিয়ায় আর মানুষ মানুষ নেই, ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়ের কথা আর কেউ ভাবে না। মানুষের এই অবস্থা হ'লে ধ্বংস অনিবার্য।'

আশাহীন লিংটান একেবারে মুষড়ে পড়ে। যে চাষবাসে তার আনন্দ, তাতে পর্যন্ত আর সে মননিবেশ করতে পারে না। মুখে খাওয়া রোচে না। স্বামীর এই অবস্থা দেখে উৎকণ্ঠিত লিংসাও লাও-এরকে বলে : 'বাপের দিকে দেখরে। জীবনে কোনদিন কোনকিছুতে যে আশাহীন হয় নি, আজ যে সে একেবারে মুষড়ে পড়ল! কী যে উপায় হবে? যে কোন ভাবে মনে আবার আশা ফিরিয়ে আনতে পারলে তোর বাপ বাঁচবে—'

'কিন্তু কী ভাবে সে-আশা জাগাব মনে? কোনো রাস্তাই তো দেখি না, মা—' দুঃখক্লিষ্ট কণ্ঠে লাও-এর বলে : 'চারদিকের যে অবস্থা, তার মধ্যেই আশা খুঁজে নিতে হবে, এটুকুই শুধু মনে হয়। এ জিনিস তো মা কেনাও যায় না, পথে কুড়িয়েও পাওয়া যায় না।'

কেঁদে ফেলে লিংসাও : 'তা হ'লে আর ওঁকে বাঁচান যাবে না!··· এতদিনের সংগ্রামে হেরে গেলাম! শয়তান বেটারা এবারে সত্যিই জিতল।'

গভীর ভাবে চিন্তা করে লাও-এর। পথ কই? বাবার নিরাশ মনে আশার বর্তিকা আবার কি ভাবে জ্বালানো যায়? হঠাৎ তার মনে পড়ে পণ্ডিত-খুড়োর কথা। বহুদিন তার কোন খবরই তারা রাখেনি। তবে সে যে বেঁচে আছে সেকথা লোকমুখে প্রচারিত টুকরো খবর থেকে বুঝতে পারে লাও-এর। মুখে মুখে এসব খবর শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হ'য়ে যখন গ্রামে এসে পৌঁছয় তখন গোড়ায় যে কি খবর ছিল তা কেউ ধরতে পারে না। লাও-এর ভাবে : 'পণ্ডিত-খুড়োর কাছে বাবাকে নিয়ে গেলে হয়তো কোন আশা-জাগান খবর শুনে বাবা আবার আশাবাদী হ'তে পারে।'

লিংটানের জন্মদিনে একটা মাছ লুকিয়ে ধরে তাই রান্না করল লিংসাও।

ভাল ক'রে দোর বন্ধ ক'রে তাই দিয়ে খেল সকলে উৎসবের খাওয়া। লাও-এর বলল লিংটানকে : 'চল যাই বাবা, আজ শহরের সেই চা-খানায়। পণ্ডিত-খুড়োর কথা একবার শুনে আসি।'

লিংটানের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু ছেলের ঔৎসুক্য দেখে রাজী হ'লো। সেই আগের মতই লিংটান ও লাও-এর আন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে লুকিয়ে চা-খানার পিছন ঘরে পণ্ডিত-খুড়োর সংবাদ শুনতে গেল। এই কয়েক মাসে পণ্ডিত আরও কৃশ হয়েছে, আরও শুকিয়েছে, আফিং-এর নেশা তাকে আরও স্বপ্নাবিষ্ট ক'রে দিয়েছে। আজ যদি লিংটান নিজের পরিচয় দিয়েও পণ্ডিতের সামনে দাঁড়ায়, পণ্ডিত আজ তাকে চিনতে পারবে না। আফিংখোর বুড়ো নেশার খরচ তোলার প্রয়োজনেই এখন পর্যন্ত এই সংবাদ বিতরণের কাজটী ঠিকমত ক'রে চলেছে। তবে সেদিনেরও প্রায় শেষ হ'য়ে এল, ঐ নেশায় ডুবে থাকার জন্য সে যে আর বেশীদিন বাঁচবে না, তাকে দেখেই এটা সকলে বুঝেছিল।

টুলের উপর বসে পণ্ডিত তার সদা কম্পমান হাত দিয়ে বার তিনেক চেষ্টা ক'রে অতিকষ্টে চশমাটা নাকের ওপর বসিয়ে বলল :

'কাল যে নেতাদের সাক্ষাৎকারের কথা বলেছিলাম, তার ওপর একটা বিবৃতি আছে। বিবৃতিটা হ'লো—'

আলখাল্লার পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে সে পড়ে :

'বিজিত দেশের অধিবাসীদের কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে। তাদের কঠিন সংগ্রামে আমরা তাদের আশা দিচ্ছি। আমরা দৃঢ় আশ্বাস দিচ্ছি যে তাদের এই কষ্ট ভোগ এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম বৃথা যাবে না। পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুর্গম হতে পারে কিন্তু পথের শেষে আলো জ্বলছে।'

এই সাহসে-ভরা আশার বাণী লিংটানের কানে বর্ষিত হয় উর্বরা ধরণীর বুকে বীজ ছড়ানর মত। সে জিজ্ঞেস করে :

'কে বলেছে একথা ? কাল আমি আসিনি—'

পণ্ডিত আর কিছুই বলে না, ঝিমোতে থাকে। শ্রোতাদের কাছ থেকেই লিংটান শোনে বিষদভাবে যে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের জনসাধারণ ও সরকার আজ শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে। সংগ্রামে নেমেছে আজ সকলে, নেমেছে মেই দেশের লোক, ইং দেশের লোক, নেমেছে সকল দেশের

মানুষ ঐ বিবৃতি দিয়েছে ইং দেশের নেতা। সত্যিকারের আশার বাণী শুনে মনের সমস্ত নিরাশা ঝেড়ে ফেলে লিংটান বলে :

'শত্রুর বিরুদ্ধে আজ যখন তারা সকলে নেমেছে, তা হ'লে তো তারা আমাদের সাথী।' আনন্দাশ্রু নামে লিংটানের গাল বেয়ে চার-দিকে ধ্বংস দেখেছে লিংটান, নিজের শ্রীমণ্ডিত গৃহ জীর্ণ হ'য়ে ভেঙে পড়েছে, সমস্ত গ্রাম আজ হতশ্রী, মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য চারদিকে। এত দেখেও লিংটানের চোখে জল পড়েনি কোনদিন। আজই প্রথম ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ চার বছরের মধ্যে আশার বাণী শুনে তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ছেলের দিকে ফিরে বলে :

'চল রে যাই—'

আশা-উদ্বেলিত বৃদ্ধ পিতার পিছনে পিছনে হাঁটে লাও-এর। একটি কথাও কেউ বলে না। নির্জন শহরের অলি গলি পার হ'য়ে উপত্যকার পুরোনো পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে তারা চলে গাঁয়ের দিকে। আকাশের কোলে পাহাড়ের কালো ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে চাঁদ নেই।

বাবার মত অত আশায় উদ্বেলিত হয় না লাও-এর। ইং ও মেই নেতাদের কথায় অত বিশ্বাস তার নেই। সে বাবাকে বলতে চায় : 'পরের সাহায্যের ওপর অত আস্থা না রাখাই ভাল, বাবা। বিনা উদ্যোগে কে আর সাহায্য করবে?' কিন্তু কিছু বলে না। বাবার কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে। বৃদ্ধ নীরব। সেও চুপচাপ হাঁটতে থাকে। লাও-এরের মনে হয় যে বাবার মনে যে-আশা জেগে উঠেছে তাকে সে সন্দেহাচ্ছন্ন করবে না। থাকুন তিনি সেই আশা নিয়েই। লাও-এর যুবক, জীবনে অনেক পথ-পরিক্রমাই তো তার বাকী। অতখানি আশায় উদ্বেলিত না হয়েও সে বাঁচতে পারবে। নিজের মনের মধ্যে তিক্ততা চেপে রেখে লিংটানের পিছন পিছন সে হাঁটে। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ মাথা তুলে তাকায় আকাশের কোলে নক্ষত্ররাজির দিকে। হাত তুলে ঝিরঝিরে বাতাসের গতি অনুভব করে। নীরন্ধ্র অন্ধকার চিরে হঠাৎ লিংটান জিজ্ঞেস করে :

'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, না?'

জলের প্রয়োজন হয়েছে অ—

লাও-এর উত্তর দেয়